বিশ্ববিবেক

সম্পাদনা :

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
শংকর

বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৭০
জুন, ১৯৬৩

প্রকাশক :
স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
সুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবুবিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
কানাই পাল

দশ টাকা

বিশ্ববিবেক

"তিনি তাঁহার বিবেককে ভাবী-ইতিহাসের
উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন।"
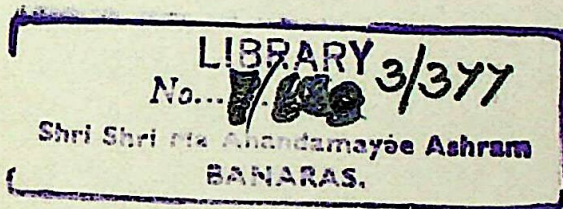
আমাদের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমাদের এই সামান্য শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশিত হল। তাঁর বিবেক বিশ্ব ইতিহাসের সামনে ধ্রুবতারার দীপ্তিতে পথনির্দেশ করছে। এই গ্রন্থের নামকরণের মাধ্যমে আমরা যা বলতে চেয়েছি তা হল, বিবেকানন্দ বিশ্ব-ইতিহাসের চরিত্র—কেবল ভারত-ইতিহাসের নন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর জীবন বিভিন্ন যুগ ও কালের সামনে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করবার সম্ভাবনা সম্পন্ন। অনাগত কালে আমাদের এই বিশ্বাসের সত্যতা যখন নির্ণীত হবে তখন আমরা কেউই জীবিত থাকব না; আমরা তাই কেবল আমাদের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করে গেলাম।

স্বামীজীর তিরোধানের পর যে ষাট বছর অতিবাহিত হয়েছে তার কথাই ধরা যাক না কেন। পরাধীন হতশ্রী ভারতবর্ষে তাঁর জন্ম এবং সেই ভারতেই তাঁর মৃত্যু, আর এই এতোদিন পরে স্বাধীন ভারতবর্ষে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই দুই যুগে, ইতিহাসের দুই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মর্মবাণীও আমরা দু'ভাবে গ্রহণ করেছি। পরশাসিত ভারতবর্ষে যা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তা হল তাঁর কর্মযোগ, সেবাধর্ম, ও নিপীড়িত ভারতবাসীর প্রতি অমেয় প্রেম, আর আজকের নতুন পরিবেশে স্বামীজীর সর্বজনীন মানবমুক্তি ও বিশ্বধর্মের আদর্শও ক্রমশ বরণীয় হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের বিস্ময়কর তৎপরতার ফলে স্বামীজীর যাবতীয় বাণী ও রচনা সুলভে প্রকাশিত হয়েছে; বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁর সমগ্র রচনার অনুবাদও প্রকাশিত হচ্ছে। খণ্ডিত না করে তাঁকে সমগ্রভাবে দেখার এই সুযোগকে আমরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আমাদের এই সঙ্কলনেও বিবেকানন্দের এই সামগ্রিক রূপটির কথা মনে রাখবার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থ সঙ্কলন কালে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—স্বামীজীর রচনা ও বাণী, তাঁর সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী মনস্বী ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা,

আলোচনা এবং আধুনিক কালের চিন্তাশীল লেখকদের রচনা সঙ্কলিত করে তাঁর মানসমূর্তি, চরিত্র, কর্ম ও সাধনার একটি সমগ্র রূপের অবধারণা করা। এই প্রসঙ্গে আমরা সর্বদা মনে রাখার চেষ্টা করেছি যে, বিবেকানন্দ নিছক মননসাপেক্ষ চরিত্র নন; তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বিরাট মনীষী—একথাও সত্য। এই সঙ্কলনে আমরা তাই তাঁর গভীর জীবন ও গভীর চিন্তার একটা সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করেছি। এই উদ্দেশ্যে বহু তথ্যের সন্ধান, পরীক্ষা ও নির্বাচন করতে হয়েছে। স্থানাভাবের জন্য আমাদের প্রাপ্ত উপাদান ও তথ্যের অনেক অংশ মুদ্রণ সম্ভব হল না। ঐ একই কারণে অতিপরিচিত ও বহুলপ্রচারিত গ্রন্থ ও রচনাদি সম্বন্ধে কিছু কৃপণতা করতে হয়েছে। স্বামীজী-সংক্রান্ত যে সমস্ত নতুন তথ্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত ও পরিবেশিত হচ্ছে, তাতে তাঁর সম্বন্ধে একটি বিশালকায় কোষগ্রন্থ সঙ্কলন ইতিমধ্যেই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমরা এখানে তারই সামান্য সূচনা করে গেলাম।

এই সঙ্কলনের শেষাংশে একটি ইংরেজী রচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিশ্বসভায় ইংরেজী লেখক ও বক্তা বিবেকানন্দের একটি বিশেষ স্থান আছে; এবং 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে কোন আলোচনা না থাকলে সঙ্কলনটি অসম্পূর্ণ বিবেচিত হবার ভয় ছিল। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিভিন্ন ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত স্বামীজী সম্পর্কিত একটি গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হল। যতদূর জানি, এই ধরনের প্রচেষ্টা পূর্বে কখনও হয়নি।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন: আমরা নীরস চিন্তায় যেমন বিশ্বাস করি না, তেমনি 'নিশ্চিন্ত' ভাবাতিরেকও ক্ষতিকর একথা জানি। তবু শেষপর্যন্ত বিবেকানন্দের জীবনের একটি দুর্জ্ঞেয় অংশ আছে, যেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। সে অসামর্থ্য আমাদের মনে জাগরূক ছিল সর্বসময়।

২০শে জুন, ১৯৬৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্করীপ্রসাদ বসু
শংকর

বিশ্ববিবেক সম্পাদনায় আমরা তিনজন কিভাবে একত্রিত হলাম? যিনি আমাদের তিনজনের যোগসূত্র তাঁর নাম শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ-পূজারী, বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউসনের এই প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমেই আমরা প্রথম বিবেকবাণীর আস্বাদ লাভ করেছিলাম। বিশ্ববিবেকের প্রকাশ উপলক্ষে সেই নীরব সাধকের উদ্দেশে তিনজন প্রাক্তন ছাত্রের সশ্রদ্ধ প্রণাম রইল।

অসিত, শঙ্করী ও শংকর
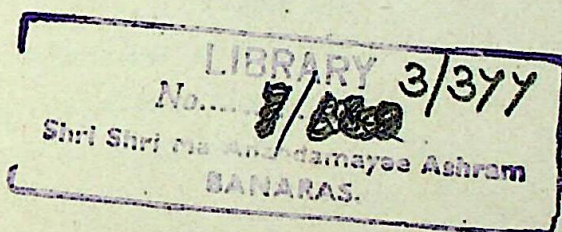
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বহুজনের সহায়তা ভিন্ন এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ যে সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন, ও অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য, মহেন্দ্রনাথ দত্তের ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাবলী, শ্রীমতী লুই বার্কের গবেষণা গ্রন্থ 'আমেরিকায় বিবেকানন্দ' আমাদের কর্ম ও চিন্তার উৎসস্বরূপ হয়েছে। হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম গ্রন্থাগার ও হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউসনের কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বামীজী সম্বন্ধে রচনাটি পাতিপুকুর স্বামীজী-সঙ্ঘের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়েছে।

সূচী

আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ

———

আত্মপরিচয়

স্বামী বিবেকানন্দ

[১] বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্টযন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর, বদমাস বলিয়াছে। (মাদ্রাজে অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ।.........

গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই। তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর, পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর; আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভাব লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথাকথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর যদি আমার স্বদেশে লোকে আমায় জুয়াচোর ভাবিয়া থাকে, তবে যখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থভিক্ষা করিতে দেখিবে, তখন তাহারা কি না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি, কিন্তু হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন

১। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত

করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর ; বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য ; তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

মাসাচুসেটস্, ২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩

[১] 'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্য একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাই-এর নাগরকার ; বীরচাঁদ গান্ধী জৈনসমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনিবেসাণ্ট ও চক্রবর্তী থিয়সফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মজুমদারের সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল। আর চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে 'শিল্পপ্রাসাদ' পর্যন্ত খুব ধূমধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, তাহার পরে প্রকাণ্ড গ্যালারি ; তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। তার আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সংগীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল ; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুরদুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া

১। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত

অগ্রসর হইলাম। ডক্টর বারোজ আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিকবসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু'এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন; 'মূকং করোতি বাচালং'—হে ভগবান, তুমি বোবাকেও মহা বক্তা করিয়া তোল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। চিকাগো, ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩

১ আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোট ভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের একমাত্র কোমল স্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে, আমি নিষ্ঠুর পাষাণ নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকে তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনো করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না। আর তা ছাড়া যে সকল যুবক বর্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করিবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণস্তম্ভের মত দাঁড়াইয়াছে—তাহাদেরই বা কী অবস্থা হইত? ইহারা ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার, অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে—আর এই তো সবে আরম্ভ। প্রভুর ইচ্ছায় ইহারা এমন কাজ করিয়া যাইবে যাহার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ ইহাদিগকে আশীর্বাদ করিবে। সুতরাং একদিকে ভারতের ও বিশ্বের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা, এবং যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোময় গর্ভে ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, যাহাদিগকে সাহায্য করিবার কিংবা যাহাদের বিষয় চিন্তা করিবার কেহ নাই—তাহাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা,—আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয়স্বজন, তাহাদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতুস্বরূপ হওয়া,—এই দুইয়ের মধ্যে

১। জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত

প্রথমটিকেই আমি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি,—বাকী যাহা কিছু তাহা প্রভু সম্পন্ন করিবেন। তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি যতক্ষণ খাঁটি আছি, প্রভুর ইচ্ছায় ততক্ষণ কেহই আমাকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না। ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়া-পরার ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডীই যে কখনো অতিক্রম করিতে পারে না! কেবল আপনার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র আমার গুণগ্রাহী। ভগবান আপনাকে আশীর্বাদ করুন! আমার সমাদর হউক আর নাই হউক—আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর শুধু ইহারাই নহে, ভারতের প্রত্যেক নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন, হীন ও উৎপীড়িত, তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত,—ইহা আমি উদ্‌যাপিত করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব। চিকাগো, ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৪

……বক্তৃতা এবং নানা নিরর্থক বাজে কাজে আমি একেবারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। শত বিচিত্র রকমের মনুষ্য-নামধারী কতকগুলি জীবের সহিত মিশিয়া মিশিয়া আমি উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার বিশেষ পছন্দের বস্তুটি যে কি তাহা বলিতেছি। আমি লিখিতেও পারি না, বক্তৃতা করিতেও পারি না, কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতে পারি আর উহার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই তখন বক্তৃতায় আমি অগ্নিবর্ষণ করিতে পারি………

আমি বাস্তবিকই "ঝঞ্ঝা-সদৃশ" নহি। বরং ঠিক তাহার বিপরীত। আমার যাহা কাম্য তাহা এখানে লভ্য নহে এবং এই "ঝঞ্ঝাবর্তময়" আবহাওয়াও আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। পূর্ণত্ব লাভের পথ এই যে, নিজের ঐরূপ চেষ্টা করিতে হইবে এবং অন্যান্য স্ত্রী, পুরুষ যাহারা সচেষ্ট তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে হইবে। বেনা বনে মুক্তা ছড়াইয়া সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কর্ম নহে—মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহামানব সৃষ্টি করাই আমার ব্রত।

হায়! যদি কয়েক বৎসরের জন্য আমি নির্বাক হইতে পারিতাম এবং মোটেই আমাকে কথা বলিতে না হইত। বস্তুতঃ এই সকল পার্থিব দ্বন্দ্বের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ ও কর্মবিমুখ। আদর্শবাদী হইয়াই আমি

জন্মিয়াছি এবং স্বপ্নরাজ্যেই আমি বাস করিতে চাই। জাগতিক বিষয়সমূহ আমাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। ডেট্রইট, ১৫ই মার্চ, ১৮৯৪

[১] প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে কালে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব আমি নিশ্চিন্ত—সকল বিষয়েই। বক্তৃতা এবং অধ্যাপনাতেও আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে কয়েকমাস কাজ করার পর ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে বৎসর কয়েকের জন্য অথবা চিরতরে গা-ঢাকা দেব। আমি যে 'নিষ্কর্মা সাধু' হয়ে থাকিনি, সে বিষয়ে অন্তর থেকে আমি নিঃসন্দেহ। একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটি আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্বে এতে লেখা রয়েছে—"এবার একটা একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।" কিন্তু তাহলে কি হয়; এইসব কর্মভোগ বাকি ছিল! আমার বিশ্বাস, এবার কর্মক্ষয় হয়েছে এবং ভগবান আমাকে প্রচারকার্য তথা শুভকর্মের বন্ধনবৃদ্ধি হতে অব্যাহতি দেবেন।·········দুনিয়া তার ভাল মন্দ নিয়ে নানা আকারে চলতে থাকবে, ভাল মন্দের নাম ও স্থান ভেদ হবে—এই মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন চির প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য হৃদয় তৃষিত। "একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।" সেই কৌপীন, মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন,—হায়! ইহারাই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়! শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান যেখানে কেউ আত্মার মুক্তির সন্ধান,—ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের আড়ম্বর সর্বথা অন্তঃসারবিহীন ও আত্মার বন্ধনস্বরূপ। জীবনে আর কখনও এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিনি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দিন—সকলেই মায়ামুক্ত হউন, ইহাই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা। নিউইয়র্ক, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৫

[২] মধুরভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতকটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি ঐরূপ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে উহাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপোষ করিতে হয়,

---

১। মিসেস ওলি বুলকে লিখিত

২। মিস্ মেরী হেলকে লিখিত

সেইখানেই আমি পিছাইয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নহি—আমি সমদর্শিত্বের ভক্ত।

সাধারণ মানবের কর্তব্য তাহার "ঈশ্বর"-স্বরূপ সমাজের আদেশসকল পালন করা; জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাহার সর্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে সর্ববিধ সুখসম্পদ প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যক্তি একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া সমাজকে তাঁহার দিকে টানিয়া লয়েন।

যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে, তাহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না, তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমেষেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ক্ষয়কারী পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। উহা যেখানে পড়ে সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়; নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের বিলম্বে, কিন্তু পথ করিবেই। "যাহা লিখিত আছে, তাহার আর বদল চলে না।" ভগিনী, আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্ট মুখে আপোষ করিতে পারি না তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমি উহা পারি না। আমি সারা জীবন এজন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু আমি উহা করিতে পারি না। আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমাময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না। অবশেষে আমি উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহা ভিতরে আছে তাহা ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন রাস্তা দেখি নাই, যাহা সকলের মনস্তুষ্টি করিবে; আর আমি যথার্থতঃ যাহা, তাহাই আমাকে থাকিতে হইবে—আমায় নিজ অন্তরাত্মার প্রতি স্থিরলক্ষ্য থাকিতে হইবে। যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম যশ নশ্বর; এমনকি পর্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর! তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও। আমার বয়স হইয়াছে, এখন আর শুধু মিষ্ট, শুধু মধু হওয়া চলে না। আমি যেমন আছি যেন তেমনই থাকি। "হে সন্ন্যাসিন্, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারী ত্যাগ করিয়া, শত্রু-মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাক।" এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগী হইলাম—ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। "হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও।"

আমার ধনের কামনা নাই, নাম যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনী, এ সকল আমার নিকট খড়কুটা। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিতে চাই। কিরূপে সহজে অর্থোপার্জন হয় সে জ্ঞান আমার নাই—ইহা ঈশ্বরেরই কৃপা। আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সত্যের বাণী না শুনিয়া, আমি কেন বাহিরের লোকেদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? ভগিনী, আমার মন এখনও দুর্বল আছে, ইহা বাহ্য জগতের সাহায্যে আসিলে সময়ে সময়ে যন্ত্রচালিতবৎ উহা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করে। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মহাশয়ের সহিত আমার যে তর্ক এবং তৎপরে মিসেস্ বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক তাহা হইতে আমি সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি, কেন মনু সন্ন্যাসিগণকে "একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে," এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা ভালবাসামাত্রেই বন্ধন,—বন্ধুত্বে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুত্বে চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা হইলেই প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। জীবন কিছুই নহে, মৃত্যু ভ্রম মাত্র! এইসব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্বই নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে, আমাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে। আমার আদবকায়দা পরিপাটি করিবার সময় নাই। আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি সৎস্বভাবা, তুমি পরম দয়াবতী। আমি তোমার জন্য সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের সকলকে শিশু দেখি। আর স্বপ্ন দেখিও না, হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না! এক কথায় আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে। আমার জগৎকে মনযোগান কথা বলিবার সময় নাই এবং উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। আমার স্বদেশবাসিগণ এবং বিদেশীয়গণ সকলেই নির্বোধ। এই নির্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নস্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। মিসেস্ বুল ভাবেন আমার কোন কার্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব। আমি আমার

বক্তব্যগুলি হিন্দু ছাঁচেও ঢালিব না, খ্রীষ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না, বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢালিব না। আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব—এইমাত্র। মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম। আর যাহা কিছু উহাকে সঙ্কোচ করিতে চাহে, তাহাকে আমি দূরে রাখিব—উহার সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক বা উহা হইতে পলায়ন করিয়াই হউক। কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব! ভগিনি, দুঃখিত হইও না—কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীন থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাও নাই, যাহা "হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পরিণত করে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়।" শক্তি থাকে তো লোকে যাহাকে এই 'জগৎ' নামে অভিহিত করে সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস। তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলিব। যাহারা এই আভিজাত্য নামক ঝুটা ঈশ্বরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, যদি তুমি তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে না পার, তবে চুপচাপ থাক, কিন্তু আপোষ ও মনস্তুষ্টি করা রূপ মেকি অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিবার চেষ্টা করিও না।[১]

আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি, এই স্বপ্নকে, এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তাহার গির্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমায়েসিগুলাকে, তাহার মিষ্টমুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে, এবং সর্বোপরি তাহার ধর্মের নামে দোকানদারীকে আমি ঘৃণা করি। কী! সংসারের ক্রীতদাসসমূহ কি বলিতেছে তদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব! ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, "সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ," কারণ, তিনি গির্জা, ধর্মমত, ঋষি, শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না, তা মিশনরিই হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায়েরই হউক। তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না। নিউইয়র্ক, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

[১] আমার নিজ জীবনের একটু অভিজ্ঞতা তোমাকে জানাইতেছি। যখন মদীয় আচার্যদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশজন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দকহীন যুবক ছিলাম, আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদিগকে পিষিয়া মারিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলাম—কেবল বাকসর্বস্ব না হইয়া

১। মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে লিখিত

যথার্থ জীবন যাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পায়ে মাথা নত করে, তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ আজ দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে ; দশ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্মতিথি উৎসবে এক শত ব্যক্তি আমি একত্র করিতে পারি নাই, আর-গত বৎসরে পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল।............আমি নিজ জীবনে যত বাধা পাইয়াছি ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। এক টুকরা রুটির জন্য আমি গৃহ হইতে গৃহান্তরে বিতাড়িত হইয়াছি, আবার রাজা মহারাজগণ কর্তৃক আমি বহুভাবে পূজিত এবং বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। বিষয়ী লোক এবং পুরোহিতকুল সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কি যায় আসে ? ভগবান তাহাদের কল্যাণ করুন, তাহারাও আমার আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।............আর একটি কথা, ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি ? ভ্রান্তিবশতঃ যাহাদিগকে লোকে "মানুষ" বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই "নারায়ণেরই" সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জল সেচন করে সে প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতে জল সেচন করে না কি ? নিউইয়র্ক, ৯ই আগষ্ট, ১৮৯৫

[১] আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারো কথায় আমি চলব না। আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি। আমার জাতিবিশেষের উপর তীব্র অনুরাগ বা জাতিবিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের তেমনি আমি সমগ্র জগতের, এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না। আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—তোমরা এখন নিজেদের সামলাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবি আছে ? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি ? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা বাজে আহাম্মকি বকো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কলকাতা ও মাদ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চলতে হবে ! তোমরা কি লজ্জিত হচ্ছ না ? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি ? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু তোয়াক্কা রাখি, না তাদের নিন্দের ভয় করি ? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্যন্ত এখনও আমায়

১। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত।

বুঝতে পারবে না। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও; তা যদি না পার, চুপ করে থাক। কিন্তু তোমাদের আহাম্মকি দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করাবার চেষ্টা করো না। আমার পেছনে আমি এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণে বড়। আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই। আমিই তো সারাজীবন অপরকে সাহায্য করে আসছি। আমাকে সাহায্য করেছে, এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাই নি। বাঙালীরা, তাদের দেশে যত লোক জন্মেছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে, আর যার জন্যে তারা কিছুই করে নি, বরং যে তাদের জন্য তার যথাসাধ্য করেছে, তারই উপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে! তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদ-চক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়ালেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি? প্যারিস, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

[১] তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমি দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবল প্রতাপশালী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পারব।

বিশ বছর বয়সের সময় এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম যে, কারু সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতাম না,—আমার ভাবের বিরুদ্ধে হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চলা সম্ভব ছিল না,—কলকাতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্যন্ত চলতাম না। এখন এই তেত্রিশ বৎসর বয়সে বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়িতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না! একি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না, আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি? আবার লোকে বলে শুনতে পাই, যে ব্যক্তি চারিদিকে মন্দ, অমঙ্গল দেখতে না পারে, সে ভাল কাজ করতে পারে না—সে একরকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চেষ্ট মেরে যায়! আমি তো তা দেখছি না। বরং আমার কার্যশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কার্যের সফলতাও খুব অধিক হচ্ছে। কখনও কখনও আমার এক প্রকার

১। মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটকে লিখিত

ভাবাবেশ হয়—আমার মনে হয়, জগতের সবাইকে, সব জিনিসকে আশীর্বাদ করি, সব জিনিসকে ভালবাসি—আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তি মাত্র! প্রিয় ফ্র্যান্সিস্, এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি,—আর তুমি ও মিসেস লেগেট আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্য সত্যই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাঁকে ধন্য ধন্য করছি! আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি; আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ থেকে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ('মন্দ' কথাটিতে ভয় পেয়ো না) প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য করে আসছেন। কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি,—কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কিছু ছিলাম! তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, আমার প্রেমাস্পদদের ত্যাগ করেছি, সব সুখের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদা-ক্রীড়াশীল আদরের ধন, আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে, যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করছেন! জো যেমন বলে—"ভারি তামাসা, ভারি তামাসা!"

এ ত বড় মজার জগৎ! আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু! সব জগৎটা খুব মজা না কি? আমাদের পরস্পরে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বল আর খেলুড়েগিরিই বল, এ যেন জগতের এই ক্রীড়াক্ষেত্রে একদল স্কুলের ছেলেকে খেলতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর সকলে চেঁচামেচি করে খেলা করছে—তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি করব—কাকে নিন্দা করব—এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়—কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করবে কিরূপে? তাঁর তো মাথা-মুণ্ডু কিছু নেই—তিনি যুক্তি-বিচারেরও কোন ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাট মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পারছেন না—আমি এবার খুব হুঁসিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দু'একটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, "ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ"—এ সকল যুক্তিবিচার, বিদ্যাবুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে—ও সব হতে অনেক দূরে। ওহে 'সাকি' পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেমমদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই। লণ্ডন, ৬ই জুলাই, ১৮৯৬

আমার জন্য তোমাদের এত চিন্তিত হবার কিছুই নাই। আমার দেহ নানা প্রকার রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই কাল্পনিক পক্ষিবিশেষের ন্যায় আমি আবার পুনঃ পুনঃ আরোগ্যও লাভ করছি। আমার শরীর দৃঢ়বদ্ধ বলে আমি যেমন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারি, তেমনি আবার অতিরিক্ত শক্তি আমার দেহে রোগ আনয়ন করে। সর্ব বিষয়েই আমি চরমপন্থী—এমন কি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই ; হয় আমি লৌহদৃঢ় বৃষের ন্যায় অদম্য-বলশালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ, মৃত্যু-সৈকতশায়ী। আলমোড়া, ৩রা জুন, ১৮৯৭

[১] আমার জন্য কিছু ভয় করো না। মার্কিনেরা বড় কেবল ইউরোপের হোটেল-ওয়ালা ও কোটিপতিদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। জগৎটাতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—ইয়াঙ্কিরা চটলেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। যাই হোক না কেন, আমি যতটুকু কাজ করেছি তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনও কোন জিনিস মতলব করে করিনি। আপনা-আপনি যেমন সুযোগ এসেছে আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব মস্তিষ্কের ভিতর ঘুরছিল—ভারতবাসী জনসাধারণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো যদি তুমি দেখতে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভেতর কেমন কাজ করছে, কলেরাক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা করছে এবং অন্নক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে—আর প্রভু আমার এবং তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন! মানুষের কথা আমি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিনত না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত খোকা! ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বুঝবে কি করে? কি! যে আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করছি—আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব?—আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হল, কারণ তোমাদের কাছে না বললে যেন আমার কর্তব্য শেষ হত না। আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার

১। মিস্ মেরী হেলকে লিখিত

নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ দৃঢ়ভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চিত বুঝব যে, লোককল্যাণকল্পে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমুবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান আছেন এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর আমার সর্বাধিক উপাস্য দেবতা হবেন আমার পাপী নারায়ণ, আমার তাপী নারায়ণ, আমার সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র নারায়ণ!

"যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।"

"যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট,—সর্বরূপী সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।"

"যাঁতে পূর্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাতে অবস্থিত থেকে আমরা সর্বদা অখণ্ডত্ব লাভ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁরই উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।"

"হে মূর্খগণ, যে সকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিম্বে জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ! তাঁর—সেই প্রত্যক্ষ দেবতারই—উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।"

আমার সময় অল্প। এখন আমার যা কিছু বলবার আছে কিছু না চেপে বলে যেতে হবে; ওতে কারও হৃদয়ে আঘাত লাগবে বা কেউ বিরক্ত হবে এবিষয়ে লক্ষ্য করলে চলবে না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বের হোক না কেন কিছুতেই ভয় পেয়ো না। কারণ যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নয়, তা স্বয়ং প্রভু। আলমোড়া, ৯ই জুলাই, ১৮৯৭

বড় অসুবিধা এই, আমি দেখতে পাই যে, অনেকে তাদের সবটুকু হৃদয় দিয়ে ভালবাসাই আমায় অর্পণ করে; কিন্তু প্রতিদানে কোন ব্যক্তিকে আমার ত সবটুকু দেওয়া চলে না; কারণ একদিনেই তাহলে সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। অথচ নিজের গণ্ডীর বাইরে দেখতে অনভ্যস্ত এমন লোকও আছে যারা এরূপ প্রতিদানই চায়। কর্মের সাফল্যের জন্য ইহা আবশ্যক যে, যত বেশী লোকের

সম্ভব আমার প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা জন্মাক; অথচ আমাকে সম্পূর্ণভাবে সব গণ্ডীর বাইরে থাকতে হবে। নতুবা হিংসা ও কলহে সমস্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নেতা যিনি, তিনি থাকবেন সব গণ্ডীর বাইরে। আমার বিশ্বাস তুমি একথা বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, তিনি অপরের শ্রদ্ধাকে পশুর ন্যায় নিজের কাজে লাগাবেন আর মনে মনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই তা আমার নিজের জীবনেই পরিস্ফুট; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, কিন্তু তেমনি আবার প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন, "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়", আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। প্রেমে আমি উন্মাদ; কিন্তু তাতে তিলমাত্র বন্ধন নাই।

শ্রীনগর কাশ্মীর, ১লা অক্টোবর, ১৮৯৭

[১] এক্ষণে আমি এ সমস্ত কাজ হতে অবসর নিলাম। দু'এক দিনের মধ্যে আমি সব…ছেড়ে দিয়ে একলা একলা চলে যাব; কোথাও চুপ করে বাকি জীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে হয় করো, যা ইচ্ছা হয় করো। মিসেস্ বুল বেশী টাকা দিয়েছেন। শরতের উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ করো, যা হয় করো। তবে আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র আর বজ্রের মত অটল চাই। আমি ঐ রকমই মরবো। আমি লড়ায়ে কখনও পেছপাও হইনি; এখন কি…হব? হারজিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাস যে, কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই।—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে?…আমার চোখে এ সংসার খেলা মাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান অপমান‥লাভ লোকসান নিয়ে কি ছমাস ভাবতে হবে?…আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে—ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন, তো উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয় ডর করে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে।…

লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; সে বলে, "কুছ পরোয়া নেই, ওরা বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি"…তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা।…যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখন কোন কাজ থেকে হঠেন নি, যে-সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে

১। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

হুকুম অগ্রাহ্য করেন নি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ভিনমিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, "এ বীর"!—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই, …"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা।" এই ঠাকুরের দাসানুদাসদের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মতো, যে আমায় বুঝবে!

"জাগ বীর ঘুচায়ে স্বপন; শিয়রে শমন,…তাহা না ডরাক তোমা"—যা কখন করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি…তাই হবে? হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ; কিন্তু না লড়েই হারব!

তারা! মা…একটা তাল ধরবার মানুষ নেই; আবার মনে মনে খুব অহঙ্কার, "আমরা সব বুঝি।"…আমি এখন চললাম,…সব তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন—যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব।

(সম্ভবতঃ) মারী, ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭

…মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন হেতু আছে বলে মনে করি না। এই জাতীয় স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কখনো বা মহাসঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কখনো উহা অন্ধকারে কেঁদে মরে।

নিউইয়র্ক,১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৯

[১] কারো কারো প্রকৃতিই এরূপ যে, তারা যাতনা পেতেই ভালবাসে। বস্তুত যাদের মধ্যে আমি জন্মেছি, যদি তাদের জন্য আমার হৃদয়কে উজাড় না করতাম তো অন্যের জন্য করতেই হত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই হচ্ছে কারো কারো ধাত—আমি তা ক্রমে বুঝতে পারছি। আমরা সকলেই সুখের পেছনে ছুটছি সত্য; কিন্তু কেউ কেউ যে দুঃখেরই মধ্যে আনন্দ পায়—এটা কি খুব অদ্ভুত নয়? এতে ক্ষতি কিছু নেই; শুধু ভাববার বিষয় এই যে, সুখ দুঃখ উভয়ই সংক্রামক। ইংগারসোল একবার বলেছিলেন যে, তিনি যদি ভগবান হতেন তবে তিনি ব্যাধিকে সংক্রামক না করে স্বাস্থ্যকেই সংক্রামক করতেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যে ব্যাধি অপেক্ষা অধিক না হলেও অনুরূপভাবে সংক্রামক, তা তিনি একটুও ভাবেন নি।…………দুঃখভার জর্জরিত যে যেখানে আছে, সব এস, তোমাদের সব

১। ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

বোঝা আমার উপর ফেলে দিয়ে আপন মনে চলতে থাক, আর তোমরা সুখী হও এবং ভুলে যাও যে, আমি একজন কোনকালে ছিলাম। লস্ এঞ্জেলস্, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

১ দৈবের সহায়তা সত্যই হয়তো আমি পেয়েছি; কিন্তু উঃ! তার প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্ত মোক্ষণ করতে হয়েছে। উহা না পেলে হয়ত আমি অধিকতর সুখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আরো ভাল হতাম। বর্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই তমসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমায় প্রাণ দিতে হবে—হাল ছাড়া চলবে না; এই কারণেই তো ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি তো তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না—আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি……। আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে; কিন্তু তার প্রত্যেকটির কারণ অত্যধিক ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার কিছুমাত্র তা না থাকত! ভক্তির কথা বলছেন! হায়, আমি যদি নির্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম! যাক, এ জীবন শেষ হয়েছে। পরজন্মে চেষ্টা করে দেখব। আমার দুঃখ এই—বিশেষতঃ আজকাল—যে, আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমার নিকট হতে আশীর্বাদ অপেক্ষা আঘাতই বেশী পেয়েছে। যে শান্তি ও নির্জনতা চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদৃষ্টে জুটল না।

বহুবৎসর পূর্বে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না, এই মনে করে। এদিকে ভগিনী আত্মহত্যা করল, সে সংবাদ আমার নিকট পৌছল, আর আমার সেই দুর্বল হৃদয় আমাকে সেই শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সে দুর্বল হৃদয় আবার আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তির আমি পিয়াসী, কিন্তু ভক্তির আলয় সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা হতে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম!……

কিন্তু ভগবানের দয়ায় একথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্তের জন্যও হাল ছাড়ব। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমায় তাঁর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া করে থাকেন, তবে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। বর্তমানে, আপনার চিঠি পেয়ে আমি এত আনন্দে আছি যে, এরূপ আনন্দ বহু বৎসর উপভোগ করিনি। ওয়াহি গুরুজীকি ফতে, গুরুজীর জয় হোক! হাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—জগৎ আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, মা আসুন—

১। মিসেস ওলি বুলকে লিখিত

আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনো হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেছিল। মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম ত গৌরবের বিষয়। ১২ই ডিসেম্বর, ১৮৯৯

আমি বুঝতে পারছি যে, আমি আর বক্তৃতামঞ্চ থেকে বাণী প্রচার করতে পারব না।.........এতে আমি খুশী আছি।

আমি বিশ্রাম চাই, আমি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়; কিন্তু পরবর্তী অধ্যায় হবে—বাক্য নয়, কিন্তু অলৌকিক স্পর্শ, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল।......

১৭ই জানুয়ারী, ১৯০০

যে শান্তি ও বিশ্রাম আমি খুঁজছি, তা আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে মহামায়া আমাকে দিয়ে অপরের—অন্ততঃ আমার স্বদেশের—কথঞ্চিৎ কল্যাণ করাচ্ছেন; আর এই উৎসর্গের ভাব অবলম্বনে নিজ অদৃষ্টের সঙ্গে একটা আপস করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা সকলেই নিজের নিজের ভাবে উৎসর্গীকৃত। মহাপূজা চলছে—একটা বিরাট বলি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এর অর্থ পাওয়া যায় না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেয়, তারা অনেক যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি পায়। আর যারা বাধা দেয় তাদের জোর করে দাবানো হয়, এবং তাদের দুর্ভোগও হয় বেশী। আমি এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর।

লস্ এঞ্জেল্স্, ক্যালিফোর্ণিয়া, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯০০

আমি যেন ঐ অসীম নীলাকাশ; মেঘরাশি মাঝে মাঝে আমার উপর পুঞ্জীভূত হলেও আমি সর্বদা সেই অসীম নীলই আছি। স্যানফ্রান্সিসকো, ২৮শে মার্চ, ১৯০০

[১] কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়; আর আমার সমুদয় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন!...... আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি, স্বচ্ছন্দতাই খুব বোধ করছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই হল—এখন পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।

যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে

১। জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখিত

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক-ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা-কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছু কালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চির পরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলেছে!—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে!—জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে!—রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, "মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে, সংসারের ভাল মন্দের ব্যাপার সংসারীরা দেখুক গে, তুই ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছে পিছে চলে আয়!"—যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্তও যার শান্তিভঙ্গ করছে না।

আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি; এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুশী; জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি দিক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্যে—গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চির পদাশ্রিত দাস!……

তাঁর ইচ্ছা-স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্য-সম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত!—আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার

ভেঙে যায়। প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! আমার কর্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তি-বিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্ব-স্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা যাই! —তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

আহা হা—কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে! আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যেন যা কিছু দেখছি শুনছি, সকলকে ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি!—চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই!

ঐ আবার সেই আহ্বান! যাই, প্রভু যাই!

আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০

প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বিবেকানন্দের জীবন

বাল্যজীবন

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

[মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা। নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের কয়েকটি চমৎকার ঘরোয়া ছবি তাঁর রচনা থেকে পাওয়া গেছে।]

বংশ পর্যায়

কয়েক পুরুষের নামমাত্র আমি জ্ঞাত আছি। যথা, রামজীবন দত্ত, তাঁহার পুত্র রামনিধি দত্ত, তাঁহার পুত্র রামসুন্দর দত্ত। রামসুন্দরের পাঁচ পুত্র—রামমোহন, রাধামোহন, মদনমোহন, গৌরমোহন ও কৃষ্ণমোহন। ইহাদের মধ্যে রামমোহন ও কৃষ্ণমোহনের বংশ আছে, অপর তিনজনের বংশ নাই। রামমোহন দত্ত প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া দুটি নাবালক সন্তান দুর্গাপ্রসাদ দত্ত, কালীপ্রসাদ দত্ত ও কয়েকটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। দুর্গাপ্রসাদ তখনকার প্রথানুযায়ী ষোল বা সতের বৎসর বয়সে শ্যামবাজারের দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। কালীপ্রসাদ দত্ত জয়নগর মজিলপুরের কৃষ্ণমোহন মিত্রের দুহিতা বিশ্বেশ্বরীকে বিবাহ করেন। দুর্গাপ্রসাদের এক পুত্র—বিশ্বনাথ দত্ত। কালীপ্রসাদের দুই পুত্র—কেদারনাথ ও তারকনাথ। বিশ্বনাথের তিন পুত্র—নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। ইহার অন্যান্য পুত্র ও কন্যা হইয়াছিল, তাহারা শৈশবেই মারা যায়; কেবল চারি কন্যা বড় হইয়াছিল। তাহাদের নাম—হারামণি, স্বর্ণলতা, কিরণবালা ও যোগেন্দ্রবালা। মোটামুটি দশটি সন্তানের মধ্যে সাতজন বড় হইয়াছিল।

বাড়ির বিবরণ

গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল। বাড়ির অভ্যন্তর দেড় বিঘা ছিল এবং আশেপাশে অনেক জমিতে রেওয়ত ছিল। বাড়ির বর্ণনা বলিতে হইলে প্রথম ঠাকুরদালান হইতে আরম্ভ করিতে হয়। পাঁচ ফুকুরী ঠাকুরদালান পশ্চিমমুখী অর্থাৎ ইহার পাঁচটি খিলান ও ঘসা গোল ইটের থাম। ঠাকুরদালানের সম্মুখে বড় প্রাঙ্গণ। ঠাকুরদালানের উপরের দক্ষিণ দিকে দুইতলা বড় বড় হলঘর। উত্তরদিকের ঘরটিকে 'বড় বৈঠকখানা ঘর' বলা হইত। দক্ষিণদিকের নীচের ঘরটিকে 'বোধন ঘর' বলা হইত এবং উপরকার ঘরটিকে 'ঠাকুর ঘর' বলা হইত। তাহার পর বাহিরের উঠানে চকমিলান দালান ও ঘর। অন্দরমহলে দুইদিকে দুটি

উঠান ছিল এবং পিছনদিকে কানাচ বা পুকুর ছিল। এই হইল মোটামুটি বাড়ির বর্ণনা।

বৈঠকখানা ঘরেতে দেওয়ালগিরি, বেল লণ্ঠন ও হাঁড়ির লণ্ঠন ছিল। কারণ তখনকার দিনে বাতি বা তেলের গেলাসের প্রথা ছিল। দেওয়ালে নানারকম ছবি টাঙ্গান থাকিত। এইরূপে সব বৈঠকখানাই বেশ সুসজ্জিত ছিল। তবে বিশ্বনাথ দত্তের নিজের বৈঠকখানাটি বিশেষ রকমে সুসজ্জিত ছিল।

কোচোয়ানের সহিত গল্প

বুড়ো কোচোয়ান বালক বীরেশ্বরকে আস্তাবলে তাহার খাটিয়ায় বসাইয়া একটি শুকনো থেলো হুঁকো হাতে দিয়া ঘোড়ার গল্প করিত, "দেখ বিলুবাবু, তোমায় ঘোড়ায় বসিয়ে এমন ঘোড়া চালিয়ে দেব যে, ঘোড়া ঐ ছাতের উপর গিয়ে উঠবে, আর ঘোড়া হাওয়া দিয়ে চলে যাবে, আর টগ্‌বগ্‌ শব্দ করে যাবে। আর পক্ষীরাজ ঘোড়া যে আছে, তাতে চড়লে মেঘের উপর পর্যন্ত যাওয়া যাবে।" সে এইরূপ কোচোয়ানী ভাষায় ঘোড়ার অলৌকিক গল্প বলিত। বালক বিলু সেইসব নিবিষ্ট মনে শুনিত আর ভাবিত, "দাঁড়াও, বড় হয়ে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনতে হবে, আর সেইটা চড়ে খুব উঁচুতে মেঘের উপর দিয়ে বেড়াব।" কোচোয়ানের এই ঘোড়ার গল্পটি স্বামীজী অনেক সময় লোকের কাছে বলিতেন যে, ছেলেবেলায় কোচোয়ান এইসব গল্প বলিত, আর আমার মনে এইসব ভাব হইত।

ব্যাটবল খেলা

এখন যাহাকে ক্রিকেট খেলা বলা হয়, তখন ব্যাটবল, চলিত কথায় 'ব্যাটম্বল' বলিত। খানকতক ইটের উপর ইট দিয়া একটি উঁচু ঢিপি করা হইত। তার পাশে একজন ব্যাট হাতে করিয়া দাঁড়াইত, তখন দূর থেকে একজন বল দিত। ওদিককার লোক বল লুফিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইত। বল যদি ইটে ঠেকিত তো 'আউট' হইত। আবার যে বল দিতেছে তাহার পায়ের কাছে ব্যাটটা ছুঁইয়া আনিতে হইত। ইতিমধ্যে সেও যদি বল ছুঁড়িয়া ইটে মারিত, তাহা হইলে তাহার খেলা শেষ হইত। এই ব্যাটম্বল খেলা বেশ চারিদিকে নজর রাখিয়া সতর্ক হইয়া খেলিতে হইত। হাতের টিপ, ইহাতে জোর চাই। কোন্‌দিকে কে বল লুফিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেদিকে নজর রাখা চাই। মোটামুটি বেশ খেলা। বীরেশ্বরের এই খেলাতে বেশ উৎসাহ ছিল। সে বল ঠিক মারিতে

পারিত। লাটিম খেলার মত এটা বোকা খেলা নয়। বীরেশ্বর ব্যাটম্বল বেশ ভাল রকম খেলিতে পারিত। পাড়ার অনেক ছেলে বাহিরের উঠানে জড় হইত এবং বৈকালে ব্যাটম্বল খেলা খুব চলিত। বীরেশ্বর এই খেলায় সর্দার বা মোড়ল হইয়া সব হুকুম-হাকাম করিত। বাল্যকালেই বেশ দেখা যাইত যে সর্দারগিরির জন্যই যেন এই বালকটি জন্মিয়াছে। বীরেশ্বর বা বিলে হুকুম করিবে আর সকল ছেলে শুনিবে। ঝগড়া হইলে বীরেশ্বর মিটাইয়া দিবে, অপর কেহ হইলে ঝগড়া বাড়িয়া যাইত। এইজন্য বীরেশ্বর বা বিলে যতক্ষণ না খেলায় নামিত, খেলাটা বেশ জমিত না।

রাত্রিতে গল্প বলা

রাত্রিতে আমরা বিছানায় শুইতাম। ঘর খুব বড়। তুইখানি তক্তাপোষ জুড়িয়া বড় তুইখানি গদি পাতিয়া তাহাতে ঢালা বিছানা হইত। প্রথম বীরেশ্বর শুইত, তাহার পর আমি ও ছোট তুই বোন, তাহার পর দিদিমা বা ঝি-মা, তাহার পর মা। বীরেশ্বর উল্টাইয়া চোখ তুটি ও মুখটি মাথার বালিশে খানিকক্ষণ চাপিয়া থাকিত। তাহার পর পিঠের উপর শুইত। স্বামিজী মঠে শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ছেলেবেলাতে চোখের সামনে আলোর বিন্দুর মত কতকগুলি দেখিতেন। আলোর বিন্দু কখনও স্থির কখনও বা চঞ্চল থাকিত, সেইজন্য তিনি বালিশে মুখ দিয়া চোখটা চাপিয়া থাকিতেন। যাহা হউক, আমি একটু পরে বলিতাম, "ও দাদা, একটা গল্প বল না।" বীরেশ্বর অমনি গল্প বলিতে আরম্ভ করিত,—"এক বাগ্‌দী মাগীর একটা ছাগল ছিল। সকালে ছাগল চরাতে যায়, বিকেলবেলা সে ছাগলটাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।" অনেকক্ষণ ধরিয়া এই গল্পটা চলিত এবং নানারকম স্বর করিয়া এই গল্পটা বলিত।

তখন আমরা সব ভাইবোন বলিয়া উঠিতাম, "ও দাদা, তোর গল্প যে বড় ছোট, ফুরিয়ে গেল। তুই আর একটা ভাল গল্প বল।"

অমনি আবার একটা শুরু হইল।—

মাতা ভুবনেশ্বরীর কথা

পূজনীয়া মাতা ভুবনেশ্বরীর পড়াশুনার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। তুপুরে কয়েক ঘণ্টা এবং রাত্রে কয়েক ঘণ্টা তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। তাহা না হইলে তাঁহার অতি কষ্ট হইত। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি বিখ্যাত ছিল। গান বা কবিতা একবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেই তাঁহার বেশ স্মরণ থাকিত। স্বামীজী বা আমি যে সকল চলিত কবিতা বলিয়া থাকি, সে সকলের অধিকাংশ পূজনীয়া মাতার নিকট

হইতে শুনিয়াছি এবং তাহাই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী তো প্রায়ই মায়ের কাছে শেখা ছড়া বা কবিতা আওড়াইতেন। পিতা ও মাতার বিদ্যাচর্চার বিশেষ অনুরাগ থাকায় সন্তানদের ভিতর বিদ্যাচর্চার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে। স্মরণশক্তি বিষয়ে পিতার বা মাতার কাহার প্রাধান্য ছিল একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ উভয়ের স্মরণশক্তি প্রখর ছিল। এইজন্য সন্তানদের এই ক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়াছে।

বীরেশ্বরের খুব শৈশবে খেয়াল ছিল যে, সে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়িবে। ইংরাজী বিদেশী ভাষা ও ম্লেচ্ছ ভাষা, ওটা পড়িতে নাই। তাহার বিদেশী ও ম্লেচ্ছ ভাষার উপর বিশেষ ঘৃণা ছিল, একেবারেই পড়িতে চাহিত না। মা বাঙ্গালা লেখাপড়া বেশ ভাল রকম জানিতেন এবং তখনকার দিনে পাদরী মেম মাস্টারণী রাখিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন ও সেলাই বুনন শিখিয়াছিলেন। মোট কথা First Book-এর কতকটা পড়াইবার মত শিখিয়াছিলেন। বীরেশ্বর যখন কিছুতেই ইংরাজী পড়িবে না ও বড় দুরন্তপনা আরম্ভ করিত, মা তখন তাহাকে নিজে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন। তিনি বাঙ্গালা পড়াইতেন, পরে ইংরাজীও শুরু করিলেন। এইজন্য পড়াশুনা শীঘ্র শীঘ্র আগাইয়া যাইত। আমিও মায়ের কাছে প্রথম বাঙ্গালা পড়াশুনা শিখি এবং চার পাঁচখানা বাঙ্গালা বই তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলাম। মা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দিনকতক আগে পর্যন্ত দুপুরবেলা ও রাত্রে নিয়মমত বই পড়িতেন।

রাজা-কোটাল খেলা

এই খেলাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাই এস্থলে প্রদত্ত হইল। আমাদের ঠাকুর-দালান উঠান হইতে একমানুষ উঁচু ছিল। উঠান হইতে ঠাকুরদালানে উঠিতে ছয়টি ধাপ বা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হইত। বীরেশ্বর রাজা হইয়া সকলের উঁচু ধাপটিতে বসিত; এবং সম্পর্কে ও বয়সে বড় অপর ছেলেরা মন্ত্রী ও পারিষদ হইয়া তলার তলার ধাপে বসিত। কেহ রাজার সহিত এক আসনে বসিত না। একটি ছেলে চোর হইত এবং আর কতকগুলি ছেলে পাহারওয়ালা হইত এবং আর আর ছেলেরা কোটাল ও অন্যান্য কর্মচারী হইত। আমি ঠাকুরদালানের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতাম (Neutral observer), কে কোথায় লুকাইতেছে। তাহা মাঝে মাঝে বলিয়া দিতাম। তারপর কোটাল ও পাহারাওয়ালারা চোরকে খুঁজিয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিত। চোর অনেক কাকুতিমিনতি করিত। এমন সময় কোটাল বলিয়া উঠিত, "মহারাজ, এই চোর, এ এই এই কাজ করেছে।" কিন্তু প্রত্যেক কথার পূর্বে 'মহারাজ' বা 'রাজামশাই' শব্দ ব্যবহার করিত।

বীরেশ্বর তখন রাজা হইয়া বসিয়াছে কাজেই মহাগম্ভীর ও স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। তখন যেন সে আর বালক নাই। সত্যই সে অন্যরকমের হইয়া যাইত। ভিন্ন চাহনি, ভিন্ন গলার আওয়াজ, ভিন্ন রকমের চাল-চলন, ভিন্নরকমের হাত-পা নাড়া। সত্যই সে এরূপ রাজার ভাব ধারণ করিত যে, অপর ছেলেরা ভয়ে দমিয়া যাইত। সত্যকারের রাজা যেরূপ চোরের উপর দণ্ড বিধান দেয়, সে সেইরূপ দিত। একটা কাপড় পাকাইয়া তাহা দিয়া চোরকে ঘা-কতক মারা হইত। কয় ঘা মারিতে হইবে তাহা রাজাই হুকুম দিত কিন্তু এমন একটি গম্ভীর ভাব লইয়া বলিত যে তাহার ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার আর কাহারও সাহস থাকিত না। সত্যকারই যেন সে জন্মিয়াছিল রাজা।

বাল্যকালে বীরেশ্বরের রাজা হইবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। সে সর্বদা মনে করিত যে বাবা ও কাকা ওকালতি করেন, তাহাতে আর বিশেষ কি হইল। সে নিজে রাজা হইবে এবং সকলকে শাসন করিবে। গল্পেতে যেমন রাজার সভা, রাজার সিংহাসন, মন্ত্রী ইত্যাদি সব শুনিত, কল্পনা করিয়া সেইসব সে চোখের উপর দেখিত এবং সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছে এরূপ মনে করিত। এমনকি মাঝে মাঝে অপর বালকদের মুখ ফুটিয়া বলিত "ছ্যাখ, আমি যদি রাজা হই, তোকে কোটাল করিব এবং অমুককে মন্ত্রী করিয়া দিব।" এইরূপে খেলুড়িয়াদের চাকুরী দিবে বলিত, কিন্তু সমকক্ষ কাহাকেও হইতে দিত না। সকলকে শাসন করিবে, সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে এই ভাবটি খুব বেশী ছিল। যাহারা স্নেহভাজন বা বিনীত, তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে, কিন্তু যাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদিগকে নিপাত করিবে এরূপভাব বাল্যকালে তাহার প্রবল ছিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

স্কুলের কথা

বীরেশ্বর একটু বড় হইলে স্কুলে গেল। তখন বিদ্যাসাগর স্কুল সুকিয়া স্ট্রীটে ছিল। এখন ঐ জায়গাটাতে লাহাদের বাড়ি হইয়াছে। স্কুল বাড়িটার তখন চারিদিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল, আর একধারে একটা পুকুর ছিল। তখনকার দিনে বিদ্যাসাগর স্কুলের খুব নাম ছিল। সেইজন্য বাড়ির সকল ছেলে বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়িত। স্কুলে নাম লেখান হইল 'নরেন্দ্রনাথ', যদিও বাড়ির নাম রহিল 'বীরেশ্বর' বা 'বিলে'। শিশু নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত স্কুলে যায়। একদিন ক্লাসের এক মাস্টার এত জোরে কান ধরিয়া টানিয়াছিল যে, শিশুর কান ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং রক্তে চাপকান ইজের ভিজিয়া গিয়াছিল। তখন কাপড় পরিয়া স্কুলে যাওয়ার প্রথা ছিল না। ইজের চাপকান পরিয়া ছেলেরা স্কুলে যাইত। নরেন্দ্রনাথ বাড়িতে ফিরিয়া

আসিলে খুব একটা হৈ চৈ পড়িল। বিশ্বনাথ দত্ত ও তারকনাথ দত্ত মাস্টারকে উকীলের চিঠি দিয়া আদালতে আনিয়া শাস্তি দিবেন ও স্কুলে আর ছেলেদের পড়িতে পাঠাইবেন না, এইরূপ স্থির করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে মধ্যস্থ হইয়া নালিশ মকর্দমা রহিত করিল এবং পরদিন যথাসময়ে স্কুলে যাইল। এই শাস্তির কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে যাইলে তিনি ছেলেদের মারিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন।

স্কুলে পড়িবার কথা

নরেন্দ্রনাথ সকালবেলা খানিকক্ষণ এবং সন্ধ্যার পর খানিকক্ষণ পড়িত। বাকি সব সময় খেলা ও দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইত। স্কুলে দেড়টার ছুটির সময় খুব খানিকক্ষণ কপাটি খেলিত। সারা বৎসর বিশেষ মন দিয়া পড়িত না, তবে পরীক্ষার দু'এক মাস আগে খুব চেপে পড়াশুনা করিত। কিন্তু বরাবরই পরীক্ষায় খুব ভাল দাঁড়াইত। ক্লাসের মধ্যে খুব ভাল নম্বর পাইত। বিদ্যাসাগর স্কুলে তখন সংস্কৃত পড়াটা ভাল হইত। নরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইংরাজী ও ইতিহাস তিনটি বিষয় মন দিয়া শিখিত, কিন্তু গণিতের বেলায় তত নয়। এ বিষয় তাহার ভাল লাগিত না, তবে কাজ চলা গোছ শিখিত। কিন্তু সাউখুড়ি ও কথাবার্তাতে মাস্টার ও পণ্ডিতদিগকে মোহিত করিয়া রাখিত এবং তাঁহারা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। কয়েকবৎসর পর আমি যখন সেইসব মাস্টার মহাশয়দের কাছে পড়ি তখন সকলেই আমাকে 'নরেন্দ্র' বা 'নরেন' বলিয়া ডাকিতেন। আমার নাম যে 'মহেন্দ্র' তাহা তাঁহাদের মনে থাকিত না, ভুলিয়া যাইতেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ওহে, ঐ নরেন নামটাই বেশী মনে আছে।" ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে মাস্টার, পণ্ডিত মহাশয়রা নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং সেইজন্য অনেকদিন স্মরণ রাখিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সব ক্লাসেই প্রধান ছাত্র ছিল। সহপাঠী ছাত্রদের সহিত তাহার বড্ড মেশামিশি ছিল। ছুটি পাইলেই, তা সে ক্লাসে বসিবার আগে কিংবা পরে বা দেড়টার সময়, তাহাদের সঙ্গে হয় কপাটি খেলা, নয় গল্প করা, নয় গান করা, নয় কাহাকে ভেঙ্গচাইয়া রাগাইয়া দিত, যাহাতে অপর সকলে হাসিতে পারে। যা হোক একটা কিছু দুষ্টামি তাহার করা চাই। তাহার ভিতরে প্রভূত শক্তি ছিল। তাই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না, একটা নয় একটা কিছু করিত, কিন্তু কখনও কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। সে খুব হাসাইতে পারিত ও নূতন নূতন ঠাট্টা করিতে পারিত। সেইজন্য সহপাঠীরা তাহাকে বড় ভালবাসিত এবং সে ক্লাসের সর্দার-পোড়ো ছিল। সে সহপাঠী ছাত্রদের সকল সময় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত।

স্বামিজী লণ্ডনে ষ্টাৰ্ডিকে একদিন বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ষ্টার্ডি, ছেলেবেলায় আমার ভিতর দেখতুম একটা অফুরন্ত শক্তি উঠছে। যেন দেহ ছাপিয়ে সেটা উঠতো। আমি অস্থির হতুম, চুপ করে থাকতে পারতুম না। সেইজন্য সব সময় ছটফট করতুম, কিছু পড়তে না পেলে দুষ্টুমি করতুম। সে সময় যদি আমি তিন চার দিন স্থির হয়ে বসে থাকতুম তা হলে হয় একটা ব্যামো হোতো, নয় পাগল হয়ে যেতুম। কিছু করবার জন্য সব সময় ভেতরটা যেন কাঁপতো, আমাকে অস্থির ক'রে তুলতো।"

পড়াশুনার নিয়ম

নরেন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যে বই পড়িতে পারিত এবং মুখস্থ করিয়া ফেলিত। বইখানির মানে বুঝিবার আগে মুখস্থ করিয়া লইত। তাহার মেধা অদ্ভুত ছিল। সেইজন্য অল্প সময়ের ভিতর নিজের পড়া শেষ করিয়া ফেলিত। তাহার পর শ্লেটে খানিকক্ষণ অঙ্ক কষিত। তখন ম্যাপ বা মানচিত্র আঁকা এক প্রথা ছিল। সেইজন্য রঙের বাক্স ও তুলি কিনিতে হইত। রঙের বাক্সে, একটা ছোট চীনেমাটির বাটি থাকিত। সেই বাটিতে রঙ গুলিতে হইত। নরেন্দ্রনাথ আগে একটা কাগজে উডপেন্সিল দিয়া নক্সা করিয়া লইত এবং পরে ভিন্ন দেশ ভিন্ন রঙে আঁকিয়া দিত। নরেন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় বেশ ছবি আঁকিতে পারিত। এই ছবি আঁকা বিদ্যা একসময় তাহার কাজে লাগিয়াছিল। সে নিজের পড়া শেষ করিয়াই চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িত আর গুন্‌গুন্ করিয়া নিজের মনে গান ধরিত, না হয় কাহারও সহিত খুনস্থড়ি বা ভেঙ্গানো শুরু করিত। সে সকলকে অপ্রস্তুত করিতে পারিত। কথায় সকলকে হারাইতে পারিত কিন্তু তাহাকে কেহই কথায় হারাইতে পারিত না। এই সময় নরেন্দ্রনাথকে দেখিতাম যেন একটি ছটফটে বালক। হাত-পা সব সময় নাড়িতেছে এবং চোখটা মিট্‌মিট্ করিতেছে, কি যে করিবে তাহা যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বেশ একটা বড় কিছু কাজ করিবে তাহার জন্য যেন অস্থিরভাবে রহিয়াছে। সে কখনও কাহাকেও বকিতেছে, কখনও কাহাকেও হাসাইতেছে, কাহাকেও অপ্রতিভ করিতেছে, কাহাকেও আদর যত্ন করিতেছে, কিন্তু সকলকে দলভুক্ত ও আপনার করিয়া লইতেছে। একবার যে ছেলে তাহার কাছে যাইত তাহাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বশে আনিত। উপস্থিত বুদ্ধি ও কথা কহিবার ক্ষমতা তাহার অদ্ভুত ছিল। কিন্তু কখনও সে বিষণ্ণ হইত না। এই ছটফটে ভাবের ভিতর কখনও কখনও তাহাকে দেখিতাম যেন কি একটা ভাবে বিভোর হইয়া যাইত, যেন মনটা দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হাওয়ার ভিতর যেন কি একটা দেখিত, আর এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ স্থির হইয়া

দেখিত। হঠাৎ মুখটা এমন গম্ভীর হইয়া যাইত যে সব হাসি ঠাট্টা বন্ধ হইয়া যাইত। সকলেই ত্রস্ত হইয়া যাইত। তাহার পর দু'-তিন মিনিটের পর আবার আগেকার বিলে হইয়া দুষ্টামি করিত। মাঝে মাঝে বসিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিত, "আমি রাজা হবো। আমি এটা করবো, ওটা করবো।" আর সেই বিষয়ে খানিকক্ষণ বড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিয়া যাইত—"ভ্যাখ্‌, এটা এই করতে হবে, এটা ঐ করতে হবে, এটা এই বারেতে হবে।" এইরকম খানিকক্ষণ বলিতে শুরু করিত। দেখা যাইত যে, আগে যে-সব কথাবার্তা বলিত তাহার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নাই। কখনও কখনও মাঝখান থেকে উচ্চৈঃস্বরে স্বগত বলিয়া উঠিত। তখন যেন সে স্বতন্ত্র বালক হইত। তাহার পর সে ঝোঁকটা কাটিয়া যাইলে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিত আর গালগুলি কুঁচকাইত—যেন কত অপ্রতিভ হইয়াছে। কখনও মুচকাইয়া হাসিত, আর নাকটা কুঁচকাইয়া উপরে তুলিত। এই রকম মাঝে মাঝে দেখিয়া খেলুড়িয়ারা অনেক সময় তাহাকে 'পাগলা বিলে' বলিত। তাহারা আরও বলিত, "বিলেটা বেশ ছেলে, ভাল, খুব হাসি তামাসা স্ফূর্তি করিতে পারে, কিন্তু মাথাটা একটু খারাপ, মাঝে মাঝে পাগলের মত কি বলে।" অনেকেই আহ্লাদ করিয়াই হউক বা ব্যঙ্গচ্ছলে হউক, তাহাকে 'পাগলা বিলে' বলিয়া ডাকিত।

ছাত্রজীবনে

প্রিয়নাথ সিংহ

[নরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের এই অন্তরঙ্গ ছবিটি উপস্থিত করেছেন তাঁর অন্যতম বাল্যবন্ধু। এই কালে তাঁর গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসার রূপ পাওয়া যাবে পরবর্তী অংশে সংযোজিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের রচনায়।]

স্বামীজীর স্মৃতি

নরেন্দ্রনাথ হেদোর ধারে জেনারেল এসেমব্লি কলেজে পড়েন। এফ. এ. সেইখান হইতেই পাশ করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য গুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাঁহারা তাঁহার গান শুনিতে এতই ভালবাসিতেন যে, অবকাশ পাইলেই নরেনের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তথায় বসিয়া একবার তাঁহার তর্ক যুক্তি বা গান বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা বুঝিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁহার পিত্রালয়ে দুইবেলা কেবল আহার করিতে যান, আর সমস্ত দিবারাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তাহা নহে। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকিতে ভালবাসেন। বাড়িতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান জপের বড়ই ব্যাঘাত। মাতামহীর বাটীতে লোক বেশী নয়, দুই একজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দ্বারা নরেনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কচি কাচা ছেলে—যাহাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়—এখানে একটিও নাই। যে ঘরটিতে নরেন থাকেন তাহা বার বাড়ির দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই উঠিবার সিঁড়ি। অন্দর মহলের সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব নাই। সুতরাং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের—যাঁহার যখন ইচ্ছা—আসিয়া উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন 'টঙ'। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, "চল, টঙে যাই।" ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তাহার উপর ময়লা ছোট একটি বালিস। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া বালিস। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তম্বুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাদুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখন বা খাটিয়ার নীচে, কখন বা তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি থেলো হুঁকো, তাহার নিকট খানিকটা তামাকের গুল আর ছাই ঢালিবার একখানি সরা। তাহারই কাছে তামাক টিকে ও দেশলাই রাখিবার একখানি মৃৎ-পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাদুরের উপরে হেথা-সেথা ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটান, তাহাতে কাপড় পিরান ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে দুটি একটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে; সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল তাহারই নজির। নরেন মনে করিলেই বাড়ি হইতে পরিষ্কার বালিস, উত্তম বিছানা ও ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া দুই একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া ঘরটি বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার ও সমস্ত দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সেজন্য ঘরে সর্বত্র একটা যেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা, আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশপূর্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হইল, বেলা এগারটা। আহারাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, "ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।"

অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারে স্থর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, "তবে বাঁয়াটা নে।"

বন্ধু বলিলেন, "ভাই, আমি ত বাজাতে জানিনে। ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারব ?"

অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, "বেশ করে দেখে নে দিথি। পারবি বৈকি, কেন পারবিনি ? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তা হলেই হবে।" সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই একবার চেষ্টা করিয়া কোন রকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। তানলয়ে উন্মত্ত হইয়া ও উন্মত্ত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল, টপ্‌পা, ঢপ, খেয়াল, ধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজ ভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দিতেছেন যে, কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমনকি সুরফাঁকতাল পর্যন্ত তাঁহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন ; সেটা কেবল বাজান কার্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই, হিন্দী গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সহিত স্থরলয়ের অপূর্ব ঐক্য দেখাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল, বাড়ির চাকর আসিয়া একটি মিটমিটে প্রদীপ দিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুইজনের হুঁস হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থে চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন, নরেন্দ্র নির্বিকার। * *

বি. এ. পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই আপন আপন বেতন ও পরীক্ষার ফী জমা দিল। হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর এক বৎসরকাল বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এই প্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হইত। যাহারা নেহাৎ সমস্ত বেতন দিতে অপারগ তাহাদের কিছু কিছু, আবার তেমন তেমন স্থলে সমস্তই, ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত ছাড়ছুড়ের ভার রাজকুমার

নামক একজন বৃদ্ধ কেরানীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু আধটু নেশাটা আশটা করেন, কিন্তু গরীব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোনও উপায়ে ফির টাকার জোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকা কিন্তু জোগাড় করিতে না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রকে সে কথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "তুই ভাবিসনি, একজামিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব। তোর মাইনেটা মাপ করিয়ে দেব। কেবল ফীর জোগাড়টা করিস।"

দুই একদিন পরে দুই বন্ধু একত্রে কেরানী রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাজকুমার আসিলেন। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বাঁধিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। অমনি ঝন্ ঝন্ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারিধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, "মোশাই, অমুক দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না। তা আপনি একটু অনুগ্রহ করে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাস হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।"

রাজকুমার দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিস করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।"

নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন; তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, "তুই হতাশ হচ্ছিস কেন? ও বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বলছি তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ।"

নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই গুলির একটি বৃহৎ আড্ডা। ইতিমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারীর সহিত চুপি চুপি দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আড্ডাধারী বিনা বাক্য-ব্যয়ে ঘাড় নাড়িয়া "না" বলিল। নরেন আবার হেদোর দিকে দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়াই পার্শ্বের আর একটি গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘিরিয়াছে, বেশ গা ঢাকা মত হইয়াছে। এমন সময় গলির মুখে রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত। অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার-ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল, নিজ· ভাব চাপিয়া কহিলেন "কিরে দত্ত, এখানে কেন ?"

নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কেন আর কি, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই, আমি বেশ জানি—হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না। তাকে কিন্তু পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়বো না। যদি আমার কথা না রাখেন ত আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাবো; ইস্কুলে টেঁকা দায় করে তুলবো। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না ?"

স্থিরপ্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হাত জড়াইয়া কহিলেন, "বাবা রাগ করিস কেন ? তুই যা বলছিস তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস আমি কি তা করবো না ?"

নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া কহিলেন, "তবে কেন সকাল বেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন ?"

রাজকুমার বলিলেন, "কি জানিস, তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো যখন ঐ বায়না ধরবে তখন কাকে রেখে কাকে দেব, বাবা ? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়বো। আমায় আড়ালে বলতে হয়। তুই ছেলে মানুষ, ওসব ত বুঝিসনি, কারো সামনে কি কিছু বলে ? তুই নিশ্চিন্ত হ। মাইনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফীর টাকা তো আর মাপ হয় না, সেটা দেবে তো ?"

নরেন্দ্র কহিলেন, "সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে, সে এক পয়সা দিতে পারবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে" বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আশে পাশে বেড়াইয়া, নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড় চাপিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা নরেন্দ্রনাথের বাটী হইতে বেশী দূর নহে, চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুর বাসায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে গান ধরিলেন,—

অনুপম মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর সেই প্রেম মুখ-ছায়া
দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে ॥
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণগান করি অমৃত ঢালে,
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত নিকেতনে
প্রেম উপহার লয়ে হৃদয় থালে ॥

নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠীরা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "ওরে খুব ফুর্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" এই বলিয়া পূর্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখান, ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তারপর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া ফস করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

পরীক্ষার আর বেশী দেরী নাই; বোধ হয় মাসখানেকও নাই। বিপুল কলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's *History of England*) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাস হইতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টা তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু আধটু পড়াশুনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে নরেন্দ্র থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর, এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোর-কুঠরী বা দোছত্রির ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণদিকে একটি ছোট জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া "নরেন" বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিক খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, "এই চোর কুঠরীর ভিতর আছি।" সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্তা কওয়া হইল। পরে বন্ধু শুনিলেন, বিগত দুইদিন ঐ কুঠরীর মধ্যে বসিয়া নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন; সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছেন যে, একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরী হইতে বাহির

হইবেন। নরেন্দ্র কার্যতও তাহাই করিলেন। তিন দিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল, নরেনের কোনও উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোনও উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্যোদয়ের পূর্বেই নরেন শয্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন,—

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥

নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন; দেখিলেন, নরেন আনন্দপ্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক-হাতে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। গানের স্রোত থামিল না দেখিয়া বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেন, একজামিনের দিন, কোথায় একটু আধটু খুঁতখাঁত যা আছে সেটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সকলই বিপরীত; বেড়ে ফুর্তি করছো।"

নরেন উত্তর করিলেন, "হাঁ, তাই তো করছি, মাথাটা সাফ রাখছি, মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দু'ঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাব সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই তো নয়? এতদিন পড়ে পড়ে যা হোল না, তাকি আর দু এক ঘণ্টায় হয়?—হয় না। একজামিনের দিন সকাল বেলায় কেবল ফুর্তি, কেবল ফুর্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়, ঘোড়াটা ছুটে এলে তাকে দলাই-মলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই করতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে

শ্রীম

১৮৮২ খৃঃ, ৫ই মার্চ, রবিবার।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ। প্রাণকৃষ্ণ, কেদার, মাষ্টার প্রভৃতি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক। একটি ঊনবিংশতিবর্ষ বয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁর দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া কথা বলিতেছেন। নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। চক্ষু দুটি উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—নরেন্দ্র, তুই কি বলিস! সংসারী-লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু ছাখ, হাতী যখন চলে যায়, পিছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু ফিরে চায় না। তোকে কেউ যদি নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি?

নরেন্দ্র—আমি মনে করব, কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নারে অতদূর নয় (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন, তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদারের প্রতি)—এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি, আবার চাঁদনিতে যখন খ্যালে, তখন আর এক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা কখন সংসারে বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্য।

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়, সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্‌কচ্‌ করে কেটে দিতে লাগলো। (ঠাকুর ও সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখন

কোথাও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা নাড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। গানটি এই—

'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।' ইত্যাদি

'যে রূপ আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন,'—গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। আবার গান চলিতেছে—

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন!"

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য। শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন। কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন। আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!

এইবার গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দরসে, হায় রে, প্রেমানন্দরসে)"

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগল। 'প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।'

১৮৮২, ৬ই মার্চ।

বেলা তিনটার সময় আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেঝেতে মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই একজন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা, উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, "ঐরে আবার এসেছে।"—বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন।—

"ছাখ্, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল, তারপর দিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত—আফিমের মৌতাত ধ'রেছিল—ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে।" (সকলের হাস্য)।

মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন,—"তোমরা তু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনবো।"

মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। তু'জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গলাতে।

১৮৮৫ খৃঃ, ২২শে ফেব্রুয়ারী।

রবিবার সকাল ৮টা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, হাজরা, মণি মল্লিক, গিরিশ প্রভৃতি।

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় অনেকক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়িতে বড় কষ্ট হইয়াছে। এইবার নরেন্দ্র ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড়হাজার টাকার দরকার (হাস্য)। হাজরা বলে—নরেন্দ্রের ষোল আনা সত্ত্বগুণ হয়েছে, একটু লালচে রজঃগুণ আছে। আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব সতের আনা (সকলের হাস্য)।

মেঝেতে নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন। গিরিশও আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি, আর আমি ওর অনুগত।

গিরিশ—আপনি কারই বা অনুগত নন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওর মদ্দের ভাব (পুরুষ ভাব) আর আমার প্রকৃতি ভাব। নরেন্দ্রের উঁচুঘর, অখণ্ডের ঘর।

গিরিশ বাইরে তামাক খাইতে গেলেন।

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খুব বড় লোক,—আপনার কথা হচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি কথা?

নরেন্দ্র—আপনি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত। এইসব কথা হচ্ছিল (হাস্য)।

মণি মল্লিক (ঠাকুরের প্রতি)—আপনি না পড়ে পণ্ডিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি প্রতি)—সত্যি বলছি, আমি বেদান্ত আদি শাস্ত্র পড়িনি বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর গীতার সার—গীতা দশবার বললে যা হয়—ত্যাগী ত্যাগী।

১৮৮৫ খৃঃ, ২২শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার।

কাশীপুরের উদ্যানবাটী—হীরানন্দ, মাষ্টার, নরেন্দ্র প্রভৃতি।

হীরানন্দ সিন্ধুদেশবাসী, কলিকাতার কলেজে পড়াশুনা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া সেখানে এতদিন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর হীরানন্দের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মাষ্টারকে ইঙ্গিত করিলেন—যেন বলিতেছেন, ছোকরাটি খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আলাপ আছে?

মাষ্টার—আজ্ঞে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা একটু কথা কও, আমি শুনি।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন্দ্র আছে? তাকে ডেকে আন।'

নরেন্দ্র উপরে আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র ও হীরানন্দকে)—একটু দু'জনে কথা কও।

হীরানন্দ চুপ করিয়া আছেন। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন।

হীরানন্দ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আচ্ছা, ভক্তের দুঃখ কেন?

নরেন্দ্র—The scheme of the Universe is devilish! I could have created a better world.

হীরানন্দ—দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়?

নরেন্দ্র—I am giving no scheme of the Universe, but simply my opinion of the present scheme. তবে একটা বিশ্বাস করলে সব চুকে যায়। Our only refuge is in pantheism: সবই ঈশ্বর—এই বিশ্বাস হলেই চুকে যায়! আমিই সব করছি।

হীরানন্দ—ও কথা বলা সোজা!

নরেন্দ্র নির্বাণষট্‌কম্ সুর করিয়া বলিতেছেন—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে। ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।

হীরানন্দ—বেশ।

ঠাকুর হীরানন্দকে ইশারা করিলেন, জবাব দাও।

হীরানন্দ—এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়, আর আমি সেই, সোঽহং—তাতেও ঈশ্বরানুভব। একটি দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। হীরানন্দ নরেন্দ্রকে বলিলেন, একটু গান করুন। নরেন্দ্র সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চক গাহিতেছেন—'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।'

ঠাকুর যেই শুনিলেন—অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্ত—অমনি আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'আহা!' আর ইশারা করিয়া দেখাইতেছেন, 'এইটি যোগীর লক্ষণ।'

নরেন্দ্র কৌপীনপঞ্চক শেষ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আর ঐটে "যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।"

নরেন্দ্র ঐ গানটি গাহিতেছেন—

'তুঝ্‌সে হামনে দিলকে লাগায়া যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।'

হীরানন্দ শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সব তুঁহি হ্যায়, এখন তুঁহু তুঁহু! আমি নয়, তুমি!

নরেন্দ্র—Give me one and I will give you a million. তুমিও আমি, আমিও তুমি, আমি বই আর কিছু নাই।

এই বলিয়া নরেন্দ্র অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে কতকগুলি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আবার সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হীরানন্দের প্রতি, নরেন্দ্রকে দেখাইয়া)—যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে।

(মাষ্টারের প্রতি, হীরানন্দকে দেখাইয়া)—কি শান্ত! রোজার কাছে জাতসাপ যেমন ফণা ধরে চুপ করে থাকে।

১৮৮৫ খৃঃ, ৯ই মে শনিবার। বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি।

বলরাম বসুর জেষ্ঠ্যা কন্যা ঠাকুর ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন।

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাহিতে আসিয়াছেন, ভক্তেরা দুই একটি গান শুনিলেন। নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও'।

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক থাক, আর কাজ নেই, পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই ত বললি।

ভক্ত (সহাস্যে)—মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে, আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হয়েছে ভাবতে পারে।

নরেন্দ্র—প্রমাণ না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন?

গিরিশ—বিশ্বাসই Sufficient Proof। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত—External World বাহিরে আছে Philosopher কেউ Prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবেনা! হয়ত বলবে ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যেবাদী ভণ্ড।

[দেবতারা অমর এই কথা পড়িল]

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই?

গিরিশ—তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।

নরেন্দ্র—অমর, Past agesতে ছিল প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—অনাদি কি দরকার? অমর হ'তে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটীর ছেলে (সকলে হাস্য)। সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে)—নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে বললুম; মা, এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল? ভারি ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে! ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠল, ঐ! ঐ! আমি বললাম, কি? ও বললে, ঐ চাতক! ঐ চাতক! দেখি কতকগুলো চামচিকে! সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ টুপ যা দেখ,

ও মনের ভুল। তখন অবাক্ হ'য়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা, একি হ'লো! এসব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, 'এসব কথা মেলে কেমন ক'রে যদি মিথ্যা হবে!' তখন বলেছিলাম, শালা, তুই আমার অবিশ্বাস ক'রে দিছলি! তুই আর আসিস নাই!

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতিকে)—শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন ক'রে করি। মহানির্বাণ তন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে। আবার বলেন, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই। মনুসংহিতায় মনু লিখেছেন মনুরই কথা! Moses লিখেছেন *Pentateuch*, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা।

সাংখ্য দর্শন বলছেন, 'ঈশ্বরাসিদ্ধে'। ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

তা বোলে এসব নাই, বলছিনা। বুঝতে পারিতেছি না, বুঝিয়ে দাও। শাস্ত্রের অর্থ যার মনে যা এসেছে তাই ক'রেছে। এখন কোন্‌টা লব? White light Red medium-এর মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়। Green medium-এর মধ্য দিয়ে এলে Green দেখায়।

একজন ভক্ত—গীতায় ভগবান বলেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে গীতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত—গীতা, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন!

নরেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন।—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক্ হইয়া নরেন্দ্রের কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব বেশ কথা হচ্ছে।

শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থ টুকু লতে হয়; যে অর্থ টুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা। আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী, মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

আবার অবতারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার।

'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড', 'অনন্ত অবতার' শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাতযোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা!'

১৮৮৬, ৪ঠা জানুয়ারী, কাশীপুর উদ্যানবাটী, দ্বিতলে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ।

নরেন্দ্র আসিয়া বলিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন—যেন তাঁহার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন,—'কেঁদেছিল'! ঠাকুর কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, 'কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে এসেছিল!'

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন—

নরেন্দ্র—আজ ওখানে যাব মনে করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়?

নরেন্দ্র—দক্ষিণেশ্বরে—বেলতলায়—ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা—অনেক সাধু জপ করছে। কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—পড়বি না?

নরেন্দ্র—একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।

সন্ধ্যা হইয়াছে। নরেন্দ্র নীচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভৃতে মণির কাছে নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল, গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র—গত শনিবার, এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম করে এল।

মণি—কুণ্ডলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র—তাই হবে। বেশ বোধ হল—ইড়া পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে। কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করলাম, ওঁকে সব বললাম। আমি বললাম, সব্বাইয়ের হল, আমায় কিছু দিন।

মণি—তিনি তোমায় কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি বললেন, তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয় না, সব হবে। তুই কি চাস? আমি বললাম,—আমার ইচ্ছা, অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হয়ে

থাকবো। কখনো কখনো এক একবার খেতে উঠবো। তিনি বললেন, তুই তো বড় হীনবুদ্ধি, ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, 'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'

মণি—হাঁ, উনি সর্বদাই বলেন যে, সমাধি থেকে নেমে এসে দেখেন—তিনিই জীবজগৎ, এই সমস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা হতে পারে। উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে, আর নামতে পারে না।

নরেন্দ্র—উনি বললেন, তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয়, সমাধিলাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।

আজ সকালে বাড়ী গেলাম। সকলে বকতে লাগল, আর বললে—কি হো হো করে বেড়াচ্ছিস? আইন এগজামিন এত নিকটে, পড়াশোনা নাই, হো হো করে বেড়াচ্চ।

মণি—তোমার মা কিছু বললেন?

নরেন্দ্র—না, তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। হরিণের মাংস ছিল খেলুম, কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মণি—তারপর?

নরেন্দ্র—দিদিমার বাড়ীতে, সেই পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে, পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এল—পড়াটা যেন কী ভয়ের জিনিস। বুক আটুপাটু করতে লাগল! অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই!

তারপর বইটই ফেলে দৌড়!—রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতোটুতো রাস্তায় কোথায় এক দিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম—গায়ে ময়ে খড়—আমি দৌড়ুচ্ছি—কাশীপুরের রাস্তায়।

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র—বিবেক চূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলেন যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায় মেলে—মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। ভাবলাম, আমার তো তিনটিই হয়েছে! অনেক তপস্যার ফলে মানুষজন্ম হয়েছে,—অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে—অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে।

মণি—আহা!

নরেন্দ্র—সংসার আর ভাল লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না, দু একজন ভক্ত ছাড়া।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে! আপনারাই ধন্য।

রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুর থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্রের কথাই বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য! দেখো, এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানতো না! এর প্রাণ কিরূপ আটু পাটু হয়েছে দেখছিস্? সেই যে আছে, একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? গুরু বললে, এস আমার সঙ্গে, তোমায় দেখিয়ে দিই কি হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার প্রাণটি কি রকম হচ্ছিল? সে বললে, প্রাণ যায় যায় হচ্ছিল।

ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে, দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হলে—পূর্বদিক লাল হলে—বুঝা যায় সূর্য উঠবে।

ঠাকুরের আজ অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কষ্ট। তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা—সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার—অমাবস্যা পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দু' একটি ভক্ত। মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন, সন্ন্যাসীমণ্ডলের ভিতর বসিয়া আছেন।

পরিব্রাজক

হরিপদ মিত্র

[শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে বরাহনগর মঠে কঠোর সাধনার কিছু সময় বাদ দিলে আমেরিকা যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক বৎসর স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেন। ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর এই প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকেই ভারতের বিবেকানন্দের জন্ম। পরিব্রাজক অবস্থার একটি বিবরণ আমরা উপস্থিত করছি।]

বেলগাঁ—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উকিল বন্ধুটি বলিলেন, "ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশান্ত মূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁফ দাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটি জুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ী,—সন্ন্যাসীর

সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হইলে এখনও যেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নাই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।" তিনি বলিলেন, "তামাক, চুরুট, যখন যাহা পাই তখন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হুঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।" তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস, গেরুয়া বেশধারী সন্ন্যাসী মাত্রেই জুয়োচোর। ভাবিলাম, ইনিও কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন, তাহা ছাড়া উকিল বন্ধু মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত মিল হওয়া কঠিন, তাই বোধ হয় আমার বাড়িতে থাকিবার জন্য আসিয়াছেন। মনে এইরূপ নানা তোলপাড় করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি উকিল বাবুর বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মনে দুঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।" সে রাত্রে বড় বেশী কথাবার্তা হইল না; কিন্তু দুই চারি কথা যাহা বলিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমাপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমাপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী। বোধ হইল, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, কারণ স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না, জানিয়া পুনরায় বলিলাম, "যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।" তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির সহিত তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল—এমন নিঃস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখন দেখি নাই। মনে করিতাম,—যাহার পয়সা নাই তাহার মরণ ভাল, বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব, কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।

পরদিন ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। প্রাতে ৬টার সময় উঠিয়া স্বামীজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু

স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেক্ষা না করিয়া, আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী যেখানে ছিলেন তথায় গেলাম। গিয়া দেখি, তথায় মহাসভা; স্বামীজী বসিয়া আছেন ও নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরাজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার ন্যায় কেহ কেহ হক্স্লের ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলম্বনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্ছলে, কাহাকেও গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া, অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য না দেবতা ?···

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। যাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাইবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, "বাবা, অনেক লোকের মনক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।" পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন, "আমি যাঁহার অতিথি তাঁহার মত করিতে পারিলে, আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।" উকিলটিকে বিশেষ বুঝাইয়া, স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্সদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চাহিয়া খাইলেন। আমার নিজের মনে যে সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস ভরসা হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া, তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দুই কথাতেই বুঝিয়া লইলেন।

ইতিপূর্বে টাইমস্ সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম সত্য,—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন; সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায়, আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত—'ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান, এককালে দুই-ই হইতে পারে না'—এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম এ সমস্যা পূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি ত Science অনেক পড়িয়াছ

দেখিতেছি, প্রত্যেক জড় পদার্থে দুইটি Opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি দুইটি Opposite forces জড় বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ন্যায় Opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব না? All I can say is that you have a very poor idea of your God". আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, Truth is absolute, সমস্ত ধর্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, আমরা যে-বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে সকলই আপেক্ষিক সত্য বা Relative truths—Absolute truth-এর ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute হইলেও বিভিন্ন মনবুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (absolute) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে Photograph লইলে একই সূর্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয় প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের, তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্য সকল (Relative truth) নিত্য সত্যের (absolute truth) সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই সেই জন্য সেই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "রাজা হইলে আর খাওয়া পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন। বিশ্বাস কি কখন জোর করিয়া হয়! অনুভব না হইলে ঠিকঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে "সাধু" বলায় তিনি উত্তর করিলেন; "আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়।"...

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর, পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নয়টার সময় স্বামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাসায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, "স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।"

তিনি বলিলেন "বাবা, তোমরা যেরূপ Utilitarian, যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেন, যে সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝতে পারি কে কি ভাবে কি কথা বললে, ও তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।"......

তিনি বলিলেন, "এ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন, কিন্তু আমাকে কত লোক কতবার ঐ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়াছি।" রাত্রে আহার করিতে বসিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুঁইয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল, সে সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করিয়াছেন! কিন্তু তিনি—সে সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খাইয়া এমন পেট জ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও—এখানে সাধু সন্ন্যাসী জায়গা পায় না—এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিশের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।···

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী *Pickwick Papers* হইতে দুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি,—বুঝিলাম পুস্তকের কোন স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া, আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "দুই বার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ ছয় মাস হইল আর একবার।"···

ইতিপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেকবার পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পরিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে Jules Verne-এর Scientific novels এবং Carlyle এর *Sartor Resartus* পড়িতে তাঁহার নিকটে শিখি।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "স্বামীজী, দেখিতেছি, ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখা পড়া জানা আবশ্যক।"

তিনি বলিলেন, "নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্য লেখা পড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, 'রামকেষ্ট' বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহা অপেক্ষা কে বুঝিয়াছিল?"

আমার বিশ্বাস ছিল সাধু সন্ন্যাসীদের স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও

বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিলেন, "ইহাই আমার Famine Insurance Fund ; যদি পাঁচ সাতদিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখিবে। তোমরা একদিন না খাইলে সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে—Dyspepsia-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও।"

স্বামীজী সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।' তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোথায় ? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন ; আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাসকল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য, একই দিকে গতি, দেখাইতে তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতা আর কাহারও দেখা যায় নাই।

রাজোয়ারা ও খেত্‌ড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন ; তাহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামান্য ত্যাগী হইয়া, রাজা-রাজড়ার সঙ্গে মেশামেশি অত কেন করেন, একথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইত না, কোন কোন নির্বোধ লোক এজন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন, "হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া ও সৎকার্যের অনুষ্ঠানে লওয়াইয়া যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান রাজাকে, সেইদিকে লওয়াইতে পারিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি ! গরিব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সৎকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায় ? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই, সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তাহার ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধীনস্থ সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।"...

স্বামীজীর সহিত, একদিন অনন্ত (Infinity) পদার্থ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয় ; সেই কথাটি বড় সুন্দর ও সত্য। তিনি বলিলেন, "There can be no two infinities।" আমি, সময় অনন্ত (Time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (Space is infinite) বলায় তিনি বলেন, আকাশ অনন্তটা বুঝলাম কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, একথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিস

অনন্ত হইলে কোন্‌টা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখিবে, সময়ও যাহা আকাশও তাহাই, আরো অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, ও সেই সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।”...

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপনাপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্য কর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া, সকল দেশের কল্যাণ-চিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখন জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন “যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?” আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী একথা স্বীকার করিতেন। বলিতেন, “সে সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে সকল ঘোষণা করিবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাহার মত গর্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street.”

আমেরিকা ও ইউরোপে

[ধর্মমহাসভার পূর্বে আমেরিকায় বিবেকানন্দের জীবন: হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের পত্নী মিসেস রাইট বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর মাকে যে পত্র লেখেন তার অংশ—]

অদ্ভুতভাবে আমাদের সময় কাটছে। কেট সানবর্ন যে একজন হিন্দুকে পাকড়েছে, তা আমি বোধহয় আমার শেষ চিঠিতে লিখেছি। জন (অধ্যাপক রাইট) তাঁর সঙ্গে বোস্টনে দেখা করতে গিয়ে, দেখা না পেয়ে, তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। ঘন পীতবর্ণ দীর্ঘ পোষাকপরা মানুষটি শুক্রবার এলেন—সকলে চমকিত! অদ্ভুত জমকালো দৃশ্য—তিনি! মাথা খাড়া রাখার অপূর্ব ভঙ্গি, প্রাচ্য-রীতিতে অসাধারণ সুদর্শন, বয়সে ত্রিশ, সভ্যতায় সুপ্রাচীন। সোমবার পর্যন্ত তিনি ছিলেন। জীবনে যত লোক দেখেছি তাদের মধ্যে অতুলনীয়ভাবে আকর্ষণীয়। দিনে রাত্রে সারাক্ষণ আমরা কথা বলেছি, পরদিন প্রভাতে আবার কথা শুরু করেছি নতুনতর আগ্রহ নিয়ে। তাঁকে দেখতে শহর পাগল। মিস লেন-এর

বোর্ডাররা উত্তেজনায় উন্মত্ত। তারা অবিরত ঘরবাহির করছে। উত্তেজনায় ক্ষুদ্রকায় মিসেস মেরিলের জলজলে চোখ, টকটকে গাল। আমরা প্রধানত ধর্মবিষয়ে কথা বলেছি। এ যেন একটা নবজাগরণ। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এমন উদ্দীপিত আমি আর হইনি। তারপর রবিবারে জন তাঁকে চার্চে বক্তৃতা করতে আহ্বান করলেন। সেখানে তারা সম্পূর্ণ হিদেন-রীতিতে পরিচালিত হবে এমন একটি হিদেন-কলেজের জন্য টাকা সংগ্রহ করল! তাই দেখে হাসতে হাসতে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াল, বাধ্য হয়ে এক কোণে সরে গেলুম।

তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক। কোন মানুষের চেয়ে তাঁর জ্ঞান কম নয়। আঠারো বছর বয়স থেকে তিনি সন্ন্যাসী। তাঁদের ব্রত আমাদেরই অর্থাৎ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মতই। কেবল তাঁদের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বলতে ঠিক দারিদ্র্যই বোঝায়। তাঁদের কোনো বাড়ি নেই, সম্পত্তি নেই, ভিক্ষাও করতে পারেন না। তাঁরা বসে থাকেন, যতক্ষণ না ভিক্ষা আসে। তাঁরা বসে শিক্ষা দেন মানুষকে। দিনের পর দিন বিচার ও আলোচনা চলে। এই মানুষটি অসাধারণ বুদ্ধিমান, কিভাবে যুক্তিপ্রয়োগ করতে হয় জানেন, জানেন কিভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তাঁকে ফাঁদে ফেলা যায় না। কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে সমর্থ নয়।

[ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ। বিখ্যাত কবি হ্যারিয়েট মুনরোর বিবরণ—]

সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে ধর্মমহাসভা সাফল্যের বিজয়কীর্তি, বিশেষত রেভারেণ্ড জন বারোজের পক্ষে, যিনি এর সেনাপতিস্বরূপ, এবং দু'বছর ধরে এর প্রস্তুতি করেছেন। "পৃথিবীর প্রথম ধর্মমহাসভার" মধ্যে যখন তিনি প্রতীকদণ্ডটি উত্তোলন করে আনলেন, তখন দর্শকদের উপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাস নীরবতার একটি স্রোত বয়ে গেল,—মানব-ইতিহাসের একটি পরম মুহূর্ত যেন সমাগত,—শান্তি ও মৈত্রীর আকাঙ্ক্ষিত নবযুগের ভবিষ্যদর্শন সহসা উদ্ভাসিত! মঞ্চের উপরে ডাঃ বারোজের বাম দিকে ছিলেন কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে পরিচিতমূর্তি প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিগণ, রাশিয়ান ও রোমান ক্যাথলিকগণ। তাঁর দক্ষিণে দূর দেশের বিচিত্র পোশাকের অপূর্ব একটি দল—চীনের একজন কনফুসিয়ান, ভারতের একজন জৈন, এলাহাবাদের একজন থিয়জফিস্ট, শুভ্রবস্ত্র একজন শিণ্টো পুরোহিত, জাপানের চারজন বৌদ্ধ এবং বোম্বাইয়ের কমলারঙের বস্ত্রধারী জনৈক সন্ন্যাসী।

এই শেষোক্ত জনই, এই সুমহিম স্বামী বিবেকানন্দই, ধর্মমহাসভাকে গ্রাস করে, গোটা শহরটাকে অধিকার করে নিয়েছিলেন। অন্যান্য বিদেশীরা ভালই বলেছিলেন,—গ্রীক, রাশিয়ান, আর্মেনিয়ান, কলকাতার মজুমদার, সিংহলের ধর্মপাল ইত্যাদি,—

যাঁদের কেউ কেউ দোভাষীর সাহায্যও নিয়েছিলেন। শিণ্টো প্রতিনিধি শিবাতা, শুভ্রবর্ণ শিরোভূষণে ভূমিস্পর্শ করে, সুনম্র ভঙ্গিতে তাঁর দুই কৃশ হস্ত প্রসারিত করে, গভীর কণ্ঠে প্রশান্ত বিনয়ের সঙ্গে দুর্জ্ঞেয় শব্দরাজি উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কমলা বস্ত্রের সুদর্শন সন্ন্যাসীই নিখুঁত ইংরাজিতে আমাদের সর্বোত্তম বস্তু দিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড ও বৈদ্যুতিক, তাঁর কণ্ঠস্বর ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মত ঐশ্বর্যময়; তাঁর সংযত আবেগের অন্তর্লীন প্রবলতা, প্রতীচ্য জগতের সামনে প্রথম উচ্চারিত ও আবির্ভূত তাঁর বাণীর সৌন্দর্য,—এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত হয়ে চরম অনুভূতির এক নিখুঁত বিরল মুহূর্ত আমাদের দান করল। মানবভাষণের এই হল সর্বোচ্চ শিখর।

[ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার বিবরণ]

চিকাগো, সেপ্টেম্বর ২৩। আর্ট প্যালেসে প্রবেশপথের বাঁ দিকে একটি ঘরের উপর লেখা আছে,—'এক নম্বর ঘর—প্রবেশ নিষেধ।' এই ঘরের মধ্যে ধর্ম মহাসভার বক্তাগণ নিজেদের মধ্যে বা প্রেসিডেন্ট বনির সঙ্গে কথাবার্তা বলবার জন্য শীঘ্র বা দেরীতে, যখনই হোক আসবেনই। মিঃ বনির ব্যক্তিগত আফিস এই ঘরেরই এক কোণে। সাধারণ দর্শকেরা যাতে ঢুকতে না পারে সেইভাবে ভাঁজকরা দরজার সামনে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা; দরজা থেকে এত দূরে তাদের আটকানো হয় যে, উঁকি মারাও সম্ভব নয়। কেবল প্রতিনিধিরাই এই সুপবিত্র সীমা ভেদ করার অধিকারী, যদিও অন্যের পক্ষে "চিচিং-ফাঁক" আবিষ্কার করা হয়ত একেবারে অসম্ভব নয়। যদি কেউ তা করতে পারে তাহলে কলম্বাস হলের প্ল্যাটফর্ম থেকে যে ধরনের পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর, তার থেকে এখানে অনেক নিকট-দর্শন পেতে পারে বিশিষ্ট অতিথিদের, অন্তত কিছু সময়ের জন্য।

এই কক্ষের সবচেয়ে চমক-লাগানো চেহারা ব্রাহ্মণ সাধু বিবেকানন্দের। বৃহৎ সুগঠিত আকার, অসাধারণ সুন্দর দেহভঙ্গি, সুক্ষৌরিত মুখ, সুঠাম বিস্তৃত অঙ্গাদি, শুভ্র দন্তপংক্তি, এবং সুবিন্যস্ত অধরোষ্ঠ, যা কথোপকথনকালে সদয় হাসিতে বিভক্ত হয় প্রায়ই। স্কন্ধোত্থিত তাঁর মনোহর মস্তক কমলা বা রক্তবর্ণের পাগড়িতে সজ্জিত; নিম্নজানু পর্যন্ত লম্বিত তাঁর আলখাল্লা উজ্জ্বল নীল বা রক্তবর্ণ বেষ্টনীতে বদ্ধ। কথা বলেন চমৎকার ইংরেজীতে, প্রশ্ন আন্তরিক হলে সাগ্রহে উত্তর দেন।

তাঁর ব্যবহার অতি সরল; তারি মধ্যে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে একটু ব্যক্তিগত সমীহভাব থাকে, তাঁর স্বনির্বাচিত সন্ন্যাসজীবনের রীতিই তার মূলে।

তাঁর সম্প্রদায়ের আচারাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি স্বাধীন, আমার আচরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কখনো থাকি হিমালয়ের উপরে, কখনো শহরের পথে। পরের দিন আহার কোথায় জুটবে আমার জানা নেই, আমি সঙ্গে টাকা রাখি না। চাঁদা তুলতে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।' তারপর, তাঁর কাছাকাছি ঘটনাক্রমে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন তাঁর কয়েকজন স্বদেশবাসীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এঁরাই আমার ভার নেবেন।' তাঁর পোশাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হোল—এটাই তাঁর সাধারণ সন্ন্যাসীবেশ কি না? তিনি উত্তর দিলেন,—'এ পোশাকটা বেশ ভাল। তবে দেশে থাকলে আমার খালি পা, ছেঁড়া কাপড়।—জাতিভেদে বিশ্বাস করি কি না? জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। সকল জাতির মধ্যে আমার স্থান আছে।'

তাঁর চেহারা ও ব্যবহার থেকে অবশ্য স্বতঃই প্রমাণিত হয়, তিনি উচ্চবর্ণের সন্তান; দীর্ঘদিনের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য ও গৃহহীন পরিব্রাজকজীবন তাঁর জন্মগত ভদ্র সংস্কৃতিকে দূর করতে পারেনি। তাঁর পারিবারিক নামও অনুচ্চারিত। ধর্মজীবন বরণ করে তিনি বিবেকানন্দ নাম নিয়েছেন,—"স্বামী", সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রযুক্ত শ্রদ্ধাসূচক শব্দ। বয়স তিরিশের কোঠার গোড়ার দিকে। তাঁকে দেখে মনে হয়, এই জীবন ও তার সম্ভোগ কিংবা অপর জীবন ও তার ধ্যানসাধনা—এর যে-কোনো একটির জন্য তিনি নির্মিত। তাঁর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে চিন্তা জাগে—এক জীবন থেকে অন্য জীবনে গেলেন কিসের টানে!

'আমি বিয়ে করব কেন',—তাঁর ঝলসানো উত্তর,—'যখন আমি প্রত্যেক নারীতে জগজ্জননীকে দেখি?—এই সব কৃচ্ছ্রসাধনা করি কেন? পার্থিব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য। যাতে আমার পুনর্জন্ম না হয়, যাতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিব্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি, একাত্ত হতে পারি ঈশ্বরের সঙ্গে। আমি বুদ্ধ হতে চাই।'

এর দ্বারা কিন্তু বিবেকানন্দ নিজেকে বৌদ্ধ বললেন না। কোন বিশেষ নাম বা সম্প্রদায়ের ছাপ তাঁতে নেই; তিনি উচ্চতর ব্রহ্মণ্যের সৃষ্টি; বিশাল, স্বপ্নাচ্ছন্ন, আত্মাহুতিময় হিন্দুসত্তার মূর্ত বিকাশ—তিনি পবিত্রাত্মা সন্ন্যাসী।

তিনি তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ঈশ্বরভক্তের সম্বন্ধে কিছু পুস্তিকা বিতরণ করছিলেন। এই সাধু তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের এমনই প্রভাবিত করেছিলেন যে, অনেকেই তাঁর মৃত্যুর পরে গৃহাশ্রম ত্যাগ করেছেন। এই সাধুকে মজুমদারও (প্রতাপচন্দ্র মজুমদার) গুরুর মত দেখেন, কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষামত মজুমদার সংসারজীবনে আধ্যাত্মিকতার জন্য সচেষ্ট।

ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের ভাষণ ঊর্ধ্বাকাশের মতই উদার,—সর্বজনীন ধর্মের

পরম বিকাশরূপে তা সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠাংশকে আলিঙ্গন করেছে,—সমগ্র মানবের জন্য করুণায় তা স্পন্দিত,—তাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে শুভকর্মের আহ্বান—শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়। ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ অতিশয় প্রিয়,—তাঁর চিন্তার ঐশ্বর্যের জন্য, তাঁর অবয়বের মহিমার জন্যও বটে। মঞ্চে পদার্পণমাত্রে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়, আর সহস্র সহস্র মানুষের এই উচ্চারিত সমাদরকে তিনি শিশুর আনন্দে গ্রহণ করেন, তাতে অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকে না। এই তরুণ, সুবিনীত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পক্ষে দারিদ্র্য ও আত্মবিলয়ের জগৎ থেকে খ্যাতি ও প্রাচুর্যের শিখরে সহসা উত্থান নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

[ধর্মমহাসভার সমাপ্তি। ক্রিটিক পত্রিকায় লুসি মুনরোর রচনা। লুসি মুনরো কবি হ্যারিয়েট মুনরোর ভগিনী এবং স্বয়ং লেখিকা।]

দৃশ্যটি কেউ সহজে বিস্মৃত হবে না। শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পূর্ণ বিরাট হলের সামনে দূর দেশের প্রতিনিধিরা খ্রীষ্টান আদর্শের পবিত্রতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদন করলেন। তার মধ্য দিয়ে বক্তাগণের মৈত্রী-ভাবনা উদ্ঘাটিত হল,—সুন্দর ও সুমহান কিছু সম্পাদনের অদ্ভুত আনন্দাবেশে তাঁরা অভিভূত হয়ে রইলেন। কালো পোশাকের পাশ্চাত্ত্যবাসীদের পাশে এইভাবে প্রাচ্যের শান্ত, মনোযোগী এবং মর্যাদাসম্পন্ন কৃষ্ণচর্ম মানুষেরা আসন গ্রহণ করে রইলেন।

ইথিয়োপীয় গোষ্ঠীর একজন তরুণ আফ্রিকান রাজকুমার তাঁর বহুখচিত ঘন বর্ণের পোশাকসুদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সুকৃষ্ণ মুখে ইথিয়োপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,—ধর্মসভা যে মানবসমাজে ভ্রাতৃভাবনাকে দৃঢ়তর করেছে এ বিষয়ে তাঁর সুগভীর প্রত্যয় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—"শুধু এই পরিবেশের মধ্যেই অনির্বচনীয়, অসংজ্ঞেয় এক মহাবস্তুর আবির্ভাব হয়েছে, এমন কিছুর জন্ম হয়েছে যে-মহিমাকে প্রকাশে মানবভাষা অসমর্থ।" এই মহানন্দময় পটভূমিকা সকলের কল্পনাকে অনুরঞ্জিত করল এবং অধিবেশন পূর্ণ হয়ে গেল অপূর্ব প্রভাবে।……

কিন্তু ধর্মমহাসভার সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এইচ. ধর্মপাল এবং হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। "যদি ধর্মমত বা পথ সত্য-সন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে তাকে দূরে সরিয়ে দাও",—ধর্মপাল সুস্পষ্টভাবে বললেন,—"গোঁড়ামী না রেখে চিন্তা কর, সর্ব বস্তুকে ভালবাসার জন্যই ভালবাস, নির্ভয়ে নিজের বিশ্বাসকে ঘোষণা কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, তাহলেই সত্যের

কিরণ তোমাকে জ্যোতির্ময় করে তুলবে।” কিন্তু এই সভায় অনেকের সংক্ষিপ্ত ভাষণ যতই চমৎকার হোক…তাঁদের মধ্যে কেউই হিন্দু সন্ন্যাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর-ভাবে ধর্মমহাসভার প্রাণধর্ম, তার সীমাবদ্ধতা এবং সুন্দর প্রভাবের বিষয়টিকে প্রকাশ করতে সমর্থ হননি। আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ভাষণ উদ্ধৃত করছি, কিন্তু আমি শ্রোতৃ-বৃন্দের উপর তাঁর ভাষণের প্রভাবের সামান্য আভাসের বেশী কিছু দিতে পারব না, কারণ তিনি দিব্যাধিকার প্রাপ্ত বাগ্মী। তদুপরি পীত ও কমলা রঙের চিত্রবৎ সুন্দর পোশাকের পটভূমিকায় স্থাপিত তাঁর সুদৃঢ় বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, ঐ মুখোচ্চারিত ঐশ্বর্যময় ও সঙ্গীতময় বাণীর অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় ছিল না। [বক্তৃতা সমগ্রত উদ্ধৃত। তারপর—]

ধর্মমহাসভার স্পষ্টতম ফল—বিদেশে ধর্মপ্রচারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে চিন্তা। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে অভিষিক্ত প্রাচ্যকে শিক্ষিত করবার জন্য অর্ধশিক্ষিত ধর্মপ্রচারকদের প্রেরণ করার ঔদ্ধত্য এমন জোরের সঙ্গে আর কখনো ইংরাজি-ভাষী মানুষদের কাছে তুলে ধরা হয়নি। কেবল সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির সঙ্গেই তাঁদের বিশ্বাসকে স্পর্শ করার অধিকার আমাদের আছে, আর তা করবার মত গুণসম্পন্ন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমাদের বোঝা দরকার যে, আমরা যতখানি শেখাতে পারি, সেই পরিমাণেই বৌদ্ধধর্মের কাছে (স্বামীজীকে লেখিকা বৌদ্ধ ধরেছিলেন) আমাদের শেখার আছে, এবং সঙ্গতি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই শ্রেয়তম প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

[লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ। নিম্নের বিবরণ এরিক হ্যামণ্ড প্রদত্ত। এই পর্যায়ের আর একটি বিবরণ পাওয়া যাবে পরবর্তী অংশে সংযোজিত বিপিনচন্দ্র পালের রচনায়।]

স্বামীজীর আগমনে লণ্ডনে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হল। চিকাগোর ধর্মসভায় তাঁর সম্বন্ধে যে মহাবিস্ময় ও প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, তাঁর পদার্পণের পূর্বেই তা লণ্ডনে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর চেহারার চৌম্বকশক্তি, তাঁর বক্তৃতার ততোধিক মোহিনী আকর্ষণ বহু মানুষকে তাঁর দিকে টেনে আনল। অজস্র অভিজ্ঞতার শহর লণ্ডন। এর সহস্র প্রকৃতি। পৃথিবীর সর্বস্থানের সর্ব মতের প্রচারকেরা লণ্ডনে এসে হাজির হন।…প্রতিদিন শহরের বহুসংখ্যক সভাকক্ষ চাঞ্চল্যকর নানা মত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু শ্রোতায় পূর্ণ হয়।…

লণ্ডন বাস্তবিকই নানা উদ্‌গিরণের আগ্নেয়গিরি স্বরূপ ।…এই খানেই, এই

লণ্ডনেই স্বামীজী এলেন নিজের স্থান গ্রহণের জন্য, বিরোধী ও সংঘাতশীল শক্তি-সমূহের মধ্যে হিন্দুধর্মের বাণীবাহক রূপে নিজেকে স্থাপন করবার জন্য। ইংরাজি চিন্তার কেন্দ্রস্থলে তাঁর থেকে যোগ্যতর ও মহত্তর আর কোন্ উপস্থিতি সম্ভব! শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের শক্তিতে বলীয়ান্, তাঁর প্রতি অসীম বিশ্বাসে গরীয়ান বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মহান সত্তার শক্তিকে আকর্ষণ করে এনে শ্রোতৃবৃন্দের উপর প্রচণ্ডভাবে বর্ষণ করলেন।···শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা এবং তাঁর অনুভূতির যে ধর্মকে বিবেকানন্দ প্রচার করলেন, যা একমাত্র বিবেকানন্দই করতে সমর্থ, তার দ্বারা নিকট ও দূরের প্রচুর মানুষ আকৃষ্ট হল। লণ্ডন শীঘ্রই জানল, এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় হয়েছে। স্বামীজী ধারাবাহিক বক্তৃতা করে চললেন, অভ্যাগতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন,—এক কথায় নিজেকে দেখালেন ও জানালেন। তাঁর বিশেষ ভক্তদের মধ্যে ছিলেন মিস্ মার্গারেট নোবল, যিনি নিজ ভাগ্যবশে পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যা হবেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনীরূপে ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বরণ করবেন, এবং বেদান্তধর্মের এক অপূর্ব শক্তিশালী বক্তা ও লেখক হয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরই সাগ্রহ নির্বন্ধে পড়ে বর্তমান লেখক একদিন পার্শ্ববর্তী এক জেলা শহর থেকে স্বামীজীর বাসভবনের দিকে যাত্রা করলেন। স্বামীজী ঐখানে নির্দিষ্ট সময়ে দর্শন দেন। অত্যন্ত বিশ্রী ও বিমর্ষ এক সন্ধ্যায় তাঁর দ্বারে হাজির হলাম, কিন্তু সেখানে আরও হতাশা—স্বামীজী বাড়িতে নেই। তবে আমাদের জন্য একটি বিশেষ সহৃদয় বার্তা রেখে গেছেন—তাতে আছে, আমরা তাঁর জন্য সিসেম ক্লাবে যেতে পারি, যেখানে নির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে হঠাৎ-আহ্বানে তিনি চলে গিয়েছেন। তিক্ত মন নিয়ে নির্দেশমত আমরা ক্লাবের সন্ধানে বার হলাম। হাজির হয়ে দেখলাম, একটি মস্ত ড্রইংরুম, বা হলঘর সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত কেতাদুরস্ত মানুষে প্রায় ঠাসাঠাসি-ভর্তি। দু'একজন ভদ্র ও সহৃদয় ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মের একেবারে কাছে আমাদের ঠেলে এগিয়ে দিলেন, সেখানে দু'একটি চেয়ার খালি রাখা ছিল। আসন দুটি বিশিষ্ট, হায়, আমরাও তাই! আমাদের ওভার কোট থেকে জল ঝরছে, এবং এমন সমাবেশে আসব জানা না থাকায় আমাদের পোশাকাদিও কিছু মহার্ঘ নয়। দেখলাম, উপস্থিত ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা জাতীয়। বক্তৃতার বিষয়—"শিক্ষা"। অল্প পরেই স্বামীজী আবির্ভূত হলেন। প্রায় কোনো সময় না দিয়েই (কিংবা একেবারেই কোনো সময় না দিয়ে) তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে; তাঁর বক্তৃতা কোনো ভাবেই তৈরী নেই। তবুও তিনি, যেমন সর্বক্ষেত্রে, পরিবেশের উপরে নিজেকে স্থাপন করলেন। শান্ত, সংযত, আত্মস্থ—তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

একজন হিন্দু,—আর্য বিশ্বাসে ও বাণীতে পূর্ণ হৃদয়, পূর্ণ কণ্ঠ একজন উদ্দীপ্ত হিন্দু,—যাঁর পিছনে আছে সুপ্রাচীন সভ্যতার মহিমা ও সংস্কৃতির ঐশ্বর্য। সে এক অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা! তাঁর শ্যাম বর্ণ, সুগভীর জলন্ত নয়ন, এমনকি তাঁর পোশাক—সবই চতুর্দিকে মোহবিস্তার করল। সর্বোপরি তাঁর বাণী, তাঁর বাগ্মিতা—প্রেরণার সেই উচ্চারিত ধ্বনি! ইংরাজী ভাষার উপর তাঁর বিস্ময়কর অধিকার শ্রোতৃবৃন্দকে চমকিত ও আনন্দিত করে তুলল,—মনে রাখতে হবে এই শ্রোতাদের অধিকাংশের বৃত্তি হল, আমি আগেই বলেছি, ইংরেজদের ইংরেজি ভাষা শেখানো, এবং সেই ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিদ্যা দান করা! এ ছাড়াও, স্বামীজী শীঘ্রই দেখিয়ে দিলেন, তিনি ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমভাবে ব্যুৎপন্ন। ঐ মানুষগুলির মধ্যে, তাদের দুর্গভিত্তির উপরে তিনি সদর্পে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরম নির্ভয়ে, অনুগ্রহের কোনো প্রত্যাশা না রেখে, আঘাতের পর আঘাত করে তিনি এই হিন্দু নীতির মহিমা তুলে ধরলেন—যে শিক্ষক টাকা তৈরীর কথা শেখান ছাত্রদের, তিনি উচ্চতম ও গভীরতম সত্যের নিকট বিশ্বাস-ঘাতক। "শিক্ষা ধর্মের অঙ্গাঙ্গি বস্তু; শিক্ষা কিংবা ধর্ম এই দুইয়ের কাউকেই বেচাও যায় না, কেনাও যায় না।"...তাঁর কথাগুলি প্রচলিত শিক্ষারীতির বর্মকে ভেদ করে তীব্রভাবে প্রবেশ করল। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় কোনো বিদ্বেষ ছিল না। কারণ হিন্দু মানুষটি অতিশয় বিদগ্ধ, বিরোধী সমালোচককে বশীভূত করে ফেলে এমন অপূর্ব হাসিতে ভরপুর তাঁর মুখ,—ইনি নিজের মতকে ঘোষণা করে, প্রতিষ্ঠিত করে, নিজের ব্যক্তিত্বের "দাগ" রেখে গেলেন। এই "দাগ" রাখতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মার দ্বারা বাহিত হয়ে এসেছেন।......

স্বামীজীর সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

ভারতে বিবেকানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা

[স্বামীজীর জীবনের সুগভীর রূপটি মনস্বিনী নিবেদিতার কাছে অনেকাংশে ধরা পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিবেকানন্দের যে ভূমিকা, বিবেকানন্দকে ব্যাখ্যার ব্যাপারে, অবশ্যই অল্পতর পরিমাণে, নিবেদিতা সেই ভূমিকা নিয়েছেন। বিবেকানন্দের স্বরূপের কিছু উদ্ভাস নিবেদিতার রচনায় পাওয়া যাবে। উদ্ধৃত অংশ-গুলি নিবেদিতা রচিত 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

ব্যক্তিগণ—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং শিষ্যমণ্ডলী।

কতিপয় পাশ্চাত্য-অভ্যাগত এবং শিষ্য ; ধীরা মাতা, জয়া ও নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম। স্থান—ভারতের বিভিন্ন অংশ। সময়—সন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

এ বৎসর দিনগুলি কি সুন্দর ভাবেই না কাটিয়াছে! এইসব দিনেই যে, আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটীরে, তারপর হিমালয়বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানাস্থানে পরিভ্রমণকালে সর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল যাহা কখনো ভুলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি যাহা আমাদের মনে সারাজীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। আর অন্তত জাগরূক থাকিবে বারেকের জন্য লব্ধ সেই চকিত দিব্যদর্শন!

সে সবই যেন একটা খেলা!

এমন এক প্রেমের বিকাশ দেখিয়াছি, যে প্রেম ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রকেও, অজ্ঞান হইতে অজ্ঞানকেও আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া যায় এবং তাহারই দৃষ্টিতে তখন সমস্ত জগৎকে দেখে, যেন তাহাতে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেয়ালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি—এই সমস্ত দিব্য লীলায় মনে হয় যেন বালরূপী ভগবান তাঁহার শিশুশয্যা হইতে জাগিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া সাক্ষিস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি!

কিন্তু ইহাতে কোনরূপ মানসিক উগ্রতা বা কঠোর গাম্ভীর্যের ভাব ছিল না। দুঃখ আমাদের সকলের কাছেই ঘেঁষিয়া গিয়াছে। অতীতের কত শোকস্মৃতি আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দুঃখও উর্ধ্বশিখ হইয়া হেমজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইত, দীপ্তিতে মণ্ডিত হইত, তাহাতে কোনরূপ দাহ থাকিত না।

যদি সে ক্ষমতা আমার থাকিত, মহা-উল্লাসে আমি সে ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিতাম। তবু আজ সে কথা লিখিতে লিখিতে যেন দেখিতেছি বারামুল্লায় সেই প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল আইরিস কুসুমসকল ; দেখিতেছি ইসলামাবাদে পপলার তরুতলে চারা চারা ধানগাছগুলি ; দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাচল—অরণ্যানীর দৃশ্যাবলী, আর দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাজভোগ্য সৌন্দর্যরাশি। স্মৃতির এই সকল নিদর্শন বর্ণনা করিতে কার না আগ্রহ হয়! কিন্তু বর্ণনায় উহা বিবর্ণ হইয়া উঠিবে—কেন না সে যে অসম্ভব। তাই স্মৃতির আলেখ্যে নর-স্মৃতির আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত হইয়া বিরাজ থাকিবে তথাকার কোমলহৃদয় শান্তপ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ, যাহাদের আনন্দ মনে হয় আমাদের আগমনে, আমাদের সংশ্রবে আসিবার ফলে আরও ঘনীভূত হইয়া বিরাজ করিবে।

এমন একটি দিন (৯ই মে) কখনই ভুলিবার নহে। তরুতলে বসিয়া আমরা কথাবার্তা কহিতেছিলাম, এমন সময় সহসা ঝড় আসিল। আমরা প্রথমে নদীর তীরে পোস্তার ওপরে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা চলিত না। দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার অপর পার আর দেখা গেল না। চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। শুধু মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপতন-শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, আর থাকিয়া থাকিয়া ঘোর বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল।

তথাপি বাহ্য প্রকৃতির এই সকল আলোড়নের মধ্যে আমাদের ছোট বারান্দাটিতে বসিয়া বসিয়া আমরা ইহার চেয়েও এক গভীরতর অভিনয় তন্ময়ভাবে দেখিতে-ছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একমাত্র অভিনেতা পদচারণা করিতেছিল; একই কণ্ঠে সকল অভিনেতার ভূমিকা পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং জীবের ভগবৎপ্রেমই আমাদের সমক্ষে সংক্রামিত হওয়ায় সেই সময়ের জন্য এরূপ উর্জিত প্রেমের উদ্দীপন হইল যে, বেগবতী স্রোতস্বতী তাহা নির্বাপিত করিতে এবং প্রবল ঝঞ্ঝা তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারিত না। "বিপুল জলরাশিও কি কখনও প্রেমের নির্বাপণ করিতে পারে, অথবা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তাহাকে গ্রাস করিতে পারে?" ফলে এই জড়ে প্রাণসঞ্চারক নরদেব আমাদের নিকট বিদায় লইবার পূর্বে আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম এবং তিনিও আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।

৩রা মে। আমাদের মধ্যে দুইজন পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখনকার রাজনৈতিক গগন তমসাচ্ছন্ন। একটা ঝড়ের সূচনা দেখা যাইতেছিল। সেই সময় প্রতি রজনীতে চন্দ্র আরক্ত কুয়াসামণ্ডলে পরিবৃত দৃষ্ট হইত। সাধারণের ধারণা ইহা প্রজাগণের মধ্যে অশান্তির সূচক এবং ইতিপূর্বেই প্লেগ, আতঙ্ক ও দাঙ্গাহাঙ্গামা নিজ নিজ ভীষণ মূর্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আচার্যদেব আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মা কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কূলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না। মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান শুভের ন্যায় অশুভরূপে আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভরূপেও পুজা করিতে সাহসী হয়।"...

স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং যথাসম্ভব আবার পূর্বের ন্যায় দিন কাটিতে লাগিল; যথাসম্ভব—কেন না মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস

দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যতদিন এই আশঙ্কা সবদিক আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন স্বামীজী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। এই আশঙ্কা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সুখের দিনগুলিও অন্তর্হিত হইল। আমাদেরও যাত্রা করিবার সময় আসিল।···

তিনটি ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল।—খেতড়ীর রাজাকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্যদেবের আহ্লাদ, আমাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া দুইজন বাইজীর স্বামীজীর নিকট গমন এবং অন্যের নিষেধ সত্বেও স্বামীজীর তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করা, আর একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তি :

"স্বামীজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবি করেন, স্মরণ রাখিবেন যে, আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহাদের সকলের অগ্রণী।"

হয়ত বা তিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার-সঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম ঋতুটিতে তিনি প্রায়ই থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে 'একটি ক্ষীণালোক স্থান, তৎপরে আর একটি ক্ষীণালোক স্থান, আবার সেখানে একটি সমাধি!'—এইরূপ বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। অমন সৌন্দর্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন। আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি; সে খানি ভারতবর্ষের কলাসম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি প্রতিভা!" তিনি আকবরের প্রসঙ্গ আরো বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রা-সন্নিকটে সেকেন্দ্রার সেই গম্বুজবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদগদ হইয়া আসিত এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত বেদনা কাহারও বুঝিতে আর বাকি থাকিত না।

"অথবা তিনি কথাপ্রসঙ্গে সুদূর ইটালি দেশ পর্যন্ত গমন করিতেন। ইটালি তাঁহার নিকট "ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ধর্ম ও শিল্পের দেশ, একাধারে সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাট্‌সিনির জন্মভূমি এবং উচ্চভাব, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রসূতি!"

একদিন শিবাজী ও মহারাষ্ট্র জাতি সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাজী সাধুবেশে বর্ষব্যাপী-ভ্রমণের ফলে রায়গড় প্রত্যাবর্তন করেন, তৎসম্বন্ধে কথা হইল। স্বামীজী বলিলেন, "আজও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করেন, পাছে গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে।"

কখনও কখনও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ব্যবধানের আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজী ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসকে এতদুভয়ের সংঘর্ষমাত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেন এবং জাতির উন্নতিশীল ও শৃঙ্খল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমুহ ক্ষত্রিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আধুনিক বাঙ্গালার কায়স্থগণই যে মৌর্য রাজত্বের পুর্বতন ক্ষত্রিয়কুল, তাঁহার এই বিশ্বাসের অনুকূলে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবতারণা করিতে পারিতেন। তিনি এই দুই পরস্পর-বিরোধী সভ্যতাদর্শের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেন—"একটি প্রাচীন, গভীর এবং পরম্পরাগত আচার ব্যবহারের প্রতি চিরবর্ধমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন; অপরটি স্পর্ধাশীল, চঞ্চল প্রকৃতি এবং উদার সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি; রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান্ বুদ্ধ ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলে না জন্মিয়া যে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক উন্নতির এক গভীর নিয়মের ফলস্বরূপ। এবং এই আপাত-বিসংবাদী সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যাত হইবামাত্র বৌদ্ধধর্ম এক জাতিভেদধ্বংসী সূত্ররূপে প্রতীয়মান হইত,—'ক্ষত্রিয়কুল কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম' ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাংঘাতিক প্রতিপক্ষ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইত।

আর একদিন অরুণোদয়কালে যখন উষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি উদ্যান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামীজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ বার্তালাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ যে উর্দ্ধে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উহাই শিব, আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে তাহাই জগজ্জননী—!" কারণ এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষ ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ—তিনি জগতের ভিতর বা বাহিরে নহেন, আর জগতও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, পরন্তু ঈশ্বরই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।

শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়া কাজকর্ম করিতেছিলাম, এমন সময় এক 'তার' আসিল। তারটি একদিন দেরীতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'কল্য রাত্রে উতকামন্দে গুড্‌উইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।' প্রকাশ পাইল যে,

সে অঞ্চলে যে সান্নিপাতিকের মহামারীর সূত্রপাত হইতেছিল, আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, এবং দেখা গেল যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজীর কথা কহিয়াছিলেন এবং তিনি যেন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, সাগ্রহচিত্তে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

৫ই জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামীজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের ফটক ও উঠান হইয়া তাঁহার রাস্তা গিয়াছিল। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমরা মুহূর্তেকের জন্য বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। তিনি আমাদের দুঃসংবাদের বিষয় অবগত ছিলেন না, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাঁহাকেও যেন এক গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করাইয়াছিলেন, যিনি গোখুরো সর্প কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া 'প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে' এইমাত্র বলিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, "এইমাত্র আমি এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে—পওহারী বাবা নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি হোমাগ্নিতে স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।" তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "স্বামীজী! এটি কি অত্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই?"

স্বামীজী গভীর আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "তাহা আমি জানি না। তিনি এতবড় মহাপুরুষ ছিলেন যে, আমি তাঁহার কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই জানিতেন।"

ইহার পর আজ প্রায় কোন কথাবার্তা হইল না এবং সন্ন্যাসিগণ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। তখনও অপর সংবাদটির কথা তাঁহাদিগকে জানান হয় নাই।

৬ই জুন। পরদিন প্রাতে তিনি খুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, তিনি এক গভীরভাবে ভাবিত। তিনি পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্রি চারিটা হইতে উঠিয়াছিলেন এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া গুড্‌উইন সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিল। আঘাতটি তিনি নীরবে সহিয়া লইলেন। কয়েক দিন পরে তিনি যে স্থানে ইহা প্রথম পাইয়াছিলেন, সে স্থানেই আর থাকিতে চাহিলেন না; বলিলেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত শিষ্যের আকৃতি রাত দিন তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং ইহা যে দুর্বলতা, একথা জ্ঞাপন করিলেন।

ইহা যে দোষাবহ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি বলিলেন যে, কাহারও স্মৃতি দ্বারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর ক্রমবিকাশের উচ্চতর সোপানে মৎস্য কিংবা কুক্কুরসুলভ লক্ষণগুলি অবিকল বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই। মানুষকে এই ভ্রম জয় করিতে হইবে এবং মানিতে হইবে যে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ষণেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের (সগুণ ঈশ্বরের) ইচ্ছানুসারে এই জগৎ পরিচালিত হইতেছে, এইরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "গুড্‌উইনকে মারিয়া ফেলার জন্য এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা কি মানুষের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে নহে ?—গুড্‌উইন্ বাঁচিয়া থাকিলে কত বড় বড় কাজ করিতে পারিত !"

কাঠগুদামের পথে ১১ই জুন। শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়া পরিত্যাগ করিলাম। কাঠগুদাম পৌছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছে। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্য দিয়াই পথটুকু অতিবাহিত হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী—গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই সব গাছপালা, দলে দলে বানর, আর চির-বিস্ময়কর ভারতের রজনী।

১৪ই জুন। পরদিন আমরা পাঞ্জাব প্রবেশ করিলাম ; এই ঘটনায় স্বামীজী অতি উল্লসিত হইলেন, এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ঠতা ও এত প্রীতি ছিল যে, উহা ঠিক যেন তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া প্রতীতি হইত। স্বামীজী বলিলেন, "সেখানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটিতে তাহার সোঽহং, সোঽহং ধ্বনি শুনিয়া থাকে।" বলিতে বলিতে সহসা বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সুদূর অতীতে চলিয়া গেলেন এবং আমাদের নয়নসমক্ষে যবনগণের সিন্ধুনদীতীরে অভিযান, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিবৃদ্ধি—এই সকল মহান ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী একে একে উদ্‌ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি যেমন করিয়া হউক আটক পর্যন্ত গিয়া যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটি স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট গান্ধার ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন এবং "কলাবিদ্যা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে"—ইউরোপীয়গণের এই অর্থহীন অন্যায় দাবি নিরাকরণ করিতে করিতে যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কতিপয় চিরপ্রত্যাশিত নগর—

কোনও কোনও বিশ্বাসী ইংরেজ শিষ্যের শৈশবের বাসভূমি লুধিয়ানা, যেখায় স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতার অবসান হইয়াছিল সেই লাহোর এবং অন্যান্য নগর চকিতের ন্যায় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া আবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। আমরা অনেক শুষ্ক কঙ্করময় নদীগর্ভের উপর দিয়াও চলিতেছিলাম। শুনিলাম, দুইটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানের নাম দো-আব এবং সমস্ত নদীগুলি যে ভূখণ্ডের অন্তর্গত তাহার নাম পাঞ্জাব। গোধূলির আলোকে এই সকল পার্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটি অতিক্রমকালে, স্বামীজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাসজীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে, আর্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদতীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। তরঙ্গের পর অন্ধকার তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে স্বর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই স্বর।"

তিনি বলিতেছিলেন, "শঙ্করাচার্য বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মত কোন এক অলৌকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল এবং তিনি ঐরূপে সেই তানকে ধ্বংসমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্যই ঐ বেদ এবং উপনিষৎ-সমূহের সৌন্দর্যের স্পন্দন মাত্র।"

মহাদেবের প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভালবাসা ছিল এবং একদা তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা তাহাদের নূতন নূতন কর্তব্যের মধ্যে শুধু মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে 'শিব! শিব!' বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজা করা হইবে। তাঁহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্যন্ত সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্তি দ্বারা ওতপ্রোত, সে ধ্যান সুখচিন্তার দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে এবং তিনি বলিলেন যে, এই গ্রীষ্ম ঋতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বুঝিলেন, যাহাতে মহাদেবের মস্তকে এবং সমতল প্রদেশে অবতরণের পূর্বে শিবের জটার মধ্যেও সুরধুনীর ইতস্ততঃ

সঞ্চরণ কল্পিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি বহুদিন ধরিয়া পর্বত-মধ্য-বাহিনী নদী ও জলপ্রপাত সকল কি কথা বলে, ইহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছিলেন যে, ইহা সেই অনাদি অনন্ত 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত, সুন্দর এবং মৌন। আর আমি তাঁহার পূজক বলিয়া শ্লাঘ্য।"

আর একবার মধ্য-এসিয়োদ্ভব দিগ্বিজয়ী বীর জেঙ্গিজ অথবা চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকে তাঁহাকে একজন নীচ, পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে তোমরা শুনিয়া থাক, কিন্তু তাহা সত্য নহে। এই মহামনাগণ কখনও কেবল ধনলোলুপ বা নীচ হন না। তিনি একরকম অখণ্ড-ভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিয়াছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছাঁচে গড়া লোক ছিলেন এবং সেকেন্দরও এই শ্রেণীর আর একজন। মাত্র এই তিন জন—অথবা হয়ত একই জীবাত্মা তিনটি পৃথক দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল!"

৪ঠা জুলাই। অতি উল্লাসের সহিত গোপনে স্বামীজী এবং তাঁহার এক শিষ্যা (শিষ্যগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকাবাসী নহেন) ৪ঠা জুলাই তারিখে একটি উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই এবং থাকিলে তদ্দ্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের জাতীয় উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন করা যাইতে পারিত, এই বলিয়া একজন দুঃখ করিতেছেন—ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। ৩রা তারিখ অপরাহ্নে তিনি মহা ব্যস্ততার সহিত এক কাশ্মীরী পণ্ডিত দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটি কিরূপ হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ডোরা দাগগুলি অত্যন্ত আনাড়ীর মত একখণ্ড বস্ত্রে আরোপিত হইল এবং উহা evergreen গাছের কয়েকটি শাখার সহিত ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনতা-লাভের দিবসে প্রাতঃকালীন চা পান করিবার জন্য নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটিতে উপস্থিত থাকার জন্য আর এক জায়গায় যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন এবং তিনি অন্যান্য অভিভাষণের সহিত নিজে একটি কবিতা উপহার দিলেন। সেগুলি এক্ষণে স্বাগত স্বরূপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল।

কবিতার নাম ["৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি"]

"কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লয়েন নাই। সর্বোপরি তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন; 'বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। আইস, তোমরা সকলে প্রবেশ কর।'

"তিনি পাপিনী অম্বাপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তিনি অন্ত্যজের গৃহে, উহাতে তাঁহার প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও, ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অতিথিসৎকারককে এই মহামুক্তিদানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠান। সত্যলাভের পূর্বেও একটি ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য ভালবাসা ও দয়ায় কাতর! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি রাজা শুধু যে ছাগশিশুটিকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন.সেটিকে মুক্তি দেন, এবং কিরূপে সেই রাজা তাঁহার অনুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত ছাগশিশুকে প্রাণদান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহৃদয়তার এরূপ অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই! নিশ্চয়ই তাঁহার মত আর কেহ যে জন্মেন নাই, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই!"

সেইদিন বৈকালে গোধূলির সময় একজন আপেল গাছগুলির তলায় উপবিষ্ট ক্ষুদ্র দলটির মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, যাহা ক্বচিৎ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাই ঘটিয়াছে—আচার্যদেব ধীরা মাতা ও জয়ার সহিত নিজের সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছেন। তিনি দুই টুকরা পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, "সুস্থাবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে, অথবা আমার সঙ্কল্পের জোর কমিয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আসুক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর সামনা-সামনি হই দেখি, অমনি আমি এইরকম শক্ত হইয়া যাই,"—বলিয়া পাথর দুখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন,—"কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।"

২৯শে জুলাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামীজীকে খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে খুবই উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সব বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটান হইলে কখনও কখনও তিনি মালাহস্তে তথায় আসিতেন। আজ রাত্রিতে আমাদের মধ্যে দুইজন বওয়ানের চতুর্দিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

বওয়ান জায়গাটি একটা পল্লীগ্রামের মেলার মত।—সমস্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডগুলি ঐ ধর্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরা মাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দী-ভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগ্রামে পৌছিলাম; উপত্যকার নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা তদ্বিষয়ে স্বামীজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "স্বামীজী, ইহা সত্য যে, আপনার এই শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে।" বলিবামাত্র স্বামীজী চুপ করিয়া গেলেন। যাহা হউক, সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্যাকে আশীর্বাদলাভে ধন্য হইবার জন্য ছাউনীর চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা তাঁহাকে শক্তিমান বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটি ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে আমাদের ঠিক সম্মুখে খরস্রোতা লিডার নদী ও অপর তীরে পাইন বৃক্ষাচ্ছাদিত পর্বতমালা বর্তমান ছিল এবং খুব উচ্চে একটি রন্ধ্রের অপর পারে একটি তুষারবর্ত্ম স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল। এই গোপগণের গ্রামে আমরা একাদশী করিবার জন্য পূরা একদিবস অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে যাত্রিগণ রওয়ানা হইল।

২রা আগষ্ট। মঙ্গলবার। অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে প্রথম যাত্রিদল নিশ্চয়ই রাত্রি দুইটার সময় ছাউনী হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে। আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌছিলে সূর্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটিতে গতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল, তা নয়। আমাদিগকে, অমরনাথের গুহা পর্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া বহু কষ্টে যাইতে হইয়াছিল। আমাদের গন্তব্যস্থানের মাইলখানেক আগে বরফ শেষ হইল এবং উহা হইতে যে জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হইয়াছিল। এমন কি, যখন আমরা প্রায় পৌছিয়া গিয়াছি বলিয়াই বোধ হইতেছিল তখনও পর্যন্ত আমাদের পাথরের উপর দিয়া আরও একটা বেশ কঠিন চড়াই করিতে বাকি ছিল!

স্বামীজী ক্লান্ত হইয়া ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন। তিনি যে পীড়িত হইতে পারেন তাহা মনে থাকায়, আমি, কঙ্কর স্তূপগুলির অধোভাগে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌছিলেন এবং "স্নান করিতে যাইতেছি"—মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অর্ধঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্ধ বৃত্তটির এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটিতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। স্থানটি ছিল এত বড় যে, তথায় একটি গির্জা ধরিতে পারে এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটি প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইয়াছে! তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তিনি 'মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে কসিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে; জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহা চিরদিনের মত বর্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল—"ও যখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে না।"

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সদয়হৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে, তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব। আর তথায় কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসায় ছিল না, কোন কিছু খারাপ ছিল না। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই!"

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটি কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিতেন এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন, একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটি প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা কোন এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে, তাহারা অদ্রবতুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্বদা ইহাও বলিতেন, "সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিয়াছেন।"

আর আমাকে তিনি বলিলেন, "তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না। কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে এবং ইহার ফলকে ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য হইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।"

বেলুড় মঠের জীবন

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

[ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজীর মঠ-জীবনের কিছু বিবরণ পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে। তার থেকে কিছু অংশ নির্বাচন করা হয়েছে এখানে।]

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ : স্বামীজী কয়েকদিন হইতে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটিতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি আজ একত্রিত হইতে আহ্বান করায়, তিনটার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাড়িতে জড় হইয়াছেন। স্বামী যোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠন করা। সকলে উপবেশন করিলে পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :

"নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতন্ত্রে সঙ্ঘ তৈরী করা, বা সাধারণের সম্মতি (ভোট্) নিয়ে কাজ করাটা তত সুবিধাজনক বলে মনে হয় না। ওসব দেশের (পাশ্চাত্ত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নহে। তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদরযত্ন করেছে। এদেশে শিক্ষাবিস্তারে যখন ইতর সাধারণ লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত-ফতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতন্ত্রমতে সঙ্ঘের কার্য চালাতে পারবে। সেই জন্য এই সঙ্ঘের একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত লয়ে কার্য করা হবে।

"আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরি নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা একার্যে সহায় হোন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহিগণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভাবী কার্যপ্রণালী আলোচিত হইতে লাগিল। সঙ্ঘের নাম রাখা হইল—রামকৃষ্ণ প্রচার বা রামকৃষ্ণ মিশন। উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি আমরা উহার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তরমাত্র জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে কাযের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

কার্যপ্রণালী : মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিত-করণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।

ভারতবর্ষীয় কার্য : ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার আশ্রম স্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-দেশান্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন।

বিদেশীয় কার্যবিভাগ : ভারত-বহির্ভূত প্রদেশসমূহে 'ব্রতচারী'-প্রেরণ এবং তত্তৎ দেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতি বর্ধন এবং নূতন নূতন আশ্রম সংস্থাপন।

স্বামীজী স্বয়ং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটর্নী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী, ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ও বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারী এবং শিয্য শাস্ত্রপাঠক স্বরূপে নির্বাচিত হইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতি রবিবার চারটার পর ৺বলরামবাবুর বাড়িতে সমিতির অধিবেশন হইবে। পূর্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত 'রামকৃষ্ণ মিশন' সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজী যতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন সুবিধামত সমিতির অধিবেশনে

উপস্থিত থাকিয়া কখনও উপদেশ দান এবং কখনও বা কিন্নর কণ্ঠে গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভঙ্গের পর সভ্যগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "এইরূপে কার্য তো আরম্ভ করা গেল; এখন দ্যাখ্, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।"

স্বামী যোগানন্দ। "তোমার এ সব বিদেশীভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?"

স্বামীজী। "তুই কি করে জানলি এ সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা, পাট প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নাই। তিনি সাধন ভজন, ধ্যান-ধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়-পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয় নাই। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।"

যোগানন্দ স্বামী কথার প্রতিবাদ না করায় স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: "প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভুয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ সব কার্য করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্র ছিল না, যখন কপর্দকশূন্য হয়ে পৃথিবীভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প, তখনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রাস্তায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সম্মানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের কৃপায় তখন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কার্য করে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কার্যে সাহায্য কর, দেখ্‌বি তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।"

স্বামী যোগানন্দ। "তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা তো চিরদিন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ সকল করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জান, মধ্যে মধ্যে কেমন খটকা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কি না। তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্যপথে চলছি না তো? তাই তোমায় অন্যরূপ বলি ও সাবধান করে দিই।"

স্বামীজী। "কি জানিস্, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন্। তিনি অনন্ত ভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয়, তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নাই। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হতে পারে। তবে তিনি তা না করে ইচ্ছা করে এবার আমার ভিতর দিয়ে আমাকে যন্ত্র করে এইরূপ করাচ্ছেন—তা আমি কি করব, বল ?

বঙ্গ—১৮৯৮খ্রীষ্টাব্দ

আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন! তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুরঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন—

"ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

শিষ্য। "আমাদের পক্ষে কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত ?"

স্বামীজী। "মহাবীরের চরিত্রকেই তোমার এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্ না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবনমরণে দৃকপাত নেই—মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান! দাস্য-ভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠিত করতে হবে। ঐ রূপ হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে যাবে, দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞাপালন আর ব্রহ্মচর্য রক্ষা—এই হচ্ছে Secret of success ;

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (অবলম্বন করবার আর দ্বিতীয় পথ নেই)। হনুমানে একদিকে যেমন সেবাভাব, অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোক-সন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছু মাত্র দ্বিধা রাখে না। রামসেবা ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে উপেক্ষা—ব্রহ্মত্ব শিবত্ব লাভে পর্যন্ত উপেক্ষা! শুধু রঘুনাথের আদেশ পালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। খোল করতাল বাজিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করে দেশটা উৎসন্ন গেল, একেত এই Dyspeptic রোগীর দল—তাতে আবার লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখবি খোল করতাল বাজছে! ঢাক ঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তুরী ভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐ সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমান্‌ষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল, এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে? কবিকল্পও ঐ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়। ডমরু-শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভি নাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিগ্‌দেশ কম্পিত করতে হবে। যে সব musicএ মানুষের soft feelings উদ্দীপিত করে সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখ্‌তে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোককে অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follow করিলে তবে তখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা এ ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস, তা হলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ঐরূপ করতে শিখ্‌বে। কিন্তু দেখিস্ ideal থেকে কখন যেন এক পাও হটিস নি। কখনও হীনসাহস হবি নি। খেতে শুতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে, কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ত মহাশক্তির কৃপা হবে।"

শিষ্য। "মহাশয়, এক এক সময়ে কেমন হীনসাহস হয়ে পড়ি।"

স্বামীজী। "তখন এরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি, হীনসাহস!' হীনবুদ্ধি, হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান' বল্‌তে বল্‌তে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভিতর ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিস্ নি? তিনি বলতেন,

'এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।' এইরূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হলে আর হীনবুদ্ধি, হীনসাহস নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবি নি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখ্‌বি সব দুর্বলতা সব কাপুরুষতা তখন চলে যাবে।"

ঐরূপ বলিতে বলিতে স্বামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে আমগাছ আছে, তাহারই তলায় একখানা ক্যাম্পখাটে তিনি অনেক সময় বসিতেন; অদ্যও সেখানে আসিয়া পশ্চিমাস্যে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব যেন তখনও ফুটিয়া বাহির হইতেছে! উপবিষ্ট হইয়াই তিনি শিষ্যকে উপস্থিত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন:

"এই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! একে উপেক্ষা করে যারা অন্য বিষয়ে মন দেয়—ধিক তাদের! করামলকবৎ এই যে ব্রহ্ম! দেখতে পাচ্ছিস নে?—এই—এই—!"

এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবে স্বামীজী কথাগুলি বলিলেন যে, শুনিয়াই উপস্থিত সকলে "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।"—সহসা গভীর ধ্যানে মগ্ন। কাহারও মুখে কথাটি নাই। স্বামী প্রেমানন্দ তখন গঙ্গা হইতে কমণ্ডলু করিয়া জল লইয়া ঠাকুর ঘরে উঠিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াও স্বামীজী "এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" বলিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া তাঁহারও তখন হাতের কমণ্ডলু হাতে বদ্ধ হইয়া রহিল; একটা মহা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া তিনিও ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট গত হইলে স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যা, এখন ঠাকুর পুজায় যা।" স্বামী প্রেমানন্দর তবে চেতনা হয়। ক্রমে সকলের মনই আবার 'আমি আমার' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে যে যাহার কার্যে গমন করিল।

স্বামীজী। "যে সাধনভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহা-মোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হতে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস্ একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কালে যত জন্মে তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে, তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করিস্, প্রতি জীবে যখন ঐরূপ টান্ হবে, তখন বুঝব তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন—not a

moment before,—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা জাগরিত হলে তবে বুঝব তুই ideal-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিস্।"

শিষ্য। "এটি তো মহাশয় ভয়ানক কথা—সকলের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মুক্তি হইবে না! কোথাও তো এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনি নাই!"

স্বামীজী। "এক-class বেদান্তবাদীদের ঐরূপ মত আছে। তাঁরা বলেন, 'ব্যষ্টিগত মুক্তি—মুক্তির যথার্থ স্বরূপ নহে। সমষ্টিগত মুক্তিই মুক্তি।' অবশ্য ঐ মতের দোষগুণ যথেষ্ট দেখান যেতে পারে।"

শিষ্য। "বেদান্তমতে ব্যষ্টিভাবই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসত্তাই কাম্যকর্মাদিবশে বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হন। বিচারবলে উপাধিশূন্য হইলে, নির্বিষয় হইলে প্রত্যক্ষ চিন্ময় আত্মার বন্ধন থাকিবে কিরূপে? যাহার জীবজগতাদিবোধ থাকে, তাহার মনে হইতে পারে—সকলের মুক্তি না হইলে তাহার মুক্তি নাই। কিন্তু শ্রবণাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যখন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মময় হয়, তখন তাহার নিকট জীবই বা কোথায়, আর জগতই বা কোথায়? কিছুই থাকে না। তাহার মুক্তিত্বের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।"

স্বামীজী। "হাঁ, তুই যা বলছিস্ তাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। উহা নির্দোষও বটে। ওতে ব্যক্তিগত মুক্তি অবরুদ্ধ হয় না। কিন্তু যে মনে করে আমি আব্রহ্ম জগৎটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে মুক্ত হব, তার মহাপ্রাণতাটা একবার ভেবে দ্যাখ দেখি।"

বর্ষ—১৯০২

পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমনের পর স্বামীজী মঠেই অবস্থান করিতেন এবং মঠের গৃহস্থালী কার্যের তত্ত্বাবধান ও কখনকখন কোনকোন কর্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন, কখন নিজ হস্তে মঠে জমি কোপাইতেন, কখন গাছপালা ফল-ফুলের বীজ রোপন করিতেন। আবার কখনবা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘরদ্বারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঝাঁটা ধরিয়া ঐ সকল পরিষ্কার করিতেন। যদি কেহ তাহা দেখিয়া 'আপনি কেন!' বলিতেন, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতেন, 'তা হলই বা—অপরিষ্কার থাক্‌লে মঠের সকলের যে অসুখ করবে!' ঐ কালে তিনি মঠে কতকগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন, বড় একটা মাদী ছাগলকে 'হংসী' বলিয়া ডাকিতেন ও তারই দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মটরু' বলিয়া ডাকিতেন ও আদর করিয়া তাহার গলায় ঘুঙ্গুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা আদর

পাইয়া স্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজী তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের ছেলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেন। কিছুদিন পরে 'মটরু' মরিয়া যাওয়ায় স্বামীজী বিষণ্ণচিত্তে শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, আমি যেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটা মরে যায়।"

মঠের জমির জঙ্গল সাফ্ করিতে ও মাটি কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রঙ্গ করিতেন এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন। একদিন কলিকাতা হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। স্বামীজী তামাক খাইতে খাইতে সেদিন সাঁওতালদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়িয়াছেন যে, স্বামী সুবোধানন্দ অসিয়া তাঁহাকে ঐ সকল ব্যক্তির আগমন-সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "আমি এখন দেখা করতে পারব না, এদের নিয়ে বেশ আছি।" বাস্তবিকই সেদিন স্বামীজী ঐ সকল দীন-দুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামীজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামীজীকে বলিত, "ওরে স্বামী বাপ্, তুই আমাদের কাজের বেলা এখান্‌কে আসিস্ না—তোর সঙ্গে কথা বল্‌লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; পরে বুড়ো বাবা এসে বকে।" কথা শুনিয়া স্বামীজীর চোখ ছলছল করিত এবং বলিতেন, "না না, বুড়ো বাবা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বক্‌বে না; তুই তোদের দেশের দুটো কথা বল।" ইহা বলিয়া তাহাদের সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বলিলেন, "ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?" কেষ্টা বলিল, "আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে রে বাপ।" স্বামীজী বলিলেন, "নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবে। তা হলে ত খাবি?"

কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। অনন্তর স্বামীজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই, মণ্ডা, দধি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। খাইতে খাইতে কেষ্টা বলিল, "হাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথায় পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামীজী তাহাদের খাওয়াইয়া বলিলেন, "তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।"

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করতে গেলে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, "এদের

দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা, এমন আর দেখিনি!" অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ছাখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়' সর্বস্ব অর্পণের নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয়নি! ইচ্ছে হয়—মঠ ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এই সব গরীব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না—আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ও দেশে যখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বল্লুম, মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্য চুষ্য খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। মা! তাদের কোন উপায় হবে না? ওদেশে ধর্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্য যদি অন্নসংস্থান করতে পারি।

"দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখবাজান, ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই তোর লেখাপড়া, ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আনি ও দরিদ্র-নারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।"

শিষ্য। "মহাশয়, এদেশের লোকের ভিতর বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব—ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।"

স্বামীজী। "(সক্রোধে) কঠিন বলে কোনো কাজটাকে মনে করলে হেথায় আর আসিস্‌নি। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব দিক সোজা হয়ে যায়। তোর কার্য হচ্ছে দীন-দুঃখীর সেবা করা জাতিবর্ণনির্বিশেষে। তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি? তোর কাজ হচ্ছে কার্য করে যাওয়া, পরে সব আপনি আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে—গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙ্গা নয়। জগতের ইতিহাস পড়ে দ্যাখ এক একজন মহাপুরুষ এক একটা সময়ে এক একটা দেশে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভূত হয়ে শত সহস্র লোক জগতের হিত সাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান ছেলে, হেথায় এতদিন আসছিস। কি করলি বল দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পারলিনি? আবার জন্মে এসে তখন বেদান্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা, তবে জানবি—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী এলোথেলো ভাবে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে গভীর

চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন, "আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন ; তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

মহাসমাধি

উদ্বোধন, ১লা শ্রাবণ, ১৩০৯ (১৯০২খৃঃ)

আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি।

কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে, আমাদের পূজ্যপাদ স্বামীজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ যে দিন তিনি গৃহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি। ইচ্ছা রহিল, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব।

বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আষাঢ়, শুক্রবার, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ১৯০২খৃঃ

তিনি ইদানীং মাসকতক হইল, তাঁহার ভীষণ এলবুমেনুরিয়া (একপ্রকার প্রস্রাবের ব্যায়রাম) রোগে ভুগিতেছিলেন। কবিরাজি চিকিৎসায় সে রোগ হইতে একপ্রকার মুক্তিলাভ করেন। দেহত্যাগের মাসখানেক পূর্ব হইতে তিনি ভালই ছিলেন, বলিতে পারা যায়। যে দিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন প্রাতঃকালে যজুর্বেদের একটি মন্ত্র ("সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মি" ইত্যাদি) ও উহার টীকা একজন সন্ন্যাসী-শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, টীকাতে সুষুম্নঃ শব্দের যাহাই অর্থ থাক, পরবর্তী ষট্চক্রবাদিগণ সুষুম্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহার বীজ (অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে দেখ।

ইহাতে বোধ হয়, সে দিন তাঁহার মনে ষট্চক্রের ভাব ও সাধনাবিশেষ জাগরূক ছিল।

পরে বেলা আটটা হইতে এগারোটা পর্যন্ত ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া করিতে পারিতেন না। সে দিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন।

ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটী এই—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।" সে দিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত

আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যগণকে "লঘুকৌমুদী" ব্যাকরণ পড়াইলেন, পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০ মাইল বেড়াইয়া আসিলেন। অনেকদিন এত বেশী বেড়াইতে পারেন নাই। সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর খুব ভাল ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা বিশেষরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব হাল্কা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটিকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন।

তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় শ্যামা পূজা করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সে দিন অনেক কথাবার্তা কহেন। ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু বাতাস করিতে বলিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মালা ছিল। শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাঁহার নিদ্রার আবেশের মত আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। পরে দুইবার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাঁহার সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া লইয়া যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজীর নাড়ী নাই ও নিশ্বাস বন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনমতে সমাধিভঙ্গ আর হইল না। সেই রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহত্যাগ হইয়াছে।

তাহার পরদিন সকালে দেখা গেল, চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ এবং নাসিকা ও মুখ দিয়া অল্প রক্ত পড়িয়াছে। অপরাপর ডাক্তারগণ বলিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কোন স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। ইহাতে বেশ বোধ হয়, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া দেহাবসান হয়।

মনীষী-সঙ্গমে

[স্বামী বিবেকানন্দ বহু দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁদের অনেকে স্বামীজীর বিষয় লিখে গেছেন। স্বামীজীও তাঁদের কারো কারো বিষয়ে অল্পস্বল্প লিখেছেন। এই পর্যায়ে স্বামীজী সম্বন্ধে সমসাময়িক ও পরবর্তী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা নির্বাচন করে চয়ন করা হল। স্বামীজীর দু'একজন পাশ্চাত্ত্য ভক্তের স্মৃতিকথাও এর মধ্যে আছে। এখানে অন্য মনীষী সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যও কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকা ও ইউরোপে অধ্যাপক জন হেনরি রাইট, উইলিয়ম জেমস, ইঙ্গারসোল, নিকলাস টেসলা, স্যার উইলিয়ম টমসন (লর্ড কেলভিন), অধ্যাপক হেলমহোলজ্, হিরাম ম্যাকসিম, প্রিন্স ক্রপটকিন, ম্যাক্সমূলার, পল ডয়সন, পিয়ের হিয়াসান্থ, জুল বোওয়া, প্যাট্রিক গেডেস, মাদাম কালভে, সারা বার্ণহার্ড প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক বা শিল্পীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। জাপানী ওকাকুরা স্বামীজীকে নিয়ে যাবার জন্য ভারতে এসেছিলেন। এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণ বর্তমান পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

'জার্মান মহাজ্ঞানী ও দ্রষ্টা' পল ডয়সন স্বামীজী সম্বন্ধে বলতেন, 'আমার বন্ধু বিবেকানন্দ।' স্বামীজী ডয়সন সম্বন্ধে লিখে গেছেন। স্থান সংক্ষেপের জন্য সে লেখা দেওয়া যায়নি। পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বকে পরবর্তী কালে যিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় করেন সেই রোমাঁ রোলাঁর রচনা অত্যন্ত পরিচিত বলে বাদ দেওয়া হয়েছে।

'মনীষী-সঙ্গমে' পর্যায় শুরু করা যায় একটি ঐতিহাসিক সমাবেশের বিবরণ দিয়ে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে বেলুড় মঠে তাঁর যে জন্মোৎসব সভা হয়েছিল, তাতে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও।—

"বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী [১৯০৫] বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক এক সভা আহূত হয়। প্রায় ২৫০।৩০০ ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সমাগম হয়। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ বসু, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমিতি একখানি ষ্টিম লঞ্চ জোগাড় করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মান্যবর গোখলে ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ কার্যবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভার কার্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এই বিষয় সভার গোচর করেন। বাবু পুলিনবিহারী মিত্র কর্তৃক স্বামীজীর বিরচিত "রামকৃষ্ণ আরাত্রিক" ও "সমাধি" বিষয়ক সঙ্গীত গীত হইলে স্বামীজীর গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি পাঠ ও আবৃত্তি হইয়াছিল। (১) Appeal to young men of Bengal (এই অংশটি সমিতি মুদ্রিত করাইয়া সভাস্থলে ছাত্রবৃন্দকে বিতরণ করেন), (২) To the awakened India, (৩) "বর্তমান ভারত" প্রবন্ধের শেষাংশ, (৪) "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতার শেষাংশ। বক্তাগণের মধ্যে বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ এন এন ঘোষ অসুস্থতাবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গিরিশবাবু তাঁহার "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তাহা পঠিত হয়। তৎপরে স্বামী শুদ্ধানন্দ বাঙ্গলা ভাষায় "স্বামীজীর শিক্ষা প্রণালী" সম্বন্ধে এবং সিষ্টার নিবেদিতা—ইংরাজী ভাষায় "স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যদেশে

ধর্মপ্রচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে পুলিনবাবু কর্তৃক গিরিশবাবু বিরচিত স্বামীজী সম্বন্ধীয় দুইটি গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পর প্রসাদ বিতরিত হয়।"

উদ্বোধন | ৭ম বর্ষ | ৩য় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩১১ পৃ ৮৮

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণা

অ্যানী বেশান্ত

চিকাগোর ঘন আবহাওয়ার মধ্যে জলন্ত ভারতীয় সূর্য, সিংহতুল্য গ্রীবা ও মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, স্পন্দিত ওষ্ঠ, চকিত দ্রুত গতি, কমলা ও হলুদ রঙের পোষাকে পরমাশ্চর্য ব্যক্তিত্ব,—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়ার রূপ এই,—ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে যখন আমি তাঁকে প্রথম দেখলাম। সন্ন্যাসী—তাঁর পরিচয়? নিশ্চয়ই। কিন্তু সৈনিক সন্ন্যাসী তিনি, প্রথম দর্শনে বরং সন্ন্যাসীর চেয়ে সৈনিকই বেশী মনে হয়,—মঞ্চ থেকে এখন নেমে এসেছেন, দেশ ও জাতির গর্ব ফুটে আছে দেহের রেখায় রেখায়,—পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন কৌতূহলী অর্বাচীনদের দ্বারা, যারা কোনোমতেই নিজেদের দাবি ত্যাগে প্রস্তুত নয়, যারা যেন বলতে চায়, তিনি যে সুপ্রাচীন ধর্মের প্রতীক-পুরুষ সেই ধর্ম আশেপাশে সমবেত ধর্মসমূহের মহিমার চেয়ে হীনতর। কিন্তু না, তা হবার নয়, ধাবমান ও উদ্ধত পশ্চিম দেশের কাছে ভারত, যতক্ষণ তার এই বাণীবহ সন্তান বর্তমান আছে, ততক্ষণ লজ্জিত থাকবে না। ভারতের বাণীকে তিনি বহন করে এনেছেন, ভারতের নামে তিনি দাঁড়িয়েছেন। 'সকল দেশের মধ্যে রাণী'র মত যে দেশ থেকে তিনি এসেছেন,—তার মর্যাদার কথা স্মরণ রেখেছিলেন এই চারণ সন্ন্যাসী। প্রাণবন্ত, শক্তিধর, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্থির স্বামী বিবেকানন্দ পুরুষের মধ্যে পুরুষ, নিজেকে উত্তোলন করার সামর্থ্যসম্পন্ন চরিত্র।

মঞ্চের উপরে অপর পক্ষও আত্মপ্রকাশ করেছিল। মর্যাদা, যোগ্যতা ও শক্তির দ্যোতনা সেখানেও ছিল—কিন্তু সব কিছুই আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিবেকানন্দের দ্বারা আনীত অধ্যাত্মবাণীর অপরূপ সৌন্দর্যের কাছে, নম্র হয়ে গেল সমস্তই যখন তাঁর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল ভারতের জীবনস্বরূপ পরমাশ্চর্য আত্মতত্ত্ব,—জ্বলে উঠল প্রাচ্যের দিব্যবাণীর অতুলনীয় মহিমা। মোহিত ও অভিভূত সেই বিরাট জনমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে রইল প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্য, অপেক্ষা করে রইল রুদ্ধশ্বাসে—যে ধ্বনিতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে যেন তার কিছুই হারিয়ে না যায়! 'ঐ লোকটিকে আমরা পৌত্তলিক বলেছি!'—বিশাল সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে

একজন বলে উঠল,—'আর ওঁর দেশে আমরা মিশনারী পাঠাচ্ছি! এ দেশে ওঁদেরই মিশনারী পাঠানো উচিত।'

দৈববাণীর মত কথাগুলি। কারণ তারপরে সেই মহান প্রচারকের দ্বারা উন্মোচিত পথের উপর দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু 'মিশনারী' আমেরিকায় এসেছেন এবং পূর্ব-নিউইয়র্কে ও পশ্চিম-সানফ্রানসিস্‌কোয় বেদান্ত বাসা বেঁধেছে।

আমার পরবর্তী স্মৃতি ধূমাচ্ছন্ন ইংলণ্ডে। স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে আমার কাছে এসে দেখা করার সৌজন্য দেখিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাতৃভূমির জন্য আমি সামান্যভাবে যে সেবা করার চেষ্টা করেছি তার জন্য সদয় ও সুমিষ্ট কিছু কথা বলেছিলেন। মধুর হাসিতে তাঁর স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ নয়ন কোমল হয়ে এসেছিল, এবং দুই ভারত-প্রেমিক হাত মিলিয়েছিল বন্ধুত্বভরে।

কিছুদিন পরে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হল হিমালয়ের এক দূর উত্তরভূমিতে। তাঁর অসামান্য শক্তি তখন হ্রাস পেয়েছে, নয়ন ক্লান্ত, ওষ্ঠ ক্লিষ্ট ও শিথিল। কিন্তু স্বচ্ছ-হয়ে-আসা দেহের ভিতরে আত্মার আলো জ্বলছে স্পষ্ট শিখায়। ভারতের জাতীয়তার জাগরণের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবনের মহান কর্তব্যের বিষয়ে শান্তভাবে আমরা দুজনে আলোচনা করলাম, যা আমাদের দুজনেরই প্রিয় বিষয়। তারপর আমরা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হলাম। পরদিন সকালে তাঁর কাছ থেকে একটি চিরকুট এল, তাতে তাঁর প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতার প্রথম বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ ছিল,—অত্যন্ত অসুস্থ থাকার জন্য তিনি স্বয়ং সভাপতি হতে পারবেন না। আমি সম্মত হলাম সানন্দে। শিষ্যাকে আমি পরে অনেকবার দেখেছি, গুরুকে আর দেখতে পাইনি। শিষ্যাকে আমি ভালবেসেছি ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসার জন্য; ভারতকে আমরা দুজনেই মাতা বলে বরণ করেছিলাম।

রামকৃষ্ণ মিশনের বহু কেন্দ্র থেকে যে সেবা কাজ চালানো হচ্ছে, তা স্বামীজীরই কাজ, সেই কাজের মধ্য দিয়েই তিনি আধুনিক ভারতে মূর্ত হয়ে উঠছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যদিও তাঁর গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশে গুরুর নামে মিশনের নামকরণ করেছেন, কিন্তু যখন আমি সাহসী, শক্তিশালী ও সত্যব্রত তরুণদলকে সেবায় উদ্বুদ্ধ দেখি, যখন দেখি তারা এক হাতে দিচ্ছে দেহের অন্ন, অন্য হাতে দিচ্ছে আত্মার পরমান্ন, তখন রামকৃষ্ণের চেয়ে বেশী করে মনে পড়ে বিবেকানন্দকে—এই তরুণদলের মধ্যেই তিনি জীবিত ও সক্রিয় আছেন। মাত্র কটি ছেলে বেনারস হোমের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাদের কথা আমার বেশ মনে আছে, মনে

আছে কিভাবে তারা পথ থেকে পীড়িত ও মরণাপন্নদের কুড়িয়ে নিজেদের দীন কুটীরে এনে তুলত, তাদের ধোয়াত, মোছাত, খাওয়াত, সেবা করত,—মধুর ও কঠিন শুশ্রূষায় তাদের বাঁচিয়ে রাখত সযত্নে। এখন বেনারস হোম অব সার্ভিসের বিস্তৃত ও সুন্দর আবাস,—তখন ছিল দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কতকগুলি জীর্ণ কুটীর। কিন্তু ছেলেগুলিকে জাগিয়ে রেখেছিল তাদের মহান গুরুর শিক্ষা, এবং বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল এই ছেলেদের কাজের মধ্যেই।

বিবেকানন্দ স্মৃতি

জোসেফাইন ম্যাকলাউড

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী আমি আমার ভগিনীর সঙ্গে নিউ ইয়র্কের ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩নং ষ্ট্রীট-এর বাড়িতে যাই এবং স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার বসিবার ঘরে ১৫।২০ জন মহিলা ও দুই-তিনজন পুরুষের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় দেখি। ঘরটি জনাকীর্ণ, কৌচগুলি সব অধিকৃত হইয়াছে। অতএব আমরা সামনের সারিতে মেঝের উপর বসিলাম। স্বামীজী এক কোণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কি যেন বলিয়াছিলেনও, ঠিক কি বলিয়াছিলেন আজ আমার মনে নাই, কিন্তু যাহা কিছু বলিয়াছিলেন সব কথাই সেদিন সত্য বলিয়া আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম বাক্যটি সত্য ছিল, দ্বিতীয় বাক্যটি সত্যতর, তৃতীয় বাক্যটি আরও সত্য। এই সাক্ষাৎকারের পর আমি সাত বৎসর ধরিয়া তাঁহার বাণী শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু শুনিয়াছি সে সকলই সত্য। সেই দিনকার সেই বিশেষ মুহূর্তের পর হইতে জীবন আমার কাছে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সকলকে এই সত্য উপলব্ধি করাইয়াছেন যে—'তোমরা সকলে অনন্তের মধ্যে অবস্থান করিতেছ। এই অনন্তের পরিবর্তন নাই, পরিণাম নাই। ইহা সূর্যের মতই দীপ্যমান, সূর্যের মতই ইহাকে একবার দেখিলে কখনও ভুলিতে পারিবে না।'

সেই শীতকালে সপ্তাহে তিনদিন বেলা ১১টার সময় আমি নিয়মিত তাঁহার বাণী শুনিয়াছি। আমি তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলিতে যাই নাই বটে, কিন্তু আমরা এত নিয়মিত তাঁহার কাছে যাতায়াত সুরু করিয়াছিলাম যে, স্বামীজীর বসিবার ঘরে তাঁহার সামনের দুইটি আসন আমাদের জন্য সব সময় পৃথক থাকিত। একদিন তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কি দুই বোন?' আমরা বলিলাম,—'হ্যাঁ!' তিনি পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন—'তোমরা কি খুব দূর থেকে আস?' আমরা বলিলাম—'না, খুব দূর নয়, হাডসনের উত্তরে ৩০ মাইল

দূর থেকে আসি।' 'এতদূর! খুব আশ্চর্যের কথা তো।'—ইহাই হইল স্বামীজীর সঙ্গে আমার প্রথম বাক্যালাপ।

আমি তখন মনে করিতাম বিবেকানন্দের পরেই মিসেস রোয়েথলিস বার্জারই সবচেয়ে অধ্যাত্মভাবাপন্ন। মিসেস বার্জারই আমাদের স্বামীজীর নিকট লইয়া যান। স্বামীজীর কাছে তাঁহার একটি বিশিষ্ট মর্যাদাও ছিল। একদিন মিসেস বার্জার ও আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'স্বামীজী, কি রকম করে ধ্যান করতে হয় আমাদের শিক্ষা দিন।' তিনি বলিলেন—'এক সপ্তাহ ওঁ এই শব্দটি ধ্যান কর, তারপর আমার কাছে এসো।' এক সপ্তাহ পরে আমরা পুনরায় তাঁহার নিকট গেলাম। মিসেস বার্জার বলিলেন—'আমি একটি জ্যোতি দেখেছি।' তিনি বলিলেন—'ভাল কথা, এগিয়ে যাও।' আমি বলিলাম 'কিন্তু আমার কাছে তা হৃদয়ের মধ্যে একটা জ্যোতির্ময় আভাসের মত।' তিনি আমাকে বলিলেন,—'বেশ ভাল, তুমিও লেগে থাক।' স্বামীজী আমাকে মাত্র এইটুকুই শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব হইতেই আমরা ধ্যান অভ্যাস করিতাম এবং গীতা আমাদের কণ্ঠস্থ ছিল। আমার মনে হয় তাহা আমাদের স্বামীজীরূপ মহাশক্তিকে চিনিয়া লইতে সাহায্য করিয়াছিল। অপরের মধ্যে সাহস সঞ্চারের মধ্যেই ছিল তাঁহার শক্তি। তাঁহাকে নিজের সম্পর্কে সচেতন থাকিতে কদাপি দেখি নাই। সেই অপরের প্রতিই ছিল তাঁহার আকর্ষণ। তিনি বলিতেন—'জীবনগ্রন্থের পাতা যখনই আমরা উল্টিয়ে যাই তখনই রঙ্গ সুরু হয়।' তিনি আমাদের এই কথাই বারবার বুঝাইতেন—জীবনে ধর্মহীন কিছুরই অস্তিত্ব নাই—সবই পবিত্র। তিনি বলিতেন, 'সব সময় একটা কথা মনে রাখবে—তোমরা যে আমেরিকাবাসী স্ত্রীলোক হয়ে জন্মেছো, সেটা একটা নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার। স্বরূপতঃ তোমরা সবাই সেই এক ঈশ্বরের সন্তান। দিনরাত নিজেকে এই আত্মপরিচয় দিতে থাক এবং কখনো নিজেকে চিনতে ভুলো না।' এই সকলই ছিল তাঁহার শিক্ষা। সেই শিক্ষা তাঁহার ভিতর হইতে বিচ্ছুরিত হইত। তাঁর উপস্থিতিটাই ছিল 'ডাইন্যামিক'। টাকা না থাকিলে যেমন অন্যকে টাকা দেওয়া যায় না, তেমনি শক্তি যাহার নাই সে অন্যকে শক্তি দিতে পারে না। অপরে ব্যাপারটা হয়তো কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু কার্যে পরিণত করিতে পারে না।

* * *

ভগিনীর সঙ্গে তাহার বিবাহের পোষাক কিনিতে যখন প্যারিসে গেলাম, তখন স্বামীজী 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' চলিয়া গেলেন। এবং সেখানে ছয় সপ্তাহ ধরিয়া তিনি 'দেববাণী' নামধেয় অপূর্ব কথাগুলি বলিয়াছিলেন। আমার কাছে এই কথাগুলি, যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান। কারণ

সেগুলি একদল অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে কথিত হইয়াছিল। তাঁহারা ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য, যেখানে আমি তাঁহার বন্ধু ছাড়া আর কিছু ছিলাম না। সেই শিষ্যত্বের মর্যাদা তিনি তাঁহাদের দিয়াছিলেন। সেই দিনগুলিতে তিনি যেভাবে তাঁহার হৃদয় উন্মোচন করিয়াছিলেন এমনটি আর কখনও করেন নাই।

তিনি আগষ্ট মাসে মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিসে·আসেন। সেখানে আমার ভগিনী ও আমি 'হল্যাণ্ড হাউস'-এ উঠিয়াছিলাম। স্বামীজী ও মিঃ লেগেট অন্য একটা হোটেলে থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আমরা প্রত্যহই সাক্ষাৎ করিতাম। সেই সময় মিঃ লেগেটের একজন আর্দালী ছিল। সে স্বামীজীকে বলিত—'আমার প্রিয় রাজপুত্র।' স্বামীজী বলিতেন—'কিন্তু আমি তো রাজপুত্র নই, আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী।' সেই আর্দালী বলিত—'আপনি নিজেকে যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি রাজা-রাজড়াদের আদবকায়দায় অভ্যস্ত, সুতরাং আমি রাজা দেখলেই চিনতে পারি।' স্বামীজীর মর্যাদা সকলকেই প্রভাবিত করিত। তবুও একদিন যখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—'স্বামীজী, আপনি কি অপরূপ মর্যাদাবান!' স্বামীজী উত্তর দিলেন—'মর্যাদার ভাব আমার মধ্যে নেই, আছে আমার চলার ভঙ্গীর মধ্যে।'

৯ই সেপ্টেম্বর মিঃ এবং মিসেস লেগেটের বিবাহ হয়। পরের দিনই স্বামীজী লণ্ডনে রওনা হইলেন। সেখানে তিনি মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডির অতিথি হন। মিঃ ষ্টার্ডি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্যের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন এবং তিনি নিজেও ছিলেন একজন ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিছুদিন পরেই স্বামীজী আমাদের লিখিলেন—'চলে এস, এবং ক্লাসে যোগ দাও।' কিন্তু আমরা যখন সেখানে পৌছাইলাম তখন তাঁহার বক্তৃতাপর্ব সুরু হইয়া গিয়াছে। 'প্রিন্সেস হল'-এ অপূর্ব বাগ্মিতা প্রকাশ পায়। পরদিন সংবাদপত্রগুলি এই বার্তায় মুখর হইল যে—একজন বিরাট ভারতীয় যোগী লণ্ডনে আসিয়াছেন। সেখানে তিনি খুব সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি লণ্ডনেই ছিলেন, তারপর স্বামীজী আবার কাজ চালাইতে আমেরিকা ফিরিয়া যান।

স্বামীজী ছিলেন অসীম জ্ঞানের অধিকারী। একবার আমার ভগিনী অ্যালবার্টা ষ্টারজিস—পরে যে লেডী স্যাণ্ডউইচ হয়—স্বামীজীর সঙ্গে রোমে ছিল। তখন স্বামীজীকে রোমের দর্শনীয়গুলি দেখাইবার কালে ঐ সকল স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞানের পরিমাণ দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়াছিল। যখন সে স্বামীজীর সঙ্গে সেণ্ট পিটার্স গীর্জায় গেল, সেখানে রোমের গীর্জায় প্রতীকসমূহ, মণিমাণিক্য-সমূহ, সাধুসন্তদের সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদসমূহ—প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর শ্রদ্ধা

দেখিয়া সে আরও বিস্মিত হইয়াছিল। সে বলিল—'স্বামীজী, আপনি তো সগুণ সবিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, তা হ'লে এ সবকে এত সম্ভ্রমের চোখে দেখেন কি করে ?' তিনি উত্তর দিলেন—'কিন্তু অ্যালবার্টা, যদি তুমি সত্যই সগুণ ভগবানে বিশ্বাস কর, তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ বস্তুকে তাঁর জন্য অর্পণ করবে।'

সেই বৎসরেই শরৎকালে স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার এবং জে. জে. গুডউইনের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসেন এবং সেখানে সমগ্র জাতির বিপুল অভিনন্দন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় *Lectures from Colombo to Almora* নামক ইংরেজী গ্রন্থে। তাঁহার স্টেনোগ্রাফার মিঃ গুডউইন (যাহাকে ৫৪ ওয়েস্ট ৩৩ নং স্ট্রীটে থাকা কালেই নিযুক্ত করা হয়) স্বামী বিবেকানন্দের এই সব ভাষণের অনুলিখন গ্রহণ করেন। মিঃ গুডউইন আদালতের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন। তিনি প্রতি মিনিটে দুইশত শব্দ লিখিতে পারিতেন, এজন্য তাঁহার পারিশ্রমিকও ছিল প্রচুর। কিন্তু আমরা যেহেতু বিবেকানন্দের কোন শব্দই হারাইতে রাজী ছিলাম না, সেইজন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। প্রথম সপ্তাহের পরে মিঃ গুডউইন টাকা লইতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল—'এর অর্থ কি ?' মিঃ গুডউইন বলিলেন,—'যদি বিবেকানন্দ তাঁর জীবন দিতে পারেন, তাহলে আমি আমার কাজটুকু অন্ততঃ দিতে পারি।' অতঃপর সারা পৃথিবী তিনি স্বামীজীর অনুসরণ করিয়াছেন। এবং তার ফলে আমরা বিবেকানন্দের ওষ্ঠ হইতে সদ্যপতিত এবং মিঃ গুডউইন-লিখিত শব্দরাজি-পূর্ণ সাত খণ্ড গ্রন্থ পড়িতেছি।

স্বামীজী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করার পর আমি তাঁহাকে পত্র না লিখিয়া তাঁহার নিকট হইতে পত্রের প্রত্যাশা করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত একটি পত্র আসিল—'তুমি চিঠি লেখ না কেন ?' উত্তরে আমি লিখিলাম—'আমি ভারতবর্ষে আসতে পারি কি ?' তার উত্তরে তিনি জানাইলেন—'হাঁ আসতে পার, যদি তুমি আবর্জনা, অধঃপতন, দারিদ্র্য এবং কৌপীনধারীদের ধর্মকথা সহ্য করতে পার তবে এস। এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করলে এস না। আর বেশী সমালোচনা আমাদের সহ্যের বাইরে।' স্বভাবতই এই চিঠি পাওয়ার পরে প্রথম জাহাজেই আমি রওনা হইলাম। ১২ই জানুয়ারী মিসেস অলিবুল এবং স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে যাত্রা সুরু করিয়া লণ্ডন ও রোম হইয়া আমরা ১২ ফেব্রুয়ারী বোম্বে পৌছাইলাম। এখানে আলাসিঙ্গার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি কপালে বৈষ্ণবের সোজা লাল তিলক ধারণ করিতেন। কিছুদিন পরে স্বামীজীর সহিত কাশ্মীর যাওয়ার কালে আমি মন্তব্য

করিয়াছিলাম—'কি দুর্ভাগ্য! মিঃ আলাসিঙ্গাও কপালে বৈষ্ণবের তিলক আঁকেন!' তৎক্ষণাৎ স্বামীজী আমার দিকে ঘুরিয়া অত্যন্ত কঠিনভাবে বলিলেন—'থামো! তুমি নিজে কখনও কিছু করেছ?' আমি কি অন্যায় করিয়াছি তাহা আমি জানিতাম না। অবশ্য এ কথার আমি কোন উত্তর দিই নাই। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং আমি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। পরে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই পেরুমল নামক ব্রাহ্মণ যুবকটি মাদ্রাজের কোনও কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। মাসিক ১০০ টাকা মাহিনার তিনি তাঁহার পিতামাতা, স্ত্রী এবং চারিটি শিশু সন্তানকে প্রতিপালন করেন এবং তিনি বিবেকানন্দকে পশ্চিমে পাঠাইবার জন্য দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি ছাড়া হয়তো আমরা বিবেকানন্দকে দেখিতাম না। মিঃ আলাসিঙ্গার সম্বন্ধে সামান্যতম কটাক্ষেও স্বামীজীর রোষের কারণ ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

দুই একদিনের মধ্যেই বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগান-বাড়িতে স্বামীজীকে তাঁহার অস্থায়ী মঠে দেখিতে যাই। বিকাল বেলায় স্বামীজী বলিলেন—'যে নূতন মঠটি সম্প্রতি আমরা কিনেছি সেখানে তোমাদের আজই নিয়ে যাব।' জায়গাটি দেখিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম—'কিন্তু স্বামীজী, জায়গাটি খুব বেশী বড়ো হয়ে যায়নি কি?' কয়েক বিঘা জমির উপর বেশ সুন্দর ছোটখাটো একটি ভিলা; তাহাতে দীঘি ও ফুলের বাগান। আমি ভাবিলাম, যে-কাহারও পক্ষে এইটি যথেষ্ট বড়ো। কিন্তু স্বামীজী স্পষ্টতই ব্যাপারটি ভিন্ন আকারে দেখিতে ছিলেন।...প্রতিদিন সকালে তিনি চা পান করিতে আসিতেন এবং একটি বড়ো আমগাছের নীচে বসিয়া চা পান করিতেন। সেই গাছটি এখনও আছে। এই গাছটি কাটিতে মঠের লোকেরা বিশেষ ব্যস্ত হইলেও আমরা কাটিতে দিই নাই। গঙ্গাতীরে এই কুটীরে আমাদের অবস্থানকে স্বামীজী খুব পছন্দ করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে যে-কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন স্বামীজী তাঁহাকেই এই বাড়িটি দেখাইতে লইয়া আসিতেন। যে বাড়িটি তিনি বাসের অযোগ্য মনে করিতেন সেইটি আমরা কি সুন্দর আবাসগৃহ করিয়া তুলিয়াছি—সেই কথাটিই তিনি সকলকে বুঝাইতে চাহিতেন। অপরাহ্ণে আমরা বাড়ির সামনে চায়ের আসর বসাইতাম—সম্মুখে থাকিত নদীর পূর্ণদৃশ্য। আমরা যেন নিজেদের বৈঠকখানায় বসিয়া দেখিতাম—মালবোঝাই নৌকাগুলি উজান বাহিয়া চলিয়াছে। যে সকল জিনিস অপরে নিতান্ত গতানুগতিক মনে করে, আমরা সেগুলিকে বিশেষ মূল্য দিতেছি দেখিয়া স্বামীজী খুব খুশী হইতেন। এক রাত্রিতে আকাশ বৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল, স্বামীজী আমাদের খাবার ঘরের সামনের বারান্দায়

একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পাইচারি করিতে করিতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে, তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে এবং পৃথিবীতে সেই প্রেমের প্রভাব সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি, যখন তিনি ভক্ত ও প্রেমিক তখন কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ সমস্ত একেবারে ভুলিয়া থাকিতেন, যেন সেগুলির কোন মূল্যই নাই। আর যখন তিনি কর্মযোগী তখন কর্মকেই মহত্তম আলোচ্য বিষয় করিয়া তুলিতেন। জ্ঞান সম্বন্ধে একই কথা। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া তিনি এমন বিশেষ ভাবাবস্থায় থাকিতেন, ঠিক পূর্বের অবস্থার সঙ্গে যাহার কিছুমাত্র যোগ থাকিত না। তাঁহার চিত্তের একটা বিস্ময়কর একাগ্রতা ছিল। মনে হইত আমাদের চারিদিকে যে মহাজাগতিক শক্তিসমূহ বর্তমান, সেইগুলির উৎস উন্মোচন করিয়া তিনি তাহারই মধ্যে বর্তমান আছেন। ঐ একাগ্রতা-শক্তিই বোধ হয় তাঁহাকে এত সতেজ ও কর্মচঞ্চল করিয়া রাখিত। পুনরাবৃত্তি করা যেন তাঁহার অভ্যস্ত রীতির মধ্যে ছিল না। অতি সামান্য ঘটনাও, যাহার তাৎপর্য অতি তুচ্ছ, তাহাও নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার নিকট নূতন পথ খুলিয়া দিত। আমাদের, পাশ্চাত্ত্যবাসীদের সম্পর্কে তাঁহার মনে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি আমাদের 'জীবন্ত বেদান্তী' বলিতেন, তিনি বলিতেন—'তোমরা যখন কোনও জিনিসকে সত্য বলে বিশ্বাস কর তা নিয়ে স্বপ্ন না দেখে তোমরা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোল। সেইটিই তোমাদের শক্তি।'

এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বামীজী সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনাগারিক ধর্মপালকে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য লইয়া আসেন। মিসেস অলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা ও আমি ঐ গৃহে এত আনন্দের সঙ্গে বাস করিতেছিলাম যে, স্বামীজী তাঁহার অতিথিদের বিশেষ গৌরবের সঙ্গে ইহাই দেখাইতে চাহিতেন, পাশ্চাত্ত্য মেয়েরাও কি সুন্দর অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে এবং কেমন ঘর গুছাইয়া লইতে পারে।

১৮৯৮ খ্রীঃ ১২মে আমরা কাশ্মীরের পথে যাত্রা করি। আমরা নৈনিতালে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাসে থামি। সেখানে শত শত ভারতীয় স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে পার্বত্য একটি টাট্টুর উপর বসাইয়া তাঁহার সামনে পত্রপুষ্প ছড়াইয়াছিল, ঠিক যেমন খ্রীষ্টের জেরুজালেম গমনকালে করা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—'তা হলে এটি একটি প্রাচ্য প্রথা।'

নৈনিতাল হইতে আমরা আলমোড়া রওনা হই। আলমোড়ায় স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হন। আমরা নিজেদের জন্য একটি বাংলা ভাড়া লইয়া

সেইখানে একমাস কাটাইলাম। স্বামীজী সব সময়ই আলমোড়াকে তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদের হিমালয়-আবাস বলিয়া মনে করিতেন। ঐ স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করিতেন। মিঃ সেভিয়ার মঠ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে খুব গুরুত্ব দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদিন চায়ের আসরে এত বেশী লোক সমাগম হইতে লাগিল যে, তিনি উত্ত্যক্ত হইয়া হিমালয়ের আরও চল্লিশ মাইল অভ্যন্তরে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। এই ভাবে মায়াবতী আশ্রমের উদ্ভব হইল, রেলস্টেশন হইতে ৮০ মাইল দূরে, আর সেখানে যাওয়ার ভাল কোন রাস্তাও ছিল না।

আমাদের আলমোড়াবাসের সময়েই একদিন সংবাদ পাওয়া গেল মিঃ গুডউইন উটকামণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামীজী এই সংবাদ পাইয়া অনেকক্ষণ তুষার-মৌলি হিমালয়ের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, 'জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া আমার শেষ হল।' এর পর কদাচিৎ তিনি জনতার মাঝখানে বক্তৃতা করিয়াছেন।

মিসেস অলিবুল মঠ-প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক হাজার ডলার দিয়াছিলেন। আমার সঞ্চয় ছিল নিতান্ত অল্প—মাত্র আটশত ডলার সংগ্রহ করিতে আমার কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। একদিন আমি স্বামীজীকে বলিলাম—'স্বামীজী, আমার কাছে অল্প কিছু আছে, আপনি তা কাজে লাগাতে পারেন।' তিনি বলিলেন—'বটে, আছে নাকি?' আমি বলিলাম—'হাঁ, আছে।' 'কত?'—তিনি জানিতে চাহিলেন। আমি উত্তর দিলাম—'আটশ ডলার।' তৎক্ষণাৎ তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এই তো হয়ে গেল, যাও তোমার প্রেস কিনে ফেল।' তিনি প্রেস ক্রয় করিলেন এবং সেই প্রেস হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা পত্রিকা 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হইল।... স্বামীজী আমার বোন মিসেস লেগেটকে "মাতা" বলিতেন এবং টেবিলে সব সময় তাহার পাশেই বসিতেন। তিনি চকোলেট আইসক্রীম খুব পছন্দ করিতেন। কারণ, তিনি বলিতেন, 'আমি চকোলেটের মতই (রঙ?), তাই একে আমি পছন্দ করি।' একদিন আমরা স্ট্রবেরী খাইতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'স্বামীজী, আপনি স্ট্রবেরী পছন্দ করেন না?' স্বামীজী উত্তর করিলেন—'আমি স্ট্রবেরীর স্বাদ জানি না।' 'সেকি? আপনি স্টবেরীর স্বাদ জানেন না! আপনি যে প্রতিদিন তা খান।' স্বামীজী বলিলেন—'তোমরা তার উপর ক্রীম মাখিয়ে রাখ। আর ক্রীম মাখানো থাকলে মুড়িও সুস্বাদু।'

সন্ধ্যাকালে রিজলি ম্যানরের প্রশস্ত কক্ষে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া তিনি কথা বলিতেন।... একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি এমন অপূর্ব কণ্ঠে ও অপূর্ব ভাবে কথা বলিতে-

ছিলেন,—তাঁহার স্বর মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া যেন বহুদূর হইতে এমনভাবে ভাসিয়া আসিতে লাগিল যে, উপস্থিত আমরা সন্ধ্যাশেষে যখন বিদায় লইলাম তখন পরস্পরের নিকট 'শুভরাত্রি' জানাইতেও ভুলিয়া গিয়াছি—চতুর্দিকে এমনই পবিত্রতা বিকীর্ণ হইয়াছিল। আমার ভগিনী মিসেস লেগেট তারপর আর একটি ঘরে গিয়া দেখেন অতিথিদের মধ্যে একজন—যিনি অজ্ঞেয়বাদী—কাঁদিতেছেন। 'ব্যাপার কি ?'—আমার ভগিনী প্রশ্ন করিল। মহিলাটি বলিলেন—'এ মানুষটি আমাকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন। আর তাঁহার কথা শুনিতে চাই না।'

স্বামীজী যখন রিজলি-ম্যানরে, তখন একদিন এক অজ্ঞাত মহিলার নিকট হইতে একখানি পত্র আসিল,—আমাদের একমাত্র ভাই লস্ এঞ্জেলস-এ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া পত্রলেখিকা পত্র লিখিয়াছেন। আমার ভগিনী বলিল, 'আমার মনে হয়, তোমার যাওয়া দরকার।' আমি বলিলাম—'অবশ্যই'। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমি তৈরী হইয়া লইলাম—দরজায় ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। চার মাইল গাড়িতে গিয়া তবে স্টেশনে পৌছানো যায়। আমি ঘরের বাহির হওয়ার সময় স্বামীজী আমার মাথায় হাত রাখিয়া সংস্কৃতে একটি আশীর্বাণী উচ্চারণ করিলেন, তারপর বলিলেন—'ওখানে কয়েকটি ক্লাসের বন্দোবস্ত কর, আমিও তাহলে শীঘ্র ওখানে যেতে পারি।' আমি সরাসরি লস এঞ্জেলস্-এ গেলাম। শহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোলাপফুলে ঢাকা ঘরে আমার ভাই ছিল, সে খুবই অসুস্থ। তাহার বিছানার উপর (দেয়ালে) স্বামীজীর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি টাঙ্গান ছিল। দশ বৎসর আমার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। ঘণ্টাখানেক তাহার সহিত কথা কহিয়া, তাহাকে খুব অসুস্থ দেখিয়া, আমি বাহিরে গেলাম এবং গৃহকর্ত্রী মিসেস ব্লজেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম—'আমার ভাই খুব অসুস্থ।' তিনি বলিলেন—'হাঁ।' আমি বলিলাম—'আমার মনে হয়, এ যাত্রায় তাকে আর বাঁচান যাবে না।' তিনি আবার বলিলেন—'হাঁ-তাই-ই।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'তার এখানে দেহত্যাগ করায় কোনও আপত্তি নেই তো ?' তিনি উত্তর করিলেন 'কিছুমাত্র নয়।' আমি আবার বলিলাম, 'আমার ভাইয়ের বিছানার উপর যাঁর প্রতিকৃতি টাঙ্গান রয়েছে, উনি কে ?' মিসেস ব্লজেট তাঁহার সপ্ততিবর্ষের সমস্ত মর্যাদাকে যেন নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া সমুন্নত হইয়া বলিলেন—'যদি এই পৃথিবীর মাটিতে কখনও কোনও ভগবান থাকেন তবে ইনিই তিনি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তাঁর সম্পর্কে আপনি কি জানেন ?' তিনি উত্তর দিলেন—'১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিকাগো ধর্মসভায় আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় এক যুবক উঠে দাঁড়িয়ে যখন বল্লেন—'আমেরিকাবাসী হে আমার

ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, তখন সেই সাত হাজার শ্রোতা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করলো তাদের অজ্ঞাত এক মহান বস্তুর জন্য। তারপর যখন সব শেষ হল—দেখলাম দলে দলে মেয়েরা তাঁর কাছে যাবার জন্য বেঞ্চ ডিঙ্গিয়ে তাঁর দিকে ছুটেছে। তখন আমি মনে মনে বল্লাম—'বৎস, তুমি যদি এই আক্রমণ সামলাতে পার, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ভগবান।' তখন আমি মিসেস ব্লজেটকে বলিলাম—'আমি তাঁকে চিনি!' তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন—'আপনি তাঁকে চেনেন!' আমি উত্তর দিলাম—'হাঁ, আমি তাঁকে নিউ-ইয়র্কের ক্যাটসকিল পর্বতে ষ্টোনরিজ গ্রামে, যেখানে শ'তুই লোক থাকে—সেইখানে তাঁকে ছেড়ে এসেছি।' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি তাঁকে সত্যিই জানেন?' আমি উত্তর দিলাম—'আপনি তাঁকে এখানে আসতে বললেই পারেন।' তিনি বলিলেন—'আমার এই কুটিরে?' 'হাঁ, আসবেন।'—আমি বলিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমার ভাই মারা গেল। আর সপ্তাহ ছয়েকের মধ্যেই স্বামীজী এখানে আসিলেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়ায় তাঁহার ক্লাস স্বরু করিলেন।

আমরা বেশ কয়েকমাস মিসেস ব্লজেটের অতিথিরূপে বাস করি।...

স্বামীজী হোম অফ ট্রুথ-এর কক্ষে এবং অন্যান্য হলে বহুসংখ্যক বক্তৃতা করিয়াছিলেন; কিন্তু 'নাজারেথের জিসাস'-বিষয়ক বক্তৃতাই, আমার মতে, আমি যতদূর শুনিয়াছি, তাঁহার সর্বোত্তম ভাষণ। এই বক্তৃতাকালে মনে হইতেছিল পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাঁহার সমগ্র দেহ এক শুভ্র আলোক বিকীর্ণ করিতেছিলেন,—তিনি খ্রীষ্টের শক্তির ও মহিমার বিস্ময়ের মধ্যে এমনই আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এই স্পষ্ট জ্যোতির উদ্ভাসে আমি এমনই অভিভূত হইয়াছিলাম যে, প্রত্যাবর্তনকালে পাছে তাঁহার ভাবে ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে তাঁহার সহিত কোন কথাই বলি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, সেই সুমহান চিন্তার মধ্যে তাঁহার মন তখনও নিমজ্জিত আছে।...

একটি কথা তিনি আমার ভাইঝিকে রিজলি-ম্যানরে বসিয়া বলিয়াছিলেন—'অ্যালবার্টা, জীবনের কোনও তথ্যই তোমার কল্পনার সত্যের অবিকল প্রতিরূপ হবে না।'...

নীলনদের উত্তরে কতকগুলি চমৎকার ইংরেজ ভদ্রলোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে জাপান যাইতে অনুরোধ করেন। ভারত ঘুরিয়া জাপান যাওয়ার পথে পুনরায় স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন—'আমি তাঁহাকে লিখিলে তিনি জাপানে যাইতে রাজী

আছেন।' জাপানে ওকাকুরা কাকাজুর সহিত আমার আলাপ হইল। তিনি টোকিওতে বিজিৎসু-রীতির চিত্রকলার প্রবর্তন করেন। তিনি জাপানে স্বামীজীকে তাঁহার অতিথিরূপে পাইবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী জাপানে আসিতে অসম্মত হওয়ায় মিঃ ওকাকুরা স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে আসিলেন। আমার জীবনের স্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্তের একটি হইল—কিছুদিন পরে বেলুড়ে যখন একদিন ওকাকুরা সহসা কিছুটা রাগতভাবে বলিয়া উঠিলেন—'বিবেকানন্দ আমাদের, তিনি প্রাচ্যের, তিনি তোমাদের নন,'—তখন আমি বুঝিলাম তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে একটা সত্যকার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। ইহার একদিন কি দুইদিন পরে বিবেকানন্দ যখন বলিলেন—'আমার মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন আগের হারানো এক ভাই ফিরে এসেছে,'—তখন আমি আবার বুঝিলাম—এই দুই ব্যক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বোঝাপড়া হইয়াছে। কিন্তু স্বামীজী যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমাদের সঙ্গে সন্ন্যাসীসংঘে যোগ দেবেন নাকি?' মিঃ ওকাকুরা বলিলেন—'না, আমি এ-জগতের হিসাব নিকাশ এখনও চুকিয়ে দিতে পারি নি।'...

বেলুড় মঠে একদিন ভগিনী নিবেদিতা খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণ করিতেছিলেন আর আমি স্বামীজীর শয়নকক্ষের জানালা দিয়া বাহিরে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—'আমি চল্লিশ পর্যন্ত বাঁচবো না।' তখন তাঁহার বয়স উনচল্লিশ, আমি তাহা জানিতাম বলিয়া বলিলাম—'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধ চল্লিশ থেকে আশী বছরের মধ্যেই তাঁর বড় বড় কাজ করেছেন।' তিনি বলিলেন—'আমার যা কিছু বলার ছিল, সে সবই তো বলা হয়ে গেছে; আমাকে যেতেই হবে।' আমি বলিলাম—'আপনি যাবার জন্য এত উতলা কেন?' তিনি উত্তর করিলেন—'বড়ো গাছের ছায়া ছোটো ছোটো গাছকে বাড়তে দেয় না। আমাকে চলে যেতে হবে, কারণ অপরকে বাড়তে দিতে হবে।'......

২রা জুলাই ভগিনী নিবেদিতা শেষবারের মত তাঁহাকে দেখেন। স্কুলে কোনো বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষার ঔচিত্য বিষয়ে নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন—'হয়তো তুমি ঠিকই ব'লেছো। কিন্তু আমার মন এখন অন্য বিষয়ে নিবদ্ধ। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।' নিবেদিতা ভাবিয়াছিলেন ইহা তাঁহার ঔদাসীন্য। তারপর স্বামীজী বলিলেন, 'কিন্তু তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।' ভগিনী নিবেদিতা সব সময়েই হিন্দু-প্রথায় হাতে করিয়া খাইতেন। তাঁহার খাওয়া শেষ হইলে স্বামীজী হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। নিবেদিতা যথার্থ শিষ্যার মত বলিলেন—'এ কি, আ-প-নি হাতে জল ঢেলে দিচ্ছেন!' স্বামীজী

বলিলেন—'যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' নিবেদিতার মুখে আসিল একটি কথা—'কিন্তু তা যে শেষ-সাক্ষাতের সময়!'

সেই তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎ।

সেই শেষ দিনে তিনি আমার সম্বন্ধে ও অপর অনেকের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আমার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'সে পবিত্রতার মতই পবিত্র—বিশুদ্ধ ভালবাসা।' সুতরাং আমি ঐ কথাগুলিকেই আমার জন্যে স্বামীজীর শেষ বাণী বলিয়াই মনে করি। তার দুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। মারা যাবার আগে বলিয়া গেলেন—'বেলুড়ের আধ্যাত্মিক প্রভাব দেড় হাজার বছর থাকবে। এবং তা একটা বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নেবে। মনে ক'রো না এটা আমি কল্পনা থেকে বলছি, আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

৪ঠা জুলাই আমার কাছে তার পৌঁছাইল—স্বামীজী নির্বাণলাভ করিয়াছেন। আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম কতদিন। যে নিঃসঙ্গতা আমার জীবনকে গ্রাস করিল তাহা আমাকে কাঁদাইল বৎসরের পর বৎসর। আমার কান্না থামিল—যখন আমি মেটারলিঙ্কের কথাগুলি পড়িলাম—'যদি তুমি কখনো কাহারও দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হও, সে প্রভাবকে প্রমাণ করো তোমার জীবনে, তোমার অশ্রুতে নয়।' তারপর আমি আর কাঁদি নাই। আমি আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়াছিলাম—তিনি যে সমস্ত স্থানে বাস করিয়াছিলেন সেই স্থানগুলি সন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' গিয়াছিলাম। সেখানে গৃহটির মালিক মিস ডাচারের আতিথ্য লইয়াছিলাম, তিনি আমাকে স্বামীজী যে ঘরে বাস করিয়াছিলেন; সেই ঘরটিতে থাকিতে দিয়াছিলেন।

চৌদ্দ বৎসরের আগে ভারতবর্ষে আর ফিরি নাই। অধ্যাপক গেডেস ও শ্রীমতী গেডেসের সহিত একসঙ্গে ভারতে গিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম ভারতবর্ষ আর শূন্যভূমি নহে। স্বামীজীর ভাবে ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠিয়াছে।······তারপর হইতে আমি প্রায়ই ভারতবর্ষে আসি। মঠের গেস্ট হাউসে আমায় তাহারা খুবই কামনা করে। কারণ আমি বিবেকানন্দকে জাগ্রত রাখি। এই তরুণদের কেহ তাঁহাকে একবারও দেখে নাই। ভারতবর্ষে থাকিতে আমার ভালো লাগে। কারণ আমার মনে পড়ে—আমি স্বামীজীকে একদা একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম—'স্বামীজী, কিভাবে আপনাকে সর্বাধিক সাহায্য করিতে পারি?' তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষকে ভালবাসো।' সুতরাং মঠের গেস্ট হাউসের দোতলার কক্ষটি আমার নিজস্ব, যেখানে আমি প্রতি শীতে গিয়া উঠি এবং সম্ভবতঃ জীবনের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত গিয়া উঠিব।

[সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত]

বিবেকানন্দ

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।—শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে তুমি ততটুকু কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশনে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীন জনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) ও কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে সকল চিঠি আমাকে লিখিয়াছেন তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এতবড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলিকাতা সহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের বোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতর স্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পুর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে

পারি—তাহার জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময়-ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা, দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান আর্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য তাহাই সূক্ষ্মকে, উদার বস্তুকে, আর্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিন ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে! দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়? যদি হয় ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর পরীক্ষা শিষ্যে, শিষ্যের পরীক্ষা গুরুতে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আর ইংরেজী-শিক্ষিত নবযুবকদের মধ্য হইতে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি, সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি, তাই ভগবান্ রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ। এক বার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাঁহার একটা বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম, সে আমাদের মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছিল, "তোরা যদি অমন কথা বলবি ত আমি দাঁড়াব কোথা? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের সাধ মিটাইব,"—উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "দেখ দাদা, শলুই চিনতে পারলে জাত সাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ত্ব চেনবার চেষ্টা করছি। তাঁহাকে ত দুইবারের অধিক দেখি নাই। তোমার মত সামগ্রী যাঁহার কৃপায় তৈয়ার হইতে পারে, তিনি যে কৃপার সাগর—সর্বনিধির আধার।" বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে,—

"আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি,
পাছে তারা-হারা হ'য়ে থাকি।"

এই গানটি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে অপূর্ব ভাব মিশাইয়া গায়িলেন।

বিবেকানন্দ কৃপা-সিদ্ধ। তাহার ইংরেজী বিদ্যার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা ও ইয়োরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাঙ্গালার যে উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হইবে কেন! তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-বোয়ার ভার পড়িয়াছিল! এ কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শনজাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে সকলই বিবেকানন্দের পূর্ণ মাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে ইয়োরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল। সে জল-বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শুখা-রুখায় পুড়িয়া যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যখন দেবতার কৃপায় পুরা ফসল হইবে, ক্ষেতভরা ধান হইবে, তখন বাঙ্গালী বুঝিবে,—কত বড় পুরুষ-সিংহ তাহাদের জন্য কি কাজ করিয়া গিয়াছে। ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে, সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসী বাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্ত রোগী দেখিলে সঙ্কুচিত হয় না, উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে ঝম্প প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করে না, সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। সংসারের সুখ অপেক্ষা, ঘর-বাড়ি স্ত্রী-পরিবারের আয়েস অপেক্ষা বেহেতর, প্রগাঢ়তর, প্রবলতর একটা সুখ, আনন্দ, উন্মাদন না পাইলে মানুষ কি সহজে এ দুনিয়ার চাকচিক্য ভুলিতে পারে? যে গুরু এমন ভাবে শিষ্যকে ভুলাইতে পারেন সে গুরু সত্যই ত ঈশ্বর,—ঈশ্বরের অবতার।

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করিতে আসেন নাই,—কেবল ভাব বিলাইতে আসিয়াছিলেন। তেমন সরল হাস্যময়, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জোটি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনও অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা, মিত্র-সংসর্গে এ ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ একজন বড় দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত।

কিন্তু তিনি সে ভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন "না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সাম্‌লাইতে পারিব না। আমার যে কাজ, সে কাজ এখন ত শেষ হয় নাই। ও দিকটা ফুটাইও না,—আমি পাগল হইব।" গান গায়িতে গায়িতে বিবেকানন্দ এক এক সময় সত্যই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া "তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ দেখি শ্যামা" এই গানটি গায়িতে গায়িতে চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে নাচাইতে বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির ধীর নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এই ভাব প্রায়ই চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "দ্যাখ্, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাহাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙ্গালী চার-শ বছর মাতাল হ'য়ে ছিল। আর ও মদ চালান ঠিক নয়।" তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।

সে চলিয়া গিয়াছে, গুরুদত্ত বীজ ছড়াইয়া, গুরুর গৌরব-ডঙ্কা বাজাইয়া, সর্ব-সামঞ্জস্যের মহামন্ত্র বাঙ্গালীর কানে বজ্রগম্ভীরনাদে উচ্চারণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসে নাই। তাই স্মৃতিসুখে সুখী হইয়া আর একজনের আশা-পথ চাহিয়া আছি। এস তুমি, ডাকার মত ডাকিলে না কি তুমি আসিয়া থাক, তাই তোমায় ডাকিতেছি! তুমি অন্যরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হও। তোমার কর্ম পূর্ণ কর। ('প্রবাহিণী', ২২ ফাল্গুন ১৩২০—"পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী" ২য় খণ্ড)

বিবেকানন্দের রূপান্তর

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল, তখন আমরা দুজনই জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে পণ্ডিত, দার্শনিক ও কবি উইলিয়ম হেষ্টির ছাত্র।[১] বিবেকানন্দ বয়সে আমার অপেক্ষা কিছু বড় হলেও আমি তাঁর

১। নরেন্দ্রনাথ উইলিয়ম হেস্টির প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এঁর কাছ থেকেই তিনি প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনেন। অধ্যক্ষ হেস্টি একদিন নরেন্দ্রনাথদের ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়ানোর সময়ে 'সমাধির' কথা বলেছিলেন। সমাধির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেবার জন্য তিনি বললেন,

এক ক্লাস উপরে পড়তাম। বিবেকানন্দ,—নিঃসন্দেহে প্রতিভাসম্পন্ন যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ, এবং মধুকণ্ঠ গায়ক; অসাধারণ বাক-নিপুণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়ই অম্ল ও তিক্ত; পৃথিবীর ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণশর সহাস্য বাক্যে অবিরত বিদ্ধ করেন, মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে আসীন তিনি, কিন্তু সেটা ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত করে রাখেন কোমলতম হৃদয়কে,—সব জড়িয়ে একজন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ বোহেমিয়ান, অথচ বোহেমিয়ানরা যাতে বঞ্চিত সেই লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞায় সমৃদ্ধ;—ভঙ্গিতে অটল ও অভ্রান্ত, অধিকারের দার্ঢ্য নিয়ে কথা বলেন, এবং তার সঙ্গে আছে চোখে এক অদ্ভুত শক্তি যা সম্মোহিত করে রাখে শ্রোতাদের।

এ সমস্তই সকলের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যকই জানত তাঁর ভিতরের মানুষটিকে, তার সংগ্রামকে,—অস্থির ও বেপরোয়া অন্বেষার মধ্যে যে সত্তার ঝড়ঝঞ্ঝা অন্য রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত।

তাঁর মানস-ইতিহাসের এক সঙ্কট মুহূর্তের সূচনাকাল এই সময়েই,—এই কালেই তিনি আত্মচেতনার জগতে জাগরিত হলেন, যার দ্বারা তাঁর ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হল। ব্রাহ্মসমাজের বহির্বর্তী অংশ থেকে তিনি যে বালসুলভ আস্তিকতা এবং সহজ আশাবাদ অর্জন করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Three Essays on Religion' তাতে বিপর্যয় এনে দিল। সৃষ্টির হেতুবাদী এবং উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খড়কুটোর মত নির্ভরের অযোগ্য হয়ে উঠল। এবং তিনি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময় স্বভাবের সঙ্গে সৃষ্টির এই অমঙ্গলকে তিনি কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবতে পারলেন না। এক বন্ধু তাঁকে

'আমি মাত্র একজনের মধ্যেই ঐ অসাধারণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পার।'

নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করে হেস্টি বলেছিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ সত্যই প্রতিভা। আমি বহুদেশ ঘুরেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার তুল্য প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় যুবকের সন্ধান পাইনি, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেও নয়।'

স্বামীজী পরবর্তীকালে কথাপ্রসঙ্গে হেস্টি সম্বন্ধে নিবেদিতা প্রভৃতিকে যে কথা বলেছিলেন—তার অংশ, "তিনি আমাদিগকে খুব গৌরবের সঙ্গে বলিলেন যে, তাঁহার পুরাতন স্কচ শিক্ষক হেস্টির সহিত মেলামেশাতেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের সহিত তাঁহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল। এই উষ্ণ মস্তিষ্ক বৃদ্ধ সামান্য ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন এবং নিজ গৃহকে ছাত্রগণের গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনিই প্রথমে তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারত-বাসের শেষভাগে বলিতেন, 'হ্যাঁ বাবা। তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে, তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!"

এই কালে হিউমের সংশয়বাদ এবং হারবার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদের[২] সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন, ফলে তাঁর অবিশ্বাস ক্রমে স্থায়ী দার্শনিক সংশয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

বিবেকানন্দের প্রাথমিক সতেজ আবেগ এবং সহজ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেল। এক ধরনের বিশুষ্কতা ও অবসাদ এল, প্রার্থনাময় ভক্তির পুরাতন সামর্থ্য আর রইল না; স্বভাবসিদ্ধ উপহাস ও ঔদাসীন্যের দ্বারা একে আবৃত করে রাখলেও ব্যাপারটা তাঁর আত্মাকে অস্থির করে তুলল যন্ত্রণায়; কিন্তু তখনো রইল তাঁর সঙ্গীত, যা আলোড়িত করত তাঁর গভীরকে, যা তাঁকে অলৌকিক, অপার্থিব ও অপ্রত্যক্ষ সত্যের চেতনায় উন্নীত করত, যা অশ্রু আনত তাঁর নয়নে।

এই সময়েই তিনি আমার কাছে এলেন; যে বন্ধু তাঁকে হিউম ও হারবার্ট স্পেনসারের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুই আমাদের আলাপ ঘটিয়ে দিলেন। আগে থেকেই তাঁর সঙ্গে মুখচেনা পরিচয় ছিল, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে উন্মোচন করলেন আমার কাছে,—বলে গেলেন সংশয়ের যন্ত্রণার কথা, নিত্যবস্তু সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হতে না পারার নৈরাশ্যের কথা। বর্তমান মানসিক অবস্থার উপযোগী হতে পারে এমন আস্তিক্য দর্শনের গ্রন্থাদির কথা তিনি জানতে চাইলেন। কয়েকজন প্রামাণ্য লেখকের নাম আমি করলাম, কিন্তু Intuitionist-দের ও Scotch Common Sense-বাদীদের ধরাবাঁধা যুক্তি তাঁর অবিশ্বাসকেই প্রবল করে তুলল। তাছাড়া একঘেয়ে সবকিছু পড়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট ধৈর্য তাঁর আছে বলে মনে হল না,—তাঁর স্বভাবধর্ম গ্রন্থ থেকে আহরণ করার চেয়ে অন্য জীবনের সহযোগ থেকে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহের পক্ষপাতী। প্রাণ থেকে প্রাণ, চিন্তা থেকে চিন্তার প্রজ্জ্বলনই তাঁর প্রকৃতিসিদ্ধ।

আমি বিবেকানন্দের দিকে সুগভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম কারণ বুঝলাম তিনি নিষ্পত্তি করতে চান ঐকান্তিকভাবে।

আমি তাঁকে শেলীর পাঠ দিলাম। শেলীর প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্বের বন্দনা, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব, এবং গৌরবদীপ্ত চিরশ্রেয় মানবসমাজের ভাবদর্শন তাঁকে নাড়া দিল,—দার্শনিকদের যুক্তিতর্ক যা করতে সমর্থ হয়নি। ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে আর

২। নরেন্দ্রনাথ কলেজজীবনে হারবার্ট স্পেনসারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, এবং অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত তাঁহার বিখ্যাত জীবনীতে স্বীকার করা হয়েছে, তিনি উপনিষদ ব্যাখ্যার সময়ে স্পেনসারের যুক্তিপদ্ধতি অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি স্পেনসারকে পত্র লিখেছিলেন, এবং স্পেনসার এই তরুণ বুদ্ধিজীবীকে প্রশংসা করে পত্রের উত্তরও দিয়েছিলেন। স্বামীজী যৌবনে স্পেনসারের 'Education' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন বলেও শোনা যায়।

প্রাণহীন, প্রেমহীন, যন্ত্রবিশেষ রইল না, তিনি অনুভব করলেন, তার মধ্যে জাগ্রত আছে আধ্যাত্মিক ঐক্য।

তারপর আমি তাঁকে শেলীর ধারণার অপেক্ষা উচ্চতর ঐক্যতত্ত্বের কথা বললাম—সার্বিক হেতুরূপী (Universal Reason) পরব্রহ্মের অদ্বয়তত্ত্বের কথা। আমার দার্শনিক প্রত্যয় তখন একের মধ্যে তিনটি তত্ত্বকে সমন্বিত করতে চাইছে—বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, হেগেলের 'Dialectics of the Absolute Idea', এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীকে। আমার কাছে তখন বস্তু-পার্থক্যের নীতি ছিল অমঙ্গলের নীতির নামান্তর। সবকিছু ঐ সার্বিক হেতু,—প্রকৃতি, জীবন ও ইতিহাস এই পরাচেতনার গতিশীল ক্রমবিকাশ। সকল নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মত ও পথের যাচাই করতে হবে এই বিশুদ্ধ হেতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অনুভূতি ব্যাপারটা আমার কাছে তখন শারীরিক ছাড়া আর কিছু নয়,—তা শালীনতা ও শৃঙ্খলার বিপর্যয়বিশেষ। কিভাবে বস্তুর, ব্যক্তিত্বের এবং যুক্তিহীনতার প্রতিরোধ অতিক্রম করে শুদ্ধ হেতুর অভিজ্ঞতা ঘটানো যায়, তাই হল জীবন, সমাজ, শিক্ষা ও নিয়মের বৃহৎ সমস্যা। তরুণ, অভিজ্ঞতাহীন স্বাপ্নিকের ভাবাবেগ নিয়ে আমি কল্পনানেত্রে দেখতাম—যুক্তিহীনতার বন্ধন থেকে জাতির মুক্তি আসছে এক নূতন বৈপ্লবিক সমাজের মধ্য দিয়ে,—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা যাদের মূলমন্ত্র।

সার্বিক হেতুর একচ্ছত্র অধিকার এবং নীতিবিধি হিসাবে ব্যক্তির অস্বীকৃতিরূপ ভাবরাজি শীঘ্রই বিবেকানন্দের বুদ্ধিকে তৃপ্ত করল এবং তা তাঁকে সংশয়বাদ ও জড়বাদের উপর জয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিল। তারো বেশী, তা তাঁকে জীবনের মত-পথের দিগ্‌দর্শন করিয়ে দিল। সবই হল, কিন্তু শান্তি মিলল না। সত্তার আরও গভীরে প্রবেশ করল সংঘাত, কারণ সার্বিক হেতুর ধারণা তাঁকে তাঁর শিল্পী ও বাউল স্বভাবের স্পর্শকাতরতা এবং অভীপ্সাকে দমিত করতে আহ্বান করল। তীক্ষ্ণ ও তীব্র তাঁর অনুভূতি, আবেগ-বাসনায় তিনি দুর্বার, যৌবনের স্পর্শচেতনায় তিনি কোমল, বন্ধুসঙ্গে তিনি সদানন্দ মুক্তপ্রাণ। এ সকলকে দমন করার অর্থ নিজের স্বাভাবিক বিকাশকে রোধ করা, কার্যত আত্মহত্যা করা। তাঁর সংগ্রাম শীঘ্রই গভীর নৈতিক রূপ ধারণ করল—বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের উপর হেতুর আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে মনে হল তাঁর অপবিত্র, স্থূল ও দৈহিক। তাঁর জীবনের ঘনতম সংঘাতের এই কাল। সঙ্গীতনৈপুণ্যের জন্য যেসব বন্ধু জুটেছিল, তাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র-সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল তিক্ততম প্রকাশ্য ঘৃণা। কিন্তু

মজা-মজলিশের প্রতি তাঁর আগ্রহও অপরিসীম। তাই যখন আমি কোনো কোনো সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসরে তাঁর সঙ্গী হতাম, তিনি আশ্বস্ত হতেন।

তাঁর মধ্যে সমুচ্চ, ঐকান্তিক এবং পবিত্র স্বভাবকে আমি লক্ষ্য করলাম, সে স্বভাব প্রচণ্ড অনুভূতিতে স্পন্দিত ও ধ্বনিত। তিনি অবশ্যই অম্লমুখ, বিরক্ত-স্বভাব, শুচিবাদীজাতীয় ছিলেন না, কিংবা ছিলেন না স্বভাব-বিষণ্ণ কোনো মানুষ; আমাকে বাঁচিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে রীতিগর্হিত ভাষাও ব্যবহার করতেন; প্রচলিতের ঘাড় ধরে নাড়া দেওয়ায়, ভব্যরীতিকে তার সাজানো আবাসে আক্রমণ করার মধ্যে তাঁর যেন একটা বিকট আনন্দ ছিল, এবং আনন্দের জন্য যা করতেন তা অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন অন্যদের কাছে অনেক সময়ই উদ্ভট ও বিভ্রান্তিকর মনে হত, কিন্তু সেই একই কালে তিনি সত্তার নিভৃত আলয়ে বাসনার সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত, মায়ার সূক্ষ্ম মোহজাল ছিন্ন করতে উদ্যত।

বিবেকানন্দ বারেবারে সন্ধান করতে লাগলেন সেই শক্তিকে যা তাঁকে বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে, উদ্ধার করবে এই দুষ্কর সংগ্রাম থেকে। উত্তরে, আমি শুধু বিশুদ্ধ হেতুবাদের মহিমার কথাই বলতে পারলাম,—সার্বিক হেতুর সঙ্গে একাত্মতা আনতে পারলে আসবে প্রার্থিত অপার প্রশান্তি। আমার কাছে এই কালটা প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদের (Platonic Transcendentalism) বিজয়ের যুগ। অবাধ্য দেহচেতনা বা বিদ্রোহী মনের অভিজ্ঞতা আমার ঘটেনি। কৃপাবাদ কিংবা ঈশ্বর-ধ্যান জাতীয় কৃত্রিম বহিরঙ্গ সাহায্যের কাছে যে-স্বভাব ও মন আত্মসমর্পণ করে, তাদের বিষয়ে তখন আমার যথেষ্ট মানসিক সহিষ্ণুতা ছিল না। হেতুবাদের সঙ্গে অনুভূতি ও স্বভাবধর্মকে সমন্বিত করার কোনো প্রয়োজন তখন আমি বোধ করিনি। আদর্শ ও বাস্তব (Ideal ও Real), জড়প্রকৃতি ও আত্মার (Nature ও Spirit) মধ্যে বিরোধ যে একটি বিশেষ সত্য, সেই বিষয়ক ধারণা আমার মনে ইতিপূর্বে বহিরঙ্গভাবে এসে গিয়েছিল, আরও পরে সেটা আত্মগতভাবে আসবে, যদিও বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার রূপের সঙ্গে তার পার্থক্য থাকবে। কিন্তু ঐকালে তাঁর সমস্যা আমার সমস্যা ছিল না, তাঁর সঙ্কটও আমার নয়।

বিবেকানন্দ স্বীকার করলেন যে, তাঁর বুদ্ধি যদিও নির্বিশেষ তত্ত্বের (Universal) দ্বারা বিজিত, কিন্তু তাঁর হৃদয় ব্যক্তি-অহং-এর অনুগত। তাঁর অভিযোগ হল, রক্তহীন বিবর্ণ হেতুবাদ, যা বাস্তবতা নয়, শুধু পুথিগতভাবে সার্বভৌম, সে বস্তু প্রলোভন থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তিনি জানতে চাইলেন, আমার দর্শন কি তাঁর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি আনতে পারবে, আত্মার উদ্ধারের জন্য কার্যত শারীরিক মধ্যস্থতায় সমর্থ হবে? সংক্ষেপে তিনি যেন রক্তমাংসে

দর্শনীয় আকারভূত সত্যকে চাইলেন ; সর্বোপরি অধীর হয়ে আর্তনাদ করলেন এমন একটি শক্তির জন্য যার বাহু তাঁকে রক্ষা করবে, উন্নীত করবে, উদ্ধার করবে এই নিষ্ফলতা থেকে, তাঁর শূন্য ভুবনে আনবে মহিমার প্লাবন,—তেমন একজন গুরু চাই, আচার্য চাই, চাই দেহধারী পূর্ণতাকে, চাই বিক্ষুব্ধ আত্মার শান্তিদাতাকে।

দেহীর মধ্যে এই পূর্ণতাসন্ধান, উদ্ধারের জন্য এই বহিরঙ্গ শক্তির প্রার্থনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বোধের (Sense) কাছে যুক্তির (Reason) বলিদানকে অ-প্রজ্ঞাজাত দুর্বলতা বলেই ঐকালে আমার মনে হয়েছিল। তরুণ অনভিজ্ঞ আমি, নিজের সঙ্গে সংগ্রামে অস্থির একটি আত্মার সম্মুখীন হয়ে বলতেই পারলাম না, কোথায় তার শান্তি মিলবে! বিবেকানন্দ শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।—আদর্শের দেহগত বাস্তবতা, সত্যের প্রত্যক্ষতা, পরিত্রাণ শক্তির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সেইসব প্রশ্নের ভিতরে ছিল অসচেতন সক্রেটিসীয় বিদ্রূপ। বিবেকানন্দ তিক্তভাবে অভিযোগ জানালেন,—তিনি স্থনীতিসন্দর্ভ যথেষ্ট পড়েছেন, তত্ত্বকথা শুনতে বাকি নেই, কিন্তু ঐসব নীরস বিস্বাদ জিনিসে আর রুচি নেই। বহু মত, পথ ও শিক্ষকের কাছে তিনি গেলেন, এবং এমন এক সংশয়ী সন্ধানই তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের নিকট হাজির করল, যিনি অন্যের অসাধ্য অধিকারের স্বরে কথা বললেন, এবং নিজ শক্তিতে বিবেকানন্দের আত্মায় আনলেন শান্তি, সত্তার ক্ষতকে করলেন নিরাময়। কিন্তু বিবেকানন্দের বিদ্রোহী মনীষা তখনো সম্পূর্ণ গুরুর বশীভূত হয় নি, মন তখনো প্রবোধ মানছে না, গুরুর সান্নিধ্যে আসায় এই যে শান্তি নামে, একি মায়া নয়? প্রখর মনীষার সেই সংশয় দূর হয়েছে অনেক পরে, ধীরে ধীরে, এবং তা হয়েছে অলৌকিক শক্তির প্রশান্ত উন্মোচনের আশ্বাসে।

গভীরতম আগ্রহ নিয়ে আমি আমার চোখের উপর ঘটে-যাওয়া এই রূপান্তর লক্ষ্য করতে লাগলাম। কালীপূজা এবং আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার মত একজন তরুণ ও উগ্র বৈদান্তিক তথা হেগেলবাদী তথা বিপ্লবপন্থীর মনোভাব সহজেই অনুমেয়। অপরদিকে বিবেকানন্দের মত একজন জন্মবিদ্রোহী, যিনি চিন্তায় স্বাধীন, বুদ্ধিতে সৃষ্টিশীল এবং প্রচণ্ড প্রতাপশালী, মানুষকে যিনি বশীভূত করেন অক্লেশে—সেই বিবেকানন্দ কিনা স্বয়ং বিদ্ঘুটে অলৌকিক অধ্যাত্মিকতার ফাঁদে ধরা পড়লেন! অন্ততঃ আমার কাছে তখন ব্যাপারটা ঐ রকম বলেই মনে হয়েছিল, এবং আমার শুদ্ধ হেতুর ধারণা এই ধাঁধার সমাধান করতে অসমর্থ হল। কিন্তু তখন যেটা বিবেকানন্দের ত্রুটি বলে মনে হয়েছিল, তার দ্বারাই

'হারানো প্রিয়' বিবেকানন্দ আমার কাছে প্রিয়তর, ও সেই হেতু অধিকতর সন্তাপকারণ হয়ে উঠলেন। এবং ব্যক্তিগত আবেগই, যে আবেগ তখন আমার বুদ্ধিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিসম্পর্কের পক্ষপাত থেকে জাত ঘৃণ্য জৈব ব্যাপার মাত্র,—আমার মত গৃহগুহাশ্রয়ী মানুষকে অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে বিবেকানন্দের গুরুকে দেখবার অ্যাডভেঞ্চার করতে বাধ্য করাল। সেখানে মন্দির-উদ্যানের শান্তিময় আশ্রয়ে এক সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম-দিবসের প্রায় সমস্তক্ষণ কাটাবার পরে সূর্যাস্তকালে দৃষ্টিভ্রান্তিকর গর্জনশীল ঝঞ্ঝাবায়ু ও বজ্রপাতের মধ্যে যখন আমি প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমি দৈহিক ও নৈতিক সত্য সম্বন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছি. আমার মনে তখন এই অস্পষ্ট সত্যবোধ জেগেছে যে, আপাতভাবে বিশৃঙ্খল উদ্ভট বস্তুকেও বিশ্বনিয়ম নিয়ন্ত্রিত করছে, যেটাকে বাইরে থেকে নিছক আত্ম-উৎসাদন বলে মনে হয়, সেটা আত্ম-আধিপত্যও হতে পারে, ইন্দ্রিয় তার ভ্রান্তি সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ হেতু ছাড়া কিছু নয়, এবং বাইরের ত্রাণশক্তির উপর বিশ্বাস আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌল কর্মের অস্পষ্ট প্রতিভাস। এই সমস্তেরই তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনেতিহাসে, যিনি তাঁর গুরুর নিকট থেকে আকাঙ্ক্ষিত কৃপা ও করুণার সুদৃঢ় আশ্বাসকে লাভ করে পরবর্তী কালে 'সর্ব মানবের' বাণী প্রচার করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন আত্মার সার্বিক আধিপত্যের সার্বভৌম তত্ত্ব।

স্মৃতিচিত্রণ

ইডা অ্যানসেল্

উনিশ শ' খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে স্বামী বিবেকানন্দ যখন জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারণার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন তখন তাঁর সম্পর্কে কারো মনোভাবকে সমস্ত প্রকার বিশেষণবাহুল্যের দ্বারাও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। স্বামীজীর বক্তৃতামালা থেকে আমি নোট নিয়েছি কেবল আমার নিজের প্রয়োজনেই; কোনদিন তা ছাপার আকারে প্রকাশ করার কল্পনা করে নিই নি। অথচ, সেই আমাকেই কিনা স্বামীজীর সম্বন্ধে আমার মনোভাবসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে! এখন কেমন ভাবে তা লিপিবদ্ধ করব? তাঁকে মনে হয়েছিল অনেক ঊর্ধ্বতর লোকের জ্যোতির্ময় প্রকাশের মত; অথচ মানবজীবনের প্রত্যেকটি পর্যায় সম্পর্কেই তাঁর পরিচয় ও অনুভূতি ছিল গভীর। তাঁর বাগ্মিতা, হিউমার এবং কৌতুকের দ্বারা—অসহিষ্ণুতা অথবা সব রকমের ক্ষুদ্রতা ও করুণার বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণাপূর্ণ

আক্রমণের দ্বারা—এবং প্রতিটি মানবিক প্রয়োজনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতির দ্বারা তিনি সর্ব মনের মানুষের কাছেই আবেদনসৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যখন আমরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে এসেছি তখনো স্বামীজীর কণ্ঠোত্থিত সংস্কৃত শ্লোকের সুরেলা আবৃত্তি সভাকক্ষে অনুরণিত হচ্ছিল। আমাদের ক্ষুদ্র আদর্শের তুলনায় তাঁর ধারণার সমুন্নতি আমাদের বিস্ময়াভিভূত করেছিল। আমরা তখন জেনেছিলাম, সেই বিশ শতকের প্রারম্ভেও তিনি আমাদের সকলকে জীবন সম্বন্ধে এক নতুনতর ও মহত্তর উপলব্ধিতে উন্নীত করিয়ে দিচ্ছেন।···

তখন স্বামীজী ছিলেন লস্ এঞ্জেলসে। এবং তিনি রেভারেণ্ড বি. কে-মিলস্ (B. Fay Mills)-এর আমন্ত্রণে অকল্যাণ্ডের 'প্রথম একেশ্বরবাদী গির্জায়, কয়েকটি বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। ১৯০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মিস্-বেল এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আমিও সেখানে গেলাম। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে আমরা সকলেই বিস্মিত ও চমকিত হলাম, আশ্চর্যান্বিত ও অভিভূত হ'লাম স্বামীজীর অবয়ব দেখে। মনে হলো, তিনি মানুষ নন—নিশ্চয় একজন মহাত্মা বা দিব্য পুরুষ। বাগ্মিতার এই সমুচ্চ ও সুমহান স্তরে তাঁর মত আর কাউকেও দেখা যায়নি। এমন উপাদেয় রসিকতা, মনোহারী গল্প এবং এমন নিখুঁত কৌতুকের অভিনয় স্বামীজী ছাড়া আর কারো মধ্যে সে পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি। যখন আমি তাঁকে দেখলাম, তাঁর কথা শুনলাম এবং তিনি যে সভ্যতার প্রতিভূ সেই সভ্যতার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করলাম তখন নিজেকে আমেরিকান বলে ভাবতে আমার ঈর্ষাতুর লজ্জাবোধ হলো। আমি মিস্ বেলের সঙ্গে এবং আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজীর প্রায় সব বক্তৃতাই শুনতে যেতাম এবং সকলের মধ্যেই প্রায় একই রকম উৎসাহ-ঔৎসুক্য এবং মানসিক উত্তেজনা লক্ষ্য করতাম—যদিও কারো কারো কাছে ধর্মমতের তুলনায় মানুষটার আবেদনই ছিল অনেক বেশি কার্যকর। আমার শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গীত-চর্চা করতেন এমন এক ধনী ও অভিজাত যুবতীর কথা আমার মনে পড়ছে, যিনি অত্যন্ত উল্লাসভরে বলেছিলেন, "আহা, তিনি যেন অপূর্ব সুন্দর একটি স্বর্ণ-মূর্তি!"

জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও উৎসাহী ছাত্রদের জন্য সকালে স্বামীজীকে ধ্যান বিষয়ক কয়েকটি ক্লাসও নিতে হোত। মিসেস্ এলিস হান্সবরো (শান্তি) এবং মিসেস্ এমিলি এ্যাস্পিনাল (কল্যাণী) টার্ক স্ট্রীটের বাড়ীটা স্বামীজীর জন্য ঠিক করেছিলেন। সেই বাসগৃহেরই একটা প্রকোষ্ঠে এই ক্লাসগুলো হোত। আমি এর কয়েকটিতেই মাত্র উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম এবং সেই ক্লাসগুলিরও আবার কোন নোট নিই নি। প্রথমে সেখানে ধ্যান করা হোত। পরের ঘণ্টায় থাকতো উপদেশ-নির্দেশের পালা।

স্বামীজী এই ক্লাসে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যারা ক্লাস আরম্ভ হবার কিছু আগে আসতো তারা স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ-পরিচয়ের কিছু সুযোগ পেত। খাবার ঘরে আমাদের ডাক পড়তো। একবার খেতে গিয়ে আমরা কিছু ঘরোয়া কথা বলেছিলাম। এই নিয়ে এবং আমাদের এখানে-সেখানে তড়ি-ঘড়ি করে ছোটাছুটি করার অভ্যাসের কথা তুলে ধরে স্বামীজী প্রায়ই আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতেন। তিনি ছিলেন অব্যস্ত। রাজোচিত মহান প্রশান্তি কখনো তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। রাস্তায় কাউকে গাড়ী ধরার জন্য ছুটতে দেখলে তিনি অত্যন্ত মজা পেতেন। জিজ্ঞাসা করতেন,—"আর একটা গাড়ী কি পাওয়া যাবে না?" দেরীতে বক্তৃতা বা ক্লাস সুরু হওয়া নিয়ে তিনি মোটেই বিব্রত হতেন না। কারণ ক্লাস বা বক্তৃতা শেষ করার কোন বাঁধাধরা সময় তাঁর ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত না বক্তব্যবিষয় শেষ হোত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি বক্তৃতা চালিয়ে যেতেন। এমন কি নির্দিষ্ট সময়ের দ্বিগুণের বেশি সময় লাগলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। ক্লাসের আগে খুব সকাল বেলার সাক্ষাৎগুলো ছিল ঘরোয়া। স্বামীজী ধূসর রঙের পশমী পোষাক পরতেন—পা মুড়ে আরাম-কেদারায় বসে ধূমপান করতেন—প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং মজার মজার গল্প বলতেন। ক্লাসের সময় হলে মিনিট-দুই পরেই তিনি পরিত্যক্ত ঘরে এসে হাজির হতেন। তখন তাঁর পরণে থাকত গেরুয়া পোষাক—চুলটা আঁচড়ানো; এবং পাইপটাকে আর দেখা যেত না। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুর মধ্যেও মাঝে মাঝে রসিকতা কিন্তু ঠিকই চলত।

স্বামীজীর জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলী সম্পর্কেও এই একই কথা সত্য। একজন যখন ঈশ্বরের সঙ্গে তার একাত্মতা অনুভব করে তখন তার ব্যক্তিত্বের কি হয়—এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি খেলার ছলে ব্যঙ্গ করতেন। "তোমরা এই দেশের মানুষ। তোমরা তোমাদের ব্য—ক্তি—ত্ব হারাতে বড্ড ভীত!" তিনি বলে উঠতেন,—"কিন্তু তোমরা তো এখনো 'ব্যক্তি'ই হয়ে ওঠনি। যখন তোমরা তোমাদের সমগ্র সত্তার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জানবে তখনই তোমরা যথার্থ ব্যক্তি হয়ে উঠবে; তার আগে নয়। ঈশ্বরকে জানার পর তোমাদের হারাবার আর কিছু থাকবে না। আর একটা কথা আমি এই দেশে ক্রমাগত শুনে চলেছি যে, আমাদের নাকি প্রকৃতির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে বাস করা উচিত। কিন্তু তোমরা কি জান না, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যা কিছু প্রগতি হয়েছে তা সমস্তই হয়েছে প্রকৃতিকে জয় করে? আমরা যদি কিছু উন্নতি করতে চাই তাহলে প্রতি পদেই আমাদের প্রকৃতিকে প্রতিহত করতে হবে।"

প্রতি বক্তৃতার শেষে স্বামীজী প্রত্যেককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ

দিতেন। এক সময়ে যখন কেউ কেউ ইঙ্গিতে বিনয় প্রকাশ করে বলত যে, অনেক প্রশ্ন করে তারা স্বামীজীকে বিরক্ত করতে চলেছে, তখন তিনি বলতেন, "তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী যত বেশি এবং যত ভালো প্রশ্ন করতে পার কর। এই জন্যই তো আমি এখানে রয়েছি। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না বোঝ, ততক্ষণ আমি তোমাদের কাছ থেকে যাব না। ভারতে অনেকে আমায় ব'লেছে, সাধারণ লোককে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি, একটা শিশুকেও আমি এটা অনায়াসে বোঝাতে পারি। তোমরা কিন্তু একেবারে প্রথম দিকেই গভীরতম আধ্যাত্মিক সত্যের শিক্ষাদান আরম্ভ করতে পার না।"

মনের উৎকর্ষের জন্য অধ্যাত্মশিক্ষার প্রয়োজনের উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন,— "যত কম পড়বে ততই ভাল। গীতা এবং বেদান্তের ওপর ভাল ভাল লেখাগুলো পড়। ঐ সমস্ত তোমাদের পড়া দরকার। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সবটাই ত্রুটিপূর্ণ। এই শিক্ষার ফলে চিন্তা করার মত ক্ষমতা অর্জনের আগেই মনটা তথ্যকণ্টকিত হয়ে ওঠে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রথমে আয়ত্ত করতে হবে। মনকে পুনরায় জয় করার শিক্ষা যদি আমার থাকত এবং এবিষয়ে মতপ্রকাশের কোন অধিকার যদি আমি পেতাম, তাহলে সকলের আগে আমি আমার মনকে আয়ত্তে আনার শিক্ষাই গ্রহণ করতাম। এবং পরে প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হতাম। এই বিষয়গুলি জনসাধারণের শিখতে অনেক বেশি সময় নেয়। কারণ তারা তাদের মনকে ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। যখন আমার মা ইচ্ছা করলে যে-কোন ধর্মগ্রন্থ একবার পড়লেই তার সমস্ত কিছু মনে রাখতে পারতেন তখন মেকলের 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' মুখস্থ করতে আমাকে তা তিনবার পড়তে হয়েছিল। সাধারণ মানুষেরা তাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না বলেই সব সময়ে কষ্ট পায়।"···

মিসেস স্টীলি বক্তৃতার আগেই এক উপাদেয় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে-ছিলেন। সেখানে স্বামীজী খুব অন্তরঙ্গ ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। খাওয়ার আগে তাঁর মুখ থেকে প্রথানির্দিষ্ট প্রার্থনা শোনার জন্য আশান্বিতভাবে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু আমাদের অবাক করে তিনি তৎক্ষণাৎ খেতে আরম্ভ করে দিলেন। আগে না ব'লে খাওয়ার পর প্রার্থনা সম্পর্কে স্বামীজী কিছু মন্তব্য করলেন এবং মিসেস স্টীলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "দেখুন, ধন্যবাদজ্ঞাপনার্থে আমি আপনাকে কিছু বলব। আপনি সমস্ত আয়োজনই বেশ সুন্দরভাবে করেছেন।" ভোজের পর ফল পরিবেশনের জন্য স্টীলির কতকগুলি সুমিষ্ট খেজুর ছিল। সেগুলির বেশির ভাগই স্বামীজী খেলেন। বক্তৃতার পর স্টীলি যখন স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে

যথোচিত গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক কিছু কথা বললেন তখন তার উত্তরে স্বামীজী বললেন, "মহাশয়া, এর মুলে আপনার সেই সুমিষ্ট খেজুর!"

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীজী ভারতীয় ধর্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যার কথা বলছিলেন। তিনি কয়েকপ্রকার নরকের বর্ণনা করলেন। বক্তৃতার পর প্রায় প্রত্যহই তাঁর কয়েকজন ভক্ত তাঁকে হয় সান্‌ফ্রান্সিসকোর একাংশে 'লিটল্ ইটালী' নামে অভিহিত মিঃ লুইস্ জুলের (Louis Juhl) রেঁস্তোরায় নিয়ে যেতেন, না হয় নিয়ে যেতেন আপটাউনের কাফেতে। এই বিশেষ ঘটনার দিনটিতে ছিল প্রচণ্ড শীতের রাত্রি। ওভার-কোটের মধ্যেই স্বামীজী কাঁপছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "এটাই যদি নরক না হয়, তা হলে আমি জানি না নরক কি!" কিন্তু এই নারকীয় ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও তিনি আইসক্রীম খেতে চাইলেন। স্বামীজী আইসক্রীম খেতে খুব ভালবাসতেন। কাফে ত্যাগ করার সময় হলে পরিচারিকা টেলিফোনের কাছে গিয়ে আমাদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন। স্বামীজী তাঁকে ডেকে বললেন, "যান, কিন্তু বেশি দেরী করবেন না যেন; দেরী হ'লে ফিরে এসে কিন্তু আপনি খালি চকোলেট-আইসক্রীমের একটা স্তূপ দেখবেন মাত্র!"

অন্য এক ঘটনায় এক পরিচারিকা ভুলক্রমে, স্বামীজী পছন্দ করতেন না যে আইসক্রীম সোডা, তাই এনে হাজির করল। তিনি পাল্টে দিতে বললেন। পাল্টে আনার জন্য যখন চলে যাচ্ছিল তখন স্বামীজী দেখলেন, ম্যানেজার পরিচারিকাটির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এই দেখে, কে শুনছে না শুনছে তা গ্রাহ্য না করেই তিনি চিৎকার করে বললেন, "যদি আপনি ঐ মেয়েটিকে বকেন তা হলে আমি কিন্তু এখানের সমস্ত আইসক্রীম সোডাই খেয়ে ফেলব!"……

আমার দীর্ঘজীবনের মধ্যে দুটি অবিস্মরণীয় রাত্রি আছে। তাদের যে-কোন একটির স্মরণ আমার যে-কোন যন্ত্রণার ওপর শান্তি এনে দেয়। স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে 'শান্তি আশ্রমে' প্রথম রাত্রি যাপন হলো ঐ দুইটির একটি। অপরটি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে টেলর তাঁবুতে স্বামীজীর সান্নিধ্যে প্রথম রাত্রি যাপন। চোখ বন্ধ করলে এখনো আমি স্বামীজীকে আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি—যেখানে জ্বলন্ত কাঠের টুকরো থেকে উড়ন্ত আগুনের ফুল্‌কি ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে, আর মাথার ওপরে রয়েছে প্রতিপদের চাঁদ। দীর্ঘ দিন ধরে বক্তৃতা দেওয়ার ফলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁবুতে এসে তিনি খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "অরণ্যেই আমাদের জীবনের আরম্ভ হয়, আবার অরণ্যেই আমরা তা শেষ করি—কিন্তু এদের মাঝখানে

থাকে অভিজ্ঞতার বিস্তীর্ণ পৃথিবী।" অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমাদের ধ্যানের সময় হ'লে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বিষয়ের ধ্যান করতে পার, কিন্তু আমি ধ্যান ক'রবো সিংহের হৃদয় সম্বন্ধে। কেননা, তা আমায় শক্তি দেয়।"

পরদিন সারাক্ষণ বৃষ্টি হল। সকালে প্রাতরাশের পর জর থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী মিস্ বেলের খাটিয়ার ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। ঐ রাত্রেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এতখানি অসুস্থ হয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসী ভাইদের নামে সমস্ত কিছু উইল পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন। শান্তি ও কল্যাণী তাঁর শুশ্রূষার ভার নিয়েছিলেন। এখনো যেন আমি শান্তিকে দেখতে পাই—দেখতে পাই, সেই অশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে স্বামীজীর তাঁবুর ওপর আর একটা ত্রিপল তিনি বিছিয়ে দিচ্ছেন; নিজে ভিজে যাচ্ছেন, সেদিকে কিন্তু তাঁর খেয়ালই নেই! স্বামীজীর তাঁবুর উল্টোদিকের তাঁবুতে মিস্ বেলের সঙ্গে আমি থাকতাম।

পরের দিন শনিবারে মিস্ বেল ও আমাকে সান্‌ফ্রান্সিস্কো যেতে হোল। রবিবারের বিকেলে যখন ফিরলাম তখন দেখলাম, স্বামীজী অনেকটা সুস্থ। বিশ্রাম নেবার জন্যই তাঁকে তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। প্রতিদিন প্রাতরাশের পর তিনি মিস্ বেলের খাটিয়ার ওপরে বসে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করতেন, গল্প বলতেন এবং নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আরো বেশি করে বোঝাপড়া এবং তার ফলে তাদের পারস্পরিক সুবিধাসম্পর্কীয় অনেক আশার কথা স্বামীজী ব্যক্ত করতেন। টমাস কেম্পিসের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা তিনি বলেছিলেন এবং কেমন করে 'গীতা' ও 'দি ইমিটেশন অব্ ক্রাইস্ট' বইদুটি নিয়ে ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তার গল্পও করেছিলেন। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর এক বক্তৃতায় তিনি শেষ বইটি থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন: "শিক্ষকেরা চুপ করুক, বইগুলোও নিশ্চুপ হোক; আমার আত্মার মধ্যে কেবল বিঘোষিত হোক তোমার বাণী।"......

রোজই বিকেলে অনেকক্ষণ ধরে বেড়ানো হত। দৈনিক কাজকর্মের মধ্যে সবচাইতে সুন্দর কাজ ছিল অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে কথাবার্তা বলা এবং ধ্যানানুশীলন করা। গল্প বলা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হলে গান গাওয়ার আগেই স্বামীজী আমাদের ধ্যানের বিষয় ঠিক ক'রে দিতেন। যেমন, "দৃঢ়তা এবং নির্ভরতা।" একদিন সকালে "চরম সত্য, ঐক্য ও স্বাধীনতা"র সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা আবার ধ্যানের বিষয় ছিল, "আমি সর্বত্র বিরাজমান, আমিই মঙ্গল এবং আমিই জ্ঞান।"

এইভাবে গম্ভীর সকাল, মজাদার বিকেল এবং মহান ও গভীর সন্ধ্যা নিয়ে দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছিল।

আরভিং-এর তাঁবুতে গ্রীষ্ম কাটানোর জন্য মিস্ বেল আমাকে যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখনই এটা ঠিক হয়েছিল যে, বিকেলে গান শেখানোর জন্য প্রতি শনিবার সকালে আমি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো চলে যাব এবং রবিবার দিন মিস্ বেলের বক্তৃতার পর ফিরে আসব। তাঁর এই বক্তৃতার সর্টহ্যাণ্ড নোট নেওয়ার চেষ্টা আমায় করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে মিস্ বেল বিশেষ কোন কারণে—কারণটা কি, তা আমার আর মনে নেই—শুক্রবার বিকেলে একা-একা সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো চলে গেলেন। যাবার সময় শনিবার দিন আমার যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন।

ঠিক সময়ে আমি যখন গাড়ী ধরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন স্বামীজী আমায় বললেন, "তুমি যাচ্ছ কেন?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমাকে যেতে হবে স্বামীজী—আমাকে গান শেখাতে হবে।" এই উত্তরের জন্য পরে কিন্তু আমি সব সময় অনুতাপ করেছি। কারণ, গান শিখিয়ে টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি সেখানে যাচ্ছিলাম না; আমার যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল মিস্ বেলের বক্তৃতা।

স্বামীজী বললেন, "তবে যাও এবং আধ লক্ষ ডলার যোগাড় করে ভারতবর্ষে আমার কাজের জন্য পাঠিয়ে দিও।" তিনি আমাকে নিয়ে গড়ানে সিঁড়ি ভেঙে রেলরাস্তার ওপরে এলেন এবং আমার জন্য গাড়ীটাকে থামানোর প্রয়োজনে একটা ফ্ল্যাগ দেখালেন। ওখানে কোন স্টেশন ছিল না। সঙ্কেত করার জন্যই কেবল ট্রেনটা থেমে গেল। স্বামীজীর আচরণ ছিল মহৎ। তাঁহার চোখ দুটি সব সময়েই আকাশের দিকে তোলা থাকত—কখনো নামত না। একজন তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে,—টেলিগ্রাফের খুঁটির চেয়ে ছোট কোন জিনিসকে নাকি দেখতে পেতেন না।

গাড়ীর গতি মন্থর হবার পর এঞ্জিনটা যখন আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল তখন শুনতে পেলাম ফ্রায়ারম্যান্ গাড়ীর চালককে বলছে, "আরে! কে ঐ 'আকাশ প্রদর্শক' (Sky Pilot)?"

এই ধরনের কথা আমি আগে শুনি নি। প্রথমে তাই এর মানে খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। পরে মনে হল, একথা নিশ্চয়ই কোন ধর্মগুরুকে বোঝাচ্ছে। আর স্বামীজী যে একজন এই ধরনেরই গুরু ছিলেন তা যে-কেউ তাঁকে দেখেছে সেই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে।…

টম এ্যালান (Allan) এবং তাঁর স্ত্রী এডিথ [অজর এবং বিরজা] আমার সব চাইতে পুরোনো বন্ধু। স্বামীজী সম্পর্কে তাঁদের প্রথম ধারণা, তাঁদের নানা অভিজ্ঞতা এবং তাঁর কাছ থেকে পাওয়া অনেক উপকারের কথা তাঁরা আমায় বহুবার বলেছেন। ১৯০০ সালে স্বামীজী যখন প্রথম অকল্যাণ্ডে এলেন তখন এডিথ ছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ। টম একা একাই তাই হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে গেলেন। এই বক্তৃতার কথা কাগজে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। বক্তৃতা শুনে ফিরে আসার পর টম এতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর উৎসাহকে তিনি কিছুতেই দমন করতে পারছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন একটি লোককে দেখলাম যিনি মানুষই নন—একজন দেবতা! এবং তিনি যা বলেছেন তা সমস্তই সত্য।" স্বামীজীর কোন্ কথায় টম এতখানি অভিভূত হয়েছেন, এডিথ তা জানতে চাইলেন। সবচাইতে চমকপ্রদ চিন্তা ছিল এই দুটি: ভাল এবং মন্দ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কেউই একটি ছেড়ে অন্যটি পেতে পারে না। আমরা 'হোম অব ট্রুথ'-এ শিখেছিলাম যে সমস্তই ভাল—খারাপ বলে কিছুই নেই। অন্য যে ভাবটি তাঁকে (টমকে) গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল তা হল,—গরু মিথ্যা কথা বলতে পারে না—মানুষ পারে। কিন্তু গরু সব সময়ে গরুই থাকবে, অথচ মানুষ দেবতা হবার ক্ষমতা রাখে।

তখন থেকেই টম স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহের সহকারী হিসেবে স্বামীজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং সুস্থ ও সমর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এডিথও তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেলেন। একসময় এডিথ যখন প্রবেশ-দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদা গণনার জন্য টমের অপেক্ষায় ছিলেন তখন স্বামীজী তাঁকে দেখতে পেয়ে ডেকে বললেন, "আপনি এখানে আসুন।"

এডিথ তাঁর কাছে যেতে তিনি বললেন, "আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তবে একদিন আমার বাসায় আসুন। সেখানে চাঁদার ভয় নেই—সব কিছুই সেখানে খোলা।"

"আমি কখন যাব?"—এডিথ জিজ্ঞাসা করলেন।

"আগামীকাল সকাল ন'টার সময়।"

পরদিন সকালবেলা এডিথ স্বামীজীর বাসায় গিয়ে পাটকিলে রঙের একটা জানলার একধারে বসেছিলেন। স্বামীজী গান গাইতে গাইতে জানলার অপর ধারে এসে বসলেন। পরে বললেন,—"তারপর, কী খবর আপনার?" এডিথ এতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, একটি কথাও তিনি বলতে পারলেন না; এমন কি বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করে কান্নাও থামাতে পারলেন না। স্বামীজী তখন বললেন,

"আগামীকাল সকালে এই সময়ে আসবেন।" এরপর এডিথ কয়েকবার আধ্যাত্মিক উপদেশ নেবার জন্য স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁকে কয়েকটি যোগব্যায়াম শিখিয়ে দিয়ে তাঁর সামনে ব্যতীত আর কোথাও যাতে এর অনুশীলন না করেন সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি এডিথকে বলেছিলেন যে, তৎকালীন পাশ্চাত্ত্যের সমস্ত রকমের কাজের মধ্যে 'হোম অব্ ট্রুথের' কাজ অত্যুত্তম। তিনি এই বলে খুব প্রশংসা করেছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য পয়সা চায় না।

এক সময়ে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমি এমন একজন লোকের শিষ্য যিনি নিজের নামটাও লিখতে পারতেন না ; কিন্তু তাঁর জুতো বেঁধে দেবার মত যোগ্যতাও আমার নেই। মাঝে-মধ্যে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে, আমার এই বুদ্ধি আমি গঙ্গার জলে ফেলে দিতে পারি।"

"কিন্তু স্বামীজী"—একজন স্ত্রীলোক আপত্তি করলেন,—"আপনার বুদ্ধির জন্যই আমরা আপনাকে পছন্দ করি।"

"দেখুন, তার কারণ, আপনিও আমার মত নির্বোধ।"—স্বামীজী উত্তর দিলেন।···

টম তাঁর অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলেছিলেন। অনেকবার তিনি স্বামীজীর সঙ্গে বক্তৃতাসভায় গিয়েছিলেন। কয়েকবার বক্তৃতার আগে শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়েও দিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। প্রথমবার যখন তাঁরা দুজনে একসঙ্গে মঞ্চের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন টমের মনে হয়েছিল, স্বামীজীর উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট এবং তাঁর নিজের মাত্র ছয় ইঞ্চি। তারপর থেকে যতবার তিনি স্বামীজীকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেছেন ততবারই তিনি নিজে মঞ্চের পাদদেশে দাঁড়িয়েছেন। একবার এক সভায় স্বামীজী ভারতবর্ষের কথা বলছিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে তিনি বললেন, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন আমি বলতে আরম্ভ করি তখন কোথায় গিয়ে থামতে হবে তা কখনো জানি না। সেইজন্য দশটার সময় আপনারা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।" টম তাই হলঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। দশটা বাজার পর তিনি তাঁর ঘড়িটা বের করলেন এবং চেনটা ধরে পেণ্ডুলামের মত ঘড়িটাকে দোলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে এই সঙ্কেতের দিকে স্বামীজীর দৃষ্টি পড়লো। তিনি বললেন, "আমি তাঁদের দশটার সময় আমাকে থামাতে বলেছিলাম। ইতিমধ্যেই তাঁরা ঘড়ি দোলাতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, অথচ আমি এখনো পর্যন্ত আরম্ভই করতে পারিনি।" কিন্তু তিনি বক্তৃতা বন্ধ করলেন এবং তখন থেকে

যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিন টম এ্যালান সেই পুরোনো ঘড়িটা বক্তৃতার সময় প্রত্যেক দিন বয়ে নিয়ে যেতেন এবং ঐ একইভাবে তার সদ্ব্যবহার করতেন।...

স্বামীজী যেখানেই যেতেন সেখানেই সর্বদা তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তাঁর আচরণ ছিল রাজোচিত,—একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করত। যখন তিনি মার্কেট স্ট্রীটে হেঁটে বেড়াতেন তখন হয় সাধারণ লোক একদিকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর যাওয়ার রাস্তা করে দিত, নয়ত চারদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করত,—"ঐ হিন্দু রাজপুত্রটি কে?" এইভাবেই তিনি এক 'জাহাজ-ঘাটা' থেকে একটা জাহাজের ভেসে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রবেশ পত্র-যুক্ত নিমন্ত্রিত অতিথি ছাড়া অন্য আর কারো জাহাজ-ঘাটায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। দু-জন রক্ষী জাহাজ-ঘাটার রাস্তা পাহারা দিত। স্বামীজী ঠিক করলেন যে, জাহাজ-ঘাটা থেকেই তিনি ভালো ভাবে জাহাজ ভাসানো দেখবেন। সেইজন্য তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে রক্ষীদের অতিক্রম করে গেলেন,—কিন্তু আশ্চর্য, তারা মোটে বাধাই দিল না! জাহাজ ভেসে যাওয়ার পর নেমে এসে তিনি বললেন,—"এটা যেন ঠিক একটা শিশুর জন্মের মত!"

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিরা উন্মত্ত ও কঠোর হন না—এ কথা স্বামীজী খুব জোর দিয়ে বলতেন। তিনি আরো বলতেন,—"তাঁরা লম্বা-মুখো ও রোগা নন, তাঁরা আমার মতই মোটা।"

আরভিং-এর তাঁবুতে মিস্ বেলের সঙ্গে আলোচনার সময়ে মিস্ বেল একবার মন্তব্য করেছিলেন, পৃথিবীটা একটা স্কুল; সেখানে আমরা সকলে আসি পড়াশোনা করতে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পৃথিবী যে একটা স্কুল, এটা কে তোমায় বলেছে?"

মিস্ বেল চুপ করে ছিলেন।

স্বামীজী বলে চললেন, "পৃথিবীটা একটা সার্কাস, আর আমরা সবাই ভাঁড়ামি করবার জন্য এখানে ভাঁড় হয়ে এসেছি।"

মিস বেল জিজ্ঞাসা করলেন,—"স্বামীজী, আমরা ভাঁড়ামি করি কেন?"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "কারণ আমরা তা করতে ভালবাসি। যখন আমরা ভাঁড়ামি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনই আমরা মরি।"

সানফ্রান্সিস্কোতে টম ও এডিথের একটা ঘর ছিল। ঘরটি স্বামীজীর অস্তিত্ব-সূচক ভাবাবেশের দ্বারা পূর্ণ থাকত। টম ও এডিথ যখন সানফ্রান্সিসকোয় আসতেন তখন এই দেশের রামকৃষ্ণ মঠের সমস্ত স্বামীরাই তাঁদের দুজনকে দর্শন করার জন্য

উৎসুক হয়ে উঠতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন বা লিখেছিলেন, "পাশ্চাত্যের অপর যে কোন ব্যক্তির তুলনায় আপনারা স্বামীজীকে আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।" আমার একজন বন্ধুও এঁদের সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন। কয়েক বছর আগে তিনি ও তাঁর পুত্র, টম ও এডিথ-পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। টম ও এডিথের মুখে স্বামীজীর আনন্দপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনে তাঁদের মনে হয়েছিল, যেন স্বামীজী নিজেই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খাবার ঘরে স্বামীজীর একটি সুন্দর ছবি ছিল। অতিথিরা সব সময়েই সেই ছবির দিকে মুখ করে বসতেন। খাওয়ার আগে হত গান। এ সময়ে ঘরের মধ্যে স্বামীজী, তাঁর গুরু এবং তাঁর কাজের আলোচনা ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তাই চলত না। স্বামীজীর সমস্ত রচনাই সেখানে ছিল। টম ও এডিথের কাছে ছিল স্বামীজীর প্রচুর ছবি। সেগুলি অতিথিদের দেখিয়ে তাঁরা আনন্দ পেতেন। বাগানে তোলা স্বামীজীর একটি ছবি তাঁদের বিশেষ প্রিয় ছিল। একবার স্বামীজী বাগানে ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মশগুল ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সেখানে এসে তাঁর ছবি তুলতে চাইলো। স্বামীজী উঠে বসতে চাইলেন না। কিন্তু সকলের অনুরোধে অবশেষে তাঁকে, যেমন ছিলেন সেই অবস্থাতেই, উঠে দাঁড়াতে হল। তাঁর মাথায় তখন পাগড়ী ছিল না—দেহে ছিল না উপযুক্ত পোষাক। পুষ্পিত দ্রাক্ষাকুঞ্জের সামনে যেন কিছু বলার ভঙ্গীতে তিনি দাঁড়ালেন। পরে এইটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা পেয়েছে।

এডিথের পক্ষে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে উপলব্ধি করেই স্বামীজী কখনো তাঁর [এডিথের] অন্তরদেশ ত্যাগ করে যান নি। জীবনের শেষ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এডিথ বহুবার স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করেছেন: "যদি তুমি কখনো বিপদে পড় তা হলে আমায় ডেকো। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তাতে কিছু যাবে আসবে না—তোমার ডাক আমি শুনতে পাবই।" এই প্রতিশ্রুতির কথা অন্তরে বহন করেই সাহসের সঙ্গে এডিথ বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

স্বামীজী তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "কখনো খারাপ সময় যদি আসে তবে তাতে কি আর হবে? পেণ্ডুলাম নিশ্চয়ই দুলে আবার বিপরীত দিকে যাবে। কিন্তু সেও ভালো নয়। এটাকে একবারে বন্ধ করে দেওয়াই হল আমাদের কর্তব্য।" তারপর তিনি একটি আমেরিকান প্রবাদ-বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। এটি—দোলনায় দুল্‌তে দুল্‌তে ঠেলা বন্ধ করে দিয়ে শিশুরা দোল্‌নাকে আস্তে আস্তে থামিয়ে দেওয়ার সময় ব'লতো: "বুড়ো বেরালটাকে মরতে দাও" [থামাও, থামাও, থামাও]।

স্বামীজীকে দেখার,—তাঁর কথা শোনার—তাঁর শক্তিময়ী বাণীর অনুভবের বন্যা আমার হৃদয়-দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে এখন কাগজের ওপর লিপিবদ্ধ হল। এরপর অনেকের পড়ার জন্য ছাপার অক্ষরে এটা প্রকাশিত হবে এবং এর থেকে সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করার এবং জীবনের সকল রকম দুর্বিপাকের ক্ষতিপূরণ করার স্বর্ণ সুযোগও মিলবে। এটা আমাকেও "থামাও, থামাও, থামাও" [বুড়ো বেরালটাকে মরতে দাও] বলতে পারার মতো করে প্রায় তৈরী করে তুলেছে।

[অমিয় দত্ত অনূদিত]

বিবেকানন্দ—ম্যাক্সমুলার

সুবিখ্যাত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্ বেদ-সম্পাদক অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের বিশেষ দান আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনে। 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় 'একজন যথার্থ মহাত্মা' নামে ম্যাক্সমুলারের শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণীর উপর তাঁর পুস্তক সর্বত্র বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে। ম্যাক্সমুলারের মত জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বীকৃতি একদিকে রামকৃষ্ণ-আন্দোলনকে যেমন বলশালী করে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর কোনো কোনো মত সম্বন্ধে সংস্কারবাদীদের অংশবিশেষের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিবাদ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে ম্যাক্সমুলারের রচনা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রথম প্রধান বৈদেশিক স্বীকৃতি বলে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের বিশেষ উল্লাসের কারণ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। স্বামীজীর বহু পত্রে সেই আনন্দের লিখিত রূপ পাওয়া যাবে।

স্বামীজী পরবর্তীকালে ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হন। অধ্যাপকপ্রবর তাঁকে অক্সফোর্ডে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। স্বামীজী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কাহিনী ও তাঁর বাণীসংগ্রহে সাহায্য করেন। ফলে উভয়ের স্থায়ী সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হয়।

স্বামীজীর বিভিন্ন রচনায় ম্যাক্সমুলারের উল্লেখ প্রচুর। ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে তাঁর পৃথক রচনাও আছে। আমরা কিছু অংশ নির্বাচন করে দিচ্ছি।—

"অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের 'আত্মার অমরত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাদার চার্চকে পাঠিয়েছি।……বেদান্তের কোনো অংশই বৃদ্ধ উপেক্ষা করেন নি। সাবাস তাঁর নির্ভীক কৃতিত্ব।" [মেরী হেলকে লেখা চিঠি—২৬ জুন, ১৮৯৫]

"গত পরশু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আমার বেশ দেখাশোনা হয়ে গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক ; তাঁর বয়স ৭০ হলেও তাঁকে যুবা দেখায় ; এমনকি তাঁর মুখে একটি বার্ধক্যের রেখা নেই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁর যেরূপ ভালবাসা, তার অর্ধেক যদি আমার থাকত! তার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ করেন এবং তাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম সহ্য করতে পারেন না।

"সর্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী'তে তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে জগতের সমক্ষে প্রচার করবার জন্য কি করছেন?' রামকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বৎসর যাবৎ মুগ্ধ করেছেন। এটা কি সুসংবাদ নয়?"

[ওলি বুলকে লণ্ডন থেকে লেখা। ৩০ শে মে, ১৮৯৬]

"শ্রীজী'র (শ্রীরামকৃষ্ণের) সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখিত প্রবন্ধ আগামী মাসে প্রকাশিত হবে। তিনি তাঁর একখানি জীবনী লিখতে রাজী হয়েছেন। তিনি শ্রীজী'র সমস্ত বাণী চান। সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি। তোমাকে এ কাজ এখনই সুরু করতে হবে। শুধু যেসব কথা ইংরেজীতে অচল বাদ দিও। বুদ্ধি করে সে সকল জায়গায় যথাসম্ভব অন্য কথা দিবে। কামিনী কাঞ্চনকে 'কাম কাঞ্চন' করবে—lust and gold etc,—অর্থাৎ তাঁর উপদেশের সর্বজনীন ভাবটা প্রকাশ করা চাই।" [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লণ্ডন থেকে লিখিত। ২৪ শে জুন, ১৮৯৬]

"আজ সকালে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের একখানি পত্র এসেছে, তাতে খবর পেলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকার অগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তুমি কি তা পড়েছ? তিনি ঐ বিষয়ে আমার মত চেয়েছেন। এখনও তা দেখিনি বলে তাঁকে কিছু লিখতে পারছি না। তুমি যদি তা পেয়ে থাক তো দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দিও।…ম্যাক্সমুলার আমাদের কার্যধারা জানতে চান… তিনি যথেষ্ট সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখতে প্রস্তুত আছেন।"

[ই. টি. ষ্টার্ডিকে লিখিত—সুইজারল্যাণ্ড, ৫ই অগষ্ট, ১৮৯৬]

"শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের প্রবন্ধ পড়েছি। ছ' মাস আগে যখন তিনি

-ণটি লেখেন, তখন তাঁর কাছে প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া লেখবার আর কোনো উপাদান ছিল না, সুতরাং সে হিসাবে তাঁর প্রবন্ধটি ভালই হয়েছে বলতে হবে। সম্প্রতি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বড় বই লেখার সঙ্কল্প প্রকাশ করে আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র লিখেছেন। আমি এর মধ্যেই তাঁকে অনেক উপাদান দিয়েছি ; ভারত থেকে আরও উপাদান পাঠাতে হবে।"

[আলাসিঙ্গা পেরুমলকে সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেখা—৮ই অগষ্ট, ১৮৯৬]

"ম্যাক্সমূলারের নূতন বই 'রামকৃষ্ণ : তাঁর জীবন ও বাণী' পড়েছ কি ? যদি না পড়ে থাক পড়ে ফেল, এবং যাকে পড়তে দাও।"

[মেরী হেলকে বেলুড় থেকে লেখা, ১৬ই মার্চ, ১৮৯৯]

৬ই জুন, ১৮৯৬ তারিখে লণ্ডন থেকে স্বামীজী 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার সম্পাদককে যে পত্র লেখেন, তার অংশ—

..."কে ভাবিয়াছিল যে, সুদূর বঙ্গীয় পল্লীগ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ও উপদেশ—এই কয়েকবর্ষের মধ্যে এমন দূরদেশের লোকে জানিতে পারিবে, যাহার কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই ? আমি ভগবান রাম-কৃষ্ণের কথা বলিতেছি। শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরো বিস্তারিত বিবরণ-সম্বলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রস্তুত আছেন ? অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দিন কয়েক পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম। কারণ, যে কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি স্ত্রী-ই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে কোন সম্প্রদায়, মত বা জাতিভুক্ত হউন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'—'আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।' ইহা কি সত্য নহে ?

"অধ্যাপক প্রথমে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে হইল, তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন ; তাহার পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন ও উহাদের চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোক রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।'

অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকেলোকেপূজা করিবে না ত, কাহাকে পূজা করিবে ?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্তিবিশেষ। তিনি ষ্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁহার সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোডলিয়ান পুস্তকালয় (Bodleian Library) দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন আর আমাদিগকে এত যত্ন কেন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সহিত ত আর প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয় না।' এ বাস্তবিক আমি নূতন কথা শুনিলাম। সুন্দর উদ্যান-সমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্রগৃহ, সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম সত্ত্বেও সেই স্থির প্রসন্ন আনন, বালসুলভ মসৃণ ললাট, রজতশুভ্র কেশ, ঋষিহৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর অধ্যাত্মখনির অস্তিত্বসূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁহার সমুদয় জীবনের সঙ্গিনী উচ্চাশয় সহধর্মিণী, তাঁহার সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধভাব, নির্মল আকাশ—এই সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় আমায় প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের যুগে লইয়া গেল, যখন ভারতে ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিগণের নিবাস ছিল।

"আমি তাঁহাকে ভাষাতত্ত্ববিৎ বা পণ্ডিতরূপে দেখিলাম না, দেখিলাম যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত আপন একত্ব অনুভব করিতেছেন, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বসমূহের বিচাররূপ মরুতে দিশাহারা হইয়াছে, সেখানে তিনি এক অমৃতকূপ খনন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ধ্বনি যেন উপনিষদের সেই সুরে সেই তালে ধ্বনিত হইতেছে, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ,'—সেই এক আত্মাকে জান, অন্য বাক্য ত্যাগ কর।

"যদিও তিনি একজন ব্রহ্মাণ্ড-আলোড়নকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক, তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া আত্মসাক্ষাৎ-কারে সমর্থ করিয়াছে, তাঁহার অপরাবিদ্যা বাস্তবিকই তাঁহাকে পরাবিদ্যা লাভে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই প্রকৃত বিদ্যা। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। জ্ঞান যদি আমাদিগকে সেই পরাৎপরের নিকট না লইয়া যায়, তবে জ্ঞানের আবশ্যকতা কি ?

"আর ভারতের উপর তাঁহার কি অনুরাগ! যদি আমার তাহার শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বসবাস ও বিচরণ করিয়াছেন; পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ায় বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে এ সমুদয় তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে উহার রং ধরাইয়া দিয়াছে।

"ম্যাক্সমূলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিক বেদান্তের সুর-বেসুর ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিতর উহার প্রকৃত তানকে ধরিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করিতেছে, উহা সেই এক তত্ত্ব, সমুদয় ধর্মই যাহার কার্যে পরিণতি মাত্র। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের আকার অবয়বস্বরূপ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্বাভাসস্বরূপ—সকল জাতির নিকট আধ্যাত্মিক আলোক-বাহকস্বরূপ। চলিত কথায় আছে, জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্ত্য ঋষি ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্রের উদয় হইলেই, ভারতবাসিগণ উহার মহত্ত্ব বুঝিবার পূর্বেই উহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন?

"আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন? ভারতবাসীর পূর্ব পুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তথাকার সকলেই আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হইবে। বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল—মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল—ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বাহির হইল, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেখানে তোমাদের দাহ করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানবহৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। কে জানে, হয় ত কবি যাহা বলিয়াছেন, এ তাই—

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং।
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি॥

তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতভাবে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্বের কথা ভাবিতেছেন।

"তাঁহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন বর্তমান শরীর ত্যাগ করিবার পুর্বে তাঁহার বহু বহু বর্ষ যায়।"

এ ছাড়া স্বামীজী ম্যাক্সমূলারকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' নামক স্বামীজীর সেই উৎকৃষ্ট রচনাটি 'ভাববার কথা' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। স্বামীজী অবশ্য সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন বা ইতিহাস সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের সকল কথাকে অভ্রান্ত বলে মনে করতেন না, কখনো কখনো প্রয়োজনে সে সকল কথার প্রতিবাদও করেছেন, কিন্তু বেদের এই আধুনিক উদ্ধার-কর্তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামী-শিষ্য-

সংবাদ' থেকে ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাবের কিছু প্রকাশ উদ্ধৃত করছি—

"স্বামীজী ম্যাক্সমুলারপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মনে হল কি জানিস, সায়নই নিজের ভাষ্য নিজে উদ্ধার করতে ম্যাক্সমুলাররূপে পুনরায় জন্মেছেন। আমার অনেকদিন হতেই ঐ ধারণা। ম্যাক্সমুলারকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এমন অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এদেশে দেখা যায় না। তার উপর আবার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে অবতার বলে বিশ্বাস করে। বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম—কী যত্নটাই করেছিল! বুড়োবুড়ীকে দেখে মনে হত, যেন বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর মত দুটিতে সংসার করছে! আমাকে বিদায় দেবার কালে বুড়োর চোখে জল পড়েছিল।'

"শিষ্য। আচ্ছা মশায়, সায়নই যদি ম্যাক্সমুলার হয়ে থাকেন ত পুণ্যভূমি ভারতে না জন্মে ম্লেচ্ছ হয়ে জন্মালেন কেন?

"স্বামীজী। অজ্ঞান থেকেই মানুষ 'আমি আর্য, উনি ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি অনুভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভাষ্যকার, জ্ঞানের জলন্ত মূর্তি, তাঁর পক্ষে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি? তাঁর কাছে ওসব অর্থশূন্য। জীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিদ্যা অর্থ উভয়ই আছে, সেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই-বা কোথায় পেতেন? শুনিসনি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ঋগ্বেদ ছাপাতে ৯ লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল? তাতেও কুলোয়নি। এদেশের শতশত বৈদিক পণ্ডিতকে মাসোহারা দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিদ্যা ও জ্ঞানের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থব্যয়, এরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এদেশে, এ যুগে কেউ দেখেছে? ম্যাক্সমুলার নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বৎসর কাল কেবল ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট লিখেছেন, বই নিয়ে এরূপ লেগে পড়ে থাকা সামান্য মানুষের কার্য নয়। এতেই বোঝ! সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন।"

[১৮৯৭ খ্রীঃ]

বিবেকানন্দ—টিলক

পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর টিলক স্বামী বিবেকানন্দের গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় অনেক কিছু লিখেছিলেন। 'বিবেকানন্দ ভারতে দ্বিতীয় শঙ্কর'—এমন উক্তিও তিনি নাকি করেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে তিনি স্বামীজী-প্রবর্তিত আন্দোলনের বিশেষ সমর্থন করেন। স্বামীজী

সম্পর্কে তাঁর সকল লেখা সংগৃহীত হয়নি। 'Reminiscences of Swami Vivekananda' নামক গ্রন্থে টিলকের নিম্নলিখিত রচনাটুকু গৃহীত হয়েছে—

"১৮৯২ সালের কাছাকাছি সময়ে, অর্থাৎ চিকাগোর বিশ্বমেলায় বিখ্যাত 'পার্লামেণ্ট অব রিলিজনস্' অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে, আমি একবার বোম্বাই থেকে পুণায় ফিরছিলুম। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে আমার কামরায় একজন সন্ন্যাসী উঠলেন। কয়েকজন গুজরাটি ভদ্রলোক তাঁকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁকে পুনায় আমার বাড়িতে থাকতে বললেন। আমরা পুনা এলাম, এবং সন্ন্যাসী আমাদের বাড়িতে ৮।১০ দিন রইলেন। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু বললেন, তিনি সন্ন্যাসী। এখানে তিনি কোনো প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নি। বাড়িতে তিনি প্রায়ই বেদান্ত এবং অদ্বৈত দর্শন সম্বন্ধে কথা বলতেন। সন্ন্যাসী সামাজিক মেলামেশা একদম এড়িয়ে চলতেন। তাঁর কাছে একেবারে কোনো টাকাপয়সা ছিল না। একটা হরিণের ছাল, একটা কমণ্ডলু, এবং একটা কি তুটো কাপড়—এই তাঁর যা কিছু সম্বল। ভ্রমণকালে কেউ হয়ত তাঁকে উদ্দিষ্ট স্থানের রেল-টিকেট কেটে দিত।

সন্ন্যাসী বিশেষভাবে এই আশা পোষণ করতেন যে, যেহেতু মহারাষ্ট্রের নারীরা পর্দাপ্রথার দ্বারা বাঁধা পড়েনি, সে কারণে তাদের উচ্চবর্ণের বিধবাদের মধ্য থেকে হয়ত প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের যোগীদের মত কেউ কেউ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে। এ ছাড়া সন্ন্যাসী আমার মতই বিশ্বাস করতেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংসারত্যাগের পক্ষে প্রচার না করে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিয়েছে। *

"আমি সেই সময়ে হীরাবাগের 'ডেকান ক্লাবের' একজন সদস্য ছিলুম। সেখানে সাপ্তাহিক সম্মেলন হত। এমনই এক সম্মেলনে সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেই সান্ধ্য অধিবেশনে স্বর্গতঃ কাশীনাথ-গোবিন্দনাথ দর্শনবিষয়ে একটি চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন। সে বিষয়ে কারও কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে বিষয়টির বিপরীত পক্ষ সম্বন্ধে অতি স্বচ্ছভাবে অনর্গল ইংরেজীতে বলে গেলেন। সেখানে উপস্থিত সকলে তাঁর উচ্চ ক্ষমতা সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হল। এর অল্প পরেই সন্ন্যাসী পুনা ছেড়ে চলে গেলেন।

"তু'তিন বৎসর পরে [ঠিকভাবে, চার বৎসর বাদে] পার্লামেণ্ট অব রিলিজনে,

---

* 'গীতা সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে নয়'—এটা মোটেই স্বামীজীর মত নয় বলে 'Reminiscences' গ্রন্থের প্রকাশক জানিয়েছেন।

এবং তারপরে আমেরিকার অন্যত্র ও ইংলণ্ডে বিপুল সাফল্যের ফলে জগৎ-জোড়া খ্যাতি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভারতে যেখানেই তিনি গেলেন, সেখানেই তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল, এবং প্রত্যেক অভিনন্দনের উত্তরে তিনি চাঞ্চল্যময় উদ্দীপক ভাষণ দিলেন। কয়েকটি সংবাদপত্রে তাঁর ছবি দেখে আমার চেনা মনে হল, এবং আকারের সাদৃশ্য দেখে ভাবলাম, যে সন্ন্যাসী আমার বাড়িতে বাস করেছিলেন তিনি ইনি। এই ভেবে আমি তাঁর কাছে আমার অনুমান সত্য কিনা জানতে চেয়ে পত্র লিখলাম, এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে অনুগ্রহ করে পুনায় পদার্পণের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালাম। আমি অত্যন্ত অনুরাগময় তাঁর যে উত্তর পেলাম, তাতে স্বামীজী খোলাখুলি স্বীকার করলেন, হাঁ, তিনি সেই একই সন্ন্যাসী ; তবে দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন, সেবার তাঁর পক্ষে পুনা যাওয়া সম্ভব হবে না। স্বামীজীর সে চিঠিটি আর পাওয়া সম্ভব নয়। সেটি নিশ্চয় ১৮৯৭ সালের 'কেশরী' বাজেয়াপ্তের পরে অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

"এর পর একবার, কলকাতায় এক কংগ্রেস অধিবেশনকালে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আমরা একসঙ্গে চা পান করেছিলাম। কথাবার্তার সময়ে স্বামীজী কিছু রহস্য করে বলেছিলেন, খুব ভাল হয় যদি আমি সংসার ত্যাগ করে তাঁর বাংলাদেশের কাজের ভার গ্রহণ করি, সেক্ষেত্রে তিনি মহারাষ্ট্রে গিয়ে আমার কাজের ভার নেবেন। 'দূর দেশে যেমন প্রভাব বিস্তার করা যায়, নিজের দেশে তেমনটি হয় না',—তিনি বলেছিলেন।"

স্বামীজী পুনা গমনের জন্য তিলকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ সম্বন্ধে কে. সুন্দরম আয়ার লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত তিলক স্বামীজীকে পুনা যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, স্বামীজী প্রথমে ভেবেছিলেন যাবেন, কিন্তু তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, এবং হিমালয়ের কোলে ফিরে যেতে চাইছিলেন।"

পুনায় বিবেকানন্দ-তিলকের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।—

"পুনার বসুকাকা লেখককে (ডাঃ দত্তকে) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের গৌহাটি অধিবেশনে বলেছিলেন,—স্বামীজী যখন তিলকের বাড়িতে তাঁর অতিথিরূপে বাস করছিলেন, তখন তিনি (বসুকাকা) উভয়ের কথাবার্তার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। বসুকাকা বলেন—স্থির হয় যে, তিলক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

জাতীয়তার জন্য কাজ করবেন, আর স্বামীজী করবেন ধর্মের জগতে জাতীয়তার জন্য। টিলকের অবলম্বন হল জাতীয় কংগ্রেস, স্বামীজীর অবলম্বন ধর্ম। অবশ্য জনজাগরণের জন্য টিলকও 'গণপতি উৎসব', 'শিবাজী উৎসব' প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।"

টিলকের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে কোন্ সময়ে স্বামীজীর কথাবার্তা হয়েছিল উপরে তা বলা হয়নি। তা কি আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে, না পরে? বসুকাকা যে জাতীয়-কথাবার্তার কথা বলেছেন, তা টিলক-প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী আমেরিকা যাবার পূর্বে হওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ঐ সাক্ষাৎ হয় আমেরিকা যাওয়ার পরে। কিন্তু আমেরিকা থেকে ফেরার পরে স্বামীজী সম্ভবত টিলকের বাড়িতে আর যাননি। মনে হয়, বসুকাকা বেলুড়ে স্বামীজীর সঙ্গে টিলকের কথাবার্তার কথাই উল্লেখ করেছিলেন। এবং এ বিষয়ে পূর্বে উদ্ধৃত টিলকের রচনা ও বসুকাকার বিবরণে অনেকটা মিল আছে।

টিলক-প্রবর্তিত শিবাজী-উৎসবের সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল।—

"বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় শিবাজী উৎসবের উদ্যোগ করেন। অন্য প্রদেশগুলির আদর্শ বীরদের চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়সাধনই এই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কেউই প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সভাপতি হতে রাজী হলেন না। তাঁরা সরকারের শ্যেন দৃষ্টির ভয়ে থরহরি। অবশেষে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র এবং সাহিত্যিক,—তাঁর ছোটভাই জ্যোতিষকে বেলুড় মঠে স্বামীজীর কাছে অসুবিধার কথা জানিয়ে বলে পাঠালেন—স্বামীজী যদি উৎসবের সভাপতি হন। সব শুনে স্বামীজী কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, 'বেটি বলি চায়। ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে গিয়ে সভাপতি হতে বল; কেউ যদি রাজী না হয়, আমি আছি, সভাপতি হব।" [মহেন্দ্রনাথ দত্তের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা।]

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে পুনায় টিলকের বাড়িতে স্বামীজীর গমন এবং তারপরে বেলুড় মঠে স্বামীজীর আগমন সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী প্রেমানন্দের যে সব উক্তির উল্লেখ করেছেন তা টিলক-প্রদত্ত বিবরণের প্রায় অনুরূপ। [শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—২য় খণ্ড—পৃ—১৯৭-৯৮]

টিলকের বেলুড় মঠে আগমন সম্বন্ধে আকর্ষণীয় বিবরণ পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান' গ্রন্থে। তার কিছু অংশ—

"স্বামী নিশ্চয়ানন্দ (তিনি স্বামীজীর মারাঠি শিষ্য) বলেছিলেন, 'এক বছর কলকাতায় কংগ্রেস হয়েছিল। সেই উপলক্ষে লোকমান্য টিলক কলকাতায় এসেছিলেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ থাকায় তাঁর সঙ্গে সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ করা নিষেধ ছিল। টিলক একদিন অপরাহ্ণে নৌকা করে এসে মঠের দক্ষিণ অংশে বেলতলার দিকে নৌকা লাগিয়ে উঠলেন, এবং নিজের নাম-লেখা একখানা কার্ড একটি বৃদ্ধ সাধুকে দিলেন, যাতে স্বামীজী শীঘ্র তাঁর আসবার খবর পান। বৃদ্ধ সাধুটির বিবেচনাশক্তি কোনো বিশেষ কারণবশত একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। টিলক মাঠে দাঁড়িয়ে রইলেন, বৃদ্ধ সাধুটি মঠবাড়ির এদিক ওদিক ঘুরে টিলককে বললেন, স্বামীজীর শরীর অসুস্থ, তিনি এখন সাক্ষাৎ করবেন না। টিলক অতি বিনীতভাবে বললেন, আচ্ছা, স্বামীজীকে সময়মত কার্ডখানি দেবেন। এই বলে তিনি নৌকা করে চলে গেলেন।

"সন্ধ্যার পরে স্বামীজী নীচে নামলে বৃদ্ধ সাধুটি তাঁকে কার্ডখানি দিলেন। স্বামীজী কার্ডে তিলকের নাম দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, টিলক কোথায়? বৃদ্ধ সাধুটি বললেন, সে ব্যক্তি অপরাহ্ণে এসেছিলেন, এখন চলে গেছেন। স্বামীজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং নানা প্রকার ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। শেষে আমাকে বলতে লাগলেন, তুই তো মারাঠি, তুই তো টিলককে জানিস, তুই কেন আমাকে খবর দিসনি?' তারপর স্বামীজী নিজের হাতে তখনি টিলককে একখানি পত্র দিলেন, এবং সেই বৃদ্ধ সাধুটিকে আদেশ দিলেন, 'তোমার শাস্তিস্বরূপ এই চিঠি নিয়ে হাওড়া গিয়ে ডাকঘরে দিয়ে আসতে হবে।' স্বামীজী মহা ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আদেশ পালন করতেই হবে। বৃদ্ধ সাধুটি একটি লণ্ঠন নিয়ে একে ওকে ডাকতে লাগলেন—যদি কেউ সঙ্গে যায়। স্বামীজী বললেন, 'কেউ সঙ্গে যাবে না, তোমাকে একলাই যেতে হবে, তুমি অতি গর্হিত কাজ করেছ।' বৃদ্ধ সাধুটি অনন্যোপায় হয়ে হাওড়ায় গিয়ে ডাকে চিঠিটি ফেলে এলেন। টিলক পত্র পেয়ে দু'একদিনের ভেতর মঠে এলেন। মঠবাড়ির দক্ষিণ দিকের মাঠে পায়চারি করতে করতে স্বামীজীর সঙ্গে নানা প্রকার কথা কইতে লাগলেন। সেখানে কারও যাওয়ার আদেশ ছিল না।······

"স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বলেছিলেন, টিলক আগে শুধু মারাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্য নানাপ্রকার প্রচেষ্টা করছিলেন। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন, একটা জাতিকে তুলতে হলে জাতের মাত্র এক অংশকে তুললে হবে না। গরীব, দুঃখী, নিম্নশ্রেণীর

সকলকেও না তুললে জাত উঠবে না। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসা অবধি টিলকের মনোভাবের পরিবর্তন হল। তিনি নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যও নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন।"

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসের কলিকাতা কংগ্রেস থেকে টিলক প্রভৃতির বেলুড় মঠে আগমন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখেছেন—

"এবার ডিসেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেস। কংগ্রেস হইতে ধূলিপায়ে কতিপয় সদস্য, বিশেষতঃ মিঃ টিলক বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ঠাকুরঘর হইতে পুজা শেষ করিয়া স্বামীজী অবতরণ করিতেছেন, এমন সময়ে টিলক মহারাজকে পুরোভাগে রাখিয়া সদস্যেরা জোড় হস্তে দণ্ডায়মান। স্বামীজী দেশাত্মবোধের বাণী বজ্রগম্ভীর স্বরে নিনাদিত করিলেন। প্রথমবার আমেরিকা যাইবার পূর্বেই স্বামীজী টিলক মহারাজের অতিথি হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আবার জীবন সায়াহ্নে স্বামীজী টিলক মহারাজের সহিত মিলিত হইলেন। অস্ত যাইবার পুর্বে উনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীকে স্পর্শ করিয়া গেল।" [শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ]

স্বামীজীর রচনায় বা ভাষণে টিলকের মাত্র দুটি উল্লেখ পাওয়া যায়।—

"নামটি হল, বাল গঙ্গাধর টিলক, এবং বইটি হল 'Orion'. [ই. টি. স্টার্ডিকে ৮ আগস্ট ১৮৯৬, তারিখে লেখা চিঠিতে আছে।]

"পণ্ডিত বাল গঙ্গাধর টিলক প্রমাণ করেছে যে, হিন্দুদের বেদ অন্তত খ্রীঃ পূঃ পাচ হাজার বৎসর আগে বর্তমান আকারে ছিল।" [পরিব্রাজক]

টিলকের পাণ্ডিত্যের ও মনীষার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ঐ সামান্য দুই উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

বিপিনচন্দ্র পাল

(১)

বিবেকানন্দ একাকী নহেন। তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত তিনি অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। কেবল ভারতবর্ষের নয়, বর্তমান কালের বৃহত্তর পৃথিবীর আধুনিক মানবের সম্বন্ধবিচারে এই দুই জন প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হইয়া

আছেন। বর্তমান যুগের মানুষ কেবলমাত্র বিবেকানন্দের মধ্য দিয়াই পরমহংস-দেবকে বুঝিতে পারে, সেইরূপ আবার বিবেকানন্দকেও তাঁহার গুরুর জীবনালোকেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার গুরু ছিলেন এক বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি। অতএব সে যুগে 'যুক্তিবাদে'র বাঁধা বুলিতে বিভ্রান্ত মানুষের কাছে তিনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এক রহস্যময় মানবরূপে দেখা দিয়াছিলেন ; বস্তুত এই যুক্তিবাদের অর্থ, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ যে ভাবুকতা, তাহার অভাব ভিন্ন আর কিছু নয়। ভাব আর খেয়াল এক বস্তু নয়। ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগম্য এক বোধশক্তি। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব যে যুগে, সে যুগে এই ভাবুকতার দৈন্য দেখা দিয়াছিল। কাজেই সে যুগের নিকট তিনি এক দুর্বোধ্য রহস্য।

পরমহংসদেবের জীবনবেদ ও বাণী এ যুগের মানুষের হৃদয়ঙ্গমের উপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচারের ভার বিবেকানন্দের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন সম্প্রদায় বা নামের গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন না, অথবা অন্যভাবে ইহাও বলা চলে যে, তিনি ভারতীয় ও অ-ভারতীয় সকল সম্প্রদায় ও নামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি 'সর্বজনীনতাবাদী', কিন্তু তাঁহার সর্বজনীনতা বস্তুনিরপেক্ষ সর্বজনীনতা নয়। বিশ্বজনীন ধর্মকে উপলব্ধি করিতে তিনি বিভিন্ন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্জন করেন নাই! সূর্য ও ছায়ার ন্যায় তাঁহার নিকট 'সামান্য' ও 'বিশেষ' সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজ করিত। সেই জন্য জীবন ও চিন্তার অনন্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া তিনি সার্বজনীন সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গুরুর এই উপলব্ধিকে বিবেকানন্দ আধুনিক 'মানবতা'র বেশ পরাইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঈশ্বর ন্যায়শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রের ঈশ্বর ছিলেন না, তাঁহার ছিল ব্যক্তি-ভগবান এবং তাহা অপরোক্ষ অনুভূতির বস্তু। প্রাচীন শাস্ত্র বা ঐতিহ্যের কিংবা কোন গুরুর প্রামাণিকতার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তিনি ছিলেন একজন বেদান্তী, 'শক্তি'-ধর্মে তাঁহার সহজ আনুগত্য ও প্রথম জীবনের শিক্ষাদীক্ষা। বাঙলাদেশে 'শক্তি'-ধর্ম 'বেদান্ত'-ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তধর্মকে কোনমতেই শঙ্করের বেদান্তধর্ম কিংবা অন্য যে-কোন বৈষ্ণব-বেদান্ত গোষ্ঠীর সহিত এক লেবেলে আঁটা চলে না। ঐ লেবেলগুলি তাহাদেরই জন্য যাহারা বিরাট চিন্তাশীল পুরুষগণের গভীর ও ব্যাপক চিন্তারাশি হইতে তাহাদের ধর্মতত্ত্ব আহরণ করিয়া থাকে। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। তিনি দার্শনিক বা পণ্ডিত ছিলেন না, আধুনিক বা প্রাচীনপন্থী তার্কিকও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা। যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই বিশ্বাস করিয়াছেন।

সচরাচর দেখা যায় সত্যদ্রষ্টাগণ অতীন্দ্রিয়বাদী হইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসও ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন না; যীশুও ছিলেন না, মানুষের আধ্যাত্মিক নেতৃগণের মধ্যে কেহই ছিলেন না। জনসাধারণ তাঁহাদের বুঝিতে পারে না; সর্বাপেক্ষা কম বুঝিতে পারেন তাঁহাদের সমকালের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা। তথাপি দর্শন যাহাকে অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়ায় তাঁহারা তাহাই উদ্ঘাটিত করিয়া যান। যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসকেও ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সে যুগের মানুষের কাছে তাঁহার বাণী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য, একজন ভাষ্যকারের প্রয়োজন ছিল। সন্ত পলের মধ্যে যীশু এইরূপ একজন ভাষ্যকার পাইয়াছিলেন; বিবেকানন্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে লাভ করিলেন। অতএব রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপলব্ধির আলোকেই বিবেকানন্দকে বুঝিতে হইবে।

(২)

বিবেকানন্দের দীক্ষান্তরের কাহিনী এখনও অকথিত। কিরূপে এই অলৌকিক ব্যাপারটি সম্ভব হইয়াছিল তাহা কেহ অবগত কিনা জানি না। বিবেকানন্দ ছিলেন যুক্তিবাদী এবং প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী, যদিও নিজেকে তিনি আস্তিক মনে করিতেন। তাঁহার প্রথম ধর্মীয় সাহচর্য ঘটে ব্রাহ্ম সমাজের সহিত। সিদ্ধপুরুষ ও সত্যদ্রষ্টাতে বিশ্বাস জন্মাইবার পক্ষে তাহা বিশেষ অনুকূল ছিল না। পরমহংসদেব তাঁহার আত্মিক শক্তি এবং বিশেষভাবে তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগের বলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কখনই পরমহংসদেবের জীবন ও উপলব্ধির গোপন প্রস্রবণ উন্মোচিত করিতে পারেন নাই। বুদ্ধির প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পরমহংসদেব তাঁহাদের অধিকাংশের নিকটই তাঁহার ভাবের নিভৃত কক্ষটি কখনও উন্মুক্ত করেন নাই। এই দিক হইতে পরমহংসদেব বিবেকানন্দের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিলেন।

গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে পরমহংসদেব বিবেকানন্দের প্রকৃতি ও চেতনার অন্তর্গূঢ় রূপটি দেখিয়া তাঁহাকেই নিজ জীবনের বাণীপ্রচারের যোগ্যতম যন্ত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। ইহাই বিবেকানন্দের দীক্ষান্তরের প্রকৃত কাহিনী। 'সল'-এরও দীক্ষান্তরের কাহিনী ইহাই, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল এক ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায়। গুরুর প্রতি বিবেকানন্দ এক অপরিজ্ঞাত আকর্ষণ অনুভব করিলেন। আত্মিক শক্তির অমোঘ প্রভাবেই তাহা ঘটিয়াছিল। গভীর আধ্যাত্মিক ভূমিতে যখন এক আত্মা অপর আত্মাকে স্পর্শ করে তখন উভয়ে এক অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক বন্ধনে চিরসম্মিলিত হইয়া যায়। তখন হইতে কার্যতঃ 'দুই' 'এক'-এ পরিণত হয়; গুরু শিষ্যের মধ্য দিয়া কাজ করিয়া যান, শিষ্য জানিতেও পারেন না যে, তিনি তাঁহার

গুরুর সুরে সুর বাঁধিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। দীক্ষান্তরের পর বিবেকানন্দ গুরুর প্রেরণার বশবর্তী হইয়া কার্য করিতে থাকেন।

বিবেকানন্দের বাণী সাধারণের উপযোগী বৈদান্তিক চিন্তাধারা অবলম্বনে প্রচারিত হইলেও যথার্থতঃ তাহা আধুনিক মানবের নিকট তাঁহার গুরুর বাণী। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের বাণী আধুনিক 'মানবতা'র বাণী। স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁহার আবেদন ছিল, "তোমরা মানুষ হও।" ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মধ্যযুগীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ধর্ম ছিল মূলতঃ পরলোককেন্দ্রিক। এই ধর্মে তাহাদের প্রতি সংসারত্যাগের এবং দৈহিক ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় আচারবিচারের অনুশাসন আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত বাণী নয়। তিনি যতখানি বেদান্তী ছিলেন, আবার ঠিক ততখানি বৈষ্ণবও ছিলেন। হিন্দুধর্মের এই দুই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার সমন্বয়ে তাঁহার ভাবাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'মাতৃ'-ধর্ম আসলে 'ভক্তি'-ধর্ম বা ঈশ্বরে ভালবাসা, মানবিক মাতৃত্বের আলোকে তাহা উপলব্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট চরম সত্য একটি বস্তুনিরপেক্ষ ভাববিশেষ নয়। তাহা জৈবিক দেহ নয়, কিন্তু আবার নিরবয়বও নয়। পরম সত্যের প্রকৃত রূপ মানবিক রূপ—আমরা চর্মচক্ষে মানুষের যে ইন্দ্রিয়জ রূপ দেখি তাহা নহে, ইহার অন্তরালে বিরাজিত এবং মরচক্ষুর অগোচর তাহা এক আধ্যাত্মিক রূপ। স্বরূপতঃ মানুষ ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।

সমস্ত ধর্মীয় কৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করিতে সাহায্য করা। বিবেকানন্দ যখন তাঁহার দেশের মানুষকে মানুষ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। দেবতার পূজার সময় ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেন :—"আমি ব্রহ্ম। ইহা ব্যতীত আর কেহ নহি। আমি শোক-তাপের অতীত, নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত।" পরমহংসদেবের এই বাণীই বিবেকানন্দ বর্তমান জগতকে প্রদান করিয়াছেন।

ইহা মুক্তির বাণী ; কিন্তু নেতিবাচক অর্থে নয়, ইতিবাচক এবং অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে। মুক্তির অর্থ বাহিরের সমস্ত বাধার অপসারণ। কিন্তু আমরা এরূপ উপাদানে গঠিত যে, প্রাকৃতিক কিংবা সামাজিক পরিবেশজনিত বাহিরের সকল সম্পর্ক আমরা ছিন্ন করিতে পারি না। এইরূপ বিচ্ছিন্ন অবস্থা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কালস্বরূপ। অতএব জীবনের ধর্ম বিচ্ছিন্নতা নয়—সাহচর্য ; অসহযোগ নয়—সহযোগিতা ; এবং যথার্থ মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়া অর্জন করা যায় না, শান্তির মধ্য দিয়াই তাহা লাভ করিতে হয়। জীবন-পরিকল্পনায় যুদ্ধ, সংসারত্যাগ বা বিচ্ছিন্নতারও স্থান আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চরম লক্ষ্যকে লাভ করিবার উপায়রূপে তাহার

কেবল একটি সাময়িক মূল্য আছে; এই লক্ষ্য, বিবর্তনের সম্ভাব্য বিবাদগুলিকে স্থায়িত্বদান নয়, সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ও বিলুপ্তিসাধনের দ্বারা একটি ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী ঐক্যস্থাপন। আবার মুক্তিও কেবলমাত্র একটিই। আমাদের রিপুগুলির প্রভুত্ব ও ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে মুক্তি এই আদর্শোপলব্ধির প্রথম সোপান। মনুষ্য ভ্রাতার ভয় হইতে মুক্তি দ্বিতীয় সোপান। বাহিরের কোন কর্তার প্রভুত্ব হইতে মুক্তি তাহার পরের সোপান। এইরূপে ব্যক্তিগত মুক্তি, সামাজিক মুক্তি এবং এমনকি রাজনৈতিক মুক্তির মধ্য দিয়া মানুষ তাহার প্রকৃত মুক্তি লাভ করিবে। সেই অবস্থা লাভ করিয়া সর্বশেষে সে উপলব্ধি করে যে, সে এবং তাহার ঈশ্বর এক। ইহাই বিবেকানন্দের ভাষ্যে বেদান্তের বাণী। বস্তুতঃ ইহাই বর্তমান জগতের নিকট রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী। [প্রবুদ্ধ ভারত, জুলাই ১৯৩২]

ভারতে কেহ কেহ মনে করেন, ইংলণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই, তাহা তাঁহার সুহৃদ ও ভক্তবৃন্দের অতিরঞ্জিত বর্ণনা মাত্র। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিলাম সর্বত্রই তিনি এক সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেক স্থানে আমি এমন বহু লোকের সান্নিধ্যে আসিয়াছি যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন। সত্য বটে, আমি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নহি এবং তাঁহার সহিত কোনকোন বিষয়ে আমার মতভেদ আছে, তথাপি আমাকে স্বীকার করতেই হইবে যে, বিবেকানন্দের প্রভাবগুণে এখানে অনেকের চোখ খুলিয়াছে এবং হৃদয় প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার ফলেই এখানকার অধিকাংশ লোক আজকাল বিশ্বাস করে যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলির মধ্যে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল নিহিত আছে। শুধু যে এই ভাবটি তিনি জাগাইয়াছেন তাহা নহে, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সফলতালাভ করিয়াছেন। মিঃ হাউইস্ (Mr. Haweis) লিখিত 'বিবেকানন্দ-বাদ' ও 'দি ডেড্ পুলপিট' নামক প্রবন্ধ হইতে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়াছিলাম, তাহা হইতে সকলে স্পষ্ট বুঝিয়াছেন যে, বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের ফলেই শত শত ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়াছে। বাস্তবিক, এ দেশে তাঁহার কার্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা নীচের ঘটনাটি হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে।—

কাল সন্ধ্যায় লণ্ডনের দক্ষিণপ্রান্তে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু পথের নিশানা হারাইয়া ফেলায় রাস্তার এক কোণে দাঁড়াইয়া কোন্ দিকে যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা একটি শিশুকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিলেন,—মনে হইল আমাকে পথ দেখাইবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন।

তিনি আমাকে বলিলেন, "মহাশয়, নিশ্চয়ই পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না? আমি সাহায্য করিতে পারি কি?" তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "কাগজে দেখিয়াছি আপনি লণ্ডনে আসিতেছেন। আপনাকে প্রথম দেখামাত্রই আমি আমার ছেলেকে বলিতেছিলাম, 'ঐ দেখ—স্বামী বিবেকানন্দ!' তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরিবার জন্য অতি দ্রুত চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম, তাঁহাকে বলিবার সময় পাই নাই যে, আমি স্বামী বিবেকানন্দ নহি। বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে না জানিয়াই তাঁহার প্রতি স্ত্রীলোকটির এরূপ শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়া আমি খুবই বিস্মিত হইয়াছিলাম। এই মধুর ঘটনাটিতে আমি খুবই তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং যাহার দৌলতে এই সম্মানলাভ ঘটিল সেই গেরুয়া পাগড়ীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। এই ঘটনা ছাড়াও, এখানে আমি অনেক শিক্ষিত ইংরাজকে দেখিয়াছি যাঁহারা ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং ভারতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। [ইণ্ডিয়ান মিররে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮, প্রেরিত বিপিনচন্দ্রের পত্র]

[সুশীলকুমার দাশগুপ্ত অনূদিত]

বিবেকানন্দ—উইলিয়ম জেমস

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের পরিচয় হয়েছিল এবং এই পরিচয় উইলিয়ম জেমসের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। স্বামীজীর সঙ্গে জেমসের প্রথম সাক্ষাৎ হয় মিসেস ওলি বুলের বাড়িতে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে।—

"মিসেস বুল এখানে যে (তাঁর কেম্ব্রিজ-ভবনে, আমেরিকায়) স্বামীজীকে দু'একটা ঘরোয়া ভাষণ দিতে প্রণোদিত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, এবং বোধহয় এখানেই স্বামীজী ডাঃ উইলিয়ম জেমসের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই সময়েই বোধহয় স্বামীজী ঈশ্বর-সান্নিধ্যের রহস্য বোঝাতে গিয়ে ঐ বিখ্যাত দার্শনিকের সামনে সমাধিমগ্ন হন।" [লুই বার্কের রচনা]

ঐ একই প্রসঙ্গে 'Life'-এর মধ্যে নিম্নের বিবরণ পাই—

"এই সময়েই মিসেস ওলিবুলের বাড়িতে ডিনারে স্বামীজী হার্ভাডের বিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসের সাক্ষাৎ পান। ডিনারের পরে স্বামীজী ও অধ্যাপক গভীর ও একান্ত আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। মধ্যরাত্রিতে তাঁদের সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ হয়। এই দুই বিরাট মনীষীর আলোচনার ফল কি তা জানতে উৎসুক হয়ে মিসেস বুল প্রশ্ন করলেন—'তা স্বামীজী, অধ্যাপক জেমসকে কেমন লাগল?' স্বামীজী

সংক্ষেপে ভাসা-ভাসা উত্তর দিলেন—'ভারী সুন্দর মানুষ, ভারী সুন্দর মানুষ!' 'সুন্দর' শব্দটির উপর তিনি জোর দিলেন। পরদিন স্বামীজী মিসেস বুলকে একটি চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কাছে হয়ত এটা আকর্ষণীয় মনে হবে!' মিসেস বুল চমৎকৃত হয়ে পড়লেন—অধ্যাপক জেমস স্বামীজীকে 'আচার্য' নামে সম্বোধন করে কয়েকদিন পরে তাঁকে তাঁর বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন! অধ্যাপক জেমসের স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর রচনায় ও উক্তিতে বহুক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজী সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে বলতেন—'বৈদান্তিকগণের মধ্যে সেই মহাদর্শস্বরূপ ব্যক্তি।' অধ্যাপক জেমস তাঁর বিরাট কীর্তি 'The variety of Religious Experience'-এর ভিতরে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্বামীজীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা, 'The Energies of Men'-এর মধ্যে তিনি জনৈক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কথা বলেছেন, যিনি স্নায়ু-বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য রাজযোগ অনুশীলন করেন এবং তার দ্বারা শুধু শারীরিক উন্নতি নয়, মানসিক ও আত্মিক আলোও লাভ করেছিলেন,—অনেকের ধারণা, স্বয়ং উইলিয়ম জেমসই ঐ অধ্যাপক, এবং ঐ প্রবন্ধে তিনি স্বামীজী-নির্দেশিত পথে রাজযোগ অভ্যাস করার ফলে নিজের ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কথাই বলেছেন।"

রোমাঁ রোলাঁ জেমসের উপর স্বামীজীর প্রভাবকে স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর মতে জেমসের 'Religious Experience' গ্রন্থ রচনার পিছনে বিবেকানন্দের প্রভাব পরোক্ষ—

"উইলিয়ম জেমসের উপর বিবেকানন্দের প্রভাব পড়িয়াছিল, একথা বিবেকানন্দের শিষ্যরা বিশ্বাস করিতে চান। তাঁহারা জেমসের রচনা হইতে দেখান,···বিবেকানন্দকে তিনি অদ্বৈত দর্শনের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উইলিয়ম জেমস্ ঐ সকল মতবাদকে নিজেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষক ছিলেন, এবং পর্যবেক্ষণের রীতিকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। 'ধর্মীয় অভিজ্ঞতা' সম্বন্ধে তিনি প্রথম শ্রেণীর শক্তির অধিকারী না হইলেও (তিনি নিজেও তাহা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন) তিনি এই বিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন ('The Varieties of Religious Experience')।

"এই পুস্তকের রচনার পশ্চাতে যে পরোক্ষে হইলেও বিবেকানন্দের দান ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু জেমস তাঁহাকে অন্যান্য অনেকের সহিত দৃষ্টান্ত হিসাবে 'অতীন্দ্রিয়বাদ' সম্পর্কে লিখিত দশম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তারপর

ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদীদের সহিত দুইবার তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং অবশেষে সকল দেশের ও সকল কালের অতীন্দ্রিয়বাদীদের সাক্ষ্যের উপসংহাররূপে তাঁহাকে স্থান দিয়াছেন ও সেইভাবে উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

"অবশ্য ইহা মনে হয় না যে, স্বামীজীর অভিজ্ঞতাকে তিনি যতখানি কাজে লাগাইতে পারিতেন, ততখানি লাগাইয়াছেন। ইহাও মনে হয় না যে, স্বামীজী তাঁহাকে নিজের চিন্তার উৎসটিকে—রামকৃষ্ণকে—অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। (জেমস অসতর্কভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে ম্যাকসমূলারের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি হইতে তাঁহাকে উদ্ধৃত করেন!) জেমসের বইখানির গুরুত্ব হইল এই যে—উহাকে চৌরাস্তার মোড় বলিয়া মনে হয়—যে চৌরাস্তায় অত্যধিক আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বছর হইতে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দিক হইতে বলিষ্ঠ আক্রমণের ফলে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে।— এই চৌরাস্তাটি ছিল—'মায়ার্স'-প্রবর্তিত 'অবচেতন', মোটামুটিভাবে খাড়া-করা 'আপেক্ষিকবাদ', 'খ্রীষ্টান বিজ্ঞান', ও বিবেকানন্দের বেদান্ত। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মোড় ফিরিবার সময় আসিয়াছে, আসিয়াছে নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কারের পূর্বক্ষণ। এই প্রচণ্ড আক্রমণে বিবেকানন্দও তাঁহার সুনির্দিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে অন্যরা, এমনকি পাশ্চাত্যের লোকেরা, এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইতিপূর্বে কালিফোর্ণিয়ার অধ্যাপক ষ্টারবাক যে গবেষণা করেন ('The Psychology of Religion') তাহা এবং তাঁহার ধর্মীয় প্রমাণ-প্রয়োগের সুপ্রচুর সংগ্রহই উইলিয়ম জেমসকে এই পুস্তক রচনায় বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।"

[অনুবাদ—ঋষি দাস]

জেমসের 'Religious Experience' গ্রন্থের পিছনে স্বামীজীর প্রভাবের পরিমাণ নিয়ে যত গবেষণাই চলুক, একথা সত্য, জেমস তাঁকে আচার্যরূপে স্বীকার করতেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে স্বামীজীর নিকট প্রেরিত নিম্নের পত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন উইলিয়ম জেমস্—

"প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতা,

কেম্ব্রিজ কনফারেন্সের সদস্যরূপে আমরা তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন ও নীতি-তত্ত্বের অনুশীলনে অনুরক্ত। আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম ও দর্শনের উপস্থাপনে আপনার সুযোগ্য প্রয়াসের গুরুত্ব আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি। ইহার দ্বারা আমেরিকার চিন্তাজগতে বেদান্ত সম্বন্ধে আগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছে।

আমরা বিশ্বাস করি, বেদান্তধর্মকে আপনি ও আপনার সহযোগী স্বামী সারদানন্দ যেভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার উপযোগিতা নিছক মানস-কণ্ডূয়নে সমাপ্ত নহে, পরন্তু তাহা দূরবিচ্ছিন্ন মানবসমাজের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করার ব্যাপারে বিপুল নৈতিক মূল্যসম্পন্ন বস্তু, এবং তাহা মানবসম্পর্কের ঘনিষ্ঠ রূপের উপলব্ধিতে সাহায্য করিয়াছে, যে-মানব-ঐক্যকে পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

"আমরা একান্তভাবে আশা করি, ভারতবর্ষে আপনার কার্য এই মহান আদর্শকে রূপদানের ব্যাপারে নূতনতরভাবে ফলপ্রসূ হইবে। আমাদের মধ্যে আপনার পুনঃপ্রত্যাবর্তনকে আমরা গভীরভাবে কামনা করি। আপনার সেই পুনরাগমনের মধ্যে আমাদের প্রতি আমাদের হইতে বহুদূরবাসী এক মহান আর্য-পরিবারের ভ্রাতৃগণের মৈত্রী-প্রতিশ্রুতি উদ্ঘাটিত হইবে; আপনার দেশবাসীর জীবন ও চিন্তার সহিত নূতনতর সংযোগলব্ধ প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যকে আপনি আমাদের মধ্যে বহন করিয়া আনিবেন ইহাই আশা করি।

"আমাদের সম্মেলনের মত সম্মেলনসমূহ বিপুল কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই আমরা আগামী বৎসরে আপনার কার্যবিধি কি হইবে তাহা জানিতে উৎসুক। আমরা কি আচার্যরূপে পুনরায় আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইব? আপনি আমাদের মধ্যে আসিতে পারিবেন, ইহা সবিশেষ আশা করি। যদি আসেন, তাহা হইলে পুরাতন সুহৃদ্‌গণ আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইবেন, এবং আপনার কার্যের প্রতি সুনিশ্চিতভাবে ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যাইবে।"

স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন, ব্রুকলিন এথিক্যাল এসোসিয়েসনের সভাপতি ডঃ লুইস. জি. জেনস, হারভার্ড ডিভিনিটি স্কুলের ডীন অধ্যাপক সি. সি. এভারেট, অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকদর্শনের অধ্যাপক জন হেনরী রাইট, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক জোসিয়া রইস প্রভৃতি।

স্বামীজীর মৃত্যুতে

রমেশচন্দ্র দত্ত

নিবেদিতাকে লিখিত পত্রের অংশ—

"......স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের শোকসংবাদ আমি তারপরেই জানতে পেরেছি। স্বামীজীকে আমি কখনও প্রত্যক্ষ দেখিনি, তাঁর উপদেশাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতও ছিলাম না, কিন্তু তাঁর উচ্চ স্বদেশপ্রেম, স্বদেশের মহত্ত্বে

তাঁর ঐকান্তিক আস্থা, এবং তাঁর স্বদেশবাসী যদি নিজের কাছে খাঁটি হয় তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর পুরুষোচিত বিশ্বাস,—তুমি জান, এ সমস্ত কিছুকে আমি হৃদয়ের সঙ্গে কিভাবে সমাদর করেছি ও সপ্রশংস আনন্দে লক্ষ্য করেছি। সেই আত্মনির্ভরতার ভাব, মুক্তিসাধনে সেই দৃঢ় সঙ্কল্প, দেশ ও জাতির প্রতি সেই একান্ত বিশ্বাস, আমাদের ভবিষ্যৎ যে আমাদের উপরই নির্ভর করছে, এই বলিষ্ঠ প্রত্যয়,—আজ যাঁকে হারিয়ে আমরা সকলে গভীর শোকবেদনা প্রকাশ করছি, এ সকলই ছিল তাঁরই জীবনের মহানতম শিক্ষা। ভারত তার আত্মবিশ্বাসী অনন্যনিষ্ঠ সেবককে অকালে হারাল—ভারত আরও দরিদ্র হয়ে গেল। বাংলাদেশে আমাদের কাছে এ ক্ষতি যেন ব্যক্তিগত, তোমার জীবনে এ শোক চিরদিনের জন্য কালো ছায়া বিস্তার করবে। তাঁকে হারিয়ে যারা পরম সুহৃদ, জীবনের সহায়, ও মহান সত্যের শিক্ষাদাতাকে হারাল, তাদের কাছে তাঁর ঐকান্তিকতা, তাঁর মহত্ব ও তাঁর জীবনের অমর শিক্ষার স্মৃতি হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা সঞ্চার করবে।"

[নিবেদিতাকে রমেশচন্দ্র দত্ত পত্রে লিখেছেন, 'I never saw the Swami।' কিন্তু টি. জে. দেশাই তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, লণ্ডনে তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় স্বামীজী ও রমেশ দত্তকে একত্র দেখেছেন। 'Once I remember that a paper was read by prof. Bain on the Upanishads. Swami Vivekananda and Mr. Ramesh chandra Datt, C. I. E. were also there", (Reminiscences of Vivekananda). আমরা মনে করি, টি. জে. দেশাইয়ের স্মৃতির চেয়ে স্বয়ং রমেশচন্দ্রের নিজের উক্তি অধিক নির্ভরযোগ্য।]

বিবেকানন্দ—জগদীশচন্দ্র বসু

স্বামীজী সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের মনোভাব শ্রদ্ধা ও সমালোচনা মিশ্রিত। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লেখা নিবেদিতার পত্র থেকে জগদীশচন্দ্রের সেই জাতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।—

"তারপর তিনি (জগদীশচন্দ্র) বললেন, কী সে অপূর্ব আনন্দশিহরণ যখন তিনি শুনলেন, স্বামীজী বলছেন, দেশের মানুষের মধ্যে পৌরুষ সৃষ্টিই তাঁর জীবনব্রত! সেই একই শিহরণের সঙ্গে তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালে স্বামীজীর কলকাতার বক্তৃতা

পড়লেন, এবং দেখলেন যথার্থ সত্যের জন্য, মানুষের জন্য, হেলায় স্বামীজী তাঁর জনপ্রিয়তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, এই মানুষটি গুরুপূজায় ও অন্যান্য পূজায় অগ্রসর, তখন তাঁকে হতাশ হয়ে ভেঙে পড়তে হল। যিনি ছিলেন মহানায়ক, তিনি হলেন কিনা নতুন সম্প্রদায়ের নেতা!"

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও ওলি বুলকে লেখা দুই পত্রে স্বামীজীর উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। নিবেদিতাকে লেখা পত্র—

"কী নিদারুণ শূন্যতা এনে দিয়েছে এই মৃত্যু! মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে কী সব বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন হল! এই সমস্ত কিছু কি করে একজন মানুষ সম্ভব করল! আবার কিভাবে এখন সব কিছুর উপর স্তব্ধতা নেমেছে! কিন্তু তবু, যখন কেউ শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার নিশ্চয়ই বিশ্রাম চাই। আমি এখনও যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, যেমন দু'বছর আগে প্যারিসে তাঁকে দেখেছি—সেই শক্তিধর পুরুষ—তাঁর বিরাট আশা,—তাঁর মধ্যে সব কিছুই বিরাট,—সন্দেহ নেই।

"কী বিপুল বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। এই বিষাদকে যেন অতিক্রম করতে পারি। ভারতে যারা বেদনার্ত, আমাদের ভাবনা যাচ্ছে তাদেরই কাছে।" [লণ্ডন, ৯ই জুলাই, ১৯০২]

ওলি বুলকে লেখা জগদীশচন্দ্রের পত্র—

"হারিয়ে যায় না কিছুই। যে সকল চিন্তা, কর্ম, সেবা ও আশা সুমহান, তারা মূর্ত হয়ে থাকে তাদের উৎসভূমির ভিতরে ও বাহিরে। আমাদের সমগ্র জীবন কয়েকটি মহামুহূর্তের প্রতিধ্বনি,—কালের মধ্যে যে প্রতিধ্বনি চিরদিন অনুরণিত হয়।...সেই মহান আত্মা মুক্ত হয়েছে; পৃথিবীতে তাঁর মহা বীরকর্ম এখন সমাপ্ত। সেই কার্য যথার্থত কি তা অনুভব করবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে?—একজন মানুষ একলা কি করে ঐ সকল কিছু সম্ভব করল তা কি আমরা উপলব্ধি করতে পারব? যখন কেউ শান্ত হয়ে পড়ে তাকে ঘুমোতে দাও, সেই ভাল, কিন্তু তাঁর কীর্তি, তাঁর শিক্ষা এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করবে,—তাকে জাগিয়ে তুলবে, আর শক্তি দেবে।"

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে স্বামীজীর সশ্রদ্ধ অনুরাগ ছিল। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠার মুলে দুইজন বিদেশী নারীর বিপুল প্রচেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার

আছে,—তাঁদের একজন, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামীজীর শিষ্যা, অন্যজন, স্বামীজীর একান্ত ভক্ত শ্রীমতী ওলি বুল।

স্বামীজীর পত্রাবলীতে কয়েকবার জগদীশচন্দ্রের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে আছে—"তুমি যদি মনে করে থাক যে, হিন্দুরা 'বসু'দের পরিত্যাগ করেছে, তাহলে সম্পূর্ণ ভুল করেছ। ইংরাজশাসকগণ তাঁকে কোণঠাসা করতে চায়। ভারতীয়দের মধ্যে ঐ ধরনের উন্নতি তারা কোন মতেই চায় না! তারা তাঁর পক্ষে জায়গাটা অসহ্য করে তুলেছে, সেজন্যই তিনি অন্যত্র যেতে চাইছেন।"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে ওলি বুলকে স্বামীজী লিখেছেন,—"ডাক্তার বসু আপনার মারফত যে 'নাসদীয় সূক্ত' পাঠিয়েছিলেন, আমি এখনি তার অনুবাদ পাঠাচ্ছি। অনুবাদটিকে যথাসম্ভব আক্ষরিক করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি ডাঃ বসু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।"

ওলি বুলকে লেখা ঐ বছরের ২৬শে জানুয়ারীর চিঠিতে স্বামীজী ডাঃ বসুর স্বাস্থ্যের সংবাদ জানতে চেয়েছেন।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনা পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্বীকৃতি পেলে স্বামীজী উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন—

"আজ ২৩শে অক্টোবর (১৮৯৯); কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ সমাগত সজ্জন-সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভাপ্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন, আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরী ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালি প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহা রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির—নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী-বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ দান করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু,—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী,—ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি!" [পরিব্রাজক]

বিবেকানন্দ—টলস্টয়

বিবেকানন্দ ও টলস্টয় সমসাময়িক কালের। টলস্টয় বিবেকানন্দের জীবনে ও রচনায় বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে আলেকজাণ্ডার শিফম্যানের এক রচনায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। রচনাটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল।—

"ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে টলস্টয় প্রাচীনকালের শঙ্করাচার্য এবং আধুনিক কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন করেন।...

"আধুনিক কালের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারা তিনি বিশদ পর্যালোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ ছিল। একথা জেনে টলস্টয়ের খুব ভালো লেগেছিল যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মগ্রহণ করেছিলেন গরিবের ঘরে এবং তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন জনগণেরই একজন। জনগণেরই মুখপাত্র হিসেবে তিনি মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটা টলস্টয়কে মুগ্ধ করে।

"টলস্টয়ের বিবেকানন্দ-অনুশীলন শুরু হয় ১৮৯৬ সালে। ঐ সময় তাঁর রোজনামচার এক স্থানে তিনি মন্তব্য লেখেন: ভারতীয় প্রজ্ঞার একখানি চমৎকার বই তিনি পড়েছেন। এই বইখানি হচ্ছে ১৮৯৫-৯৬ সালের শীতকালে নিউইয়র্কে বিবেকানন্দের বক্তৃতামালা।

"ভারতবাসীর অধ্যবসায় ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে ঐ ভারতীয় দার্শনিকের [বিবেকানন্দের] বক্তব্য এবং মানুষের জীবনের মহৎ ব্রত সম্পর্কে তাঁর সুন্দর উক্তির মধ্যে টলস্টয় প্রাচীন ভারতের মনীষীদের, বিশেষ করে বেদের বহুতর ধ্যানধারণারই প্রতিফলন দেখতে পান। এই সব চিন্তাধারার সঙ্গে টলস্টয় নিজেরও চিন্তাভাবনার যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করেন।

"বিবেকানন্দের দ্বিতীয় যে বইখানি টলস্টয় পড়েন তার নাম 'Speeches and Articles' (ইংরেজী ভাষায়)। ১৯০৭ সালে এই সঙ্কলন গ্রন্থখানি টলস্টয়কে পাঠান তাঁর বন্ধু আই. নাঝিভিন। টলস্টয় প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে লিখে জানালেন—'এই ধরনের বই পড়ে গভীর আনন্দ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষের মনের দিগন্ত আরও প্রসারিত ও অবারিত করে দেয়।'

"১৯০৮ সালে আই. নাঝিভিন 'Voices of the People' নামে একখানি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি প্রবন্ধ: 'Hymn of the people' ও 'God and man'। শেষোক্ত

প্রবন্ধটি টলস্টয়ের মনে গভীর রেখাপাত করে। বন্ধু নাঝিভিনকে এই চিঠিতে তিনি লিখে জানান: 'এই লেখাটা অদ্ভুত, অপূর্ব।' এই ভারতীয় দার্শনিকের ব্যক্তিত্বের প্রতি টলস্টয় গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইউরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের কার্যকলাপের সংবাদ তিনি সাগ্রহে পাঠ করতেন।

"১৯০৯ সালের মার্চ মাসে জনগণের পড়ার জন্য নতুন বইয়ের এক তালিকা তৈরী করতে গিয়ে টলস্টয় 'পোস্‌রেদ্‌নিক্‌' সংস্করণের ঐ পরিকল্পনায় 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উক্তি' নামক বইখানি অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ বছরেরই এপ্রিল মাসে প্রাচ্যবিদ এন, এইন্‌গর্ণকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান: 'বিবেকানন্দ আমার কাছে একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আমরা তাঁর রচনাবলীর একখানা সঙ্কলন-গ্রন্থ বার করবার আয়োজন করছি।' [গ্রন্থজগৎ, ডিসেম্বর ১৯৬০]

স্বামীজীর চিন্তার সঙ্গে নিজ চিন্তার যে ঐক্য টলস্টয় অনুভব করেছিলেন, সেই ঐক্য সমকালে অন্য ব্যক্তিদের কাছেও ধরা পড়েছিল। ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে 'Sunday Times'-এর প্রতিনিধি স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর প্রশ্নোত্তরের কিছু অংশ:—

'আপনার শিক্ষা কি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা?'

'সকলপ্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বলিলে বরং আমার প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্মসমূহের গৌণ অঙ্গগুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে যেটি মুখ্য, যেটি উহাদের মূল ভিত্তি, সেইটির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাজ। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য। তিনি একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ কোনো ধর্মকে কখনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না।...তিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিরূপে ঐগুলি অনুষ্ঠান করিয়া উপদিষ্ট ভাবগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি।...তাঁহার উপদেশের মূল সত্য এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। ...ভারত ঐ বিষয়ে [ধর্মাচরণে স্বাধীনতা বিষয়ে] শান্তি ও মৃদুতারূপ যথার্থ বীর্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি —এগুলি ধর্মজগতে দুর্বলতার চিহ্ন।'

'আপনার কথাগুলি টলস্টয়ের মতের মত লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই মত হয়ত অনুসরণীয় হইতে পারে,—সে সম্বন্ধেও আমার নিজের সন্দেহ আছে,—কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে চলা কিভাবে সম্ভব?'

'জাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্যকর হইতে দেখা যায়; ভারতের কর্মফল, ভারতের অদৃষ্ট, অপর জাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওয়া, কিন্তু আবার সময়ে ঐ সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জয় করা।...' ['বাণী ও রচনা,' নবম খণ্ড, পৃ—৪৩৯]

টলস্টয়ের আদর্শের সঙ্গে বিবেকানন্দের আদর্শের কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ঐক্য ছিল না। সুপ্ত ভারতকে জাগাতে বিবেকানন্দ যে সকল অগ্নিময় বাণী ভারতে বর্ষণ করেছিলেন, তার প্রভাবে বাংলায় ও ভারতে বিপ্লব আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনের সহিংস রূপ নাকি টলস্টয়কে পীড়িত করে এবং তিনি এর জন্য বিবেকানন্দকে পরোক্ষে দায়ী করেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, বিপ্লবী ডাঃ তারকনাথ দাস টলস্টয়কে ভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠির উত্তরেই টলস্টয়ের পুর্বোক্ত মনোভাব প্রকাশ পায়।—

"The letter was written by Dr. Taraknath Das who was then a student in the U. S. A. Tolstoi answered Das' letter regarding the freedom of India. But the former evaded the real question. He blamed Vivekananda and others for deflecting the countrymen of the Buddha and Krishna to not-nonviolent way! The letter of Tolstoi, through the kind intermidiation of American friends was published in 'Twentieth century' magazine from Newyork in 1912." [Swami Vivekananda—Patriot-prophet]

শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর 'তীর্থঙ্কর' গ্রন্থে রোমা রোলাঁর সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথনের বিবৃতি দিয়েছেন তাতেও বিবেকানন্দ-টলস্টয় প্রসঙ্গ আছে।—

"রোঁলা—'তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে দিলীপ, টলস্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল বিরুকফ, আরও অনেক সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ করে রুশ দেশে এমন আরও অনেক লোক আছেন।

"দিলীপ—এঁরা বিবেকানন্দের দ্বারা এতটা প্রভাবিত তা আমি জানতুম না, তবে টলস্টয় যে, শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তা আমি জানি। কারণ আমার এক বাঙালি বন্ধু টলস্টয়কে তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ে টলস্টয় তাঁকে লেখেন যে, এ যুগের মানুষ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক চিন্তায় এর উর্ধ্বে কখনও উঠেছে কি না সন্দেহ।

"রোলাঁ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'দিলীপ, তোমার সেই বন্ধুটিকে টলস্টয়ের সে চিঠিটির একটি নকল আমাকে পাঠাতে বলতে পারো? আমি শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখব কি না।"

টলস্টয়ের চিঠিটি এই—

Dear Sir,

I received your letter and the book and thank you very much for both.

The book is most remarkable and I have received much instruction from it…

So far humanity has frequently gone backwards from this true and lofty and clear conception of the principle of life but never surpassed it.

Yours etc.
Leo Tolstoi

বিবেকানন্দ—রকফেলার—টাটা

স্বামীজীর সঙ্গে বিখ্যাত আমেরিকান শিল্পপতি জন ডি রকফেলারের সংযোগের নিম্নলিখিত তথ্য পাচ্ছি শ্রীমতী লুই বার্কের গ্রন্থে—

"স্বামীজী তখন মিঃ 'এক্স'-এর চিকাগোর বাড়িতে ছিলেন। মিঃ 'এক্স,' জন ডি রকফেলারের সঙ্গে কোনো ব্যবসায়ের সূত্রে জড়িত ছিলেন। বহু সময়ই জন ডি রকফেলার তাঁর বন্ধুদের অপূর্ব অত্যাশ্চর্য হিন্দু সন্ন্যাসীর বিষয়ে কথা বলতে শুনেছিলেন, এবং বহু সময়ই স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল; কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি সকল সময়েই সাক্ষাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। সে সময়ে রকফেলার তাঁর সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠেননি, তবু তখনি তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী। এই দৃঢ়চেতা মানুষটিকে ইচ্ছামত নাড়ানো যেত না এবং উপদেশ শুনবার পাত্রই তিনি ছিলেন না।

"কিন্তু একদিন রকফেলার, স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের যদিও কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তবু কোনো একটা আকর্ষণে চালিত হয়ে বন্ধুর বাড়িতে সোজা চলে গেলেন এবং যে বাটলার দরজা খুলে দিল তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

"বাটলার স্বামীজীর অবস্থানকক্ষে তাঁকে নিয়ে গেলে বিনা ঘোষণায় রকফেলার সংলগ্ন পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লেন। এবং তিনি বিশেষ বিস্মিত হলেন, যখন দেখলেন, কে এসেছে তা দেখবার জন্য স্বামীজী লেখার টেবিল থেকে চোখ পর্যন্ত তুললেন না।

"কিছু পরে স্বামীজী, মাদাম কালভেকে যেমন বলেছিলেন, তেমনি রকফেলারকেও তাঁর অতীতের অনেক কথা বলে গেলেন, যা স্বয়ং রকফেলার ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, যে-টাকা তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন তার মালিক তিনি নন, তিনি নিমিত্ত মাত্র,—পৃথিবীর মঙ্গল করাই তাঁর কর্তব্য—ভগবান তাঁকে সম্পদ দিয়েছেন যাতে করে তিনি মানুষের সেবা ও সাহায্য করতে পারেন।

"রকফেলার বিরক্তিতে ও অস্বস্তিতে পড়লেন—তাঁর সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে, বা তাঁকে উপদেশ দিতে পারে, এমন সাহস! তিক্ত মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে বিদায়সম্ভাষণ পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আবার বিনা ঘোষণায় স্বামীজীর পাঠকক্ষে তিনি প্রবেশ করলেন এবং স্বামীজীকে পূর্ববৎ দেখে ডেস্কের উপরে একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন, যার মধ্যে জনহিতকর একটি প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থদানের পরিকল্পনা লিখিত আছে।

"আপনার কথামতই কাজ হয়েছে, খুশী হলেন তো! আশা করি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন,—রকফেলার বললেন।

"স্বামীজী চোখও তুললেন না, নড়লেনও না। তারপর কাগজটি নিয়ে শান্তভাবে পড়ে বললেন, আপনার আমাকেই ধন্যবাদ জানানো উচিত। —এইখানে শেষ। এবং এইটেই জনকল্যাণে রকফেলারের প্রথম বড় দান।"

উপরের ঘটনাটি স্বামীজীর জীবনীকার শ্রীমতী লুই বার্ক মাদাম কালভের বান্ধবী মাদাম ভার্ডিয়ারের (Verdier) জার্নাল থেকে সংগ্রহ করেছেন। ঘটনাটি বান্ধবীর কাছে মাদাম কালভে বলেছিলেন। ঘটনাটি বিবৃতি করার পরে শ্রীমতী বার্ক মন্তব্য করেছেন—

"পাঠকগণ যার যা ইচ্ছে অর্থ করতে পারেন। এই সময় থেকেই রকফেলারের বদান্যতার সুরু, এই তথ্য ছাড়া মুদ্রিত কোন বিবরণীতে পাওয়া যায় না যে, রকফেলার দানের ব্যাপারে স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অপরপক্ষে বলা যায়, ঘটনাটি এতই ব্যক্তিগত যে, শিল্পপতির জীবনীতে তার প্রবেশ আশাও করা যায় না। আমরা একথা জানি যে, রকফেলার নিজস্বভাবে ধর্মে আকৃষ্ট ছিলেন, এবং একবার, স্বামীজীর কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন তিনি তাঁর বিরাট দানের কারণ

ব্যাখ্যা করেছিলেন—'অর্থোপার্জন ছাড়াও জীবনের অন্য অর্থ আছে। অর্থ যেন ন্যাসস্বরূপ, অসৎভাবে তার ব্যবহারে পাপ হয়। নিজের জীবন-শেষের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হল অপরের জন্য বাঁচা। আমি সেই চেষ্টাই করছি।' (বি. এফ. উইঙ্কলম্যান রচিত জন ডি রকফেলার)।"

ভারতের শিল্পপতি ও দানবীর জামসেদজী টাটার সঙ্গেও স্বামীজীর পরিচয় ঘটেছিল। ১৮৯৩ সালে আমেরিকা যাত্রাপথে জাহাজে স্বামীজীর সঙ্গে জামসেদজী টাটার পরিচয় হয়। এ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

"সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে, এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।"

মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর যে পত্রের কথা বলেছেন, সে পত্র পত্রাবলীতে নেই। স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর জামসেদ টাটা স্বামীজীকে নিম্নের পত্র লেখেন—

প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ,

আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতের ধর্মাদর্শের পুনর্জাগরণ, এবং ধর্মপ্রেরণাকে ধ্বংস না করে যথাযোগ্য পথে চালিত করায় আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে।

ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন বা শুনেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি। আমার বিবেচনায়, যদি ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা আশ্রমজাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে মানবিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে, তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগ ও ধর্মাদর্শের উৎকৃষ্টতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্ম-সমরের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর এই অভিযানে বিবেকানন্দের অপেক্ষা বড় নায়ক

কে হবেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয় সুরুতে এ ব্যাপারে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য অগ্নিময় বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভাল করবেন। প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার আমার।

২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮, শ্রদ্ধানত, হে প্রিয় স্বামী, আপনার বিশ্বস্ত,
এসপ্ল্যানেড হাউস, বোম্বাই। জামসেদজী এন টাটা

স্বামীজী এই পত্রের কি উত্তর দিয়েছিলেন জানা যায় নি। স্বামীজীর প্রকাশিত পত্রে জনৈক মিঃ টাটার একবার উল্লেখ পাওয়া গেছে, তিনি এই টাটাই হবেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১, তিনি জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লিখেছেন—"মিঃ টাটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এবং তাঁকে খুব দৃঢ়চেতা ও সজ্জন বলে তোমার মনে হয়েছে জেনে বিশেষ খুশী হয়েছি।"

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা ও শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর আগ্রহ ছিল। শিল্প ও বিজ্ঞানের অধোগতিকে ভারতের পতনের অন্যতম কারণ বলে তিনি বিবেচনা করতেন। এ বিষয়ে স্বামীজীর অজস্র উক্তি আছে। সে সকলের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু চিকাগো ধর্মসভায় অবতীর্ণ হবার পূর্বে আমেরিকায় স্বামীজী এ বিষয়ে কি বলেছেন, জানা যায়। বিশেষতঃ জামসেদজী টাটার সঙ্গে আমেরিকার পথেই স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

আমেরিকা পৌঁছে সালেমে একটী ঘরোয়া সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন—

"The missionaries had fine theories there (in India)…but had done nothing for the industrial condition of the people." (Aug. 29. 1893).

"He said, Americans, instead of sending out missonaries to train them in religion, would better send someone out to give them industrial education." (Aug. 29. 1893)

আমেরিকা-ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন—

"The speaker explained his mission in his Country to be to organize monks for industrial purposes, that they might give the people the benefit of this industrial education and thus to elevate them and improve their condition." (Aug. 29. 1893)

দেখা যাচ্ছে, জামসেদজী টাটা আত্মত্যাগী যুবকদের বিজ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছে যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা স্বামীজীর ভাবধারা অনুযায়ীই, এবং টাটা তাঁর পত্রের প্রথম দিকে তা স্বীকারও করেছিলেন ।

বিবেকানন্দ—অশ্বিনীকুমার দত্ত

অশ্বিনীকুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসেছিলেন। কথামৃতে তার উল্লেখ আছে—

"শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিহারী ভাদুড়ীর পুত্রের সঙ্গে একটি থিয়জফিস্ট আনিয়াছেন।...

"ভবনাথ অশ্বিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে অশ্বিনীকে দেখাইয়া দিলেন। দুইজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আসিলেন। ঠাকুর অশ্বিনীকে বলিতেছেন, এরই নাম নরেন্দ্র।" [তৃতীয় খণ্ড। ১৮৮৫, ২২শে মে]

অশ্বিনীকুমার নিজে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের বিবরণ লিখে পাঠিয়েছিলেন শ্রীম'র কাছে। কথামৃতের প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে যুক্ত সেই বিবরণে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ নিম্নোক্ত প্রকার,—

"ঠাকুর বললেন,—তুমি নরেন্দ্রকে চেনো ?

আমি—আজ্ঞা, না।

ঠাকুর—আমার বড় ইচ্ছা, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়। সে বি. এ. পাস দিয়েছে, বিয়ে করেনি।

আমি—যে আজ্ঞা, আলাপ করব।

ঠাকুর—আজ রাম দত্তর বাড়ি কীর্তন হবে। সেইখানে দেখা হবে। সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও।

আমি—যে আজ্ঞা।

ঠাকুর—যাবে ত ? যেও কিন্তু।

আমি—আপনার হুকুম হল, তা মানবো না ? অবশ্য যাব।...

সেদিন সন্ধ্যার সময় রামবাবুর বাড়ি গেলাম। নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হল। ঠাকুর একটি কামরায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন। নরেন্দ্র তাঁর ডান পাশে। আমি সম্মুখে। নরেন্দ্রকে আমার সহিত আলাপ করতে বললেন।

নরেন্দ্র বললেন, আজ আমার বড় মাথা ধরেছে, কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি বললাম, থাক আর একদিন আলাপ হবে।

সেই আলাপ হয় ১৮৯৭ সনের মে কি জুন মাসে, আলমোড়ায়।

ঠাকুরের ইচ্ছা তো পূর্ণ হতেই হবে, তাই ১২ বছর পরে পূর্ণ হল। আহা! সেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আলমোড়ায় কটা দিন কত আনন্দেই কাটিয়ে ছিলাম। কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও আমার বাড়ীতে, আর একদিন নির্জনে তাঁকে নিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গে। আর তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করতেই সে বারের দেখা।"

অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগের' পরিশিষ্টে আলমোড়ায় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা আছে—

"স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়া গিয়াছেন, অশ্বিনীকুমারও তখন সেখানে। স্বামীজীর দ্বারে আসিয়া এক যুবক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত আছেন? দেখা করিব।' সাধুটি উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ এখানে কেহ নাই।' কিন্তু সমজদার স্বামীজী কৌতূহলী হইয়া ভিতর হইতে তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আছেন, আসুন'। অশ্বিনীকুমার নিজ নাম বলিলেন, নিবিড় আলিঙ্গন হইল। তখন স্বামীজীর এক আমেরিকান শিষ্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁর পায়ের বুট জুতাটি খুলিয়া দিতেছেন। ঠাকুর যে আলাপ করিতে বলিয়াছিলেন, মাথা ধরার জন্য তাহা হইল না, আশ্চর্য, স্বামীজীর সেই কথাটিও মনে আছে। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, 'আমি ঠাকুরের নরেনের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছি। একটি কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, মাদ্রাজে একজন আপনাকে 'pariah' (অস্পৃশ্য) বলিয়াছিল, আপনি তাহাকে 'pariah of pariahs' বলিয়াছেন, ইহা কি সত্য!'

স্বামীজী—'হ্যাঁ সত্য, কিন্তু আমি কি কখনো বলিয়াছি যে, একথাটা বলা আমার ঠিক হইয়াছে?' অশ্বিনীকুমার যুক্তকরে বলিলেন, 'আজ আমি আমেরিকাবিজয়ী ঠাকুরের খাঁটি নরেন্দ্রনাথকে (মানবশ্রেষ্ঠ) দেখিলাম, ঠাকুরের পায়ে আবার আমার সহস্র প্রণাম।"

বিবেকানন্দ-অশ্বিনীকুমার সাক্ষাতের উপরিউদ্ধৃত বিবরণ অপেক্ষা বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায় স্বামীজীর অদ্বৈত আশ্রমের ইংরাজী জীবনীতে। তার প্রয়োজনীয় অংশ—

অশ্বিনীকুমার আলমোড়ায় একদিন তাঁর পাচকের কাছ থেকে শুনলেন, সহরে একজন অদ্ভুত সাধু এসেছেন, যিনি ইংরেজি বলেন, ঘোড়ায় চড়েন, ভাবে মনে হয় মহারাজা। সেই সাধু যে, 'সৈনিক সন্ন্যাসী' বিবেকানন্দ ভিন্ন আর কেউ নন তা

বুঝে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অশ্বিনীকুমার বের হলেন। কেউ তাঁকে 'স্বামী বিবেকানন্দের' সন্ধান দিতে পারল না, কিন্তু যখন তিনি 'বাঙালী সাধুর' কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন একজন পথচারী বলল, 'আপনি ঘোড়সওয়ার সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করছেন? ঐ তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসছেন, তাঁর বাড়ি ঐখানে।' অশ্বিনীকুমার দূর থেকে দেখলেন, গৈরিক পরিহিত সন্ন্যাসী বাংলো গেটে উপস্থিত হতে একজন ইংরেজ গেট খুলে তাঁর ঘোড়ার মুখ ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং স্বামীজী নেমে পড়ে ঢুকে গেলেন।

অশ্বিনীকুমার ঐ বাংলোয় পৌঁছবার পরে যুবক সাধুর সঙ্গে তাঁর কি ধরনের কথা হয়েছিল তা উল্লিখিত হয়েছে পূর্বেই। অশ্বিনীকুমার 'পরমহংসদেবের নরেন্দ্রকে' দেখতে এসেছিলেন এবং সেই নরেন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন পরম আহ্লাদে। শুধু তাই নয়—

"যখন অশ্বিনীবাবু তাঁকে 'স্বামীজী' বলে সম্বোধন করলেন, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, সেকি, আপনার কাছে কখন আবার 'স্বামী' হয়ে উঠলুম? আমি এখনও সেই একই 'নরেন্দ্র'। ঠাকুর যে নামে আমাকে ডাকতেন তা আমার কাছে পরম সম্পদ। ঐ নামেই আমাকে ডাকবেন।

"অশ্বিনীবাবু—আপনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, লক্ষ লক্ষ প্রাণকে আধ্যাত্মিকায় সঞ্জীবিত করেছেন, আপনি আমাকে বলতে পারেন, ভারতের মুক্তির উপায় কি?"

"স্বামীজী—ঠাকুরের কাছ থেকে আপনি যা শুনেছেন তার বেশী কিছু বলবার নেই। ধর্ম আমাদের সর্বস্ব, সকল সংস্কারকার্যকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে ধর্মের ভিতর দিয়েই তাকে আসতে হবে। উল্টো কিছু করার মানে গঙ্গাকে হিমালয়ে ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাকে নূতন খাতে প্রবাহিত হতে বলা।

"অশ্বিনীবাবু—কংগ্রেসের কাজকর্মে কি আপনার কোনো আস্থা নেই?

"স্বামীজী—না, তা নেই। তবে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। ঘুমন্ত জাতিকে সর্বদিক দিয়ে ঠেলে জাগাবার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু বলতে পারেন, কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কি করেছে? আপনি কি মনে করেন, কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে? তাতে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম জাগাতে হবে জনসাধারণকে। গোড়ায় তাদের পেটপুরে খেতে দেওয়া হোক, তাহলেই তারা নিজেদের মুক্তির পথ করে নেবে। যদি কংগ্রেস তাদের জন্য কিছু করে তবেই কংগ্রেস আমার সহানুভূতি পাবে। সেই সঙ্গে আমাদের ইংরেজদের গুণগুলোও আত্মসাৎ করতে হবে।

"অশ্বিনীবাবু—'ধর্ম' বলতে কি আপনি কোনে বিশেষ পথ বোঝাতে চাইছেন?

"স্বামীজী—ঠাকুর কি কোনো বিশেষ পথের কথা প্রচার করে গেছেন? তিনি সর্বাত্মক সমন্বয়ের ধর্মরূপে বেদান্তকে প্রচার করেছেন। আমিও তাই করি। আমার ধর্মের সার কথা কিন্তু শক্তি। যে ধর্ম হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করে না, তা আমার কাছে ধর্মই নয়—তা উপনিষদের, গীতার কিংবা ভাগবতের, যারই হোক না কেন। শক্তিই ধর্ম, শক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।

"অশ্বিনীবাবু—আমাকে কিছু কর্তব্যের কথা বলুন।

"স্বামীজী—শুনেছি আপনি শিক্ষাদান নিয়ে আছেন। সেটাই আসল কাজ। আপনার মধ্যে বিরাট শক্তি কাজ করছে, আর জ্ঞানদানের চেয়ে বড় কি আছে! কিন্তু দেখবেন, জনসাধারণ যেন মানুষ-গড়ার শিক্ষা পায়। তারপর প্রয়োজন চরিত্রের। আপনার ছাত্রদের চরিত্রকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন। বাঙালী যুবকদের হাড় থেকে তৈরী বজ্রে ভারতের দাসত্ব চূর্ণ হবে। আপনি আমাকে কয়েকটা তৈরী ছেলে দিতে পারেন? তাহলে পৃথিবীকে একটি নাড়া দিয়ে যেতে পারি।

"আর যেখানেই শুনবেন রাধাকৃষ্ণের কীর্তন চলেছে সেখানেই ডাইনে বায়ে চাবকাবেন। সারা জাতটা পচে ধ্বসে গেল! যাদের এতটুকু আত্মসংযম নেই, তারা কি না এই সব গানে মাতে? উচ্চ আদর্শের পক্ষে সামান্যতম অপবিত্রতাও বিরাট বাধা। ছেলেমি নাকি? অনেক নেচেছি কুঁদেছি, কিছু সময়ের জন্য তাতে খ্যামা দিলে ক্ষতি নেই। এখন জাতটা শক্তি নিয়ে গড়ে উঠুক।

"আর আপনারা যান অস্পৃশ্য, মুচি, মেথরদের কাছে; তাদের গিয়ে বলুন, তোমরাই জাতের প্রাণ, তোমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা দুনিয়াকে ওলট-পালট করে দিতে পারবে। জাগ তোমরা, বাঁধন ছিঁড়ে ফেল, সারা জগৎ তোমাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে স্কুল বসান, তাদের সকলের গলায় ব্রাহ্মণের পৈতে ঝুলিয়ে দিন।"

বিবেকানন্দ—গান্ধী

স্বামীজী প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন—

"ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পরে আমার পক্ষে বিবেকানন্দকে না দেখে তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মহা উৎসাহে প্রায় সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। মঠের নিস্তব্ধ পরিবেশ আমার খুব ভাল লেগেছিল। স্বামীজী

তখন অসুস্থ হয়ে কলকাতার বাড়িতে আছেন, এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয় একথা জেনে আমি অত্যন্ত নিরাশ ও দুঃখিত হয়েছিলাম।" [আত্মচরিত]

পরবর্তী কবি, মনীষী ও নেতৃবৃন্দের উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব প্রসঙ্গে রোমা রোলাঁ লিখেছেন—

"এই 'মহত্তর ভারত, এই নূতনতর ভারত……রামকৃষ্ণের আত্মায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পরমহংসের, এবং যে বীর পরমহংসের চিন্তাকে কর্মে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যুগল নক্ষত্র বর্তমান ভারতকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। তাঁহাদের উষ্ণ জ্যোতি ভারতের মৃত্তিকার মধ্যে ময়ানের মত কাজ করিয়া তাহাকে উর্বর করিতেছে। ভারতের বর্তমান নেতারা,—মনীষীদের রাজা, কবিদের রাজা ও মহাত্মা,—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী,—এই রাজহংস ও ঈগলের যুগ্ম নক্ষত্রের আলোকে বিকশিত, কুসুমিত ও ফলভারাক্রান্ত হইয়াছেন। অরবিন্দ এবং গান্ধী প্রকাশ্যে একথা স্বীকারও করিয়াছেন।

"গান্ধী প্রকাশ্যভাবেই একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবেকানন্দের রচনাগুলি হইতে তিনি প্রচুর সাহায্য পাইয়াছেন। এবং ভারতবর্ষকে আরও ভালবাসিতে ও আরও ভাল করিয়া বুঝিতে সেগুলি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। তিনি 'রামকৃষ্ণের জীবন' পুস্তকের একটি ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের স্মৃতিবার্ষিকী উৎসবের কয়েকটিতে যোগও দিয়াছিলেন।"

গান্ধীজী স্বামীজীর রচনা সম্বন্ধে বলেছেন—

"Surely Swami Vivekananda's writings need no introduction from anybody. They make their own irresistible appeal."

রোমা রোলাঁ গান্ধীজীর যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উক্তির উল্লেখ করেছেন, তার রূপ এই—

"I have come here (Belur) to pay my homage and respect to the revered memory of Swami Vivekananda, whose birthday is being celebrated today (1923). I have gone though his work very thoroughly and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousand-fold. I ask you young men, not to go away empty handed without imbibing

something of the spirit of the place where Swami Vivekananda lived and died."

বিবেকানন্দ ও বর্তমান বাংলা

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কলিঙ্গনাথ রায়

স্বামী বিবেকানন্দের মত অসাধারণ প্রতিভাশালী মনস্বী বাংলাদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এই কথা বলিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হইবে না। সুতরাং বর্তমান বাংলাদেশের তিনটি প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একবার অবহিত চোখে প্রণিধান করা কর্তব্য।

(১) হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা

প্রথমতঃ আমরা হিন্দু মুসলমানের মিলনসমস্যার কথা বলিব। আজ বাংলাদেশে শতকরা ৫৫ জনের অধিক ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। অতএব হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন ব্যতীত "স্বরাজ" লাভের আশা সুদূরপরাহত।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ কোন স্থানে বিশেষভাবে কোন আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তবে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর আলমোড়া হইতে নৈনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে স্বামীজী একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহাতে স্বামীজী যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যে, আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে হয়ত তাঁহাকে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূতরূপে দেখিতে পাইতাম। এই চিঠিখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, উদারচেতা স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়টা কত বিশাল ছিল,—তিনি সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে কত সব সুখস্বপ্নে বিভোর থাকিতেন।

"যদি কোন যুগে কোন ধর্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে, প্রকাশ্যরূপে সাম্যের সমীপবর্তী হইয়া থাকেন তবে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী।

"আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বেদান্তের মত যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই।" "আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও

ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই একমাত্র আশা।" "আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ লইয়া ভবিষ্যৎ ভারত গৌরব-মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক মস্তিষ্ক, এই দ্বিবিধ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, ঐ আদর্শের বিকাশ সাধন করিয়া, ভারতবাসী কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে।"

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর মতবাদ কিরূপ হইত তাহার আভাস আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রখানির মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে পাইতেছি। একথা বলিলাম এইজন্য যে, বাংলাদেশের তথাচ সমস্ত ভারতবর্ষের এইরূপ একটি বিরাট সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজী একেবারে নীরব থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না—তবে বিবেকানন্দের সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ এবং প্রতিযোগিতা এরূপ প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই,—ভারতের রাজনৈতিক গগনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্যাও তাই এত ঘনঘটায় আবির্ভূত হয় নাই। আর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রথম ব্রত ছিল মৃতকল্প হিন্দু-ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা—ভেদাভেদজ্ঞানে জর্জরিত সংকীর্ণ হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে সংগঠিত করা। যাহা হৌক, এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের কথা ১৩৩১ সালের মাঘ মাসের "বঙ্গবাণীতে" প্রকাশিত "মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে—সুতরাং এখানে সে সব কথা পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তবে এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ না করিলে স্বামীজীর উপর অবিচার করা হইবে। Orphanage বা অনাথ আশ্রমে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল ধর্মের লোককে অকুণ্ঠিতচিত্তে আশ্রয় দিতে স্বামীজী রাজী ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর মারি হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত চিঠিতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, অনাথ আশ্রমে "মুসলমান বালককেও লইতে হইবে বৈকি।" কিন্তু স্বামীজী অখণ্ডানন্দকে আবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, মুসলমান বালকদের "ধর্ম নষ্ট করিও না। তাহাদের খাওয়াদাওয়া আলাদা করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম— জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলিয়ে রাখ।"

এই উক্তি হইতেই আমরা বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। হিন্দু মুসলমানের মিলনের মূর্ত অবতার যুগপ্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীর বিশাল হৃদয়েরই মতন সুপ্রশস্ত ছিল স্বামীজীর উদার হৃদয়টা। স্বামীজী অখণ্ডানন্দকে লিখিয়াছেন যে, ভগবান প্রেমরূপে সর্বভূতে প্রকাশমান—"আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজা হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাতড়া এখন কিছুদিন শান্তিলাভ করুক—প্রত্যক্ষ

ভগবান্ দয়া প্রেমের পুজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ অভীঃ। লোক না পোক! হিন্দু, মুসলমান, ক্রুশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগা হয় আর ধর্মের সাধারণ যে সার্বজনীন ভাব, তাই শিখাইবে।" আর স্বামীজীর Missionই ছিল "অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষা-ভূষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য।"

(২) অন্ন-সমস্যা

বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্রের সময় বাংলাদেশে সে কি ধর্মোন্মাদের যুগ গিয়াছে! তখন দেশময় একটা নবীন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রাণের সে কি আবেগ! আশা উৎসাহে দেশময় যেন একটা আনন্দ-স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। সে অদম্য উদ্যম, সে জলন্ত উৎসাহ আজ আর নাই।

কিন্তু সেই 'ধর্মোন্মাদের যুগে'ও ধর্মপ্রচারক বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, অন্নসমস্যা আমাদের দেশে একটা মহা সমস্যা। তিনি বলিয়াছেন যে "চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার একমাত্র কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই এত ভয়ানক যে তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।"

মনে পড়ে চিকাগো ধর্মসভায় ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারাভিলাষী মিশনারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী ভাতের—এক মুঠি অন্নের কাঙ্গাল—ধর্মের কাঙ্গাল নহে, তাহাদের ক্ষুধার্ত মুখে আজ অন্ন প্রদান করিতে হইবে। কারণ, "ক্ষুধার্ত লোকদিগকে ধর্মের কথা বলা, বা তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়াছেন যে, সাধারণ কুলিমজুরও প্রতিদিন ৯।১০ টাকা রোজগার করে, আর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে অর্ধাশনে দিনপাত করে। তাই স্বামীজী বলিতেন যে—"যে জাত সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না,—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করে, সে জাতের আবার বড়াই। ধর্ম-কর্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ।"

এবং এইজন্যই বোধ হয় আমেরিকায় ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, "বিবেকানন্দের কোন ধর্ম নাই—যত দিন পর্যন্ত ভারতের একটি বিড়াল, একটি কুকুর পর্যন্ত অনাহারে থাকিবে, ততদিন বিবেকানন্দের কোন ধর্ম নাই।" স্বামীজী অতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"যে-ধর্ম যে-ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃ-

হীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" "যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না ; মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম ? যারা এক টুকরা রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে !"

আমাদের দারুণ অন্নকষ্ট দেখিয়া মর্মবেদনা লুকাইতে না পারিয়া কত গভীর ক্ষোভেই না স্বামীজী বলিতেন যে—"অন্ন, অন্ন, যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।" স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্রই এই ছিল যে, "ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হৌন, সন্ন্যাসীই হৌন, আর যিনিই হৌন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার, এক বিন্দুও যাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে।" আমাদের "পুরোহিতদের" উপরে স্বামীজী হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। "প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ, মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব, আগে তাদের নির্মূল কর।" স্বামীজী আর একস্থানে বলিয়াছেন যে,—"দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজে প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল, তাতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন কষ্ট পাচ্ছে।"

(৩) "সমাজ-সমস্যা"

তাই স্বামীজীর মত ছিল যে, সকলকে সমান "opportunity", সুযোগ বা সুবিধা দাও—কাহাকেও পায়ের তলে চাপিয়া রাখিও না। তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে, "জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারাই করিয়াছেন।" স্বামীজী জানিতেন যে, আমাদের এই জাতিভেদ একটি সামাজিক বিধানমাত্র—ধর্মের সঙ্গে জাতির বড় একটা সম্পর্কই নাই অর্থাৎ জাতিভেদ ধর্মবিধান নহে। এবং জাতি "এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নিদিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা উহার কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে।" এবং হিন্দুসমাজ হইতে এই "পচা দুর্গন্ধ" দূর করিবার জন্য লোকের "সামাজিক সত্ত্বুদ্ধি" জাগরিত করিতে আমরণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত, তথাকথিত পৌত্তলিক মৃতকল্প হিন্দুধর্মের ভিতর, স্বামী বিবেকানন্দ শক্তি-সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে চাহিয়া-

ছিলেন—সঙ্কীর্ণ, অনুদার, অস্পৃশ্যতা ও ভেদাভেদজ্ঞানে জর্জরিত হিন্দুসমাজে অদ্বৈতবাদের সাম্যমন্ত্র প্রচার করিয়া, উক্ত সমাজকে উদারতা এবং একতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্বামীজীর গ্রন্থাবলী—বিশেষতঃ "পত্রাবলী", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য", "ভারতে বিবেকানন্দ" এবং "স্বামী-শিষ্য সংবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই মহাপ্রাণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এইরূপই ধারণা জন্মিয়াছে। "বিবেকানন্দ সাহিত্যের" সহিত যাঁহারা একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দাবি রাখেন, তাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবেন যে, আমাদের এই প্রকার ধারণা একেবারে অমূলক নয়।

বিবেকানন্দের পরে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হিন্দুধর্মের নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিয়া "উলট-পালট" করিয়াছেন। কিন্তু লম্বা লম্বা টিকিওয়ালা, ক্ষুদ্রচিত্ত আধুনিক পণ্ডিতদের মত স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক ব্যাখ্যার বুজরুকিতে কিংবা "মাইর প্যাঁচে" বড় বেশী আস্থাবান ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অসামান্য তেজস্বী পুরুষ, অনন্ত শক্তির আধার "বিগতভীঃ" বৈদান্তিক—ভণ্ডামি ন্যাকামি, কিম্বা অন্য কোন রকম দুর্বলতা তাঁহার ধাতে সইত না। বিবেকানন্দের প্রাণটা ছিল খুব বড়, হৃদয়টা ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত—গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডূকতা বিবেকানন্দ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। অলৌকিক প্রতিভাশালী আচার্য শঙ্করের অনুদার মতের নিমিত্ত স্বামীজী শঙ্করাচার্যকেও ক্ষমা করেন নাই। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে—"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।" "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" বলার দরুণ শঙ্করকে স্বামীজী অগভীর-হৃদয় বলিতেও কসুর করেন নাই। "ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, বেদান্তভাষ্যে শঙ্কর একথা সমর্থন করেছেন—তাঁর উদারতাটা অগভীর—হৃদয়টাও ঐরূপ।" স্বামী বিবেকানন্দ একস্থলে বলিয়াছেন যে,—"উপনিষদ লিখেছিল কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারীর, সকল জাতির, সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন, আর ব্যাস গরীব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য স্বকপোলকল্পিত অর্থ করেছেন।"

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের বড় উদার ভাব, মহান্ উচ্চ আদর্শের জন্য তাঁহার নিকটে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতে হয়। অধঃপতিত, দরিদ্র, পদদলিত, ইতর, অস্পৃশ্য জাতিদের উদ্ধার-প্রচেষ্টায়ও আমরা বিবেকানন্দের বিশাল হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

মহাত্মা গান্ধীর মত স্বামী বিবেকানন্দও জানিতেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম কোন জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে না, কিম্বা করিতে পারে-না। তাই তিনি চিকাগোর "সর্বধর্ম মহাসমিতিতে" সগর্বে বলিয়াছিলেন যে—"যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী Exclusion অর্থাৎ হেয় বা পরিত্যাজ্য শব্দটি কোনমতে অনুবাদিত হইতে পারে না, আমি সেই ধর্মভুক্ত।"

স্বামীজী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—"হিন্দুধর্ম ত শিখাইতেছে, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র।" অথচ বর্তমান হিন্দুসমাজ আজ সংকীর্ণতা, অনুদারতা অস্পৃশ্যতা, ও ভেদাভেদজ্ঞানে জর্জরিত। ইহার কারণ কি? সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, স্বামীজী বলেন যে, কেবল ঐ তত্ত্বকে কার্যে পরিণত না করা—সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", ভগবান "সর্বভূতান্তরাত্মা"—অদ্বৈত তত্ত্বের এই সমস্ত উচ্চতম জ্ঞানের কথা হিন্দুসমাজে কার্যে পরিণত হইল না, তাই হিন্দুসমাজ "যেই তিমিরে সেই তিমিরে"ই রহিয়া গেল। গীতা ও উপনিষদের জটিল তুরীয় আদর্শবাদ—শঙ্করের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ত মুষ্টিমেয়—Microscopic minority, কোটী কোটী লোকের কাছে উহা আজ অর্থহীন—উহার কোন মূল্য নাই বলিলেও চলে—তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে ঐ বেদান্ত দর্শনের বা Transcendental Philosophy-এর বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। আমাদের কথা অলীক, অত্যুক্তি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না—কয়জন লোক Practical life বা ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃত ধর্মের ধার ধারে? স্বামী বিবেকানন্দের কথায় "দেশশুদ্ধ লোক শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করেছে—কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে।" *

তাই সংকীর্ণ হিন্দুসমাজে আজ এই অসংখ্য জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়ি। স্বামী বিবেকানন্দ ভালমত জানিতেন যে, ব্যবহারিক অদ্বৈতবাদ হিন্দুদের মধ্যে কস্মিনকালেও বিকাশ লাভ করে নাই। "Practical Advaitism was never developed among the Hindus." এই প্র্যাক্‌টিকাল অদ্বৈতবাদই সর্বত্র সর্বভূতে সমদর্শী—মানুষকে আপনার আত্মার ন্যায় সকল প্রাণীর প্রতি ব্যবহার

* "তাই হিন্দুর ধর্ম আজ বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই, ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞান মার্গেও নয়,—ছুঁৎমার্গে, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, ব্যস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে নাকি?......যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease, সাবধান।"—পত্রাবলী।"

করিতে শিক্ষা দেয়। এবং বৈদান্তিক বিবেকানন্দ এই অদ্বৈতবাদকে হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে কার্যে পরিণত করিতে আমরণ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ স্বামীজীর মতে, এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াই আমরা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতি ও প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারি। "Adviatism is the only position from which one can look upon all religions and sects with love."

তাই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজে প্রচার করিয়াছেন যে, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" "দরিদ্র পদদলিত অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হোক।"* স্বামীজী আরও জানিতেন যে, যদি "Lower classদের education দিতে পারা যায়, তাহলে ভারতের মুক্তির উপায় হতে পারে—তাই আমাদের বাড়ির চতুর্দিকে ঐ যে "পশুবৎ হাড়ি ডোম" তাহাদের উন্নতির জন্য স্বামীজী "সেবাধর্মের" প্রবর্তন করিয়াছিলেন—ইতর অস্পৃশ্য অজ্ঞ মুচি মেথর মুদ্দফরাস এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত জাতিদের মঙ্গল কামনায় "রামকৃষ্ণ মিশনের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আমাদের হিন্দু সমাজে গলদের অন্ত নাই। সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা প্রতিপদে, শুধু দলাদলি ; এবং আমাদের দলাদলির, ভেদাভেদের মূলে শুধু গোঁড়ামি—সঙ্কীর্ণতা। আমাদের হৃদয়ে বড় ভাব আসে না—আমরা যেন "অচলায়তনে"র সঙ্কীর্ণ গণ্ডী-বেষ্টিত—তাই বোধ হয় স্বামীজী আমাদের "কূপমণ্ডূক" বলিতেন। † স্বামীজী যথার্থই বলিয়াছেন যে "সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে, তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব।" চিকাগোর ধর্মসভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কুসংস্কার মনুষ্যের শত্রু বটে, কিন্তু সংকীর্ণতা তদপেক্ষা ঘোরতর শত্রু।"

আমেরিকায় বসিয়া স্বামীজী যখনই দেশের কথা ভাবিয়াছেন তখনই তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। "ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি। তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই, তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে। কিন্তু তাহারা জানে না কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে, তাহারাও যে মানুষ ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।"

* "The poor, the down-Trodden, the ignorant, let these be your God."

† "দলাদলি দলবাঁধা কূপমণ্ডূকের মধ্যে আমি নাই, আর আমি যেথায় থাকি।"—পত্রাবলী

"আমেরিকার যে কেহ জন্মিয়াছে সেই জানে আমি একজন মানুষ। ভারতে যে কেহ জন্মায় সেই জানে যে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র।" "যদি কারও আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার!" "এ দেশের (আমেরিকার) সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, opportunities আছে, আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, জগৎমান্য হবে।…হে ভগবান, আমরা কি মানুষ, ঐ যে পশুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দিবার জন্য কি করেছ বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে আমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, ছুঁয়োনা —আমায় ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছি? এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা।"

নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি-মেথর স্বামীজীর রক্ত ছিল, তাঁহার ভাই ছিল—স্বামীজী দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন যে, ভারতের তথাকথিত অস্পৃশ্য নীচজাতিরা আপনাদের জন্মগত অধিকার দাবি করিবে; এবং আমরা উচ্চ জাতিরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের উপর এতদিন অত্যাচার করিয়াছি, এখন এরা তাহার প্রতিশোধ নিবে—"তোরা হা চাকরি, হা চাকরি করে লোপ পেয়ে যাবি।"

কত গভীর দুঃখেই না স্বামীজী বলিতেন যে, "দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী।" কিন্তু শক্তিমন্ত্র প্রচারক "মঙ্গলবাদী" বিবেকানন্দ ত কিছুতেই দমিবার পাত্র ছিলেন না। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা আজ সঙ্কীর্ণ, দুর্বলচিত্ত, ধ্বংসোন্মুখ।—দলাদলি ও ভেদাভেদজ্ঞানে জর্জরিত সমাজের চিত্র তাঁহাকে যার-পর-নাই বেদনা দিত বটে কিন্তু তিনি তাঁহার কল্পনা নেত্রে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইতেন। দুর্বল ভীরু কাপুরুষ পরপদলেহী পরমুখাপেক্ষী আমরা—তাই আমাদের লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তারস্বরে বলিয়াছেন যে,—"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ-ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি খেয়ে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে

না ; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই।" [বঙ্গবাণী, ভাদ্র, ১৩৩২]

[এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হিন্দুমুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করেছেন। এই 'সমস্যা' সম্বন্ধে স্বামীজী বেশী কথা না বললেও, বিশ্ব-ইতিহাসে ইসলাম ও তার প্রবর্তকের স্থান এবং ভারতবর্ষে ইসলাম-শাসন সম্বন্ধে বহু কথা বলে গেছেন। ব্যক্তিজীবনেও বহু মুসলমানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর মহান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম-সাধনা করেছিলেন—তা সর্বসময় তাঁর মনে জাগরূক ছিল। স্বামীজীর রচনাবলীতে ইসলাম-প্রসঙ্গ অল্প নয়। তা ছাড়া ভগিনী নিবেদিতার রচনা এবং ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথায় ইসলাম-সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর সুগভীর অনুরাগের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।—সম্পাদকীয় টীকা।]

১৫ই মার্চ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালোরে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ—

"পূর্ববর্তী বক্তা চিকাগোর মহান ধর্মমহাসভার উল্লেখ করেছেন। ঐ বিষয়ে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বর্তমান কালের ভয়াবহ ম্যাকসিম-কামানের আবিষ্কর্তা হিরাম ম্যাকসিম স্বামীজীর অধিকাংশ বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে, প্রাচ্যভূমি থেকে যে সকল প্রচারক গিয়েছিলেন, তাঁদের কেউই গৈরিক পরিহিত মহান ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হননি। তিনি ইহবাদী আমেরিকান জগতকে যেন প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকানরা এখন যন্ত্রসভ্যতায় প্রচুর এগিয়ে গেছে, তাদের প্রগতির সীমা নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে দাঁড়িয়েছেন। অনেকেই জানেন, আমেরিকা এমার্সনের মত মহাঋষির জন্ম দিয়েছে। আজ থেকে বহুদিন আগে এমার্সন প্রাচ্য সাহিত্য পড়েছিলেন। তিনি আমেরিকানদের কাছে সর্বেশ্বরবাদ এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। এমন সব লক্ষণ আছে যা থেকে বোঝা যায় আমেরিকানরা অনেকেই তাদের প্রগতির বর্তমান রূপে তৃপ্ত নয়। এমন চিন্তার ও মনের সঙ্কটক্ষণেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অদ্বৈতদর্শন প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা মুছে যাবার বস্তু নয়।"

বিবেকানন্দ—ম্যাকসিম—টেসলা

আচার্য রায় বৈজ্ঞানিক হিরাম ম্যাকসিমের উল্লেখ করেছেন। ম্যাকসিমের সঙ্গে স্বামীজীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। ম্যাকসিম স্বামীজীর সম্বন্ধে একবার এই কথাগুলি লিখেছিলেন—

"A few years ago there was a Congress of Religions at Chicago. Many said that such a thing would be impossible. How could any understanding be arrived at where each particular party was absolutely right and all the others were completely in the wrong? Still the Congress saved the American people more than a million dollars a year, not to mention many lives abroad. And this was all brought about by one brave and honest man. when it was announced in calcutta (?) that, there was to be a Congress of Religions at Chicago, some of the rich merchants took the Americans at their word, and sent them a······monk, Vivekananda, from the oldest monastery in the world. This monk was of commanding presence and vast learning, speaking English like a Webster. The American Protestants, who vastly outnumbered all others, imagined that they would have an easy task, and commenced proceedings with the greatest confidence, and with the air of "Just see me wipe you out". However, what they had to say was the old commonplace twaddle that had been mouthed over and over again in every little hamlet fram Nova Scotia to California. It interested no one, and no one noticed it.

"When, however, Vivekananda spoke, they saw that they had a Napoleon to deal with. His first speech was no less than a revelation. Every word was eagerly taken down by the reporters, and telegraphed all over the country, when it appeared in thousands of papers. Vivekananda became the lion of the day. He soon had an immence following. No hall could hold the people who flocked to hear him lecture. They had been sending silly girls and half-educated simpletons of men, and millions of dollars to Asia for years, to convert the poor benighted heathen and save his alleged soul; and here was a specimen of the unsaved who knew more of philosophy

and religion then all the persons and missionaries in the whole country. Religion was presentd in an agreeable light for the first time to them. There was more in it than they had ever dreamed ; argument was impossible. He played with the persons as a cat plays with a mouse. They were in a state of consternation. What could they do ? What did they do ? What they always do—they denounced him as an agent of the devil. But the deed was done ; he had sow the seed, and the Americans commenced to think. They said to themselves : "Shall we waste our money in sending missionaries who know nothing of religion, as compared with this man, to teach such men as he ? No !" And the missionary income fell off more than a million dollars a year in consequence."—

Li Hung Ghang's Scrap Book : by Sir Hiram Stevens Maxim. Foreword, pp. XXIII—XXIV. London, Watts & Co., 1913, *Prabuddha Bharata*, 1910

স্বামীজীও ম্যাকসিমের কথা কিছু লিখেছেন—

"প্যারিস নগরী হতে বন্ধুবর ম্যাকসিম নানাস্থানে চিঠিপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা যায়। ম্যাকসিম—বিখ্যাত 'ম্যাকসিম গানের' নির্মাতা,—যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে,—আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে—বিরাম নাই। ম্যাকসিম আদতে আমেরিকান ; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি—। ম্যাকসিম তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া ?' ম্যাকসিম চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই-পত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ।" [পরিব্রাজক]

আমেরিকার বিখ্যাত তড়িৎ-তত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তার আদানপ্রদান হয়। টেসলা স্বামীজীর বিষয়ে কিছু লিখে গেছেন কিনা জানা যায় নি, তবে স্বামীজীর এক পত্রে টেসলা-প্রসঙ্গ আছে। নিউইয়র্কে স্বামীজী সারা বার্নহার্ড অভিনীত বুদ্ধজীবনী দেখতে গিয়েছিলেন। সারা বার্নহার্ড স্বামীজীকে

দর্শকদের মধ্যে দেখতে পেয়ে আলাপের জন্য উৎসুক হন। স্বামীজীর পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত পরিবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। সাক্ষাতের সময়ে সারা বার্নহার্ড ছাড়া বিখ্যাত গায়িকা মাদাম মোরেল ও 'শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক' নিকোলা টেসলা ছিলেন। এই সাক্ষাতের ব্যাপারে স্বামীজী ই. টি. স্টার্ডিকে লিখেছেন—

"মাদাম (বার্নহার্ড) খুব সুশিক্ষিত মহিলা এবং দর্শনশাস্ত্র অনেকটা পড়ে শেষ করেছেন। মোরেল ঔৎসুক্য দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু টেসলা বেদান্তের 'প্রাণ' 'আকাশ' ও 'কল্পের' তত্ত্ব শুনে একেবারে মুগ্ধ। তাঁর মতে, এই তত্ত্বগুলিই কেবল আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। 'আকাশ' ও 'প্রাণ' আবার সর্বব্যাপী মহৎ বা বিশ্বচৈতন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। মিঃ টেসলার বিশ্বাস, জড় ও শক্তি মূলগত শক্তিতে বিলীন হয়ে যায়, এ তিনি গণিতের সাহায্যে দেখাতে পারেন। এই নূতন গাণিতিক প্রমাণ দেখাবার জন্য আগামী সপ্তাহে তাঁর কাছে যাবার কথা আছে।

"যদি ব্যাপারটা এইভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্ব দৃঢ়তম ভিত্তির উপরে স্থাপিত হবে। আমি এখন বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব নিয়ে খুব পরিশ্রম করছি। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের তত্ত্বগুলির সম্পূর্ণ ঐক্য খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। এদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরে প্রশ্নোত্তরের আকারে একখানা বই লিখব মনে করছি। [এ গ্রন্থ অবশ্য ঠিক এইভাবে লেখা হয়নি]। তার প্রথম অধ্যায়ে থাকবে সৃষ্টিতত্ত্ব— তাতে বেদান্ত মতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখানো হবে।"

[১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত যখন লণ্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তখন স্বামীজী একদিন তাঁর প্রচার সম্বন্ধে বিশিষ্ট আমেরিকানদের মনোভাব সম্বন্ধে গুডউইনের সঙ্গে কথা বলছিলেন।—"স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে কে কে সহায় হবে?…টেসলা ও এডিসনের কি ভাব? গুডউইন বলিলেন, টেসলা সপক্ষ হবে, কিন্তু এডিসনের সহিত আদায়কাঁচকলায়।" [লণ্ডনে বিবেকানন্দ—১ম—মহেন্দ্রনাথ দত্ত]

'আবির্ভাব—হয়তো বুদ্ধের, হয়তো খ্রীষ্টের!'

এলা হুইলার উইলকক্স

[এলা হুইলার উইলকক্স সমসাময়িক আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি]

"বার বছর আগে কোনো এক সন্ধ্যায় হঠাৎ শুনতে পেলাম, বিবেকানন্দ নামক

জনৈক ভারতবর্ষীয় দার্শনিক পণ্ডিত আমাদের নিউইয়র্কের বাড়ির কাছেই বক্তৃতা করবেন।

"আমার স্বামী এবং আমি নিছক কৌতূহলবশেই হাজির হলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা এমন এক পরিবেশে উত্থিত হলাম—সে এক এমন অননুভূত, অপূর্ব, প্রাণরঞ্জিত পরিবেশ যে, আমরা নিস্তব্ধ হয়ে, যেন শ্বাসরোধ করে, বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম।

"বক্তৃতা শেষ হল, আমরা ফিরতে সুরু করলাম, তখন আমাদের মধ্যে প্রতিদিনের সংগ্রামের সম্মুখীন হবার মত নূতন আশা, বিশ্বাস, শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত। 'এই হল দর্শন, ঈশ্বরের ধারণা,—এই ধর্মকেই আমি এতদিন সন্ধান করছি',—আমার স্বামী বললেন। তারপর মাসের পর মাস আমার স্বামী আমার সঙ্গে বিবেকানন্দের কথা শুনতে গেলেন,—বিবেকানন্দের সুপ্রাচীন ধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যার মধ্য থেকে, তাঁর অপূর্ব মনের ভিতর থেকে—সত্যের রত্ন, শক্তি, ও সহযোগিতার বাণী আহরণ করবার জন্য। এ হল অর্থনৈতিক দুর্দৈবের, ভয়াবহ শীতকালের কথা, যখন ব্যাঙ্ক ফেল করছে, স্টক ফুটো বেলুনের মত চুপসে যাচ্ছে, নৈরাশ্যের অন্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছে ব্যবসায়ীরা, সারা জগতে যেন ওলট্‌পালট। কখনো উদ্বেগে ও চিন্তায় কয়েকরাত্রি অনিদ্রায় কাটাবার পরে আমার স্বামী আমাকে নিয়ে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে গেলেন, বক্তৃতাশেষে শীতের নিরানন্দ পথে পদার্পণ করে হাস্যোজ্জ্বল মুখে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বললেন, 'সব ঠিক আছে, আর কোনো ভয় নেই।' এবং আমার স্বামীর মত আমিও একই প্রকার সত্তার উন্নীত চেতনা এবং প্রসারিত দৃষ্টির সামর্থ্য নিয়ে আমার কর্তব্যের ও আনন্দের মধ্যে ফিরে গেছি।

"এই সংঘাত ও যাতনার জীবনের মধ্যে মানুষের জন্য যখন কোনো ধর্ম বা দর্শন ঐ ধরনের কিছু দিতে পারে, এবং তারই সঙ্গে তা ঘনীভূত করে ঈশ্বরের বিশ্বাস, গভীরতর করে প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, ভাবী জন্মের আনন্দময় আশ্বাসে পূর্ণ করে সত্তা, তাহলে তা সত্যই সুন্দর এবং সুমহান ধর্ম।…

"ভারতের দর্শনের মহিমার পাঠ আমাদের নিতে হবে। আমাদের সঙ্কীর্ণ মতকে প্রসারিত করতে হবে ধর্ম-প্রজ্ঞায়। কিন্তু আমরা চাই, ধর্মকে আমাদের আধুনিক প্রগতির ধারণার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে, এবং মানবিক প্রয়োজনে তাকে ধৈর্য ও প্রীতির সঙ্গে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে। বিবেকানন্দ আমাদের কাছে বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি কোনো নতুন ধর্মমতে তোমাদের দীক্ষিত করতে আসিনি, আমি চাই তোমরা তোমাদের মত ধরে রাখ: আমি চাই একজন মেথডিস্টকে আরও ভাল মেথডিস্ট করতে, একজন প্রেসবিটেরিয়ানকে আরও ভাল

প্রেসবিটেরিয়ান করতে, একজন ইউনিটারিয়ানকে আরও ভাল ইউনিটারিয়ান করতে। তোমরা সত্যে জীবিত হও, তাই আমি চাই! আমি চাই তোমাদের অন্তরের আলোককে অবারিত করতে।' তিনি যে বাণী দিলেন, তাতে ব্যবসায়ী শক্তি পেল, লঘুমনা বিলাসিনীরা চমকে থেমে ভাবতে লাগল, শিল্পী পেল নতুন প্রেরণা; আর ঘরের পত্নী মাতা, পতি ও পিতা পবিত্রতর বৃহত্তর কর্তব্যের আলোকে জাগরিত হল।"

শ্রীমতী উইলক্স এই রচনাটি লিখেছিলেন ১৯০৭ সালে নিউইয়র্ক আমেরিকান পত্রিকায়। ১৮৯৫ সালের মে মাসে একটি পত্রে লিখেছেন:

"আমি আজ সকালে ঘণ্টাখানেক বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনেছি। তোমার প্রতি ভাগ্যের অসীম কৃপা, তুমি এই মহাপ্রাণের সেবা করতে পেরেছ। আমার বিশ্বাস ইনি কোনো বিরাট সত্তার অবতার—হয়তো বুদ্ধের—হয়তো খ্রীষ্টের! সমস্ত শীতকাল যে তাঁর কথা শুনতে পেরেছি, আমার জীবন এর থেকে বড় কিছু আমাকে দেয়নি। এমন মানুষকেও মানুষ ভুল বোঝে, এঁর বিরুদ্ধে নিন্দা করে—এই সংবাদে আমি হয়ত খুবই বিস্মিত হতাম, যদি না জানতাম বুদ্ধ ও খ্রীষ্টেরা কিভাবে পরিপার্শ্বের ক্ষুদ্রাত্মাদের দ্বারা নিন্দিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। আজ সকালে তাঁর আলোচনা অপূর্ব ও উদ্দীপক—তাঁর নিছক উপস্থিতিই তাই। তাঁর আত্মবিলয়ের ভাবটুকু আমার বিশেষ ভাল লাগে। সত্য ও ঈশ্বরের আগে বড়ো অক্ষরে যারা 'আমি' বসায় তাদের দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ নানা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বহু কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অবতার বলে বিশ্বাস করতেন এবং স্বামীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ। আমরা শ্রীঅরবিন্দ কথিত ও রচিত বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি।—

"অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।" [দীনেন্দ্রকুমার রায়]

"রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্য অপেক্ষা পূর্ণতর সমন্বয়াদর্শ দিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য নন, উপনিষদই প্রামাণ্য। শঙ্করের মায়াবাদ উপনিষদের বহু ভাষ্যের একটি। [কর্মযোগীন—১৯শে জুন, ১৯০৯]

"একজন অশিক্ষিত হিন্দু যোগী, যিনি আত্মদীপ্ত ভাবোন্মাদ মিষ্টিক—যাঁহার মধ্যে বিদেশী শিক্ষার সামান্যতম স্পর্শ বা চিহ্ন ছিল না—কলিকাতার সর্বোত্তম শিক্ষিত যুবকেরা যখন তাঁর চরণতলে প্রণত হইল, তখন যুদ্ধজয় হইয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁহার গুরু বলিয়াছিলেন, তিনি জগৎকে দুই হাতে ধরিয়া বদলাইয়া দিবার মত শক্তিধর পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সমক্ষে প্রথম প্রকাশ্যে দেখাইয়া দিল, ভারত জাগিয়াছে—শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নহে,—জয় করিবার জন্য সে জাগিয়াছে।" [কর্মযোগীন—১৯০৯]

"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি দেশে যে নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই। সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই, একথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পদস্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগসঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগদিগন্তব্যাপী প্রতিষ্ঠান জাগরিত হইয়াছে, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম-প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিগণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম-বিচার ছিল না। তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন

করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, তুই যে বীর রে! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বেপরোয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎবাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে—'তুই যে বীর রে'।"

["শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত", ধর্ম—১৯১০ জানুয়ারী]

"গত রবিবার আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে যোগদান করিতে বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। তখন কুয়াসায় সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, গঙ্গার একূল ওকূল কিছুই দেখা যাইতেছিল না, গঙ্গাকে সমুদ্রবৎ দেখাইতেছিল। জলের কুলকুল শব্দ সুগন্ধ বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া সঙ্গীতবৎ শ্রুত হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর এক একটি বজ্রগম্ভীর বাণী মনে উঠিতে লাগিল।—

ভারতে মানুষ চাই

"তিনি বলিতেছেন—আমি মানুষ চাই—চাই মানুষ—মানুষ খুঁজিতে আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। আমি ভারতবর্ষের লোককে মানুষের ভিতর মানুষ হইতে দেখিতে চাই, দেবতা দেখিতে চাই না। দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে দময়ন্তী-লাভের জন্য দেবশ্রেষ্ঠগণ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী বলিলেন, আমি নারী, নর চাই, দেবতায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমিও তেমনি দেবতা চাই না, মানুষ চাই। তন্ত্রে-মন্ত্রে কোন কাজ উদ্ধার করিতে চাই না। মানুষের মত সকল কাজ করিতে চাই। যে সর্বজনহিতকামী গভীর পবিত্র অন্তঃকরণ হইতে একথা উঠিয়াছিল, তাহা কি ব্যর্থ হইয়াছে? দেশ তাহার উত্তর দিবে। দেশ বলিবে, মানুষ মানুষের মত সহ্য করিতে শিখিয়াছে কিনা? মানুষ মানুষের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছে কিনা? মানুষ মানুষের মত সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা? সর্ববিষয়ে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে কিনা?

ভয়শূন্য হও

"তিনি আবার বলিতেছেন, নিজে ঈশ্বর হও, সকলকে ঈশ্বরত্ব লাভে সাহায্য কর। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর—ভীত হইও না, কারণ ভীত হওয়া হইতে জগতে আর কোন মহাপাপ নাই। এ ভারত নিশ্চয়ই পুনরায় জাগ্রত হইবে। যে মুহূর্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের অধিকাংশ দুঃখের কারণ। ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হইলে এক

মুহূর্তে স্বর্গ পর্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব ভয়শূন্য হও। ভারত শুধু ভারতবর্ষের জন্য উঠিতেছে না।" [স্বামীজীর জন্মোৎসব—২রা ফাল্গুন, ১৩১৬]

"যীশুখৃষ্ট সেণ্ট পলকে উপযুক্ত আধার মনে করিয়া প্রথমে তাঁহাকেই গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার পদতলে। ছবির মত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে, সেণ্ট পল রোমে দাঁড়াইয়া যেভাব প্রচার করিতেছেন, সেইভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তেমনি যখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভারত তাঁহার নিকট আসিয়াছে, সমস্ত ভারত তাঁহার পদতলে মস্তক লুটাইতেছে, সমস্ত ভারত তাঁহাকে সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত্নে গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারাই ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে। তিনিও ছবির মত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন যে, স্বামীজী তাঁহার আদেশ সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবন গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। তাই কাল যাহা তাঁহার আদর্শ ছিল, আজ সেই আদর্শ লইয়া ভারতবাসী জীবন-পথে অগ্রসর হইয়াছে।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, ধর্ম—৩০শে ফাল্গুন, ১৩১৬]

"৬ই চৈত্র রবিবার আমরা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সে রামকৃষ্ণ নাই, সে বীর তেজস্বী বিবেকানন্দ নাই, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি, তাঁহাদের ভাব সমগ্র ভারতকে অমরত্ব দিবার জন্য মহাশক্তি ধারণপূর্বক ছুটিয়াছে। সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে, তাহাকে অমৃতবারিসিঞ্চনে বরণ করিয়া লইতেছে, অতিথির বেশে স্বদেশ মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতেছে।" [জন্মতিথি উৎসব, ধর্ম—১৪ই চৈত্র, ১৩১৬]

[উপরের তথ্যগুলি গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর রচনা থেকে সঙ্কলিত।]

শ্রীদিলীপকুমার রায় বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা" প্রবন্ধে স্বামীজী সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের কিছু উৎকৃষ্ট রচনার অংশ তুলেছেন। সেই অংশগুলি পাঠক ঐ প্রবন্ধ থেকে দেখে নেবেন। দিলীপকুমার

শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মজীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে যেসব উল্লেখ করেছেন, তার বিস্তৃততর রূপ নীরদবরণের 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' গ্রন্থ থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হল।—

১৪।১২।৩৮। শ্রীঅরবিন্দ—···আর আমরা চেষ্টা করছিলাম জাতির অন্তরাত্মার রূপ ফুটিয়ে দিতে তারই বিশিষ্ট ধারায়, সকলের স্বাধীনতার প্রয়াসে। বাংলার আন্দোলনের কথা ভাব; সমস্ত জাতি কেমন অল্প সময়ের মাঝে জেগে উঠল; যারা ছিল অত্যন্ত ভীরু, রিভলভার দেখলে যারা কাঁপত, তারা দেখতে দেখতে এমন বদলে গেল যে, পুলিশ সাহেবরা বলত—সেই উদ্ধত বরিশাল-দৃষ্টি! জাতির আত্মাই উঠেছিল জেগে এবং দেখা দিয়েছিল চমৎকার কতগুলি মানুষ। আন্দোলনের নেতারা ছিল যোগী অথবা যোগীর শিষ্য। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ছিল বিজয় গোস্বামীর শিষ্য।

নীরদ—তিনি কি স্বদেশী ছিলেন?

শ্রীঅরবিন্দ—বল কি? সে ছিল আমার সহকর্মী এবং গুপ্ত-দলের একজন, তারপর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শক্তি ছিল পিছনে। আন্দোলন তার গুপ্তদল সহ এমন সংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে, রাজনীতি যেখানে মজ্জাগত এমন অন্য যে-কোন দেশে সেটা ফরাসী বিদ্রোহের রূপ নিত। সমস্ত জাতের সহানুভূতি ছিল আমাদের দিকে।

১০।১।৩৯। সত্যেন—···কিন্তু যাকে আপনি অতিমানস বলেছেন তা কি আপনার নিজস্ব ধারণা অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা আবিষ্কার করা না ঊর্ধ্বলোক থেকে পাওয়া?

শ্রীঅরবিন্দ—না, না, আমার চিন্তা বা ধারণা নয়। তোমাদের তো বলেইছি, নির্বাণের উপলব্ধি হবার পর আর আমার নিজস্ব চিন্তা বলে কিছু নেই। চিন্তা আসে বাইরের পরিবেশ থেকে। প্রথম হতেই নির্বাণকে আমি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সিদ্ধি বলে মনে করিনি। আমার মধ্যে একটা কিছু সর্বদাই এগিয়ে চলতে চেয়েছে। কিন্তু তখনও আমি এই অভিজ্ঞতা চাইনি। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণের শান্তি থেকে মানুষ আর কিছু চায় না। কিন্তু এভাব যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল। আরম্ভে অতিমানস সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না, আর অনেক দিন পর্যন্ত তার স্বরূপ আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে দিলেন অতিমানসের নির্দেশ, আর ঋতচেতনা কিভাবে সর্বত্র কাজ করে তার ইঙ্গিত।

নীরদ—তিনি কি অতিমানসের কথা জানতেন?

শ্রীঅরবিন্দ—অতিমানস আখ্যাটি আমার দেওয়া ; এ শব্দ ব্যবহার বিবেকানন্দ করেননি। তিনি বললেন, "ওটা এই", "এটি এ রকম" এই ভাবে। কারাগারে পনের দিন তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি, ততক্ষণ শিক্ষা দিয়েছেন। ঋতচেতনার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা আমার অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে চেষ্টা করেছেন এবং আমি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পারা পর্যন্ত তিনি ছাড়েন নি।

নীরদ—গুরুরা কি এই ভাবে এসে শিক্ষা দেন ?

শ্রীঅরবিন্দ—কেন দেন না ? প্রাচীন কাল থেকেই তো এ অভিজ্ঞতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক গুরুই দেহরক্ষার পর দীক্ষা দিয়েছেন।

নীরদ—আপনার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যে প্রভাবের কথা বলেছেন, সে কি এই ?

শ্রীঅরবিন্দ—না, বিলাত থেকে ফিরে যখন বরোদায় ছিলাম তখন তাঁদের বই পড়ি ; তার প্রভাবের কথাই উল্লেখ করেছি। সমগ্র ভারতেই তাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। হঠযোগ অভ্যাস করবার সময়ে আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন। পরবর্তী কালে এ ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২১।১।৩৯। পুরাণী—···নিবেদিতা কি একরকমের বিপ্লবী ছিলেন ?

শ্রীঅরবিন্দ—সে কি ? বিপ্লবী নেতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ ; বিপ্লবের কথা খোলাখুলিভাবে সকলকে বলতেন, কোন ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর মাঝে। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই,—তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত। যোগ করতেন বটে কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে আগুন। তাঁর বই, *Kali the Mother* উদ্দীপনাপূর্ণ বই ; তেমনি বিদ্রোহমূলক। অহিংসা নয়। রাজপুতনার ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন। একবার বরোদায় এসে মহারাজকেও তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেন এবং শেষে বলেন 'আরও কিছু জানতে চান ত মিঃ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করবেন।' কিন্তু মহারাজ পরে আমার সাথে কোনদিন রাজনীতি চর্চা করেননি। ভাল কথা, মহারাজ নাকি আমার স্বদেশী যুগ ও পণ্ডিচেরীর প্রথম যুগের মধ্যবর্তী জীবন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "মিঃ ঘোষ এখন নিভিয়ে পড়া আগ্নেয়গিরি। তিনি এখন যোগী হয়েছেন।"

রামকৃষ্ণ মিশনকে নিবেদিতার রাজনৈতিক কাজ নিয়ে ভয়ানক বিব্রত হতে হয়। বাধ্য হয়ে তারা নিবেদিতাকে মিশনের কাজ ও রাজনৈতিক কাজ আলাদা রাখতে অনুরোধ করে।

পুরাণী—তাঁর উপলব্ধি কি রকম ?

শ্রীঅরবিন্দ—জানি না। যখনি আমাদের দেখা হত, আমরা রাজনীতি আর বিপ্লবের কথাই বলতাম। কিন্তু তাঁর চোখে একাগ্রতার ক্ষমতা স্পষ্ট প্রকাশ পেত এবং বুঝতে পারা যেত, সমাধিতে তাঁর সহজ অধিকার ছিল। নিশ্চয় কিছু উপলব্ধি হয়েছে।

নীরদ—যোগের উদ্দেশ্যেই ত তিনি ভারতে আসেন ?

শ্রীঅরবিন্দ—হ্যাঁ, কিন্তু বিবেকানন্দের কাজ হিসাবেই তিনি রাজনীতি গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বই-ই শ্রেষ্ঠ। বিবেকানন্দ নিজেও রাজনৈতিক বিষয়ে ভাবতেন ও মাঝে মাঝে বিপ্লবের প্রকোপে পড়তেন। একবার একটা Vision দেখেন, অনেকটা মানিকতলা বাগানের সাথে তার মিল আছে।……

নীরদবরণ "স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন জয়শ্রী পত্রিকার 'স্বামীজী ও নেতাজী সংখ্যা'য়—পৌষ, ১৩৫৯। তার ভিতর থেকে শ্রীঅরবিন্দের উক্তির কিছু অংশ চয়ন করছি।—

"রামকৃষ্ণ কি ছিলেন ? মানুষী আধারে প্রকট ভগবান। আর বিবেকানন্দ—মহাদেবের নয়ননিঃসৃত এক দীপ্ত কটাক্ষ।—কিন্তু তাঁর পিছনে ছিল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে উদ্ভূত বিবেকানন্দ, মহাদেব স্বয়ং, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বিশ্বাতীত ওম্।"

"বিবেকানন্দের প্রভাব এখনো বিপুলভাবে কাজ করে চলেছে আমরা দেখতে পাই—ঠিক জানি না কী রূপে, বলতে পারি না কোথায়, এমন কিছুতে যা এখনো স্পষ্ট নয়; এমন কিছু যা সিংহপ্রতিম, বিরাট, সম্বোধিদীপ্ত; যা সমুদ্রের জোয়ারের মত প্রবেশ করছে ভারতের মর্মকেন্দ্রে এবং তা দেখে আমরা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ এখনো জেগে মাতৃমর্মে, মাতৃসন্তানদের মর্মলোকে।"

"বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, যোগ হল, কি করে আমাদের ক্রমবিবর্তনকে সংহত করে জৈব অস্তিত্বের একটিমাত্র জীবনে, অথবা কয়েকটি বছরে, এমন কি কয়েকটি মাসের মধ্যে পর্যবসিত করা যায়, সেই প্রক্রিয়া।"

"নির্বিশেষের ডাকে উতলা হয়েও বিবেকানন্দ আবার ঝাঁপ দিলেন নরবিগ্রহে

প্রচ্ছন্ন নারায়ণের সেবায়, শুনতে পেলেন আর্ত ও পতিতের কণ্ঠ, বিশ্বের তিমিরাবৃত দেহে অবস্থিত আত্মার প্রতি জীবাত্মার আহ্বান।"

"মাদ্রাজী পণ্ডিতের প্রতি বিবেকানন্দের প্রসিদ্ধ উক্তিটিই ধরো। তাঁর কি একটা কথায় সংশয় প্রকাশ করে পণ্ডিত বলেছিলেন, 'কিন্তু শঙ্কর তো তা বলেন না।' তাতে বিবেকানন্দের জবাব, 'না, আমি বিবেকানন্দ, তা বলছি।' পণ্ডিত একেবারে হতবাক।

"'আমি বিবেকানন্দ'—তাঁর এই কথা সাধারণের কাছে হিমালয়প্রমাণ অহমিকার মত শোনাবে। কিন্তু বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় কিছু ভূয়ো বা ঝুটো ছিল না। আর এ তাঁর অহমিকা নয়, এ একটি অতি-মহতের বোধ, যে জন্য তাঁর জীবন, যাঁর প্রতিনিধিরূপে তাঁর সংগ্রাম—তাকে কেউ খর্ব বা তুচ্ছ করবে, তা তাঁর সহ্য হত না।"

স্বামী বিবেকানন্দের মত ও দর্শনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধারণার সর্বাত্মক ঐক্য ছিল না। সন্ন্যাস বিষয়ে এবং সাকার ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামীজীর সঙ্গে নিজের মতপার্থক্য শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে ফুটিয়েছেন—

"বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের প্রশস্তি করে বলেছিলেন, ভারতের সমগ্র ইতিহাসে জনক আছে একজন মাত্র। তা নয়, জনক কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তা হল স্বরাট রাজন্যদের এক বংশ, এবং এক আদর্শের বিজয় আহ্বান।"

"বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবাবেগের বশে এই ভ্রান্তি স্বীকার করে বসেছিলেন যে, সাকার ভগবানকে মেনে নেওয়া হল একটা বিষম দুর্নীতি ; এ রকম ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করা সকল সৎ ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু জগতকে চালিত করে থাকে যদি সকল নীতির অতীত এক সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞা ও এষণা, তবে তাকে বাধা দেওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব, আমাদের দিক থেকে বাধাদান তাঁরই উদ্দেশ্যসাধন করবে, আর বস্তুত সে বাধাদান তাঁরই আদিষ্ট। তাই যদি হয়, তাঁকে অভিযুক্ত না করে তাঁকে জানবার, বোঝবার প্রয়াসই শ্রেয় নয় ?"

রামমোহন : বিদ্যাসাগর : দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ

রামমোহন প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের বর্তমান কালের সংস্কারকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়কে স্বামীজী শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করতেন এবং তিনি সেই 'মহান রাজা'র প্রতি নিজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন অকুণ্ঠে। আমরা তেমন কয়েকটির উল্লেখ করছি—

"আমাদের পিছনে নিঃস্বার্থ মহান জীবন্ত দৃষ্টান্তসকল রহিয়াছে। ভারতের পতন ও দুঃখ দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ—ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিয়াছিল, শামুকের মত দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার—জীবনপ্রদ সত্যরত্নের ভাণ্ডার—উন্মুক্ত করে নাই। আমাদের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই ; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে। সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং ভারত এখন ক্রমবর্ধমান গতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে।"

[আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর'—
১৮৯৭, ২৬শে ফেব্রুয়ারী]

কলিকাতায় আসার পূর্বে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই স্বামীজী মাদ্রাজ 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে কথোপকথনকালে বলেন—

"আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্বদা গঠন করেছিলেন, তাঁরা যে, দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন,—সেই হল আমাদের কার্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা ইউরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন, এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন,—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে চলেছে। সৌভাগ্যই হউক, আর দুর্ভাগ্যই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্যে পরিণত করার প্রাণপণ চেষ্টাই ভারতীয়দের জীবনের সমগ্র ইতিহাস।"

স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগষ্ট আমেরিকার 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' বলেন—

"সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবন ভারতের হিতার্থে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। সাধারণত লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দ্বারা কৃত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের সহায়তা-

লাভে কৃতকার্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরেজরা কিছুই করেনি। তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামক বিখ্যাত ধর্মসমাজ স্থাপন করেন, এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে গেলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এগিয়ে যাও।' তিনি নামযশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনোরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করতেন না।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নৈনিতালে স্বামীজী কথোপকথনকালে রামমোহন প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন—

"এই নৈনিতালেই স্বামীজী রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। এই আচার্যের শিক্ষার মূলসূত্ররূপে স্বামীজী তিনটি বিষয়ের নির্দেশ করেন—তাঁহার বেদান্তগ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং হিন্দুমুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যে কার্যপ্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছিল, তিনি নিজে তাহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। ['স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে'—নিবেদিতা]

সিটি কলেজ হলে অনুষ্ঠিত রামমোহন স্মৃতিবার্ষিকী সভার জন্য স্বামীজী উমেশচন্দ্র দত্তকে যে পত্র লেখেন, তাতে তিনি রামমোহন সম্বন্ধে বলেন—"The first man of new regenerate India."

[*Swami Vivekananda : Patriot Prophet* by Dr. B. N. Dutta]

স্বামীজী নিশ্চয় সর্বাংশে রামমোহনের মতের অনুগামী ছিলেন না। রামমোহনের ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—"বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান, সুতরাং তাঁহারা জাতি ও ধর্ম—উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যাহাই বলুন, জাতি একটি সামাজিক বিধান মাত্র।"

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে স্বামীজী সাক্ষাতে জানতেন। বিদ্যাসাগরের মেট্রপলিটন স্কুলে তিনি পড়েছিলেন, এবং পরে মেট্রপলিটান স্কুলের বৌবাজার শাখায় সামান্য কালের জন্য প্রধান শিক্ষকও হয়েছিলেন। স্বামীজীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনার

সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংযোগ আছে শোনা যায়। স্কুলে একদিন জনৈক শিক্ষক এমনভাবে নরেন্দ্রনাথের কান মলে দেন যাতে প্রচুর রক্তপাত হয়, এবং ফিরবার পথে নরেন্দ্রনাথকে সেই অবস্থায় বিদ্যাসাগর দেখতে পান। বিদ্যাসাগর স্কুলে গিয়ে ঐ শিক্ষককে নাকি প্রচুর তিরস্কার করেন ও দৈহিক শাস্তির প্রথা একেবারে উঠিয়ে দেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এ তথ্য জানিয়েছেন।

পরবর্তীকালে স্বামীজী কথোপকথনকালে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর অত্যুচ্চ ধারণা এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

"আর একদিন স্বামীজী হিন্দুসভ্যতার চিরন্তন উপকূলে আধুনিক চিন্তাতরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে সকল উদারহৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বেই নৈনিতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে।' এই দুই ব্যক্তি (রামমোহন ও বিদ্যাসাগর) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে একই অঞ্চলে মাত্র কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, একথা মনে হইলেও তিনি যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিতেন।

"স্বামীজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকারী এবং বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁহার একটি প্রিয় গল্প ছিল—

"একদিন বিদ্যাসাগর ব্যবস্থাপক সভা হইতে এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন—ঐরূপ স্থানে সাহেবি পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত কি না—এমন সময় দেখিলেন যে, ধীরেসুস্থে এবং গুরুগম্ভীর চালে গৃহগমনরত এক স্থূলকায় মোগলের নিকট এক ব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, 'মহাশয়, আপনার বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে।' এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিল না; ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ইঙ্গিতে ঈষৎ বিজ্ঞজনোচিত বিস্ময় প্রকাশ করিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু ক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'পাজি, খানকয়েক বাখারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই আমার বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িতে বলিস?' —এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ধুতি চাদর এবং চটিজুতা কোনক্রমে ছাড়া হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে একটি জামা ও একজোড়া জুতা পর্যন্ত পরিলেন না।

"'বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না?'—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্নে

শাস্ত্রপাঠার্থ বিদ্যাসাগরের এক মাসের জন্য নির্জন গমনের চিত্রটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জনবাসের পর তিনি 'শাস্ত্র এইরূপ পুনর্বিবাহের প্রতিপক্ষ নহে'—এই মত প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; সুতরাং যদি সরকার এই আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইতেন, তাহা হইলে ইহা কখনই আইনরূপে পরিণত হইত না। স্বামীজী আরও বলিলেন, 'আর আজকাল এই সমস্যা সামাজিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত না হইয়া বরং একটা অর্থনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

"যে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিনি যে, প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম। যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় মর্মাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তখন 'পোশাকী' মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপরনাই অভিভূত হইলাম।"

['স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে'—ভগিনী নিবেদিতা।]

এইখানে উল্লেখ করা উচিত, স্বামীজী বিদ্যাসাগরের প্রধান সংস্কারকার্য বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন না, এবং সংস্কারকগণ তাঁদের প্রচেষ্টার বড় অংশকে বিধবা বিবাহ প্রচারে নিয়োগ করেছিলেন বলে তাঁদের সমালোচনাও করেছেন। তাঁর মতে 'বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপরে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না।' বিধবাদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করাই তাঁর মতে প্রথম প্রয়োজন; তারপর নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা নিজেরাই স্থির করবে। আবার বিধবা বিবাহ ব্যাপারটার সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাছাড়া, স্বামীজীর আরও ধারণা, দেশের জন্য আরও বড় কিছু করার আছে, তা হল সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ও জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি। সে চেষ্টা না করে বিধবা বিবাহ আন্দোলন, স্বামীজীর মতে শক্তির অপব্যবহার, যদিও স্বামীজী একই সঙ্গে জানিয়েছেন, তিনি 'সকল প্রকার সংস্কারকার্যের প্রতি সহানুভূতিশীল'—বিধবা বিবাহ যার অন্তর্ভুক্ত।

বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারকার্য সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীতে ও রচনায় অনেক উল্লেখ আছে।

স্বামীজী একবার বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সহাস্যে কটাক্ষ করেছিলেন—

"তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তামাক খেতে লাগলেন, পরে বলে উঠলেন, দেখ্ সিংগি, একটা কিছু কর্। দেশের জন্য করবার এত কাজ আছে যে, তোর আমার মত হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্ রে! ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।'

"প্রশ্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

"এই কথা বলামাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন: 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক',—ওতে কোনো কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।"

['স্বামীজীর স্মৃতি'—প্রিয়নাথ সিংহ]

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে স্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনায় বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগ'-প্রসঙ্গ—

"একদিন নরেন্দ্রনাথ বলরাম বসুর বাটীতে বড় ঘরটিতে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানা প্রথম ভাগ নিবিষ্ট হইয়া দেখিতেছেন। তিনি প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাটি এক মনে পড়িতেছেন ও চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। মুখটি অতি গম্ভীর। বাবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, এখন আবার প্রথম ভাগ পড়ছ না কি? নরেন্দ্রনাথ বিস্ফারিত নেত্রে বাবুরাম মহারাজের দিকে দৃষ্টি করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আগে প্রথম ভাগ পড়েছিলুম, এখন বিদ্যাসাগরকে পড়ছি।" ['শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', ১ম,—মহেন্দ্রনাথ দত্ত]

মহেন্দ্রনাথের রচনায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে স্বামীজীর আরও বক্তব্য পাই—

"একজন বলিলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর ব্রহ্ম কিছু মানেন না। তিনি বোঝেন জগতের কল্যাণ, বিদ্যাচর্চা—ইহাই প্রধান। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আরে সে কখনও হতে পারে? আগে ব্রহ্ম না জানলে কেউ কি জগৎ বুঝতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহলে যে, ভুল পথ ধরা হয়! আগে জগৎ, তারপর ব্রহ্ম,

একি হয়? আর দেখ অতবড় লোক; ওকি কখনও ভুল করে? ও নিশ্চয় আগে ব্রহ্মের জ্ঞান বা আভাস পেয়েছে, তারপর জগৎ বা ব্রহ্ম বুঝেছে।' [ঐ]

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র দ্বিতীয় ভাগে এই জাতীয় কিছু অংশ পাওয়া যায়—

"(বরাহনগর মঠ) নরেন্দ্র দানাদের ঘরে বসিয়া আছেন।···ধর্মপ্রচারের কথা পড়িল।

"মাস্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কারুকে বলি না।

"নরেন্দ্র—বেত খাবার ভয়?

"মাস্টার—বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর, কেশব সেনকে যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপটাপ করেছে। যখন প্রমাণ হল, তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওকে পঁচিশ বেত মারো। তারপর মনে কর, আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই! অনেক অন্যায় করেছি। তার জন্য বেতের হুকুম হল। তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে ঐরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর হয়ত দূতদের আবার বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে। (সকলের হাস্য)।

"তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া (সকলের হাস্য)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?

"নরেন্দ্র—যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝলে কি করে?

"মাস্টার—আর পাঁচটা কি?

"নরেন্দ্র—যে এটা বোঝে না, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? স্কুল করে ছেলেদের বিদ্যা শেখাতে হবে, আর সংসারে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেলে মেয়ের বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে?

"যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।

"মাস্টার (স্বগত)—ঠাকুর বলতেন বটে, যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে। আর সংসার করা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে, এসব রজোগুণে দোষ নাই।"

দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ

স্বামীজী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের অনেকের বিরূপতার মধ্যেও স্বামীজীর প্রতি মহর্ষির প্রীতি ও শ্রদ্ধা অটুট ছিল। ঈশ্বর-অন্বেষায় দেবেন্দ্রনাথের নিকট নরেন্দ্রনাথের গমন, দেবেন্দ্রনাথের ঋষিসুলভ সুগভীর আধ্যাত্মিক বিনয়, নরেন্দ্রনাথের যোগীর মত চোখের প্রশংসা ইত্যাদি বিবেকানন্দ-জীবনীর সুপরিচিত ঘটনা।

১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সাফল্যের বার্তা যখন কলকাতায় এসে পৌছল তখন মহর্ষি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এক দীর্ঘ অভিনন্দনপত্র পাঠিয়াছিলেন স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ীতে। এবিষয়ে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

"আমেরিকার চিকাগোর সংবাদ যখন কলিকাতা সহরে প্রকাশিত হইল এবং সেই বিষয় লইয়া যখন সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন, সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বহস্তে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তাঁহার দারোয়ান মারফৎ ৩ নং গৌরমোহন মুখার্জীর গলির বাড়িতে পাঠাইয়া দেন। নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত তারকনাথ দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেটের উকিল ছিলেন এবং তারকনাথ দত্তর ঠাকুর পরিবারের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। নরেন্দ্রনাথ তারকনাথ দত্তর ভ্রাতুষ্পুত্র, এই জন্য হর্ষিত হইয়া মহর্ষি পত্রখানি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। মহর্ষি তখন নরেন্দ্রনাথদের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ জানিতেন না। কারণ নরেন্দ্রনাথের জননী ও অন্যান্য ভাইয়েরা তখন রামতনুবাবুর গলির বাড়িতে বাস করিতেন। অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। দুঃখের বিষয় গৌরমোহন মুখার্জীর বাড়িতে যাঁহারা তখন বাস করিতেন, তাঁহারা সেই পত্রখানি লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। সেইজন্য সেই পত্রখানি সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত হইয়া রহিল।"

আমেরিকা থেকে ফেরার পরেও স্বামীজী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে একবার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়েছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন—

"Yesterday [14.2.1899] morning two of us went early to be blessed by the old Devendra Nath Tagore. Swami sent word early that he was particularly pleased, and I told the old man this, and said I felt that I was making Swami's *Pranams* as well as my own. He was quite touched, said, he had met Swami once when wandering round in a boat, and would greatly like

him to come to him once more. When I told Swami, he was wonderfully moved, and said, 'of course I'll go, and you can go with me, and fix a day as soon as you please!' It seems that as a boy he clambered up into Mr. Tagore's boat and put anxious questions about Advaitism, and the old man paused and said gently at last, 'The Lord has only shown me dualism.' And then he had patted him and said he had the Yogi's eyes."

[*Reminiscences*]

সাক্ষাতের বিবরণ নিবেদিতা এইভাবে দিয়েছেন—

"আমাদের তখনই মহর্ষির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ির দু' একজন সঙ্গে চললেন। স্বামীজী এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'প্রণাম,' আমি দুটি গোলাপ ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। মহর্ষি আমাকে আশীর্বাদ করে স্বামীজীকে বসতে বললেন। তারপর মিনিট দশেক বাংলায় কথা চলল। স্বামীজী যে সব বাণী প্রচার করেছেন, মহর্ষি একে একে তার উল্লেখ করতে লাগলেন। বললেন, আগাগোড়া তিনি স্বামীজীর কার্যকলাপের উপর নজর রেখেছেন ; গভীর আনন্দ ও গৌরববোধ নিয়ে তাঁর ভাষণ শুনে গেছেন। ঠাকুরবাড়ির সবাই আশ্চর্য হচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছিল। কেন জানি না মনে হচ্ছিল, ওসব কথা যেন তাঁর কানেই যাচ্ছে না।. এটা তাঁর সলজ্জতা। তারপর বৃদ্ধ চুপ করলেন। স্বামীজী তখন খুব বিনীতভাবে তাঁর আশিস ভিক্ষা করলেন। মহর্ষি আশীর্বাদ করলে পর আগের মতই প্রণাম করে আমরা নীচে চলে এলাম।"

স্বামীজীর পত্রে একবার দেবেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে মহর্ষি যে 'হনস্ বাবার' মত 'স্টাইলিশ' নন তা তিনি সকৌতুকে জানিয়েছেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মিস ম্যাকলাউডকে তিনি লিখছেন—

"How did you like the old gentleman, Devendra Nath Tagore? Not as Stylish as 'Hons Baba' with Moon God and Sun God of course."

বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ

স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেছেন ব'লে জানা না গেলেও এবং রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সামান্যই বলেছেন একথা সত্য হলেও, উভয়ে

উভয়কে প্রত্যক্ষ চিনতেন, অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গাইতেন, এর নানা প্রমাণ আছে। এ বিষয়ে কালিদাস নাগ নিম্নের সংবাদ দিয়েছেন—

"নরেন্দ্রের দু-বছরের বড় রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খ্রীঃ প্রথম বিলাত-প্রবাস থেকে ফিরেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আদেশ করলেন একটি বিবাহ-মঙ্গল গীত রচনা করতে, কারণ রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাদেবীর সঙ্গে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তাঁদের পুত্র সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে লীলাদেবীর ডায়েরী থেকে আমি পেয়েছি: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে জমকালো বিবাহসভা, আচার্য—শিবনাথ শাস্ত্রী। সেখানে নগেন চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন-জীবনীকার), কীর্তনীয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ (শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের বন্ধু), কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ সঙ্গীত করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' এবং 'জগতের পুরোহিত তুমি' ও 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়াছিলেন ।" ['বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ'—কালিদাস নাগ, উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬৮]

'বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত' নামক রচনায় (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬৪) ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন—

"আমার ভাগ্য এমন যে, প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে পাই কাশীতে। আর যাঁর কণ্ঠে সেই গানটি ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর নাম শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। গানটি কাশীতে গেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনেক স্থানে আমি এই কথাটি সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছি। সম্প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি অতি প্রিয় গান একখানি বইয়ে মুদ্রিত আকারে পেয়েছি। গানটি:

এ কী এ সুন্দর শোভা! কী মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি
বলো হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী
কী ধন তোমারে দিব উপহার।

"স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব -গাইয়ে ছিলেন।

"কাশীতে আর দুটি গান বিবেকানন্দের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল। সব কটি গানই রবীন্দ্রনাথের—

মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি॥

সখী, আমার দুয়ারে কেন আসিল
নিশিভোরে যোগী ভিখারী।
কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো।"

স্বামীজী রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তার প্রমাণ কথামৃতেও আছে। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ বর্তমান সঙ্কলনে তাঁর প্রদত্ত রচনায় এবিষয়ে তথ্য দিয়েছেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের আগে স্বামীজী যে, তাঁর বন্ধু বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে একটি সঙ্গীত-সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, সেকথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন। এই সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গৃহীত হয়েছে। শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ "বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে এই বিষয়ে লিখেছেন—

"সন্ন্যাস গ্রহণের আগে……একটি সঙ্গীত-সঙ্কলন গ্রন্থের সঙ্কলন কার্যে তাঁর (স্বামীজীর) অনেকটা হাত ছিল।…বইটির নাম 'সঙ্গীত কল্পতরু'—'শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।'……

"পাঠক সমাজে এই সঙ্গীত-সঙ্কলনটি কি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ ১২৯৪ সালের মাঘ মাসেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১২৯৪), ১২৯৫-এর জ্যৈষ্ঠে তৃতীয় সংস্করণ।

"……সেকালের জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে…রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি বিষাদিনী বীণা,' 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ'…এ সঙ্কলনে সংগৃহীত।

"…রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' এবং 'কালী কালী বলোরে আজ' গান দুইটির নির্বাচন লক্ষণীয়।"

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু বিক্ষিপ্ত মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল—

"অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারত-

বর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" ["সমাজ" গ্রন্থের অন্তর্গত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ।]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে মেলাবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রামমোহন ও রানাডের সঙ্গে বিবেকানন্দের নাম করেছেন। রামমোহন ও রানাডের ভূমিকার আলোচনা করা হয়েছে স্বামীজীর কথা আলোচনার পূর্বে। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে বঙ্গদর্শনে (ভাদ্র—১৩১৫) প্রকাশিত হয়। তাতে আছে—

"আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

"ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইহারা প্রত্যেকেই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীতে যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন—তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।"

"রাজা প্রজা" গ্রন্থের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্যের সঙ্গে স্বামীজীর উল্লেখ করেছেন—

"রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী, ইহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।"

"আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই

কথাটা যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্র ভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।"

[৯ এপ্রিল ১৯২৮ সালে ডাঃ সরসীলাল সরকারের কোন পত্রের উত্তরে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে পত্র দেন, তারই অনুক্রমণিকায় কবি স্বয়ং এইটি লেখেন। রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড]

"বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি। বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।

"একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের আত্মবোধকে অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ আচারের উপদেশ নয়, ব্যবহারিক সঙ্কীর্ণ অনুশাসন নয়। ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে বলে। সে অপমানে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাবমাননা।

"বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে ত্যাগের মধ্য দিয়ে মুক্তির পবিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।"

[রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী অশোকানন্দজীকে লিখিত পত্র।
—"কিশোর বাংলা" পৌষ, ১৩৪৮।]

স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে রবীন্দ্রনাথ একটি স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন! নিম্নে তার বিবরণ,—

MEMORIAL MEETINGS

At Bhowanipur, Calcutta

The Excelsior Union of Bhowanipur, Calcutta, held a meeting to do honour to the memory of the Swami Vivekananda. There was a large gathering of the students of the locality in the spacious Hall at the South Subarban School, and Babu Rabindranath Tagore, the great poet, presided···At the request

of the Secretary, the Sister Nivedita explained to the meeting the secret of the Swami's success in the Western world and emphasised in her own inimitable way that absolutely fearless patriotism which was the most striking feature of the great Swamiji's character, bringing into strong contrast the ague fits by which the average Indian is convulsed at the least imagining of any danger into which his country's cause may lead him. The President having summed up the Swami's work and teachings on much the same lines in *Bengali*, the meeting terminated. [THE BENGALEE, July 15, 1902]

রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনকালে বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ ওঠে, তার কিছু বিবরণ—

Tagore: I have never been able to love the God of the Old Testament. He is the Lord with the rod.

Rolland: But even in the New Testament the same motive occurs. Jesus is the Lamb and the Lord sacrificed for the sake of humanity. The emphasis is wrongly placed and the attitude is not spiritual in the large sense. Do you think that Vivekananda in India tried to check the abuses in this line?

Tagore: So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life···We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them.

[*Rolland & Tagore*, P. 100, রবীন্দ্রজীবনী—৪র্থ খণ্ড]

রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর চলিত ভাষায় রচনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এ বিষয়ে কুমুদবন্ধু সেনের রচনায় এই তথ্য পাচ্ছি—

"আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হইয়াছে—তাহার প্রেরণা

যোগাইয়াছে স্বামীজীর বাংলা রচনা। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষার চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন তাহা পড়িয়া দেখুন বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এইমাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার নিকট এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' এ ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।" কুমুদবন্ধু সেন—'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধ। উদ্বোধন সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা। মাঘ—১৩৫৪

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় তাঁর 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে স্বামীজীর পৌরুষ ও আত্মমর্যাদার প্রশংসা একবার করেছিলেন তার বর্ণনা করেছেন। বর্তমান সঙ্কলনে নিজ রচনাতেও শ্রীযুক্ত রায় এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ কথোপকথনকালে নাকি একবার বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জান, কারণ তাঁর মধ্যে সবকিছুই ইতিবোধক, নেতিবোধক কিছুই ছিল না। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের নিকটও রবীন্দ্রনাথ একই জাতীয় কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্বন্ধে কথা বলবার সময়ে কয়েকবার স্বামীজীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়কর এই যে, সুদীর্ঘ 'ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে একবারও স্বামীজীর উল্লেখ করেননি।

আমার জীবনে বিবেকানন্দ

সুভাষচন্দ্র বসু

"এই সময় থেকে (বিদ্যালয় জীবনের শেষের দিকে) আমার মনের মধ্যে এক বিষম ওলট-পালট সুরু হল। প্রায় বছর ছয়েক সে যে কী অসহ্য মানসিক অশান্তিতে কেটেছিল তা বলবার নয়। বাইরে থেকে অবশ্য কিছু বোঝবার যো ছিল না। এক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের পক্ষেও কিছু করবার ছিল না। এ ধরনের উৎকট অভিজ্ঞতা সাধারণত সকলের হয় বলে আমার মনে হয় না। অন্তত প্রার্থনা করি কখনো কারও যেন না হয়। তবে আমাকে আর দশ জনের মত ভাবলে ভুল করা হবে, কারণ আমার মনের গড়নটা ছিল বেশ একটু অস্বাভাবিক ধরনের। আমি যে শুধু আত্মকেন্দ্রিকই ছিলাম তা নয়, অনেক দিক দিয়ে অকালপক্বও ছিলাম। এর ফলে যে বয়সে আমার ফুটবল মাঠে সময় কাটাবার সময়, সে সময়ে আমি বসে বসে গুরুগম্ভীর নানা রকম সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতাম।

"হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি। হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলির উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম, এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল। প্রধান শিক্ষক মশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন,—জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন,—কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেন নি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তা থেকে তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়,'—মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। আদর্শ হিসাবে মধ্যযুগের স্বার্থসর্বস্ব সন্ন্যাসী-জীবন কিংবা আধুনিক যুগের মিল ও বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজম্ কোনোটাই সার্থক নয়। মানবজাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাও বুঝেছিলেন। তাঁর জীবনীকার ও প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখে গেছেন,—'মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী। দেশের এমন কোনো

আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি।' এক স্থানে বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বল ভাই, ভারতবাসী আমার ভাই; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' তিনি বলতেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, একে একে সকলেরই দিন গিয়েছে, এখন পালা এসেছে শূদ্রের—এতদিন পর্যন্ত সমাজে যারা শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছে। তিনি আরো বলতেন, উপনিষদের বাণী হল 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—চাই শক্তি, নইলে সবই বৃথা। আর চাই নচিকেতার মত আত্মবিশ্বাস। অলস প্রকৃতির সন্ন্যাসীদের তিনি বলতেন, 'মুক্তি আসবে ফুটবলের মধ্য দিয়ে, গীতাপাঠ করে নয়।' বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম, তখন আমার বয়স পনেরোও হবে কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। তাঁর আদর্শ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না—কিন্তু কয়েকটা জিনিষ একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।···

"অল্পদিনের মধ্যেই আমি রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের একদল ভক্ত জুটিয়ে ফেললাম।···স্কুলে বা স্কুলের বাইরে, যেখানেই হোক সুযোগ পেলেই আমরা এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা সুরু করে দিতাম। অনেক সময়ে দল বেঁধে দূরে কোথাও বেড়াতে চলে যেতাম, এতে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যেত। ক্রমে আমাদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠল।···

"ধর্মচর্চা বলতে আমি শুধু যোগ অভ্যাসকেই জানতাম, একথা বললে ভুল বলা হবে। অবশ্য কিছুদিন আমি যোগ নিয়ে একটু বেশী রকম মেতে উঠেছিলাম, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। এই ধারণা বিবেকানন্দই আমাকে দিয়েছিলেন, তিনিই জনসেবা, তথা দেশসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, দরিদ্রের সেবাকেও তিনি অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে ভগবান আমাদের কাছে আসেন, কাজেই দরিদ্রের সেবা মানেই ভগবানের সেবা। মনে পড়ে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ভিক্ষুক, ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী—সকলের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করতাম। বাড়ীতে এরা কেউ এলে তাদের যথাসাধ্য দান করে মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ পেতাম।

"স্কুল ছাড়বার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার মধ্যে ধর্মভাবও ততই তীব্রতর হয়ে উঠল। লেখাপড়ায় মন রইল না। আমাদের একমাত্র কাজ হল তখন দলবেঁধে বাইরে গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা। শিক্ষকদের মধ্যে দু' একজন বাদে কাউকেই আমাদের ভাল লাগত না। যে দু-একজনকে ভাল লাগত, তাঁরা ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভক্ত।

"মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে বিবেকানন্দই আমাকে সাহায্য করলেন। তিনি যে ধর্মপ্রচার করতেন, যে যোগসাধনায় বিশ্বাস করতেন, সবেরই মূলভিত্তি ছিল বেদান্ত এবং বেদান্তকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁর জীবনের একটা বড় আদর্শ ছিল ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো। তাঁর মতে এই সমন্বয় বেদান্তের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

"যখন ধর্মচর্চা ও যোগসাধনা উপলক্ষে অনেকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ত, অনেক জায়গায় যেতে হত, তখন প্রায়ই বাবা-মার নিষেধ অমান্য করতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য মনে কিছুমাত্র দ্বিধাও জাগেনি, কারণ তখন বিবেকানন্দের আদর্শ আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি—বিবেকানন্দ বলতেন, আত্মোপলব্ধির জন্য সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে। ভূমিষ্ঠ হয়েই শিশু যে কাঁদে, তার কারণ আর কিছুই নয়, যে বাধানিষেধের গণ্ডীর মধ্যে সে ভূমিষ্ঠ হয় তার বিরুদ্ধে তার স্বাধীন সত্তা বিদ্রোহ করে ওঠে।

"জীবনের প্রতি পদে যে সব দ্বিধা, যে সব সংশয় মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলত, সুচিন্তিত একটি জীবনদর্শন ছাড়া আর কিছুতেই তাদের জয় করা সম্ভব ছিল না। বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ আমাকে এই রকম একটি আদর্শের সন্ধান দিলেন। এই আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার ফলে বহু সমস্যা, বহু সঙ্কট আমি সহজেই পার হয়ে এসেছি।

"তৃতীয় একটি দলে ছিল অনেকটা আমাদের মতই একদল পরম উৎসাহী ছেলে —নিজেদের তারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানসপুত্র বলেই বোধহয় মনে করত।... এরা রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের আদর্শকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিল, তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এরা জনসেবার উপরই বেশী জোর দিত। জনসেবা বলতে এদের বিবেকানন্দের শিষ্যদের মত হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন

করার উপরে বিশেষ আস্থা ছিল না—এদের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতি করা।···বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা বিবেকানন্দের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করেনি। আমরা এই ত্রুটি সংশোধন করতে এগিয়ে গেলাম। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ধর্ম এবং জাতীয়তার সমন্বয় ঘটানো—শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও। তখনকার দিনে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় জাতীয়তাবাদ প্রায় অপরিহার্য ছিল।···

"ছুটির দিনে প্রায়ই বাড়ী থাকতাম না, অভিভাবকের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করতাম না। কখনো কখনো বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ বা ঐ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে দল বেঁধে বেড়াতে যেতাম।

"সে সময়ে শঙ্করাচার্যের মতবাদকেই হিন্দু শাস্ত্রের সারবস্তু বলে আমি জানতাম। অবশ্য শঙ্করাচার্যের আদর্শকে নিজের জীবনে অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শই এক্ষেত্রে আমার কাছে অনেক সহজ ও বাস্তবপন্থী বলে মনে হত।" ['ভারত-পথিক' থেকে সঙ্কলিত]

[স্বামীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আরও কিছু রচনা ও উক্তি নিম্নে সঙ্কলন করে দেওয়া হল—]

"বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলেই আমি আত্মহারা হয়ে যাই। খুব কম লোকের পক্ষে, এমন কি তাঁর সংস্পর্শে থাকার সুবিধা যাঁদের হয়েছিল তাঁদের পক্ষেও তাঁর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা বা তাঁকে গভীরভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব বলেই মনে করি। সুগভীর, জটিল ও ঋদ্ধিসমন্বিত ব্যক্তিত্ব—তাঁর বক্তৃতা ও লেখা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অথচ তাঁর এই বক্তৃতা ও লেখার দ্বারাই তিনি তাঁর আশ্চর্য প্রভাব দেশবাসীর উপর, বিশেষত বাঙ্গালীর উপর বিস্তার করেছিলেন। এই রকমের বলিষ্ঠ মানুষ বাঙালীর মনকে যেমন আকৃষ্ট করে, এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন স্বামীজীর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত স্বামীজী মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির নির্মম সমালোচক ছিলেন, অথচ সারল্য ছিল তাঁর শিশুর মত। আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল।

"ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'The Master as I saw him' পুস্তকে বলেছেন, 'The queen of his adoration was his Motherland'—অর্থাৎ তাঁর আরাধনার দেবতা ছিল তাঁর মাতৃভূমি। পুরোহিত, উচ্চবর্ণ এবং বণিক শ্রেণীর

বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন আপনারা তা পড়েছেন। সে সব কথা বলা একজন সর্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকের পক্ষেও বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

"আপনারা যাকে আধ্যাত্মিক ভণ্ডামী বলতে পারেন স্বামীজীর মধ্যে তার বিন্দু-মাত্র আভাসও ছিল না। তাঁর চোখে এ সব অসহ্য বোধ হোত। বকধার্মিকদের উদ্দেশ করে তিনি বলতেন 'Salvation will come through football and not through Gita.' নিজে বৈদান্তিক হয়েও তিনি ভগবান বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বুদ্ধ সম্বন্ধে এমন অনুরাগ ও উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'স্বামীজী, আপনি কি বৌদ্ধ?' তৎক্ষণাৎ তাঁর মন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কি, বৌদ্ধ? আমি বুদ্ধের সেবকের সেবক—তস্য সেবক'। বুদ্ধের সম্মুখে তিনি নিজেকে ধূলার মত নত করে দিতেন। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন—'শঙ্করাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়বত্তাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।'

"এইভাবে তিনি একদিন খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—'যীশুখ্রীষ্টের সময় আমি জীবিত থাকলে আমি আমার চোখের জলে নয়,—বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।' অবনমিতের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল সমুদ্র সমান। তাঁর সেই বাণী কি আমাদের স্মরণ আছে?—'দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে; আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

"স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে সংগ্রামী, সেইজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। তিনি তাই দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'শক্তি শক্তি, শক্তির কথাই উপনিষদ বলেছেন',—স্বামীজী এই কথাই বারবার বলেছেন। চরিত্রগঠনের উপর তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছুই বলা হবে না, এমনি ছিলেন তিনি মহৎ, এমনি ছিল তাঁর চরিত্র—যেমন মহান তেমনি জটিল। তাঁর বিষয় বলতে গেলে বলতে হবে যে, তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতম স্তরের যোগ্য—সত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ, জাতির ও মানবসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানে তাঁর

জীবন উৎসর্গীকৃত। আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা—একথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না।

"যেভাবে স্বামী দয়ানন্দ বা আর্যসমাজীরা সংগঠনের কাজ করেছেন—স্বামীজীর সে ইচ্ছা ছিল না—এবং সে চেষ্টাও তিনি করেননি। হতে পারে এটা একটা ত্রুটি, কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে বলতেন—মানুষ তৈরী করাই আমার ব্রত—Man making is my mission. তিনি জানতেন যে, যদি দেশে সত্যকার মানুষ তৈরী হয় তাহলে সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হতে দেরী লাগবে না। তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষিত করবার জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন, কিন্তু কখনো তাদের ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু বা স্বাধীন চিন্তাকে খর্ব করবার চেষ্টা করতেন না। এই জন্যই কোনো শিষ্যকে তিনি বেশীদিন নিজের কাছে রাখতেন না। তিনি বলতেন যে, একটা বড় গাছের আওতায় অন্য একটা বড় গাছ কখনো বাড়তে পারে না। পরের যুগের মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর কতখানি প্রভেদ! তাঁরা স্বাধীন চিন্তা বরদাস্ত করতে পারেন না, এবং তাঁরা চান যে, আমরা তাঁদের পায়ে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সব সমর্পণ করে আমাদের সকল চিন্তার ভার তাঁদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি।"

[১৯৩২, ৬ই মে, সিওনি (মধ্যপ্রদেশ) জেল থেকে লেখা। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় অনূদিত]

১৩৩৭ সালে বেলুড় মঠে স্বামীজীর যে "ঊনসপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসব" পালিত হয় তাতে "কলিকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন" এবং সেই সভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* ও অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

---

* শরৎচন্দ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"আমার এস্থানে বক্তৃতা দেওয়া বিশেষ কারণে উচিত নয়, কারণ ধর্মের ব্যাপার আমি জীবনে আলোচনা করি নাই, জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা মানুষের জীবনের মধ্য দিয়াই যতদূর সম্ভব করিয়াছি।

"স্বামীজী আজ শুধু ভারতবর্ষের নহেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার আদর্শ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যাহাতে বর্তমানে সমস্ত শক্তি প্রয়োজিত হয়, তাহাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

"আমার বিশ্বাস, স্বামীজীর আদর্শ যদি আমরা অন্তরের সহিতই লইয়া থাকিতাম তবে দেশ আরও আগাইয়া যাইত। আমরা তাহা করি নাই বলিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সামান্য দিনের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে ভাঙ্গিয়া খাইতে হয়। তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও শিষ্যেরা যে আধ্যাত্মিক দিকটারই উপর সম্পূর্ণ জোর দিতেছেন, তাহার চাইতে বড়

সুভাষচন্দ্র বলেন,—

"স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমাদের সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় নাই—তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

"শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজীকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী—ধর্মসমন্বয়—তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।

"স্বামীজী দুইটি জিনিসের উপর জোর দিতেন—ত্যাগ ও চরিত্রগঠন। ত্যাগ ব্যতীত কোনো উপলব্ধিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের অভাব হয় নাই—ভারতে এমন সব প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা অন্য দেশের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের সমকক্ষ। যাহা অতি প্রয়োজনীয় তাহা এই—জনসাধারণের চিত্তের উদ্বোধন চাই। এই জন্যই স্বামীজী বলিতেন—'মানুষ গড়াই আমার কাজ।'

"স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহৎ। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে।" [উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৩৭]

সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থ থেকে—

"আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার; তাঁহার বইয়ের মধ্যে 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বইয়ের মধ্যে এসব বোধহয় পাইবে। আলাদা বইও বোধহয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও

জিনিস তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশকে ভালবাসা—আত্মত্যাগ। আমি নিজে পরকালের জন্য ব্যস্ত নই। দেশের স্বাধীনতার মধ্যেই আমি আমার চরম মুক্তি পাইব।

"আমার মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমরা মুখেই বলি, তাহা অন্তরে পৌঁছে নাই। তাহা আমাদের ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তাই আমাদের বাক্যে ও চিন্তায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। স্বামীজী অসত্যকে সকলের চেয়ে ঘৃণ্য বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।"

বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion', 'Jnanayoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িতে পার।" [মান্দালয় জেল থেকে লেখা]

[মান্দালয় জেল থেকে লেখা পরবর্তী এক পত্রে সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর এই গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে পড়তে বলেছেন—'স্বামী-শিষ্য সংবাদ', 'পত্রাবলী', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বক্তৃতাবলী', 'ভাববার কথা', 'চিকাগো বক্তৃতা'। দক্ষিণ কলিকাতা সেবকসমিতির গ্রন্থাগারে স্বামীজীর ঐ সকল বই পাওয়া যাবে এ কথাও তিনি ঐ পত্রে জানিয়েছিলেন।]

"আজ বাংলার অনেক কর্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—আমাকে ক্ষমতা দাও, কর্মচারীর পদ দাও, অন্ততঃপক্ষে কার্যকরী সমিতির সভ্য-করিয়া দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না। আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে—contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

'দাও দাও ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।'

"যে বাঙালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে, সে যে কতদিন আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?...

"আমি খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি, তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'দরিদ্র-নারায়ণের' সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব?"

[মান্দালয় জেল থেকে—১৯২৬ খ্রীঃ]

সুভাষচন্দ্রের 'নূতনের সন্ধান' গ্রন্থ থেকে—

"হে ছাত্রমণ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও, তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা কর, এবং নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।

"১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাংলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙালী ষড়্‌রিপু জয় করিবার, স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির

বলে শুদ্ধ বুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতিগঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন—Man making is my Mission—খাঁটি মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

"কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা মোটেই ভুলিয়া যান নাই। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্বধর্ম সমন্বয় ও সকল-মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তাবোধ নির্মিত হইতে পারিত না।...

"রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তখনও দেখা দেয় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মহানিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারতবিজয় একটা দৈব ঘটনা বা Divine dispensation. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom, freedom is the song of the Soul'—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

"স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন, এবং অপরদিকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন। [২১শে জুলাই, ১৯২৯]

"আজকাল তাই কোনো কোনো দেশে ism-এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিতেছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোনো ism-এর বা মতবাদের দ্বারা মানবজাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন—Man making is my mission—মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনোদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং ism-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ।...

"আমাদের সবই আছে, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্মবলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। ...এই Tenacity of purpose or Moral stamina কোথায় পাইব? বনে জঙ্গলে যুগযুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, সাধনা বা শক্তিসঞ্চয় হয় না।...

"সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এইভাবে—

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'" [২২শে জুন, ১৯২৯]

"রাজা রামমোহনের অসমাপ্ত কার্য নূতন গতিবেগ লাভ করিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট ধর্মের নবজাগরণ বাংলার সাহিত্য দর্শন ও অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইল, এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা ভ্রাতৃত্বের আদর্শপ্রচারে একত্র হইল। স্বামী বিবেকানন্দই বাংলার ইতিহাসকে নূতন পথে মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মানুষ তৈরীই আমার জীবনব্রত।

"মানুষ তৈরীর ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে তাঁহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই—তিনি সমগ্র সমাজকে একসঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী এখনো বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে—'নতুন ভারত বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে, কল-কারখানা থেকে।'

"কার্লমার্কসের গ্রন্থ হইতে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয় নাই। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ইহার উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।...

"জাতিগঠনের প্রথম ভিত্তি—মানুষ তৈরী, তারপরেই সংগঠন। স্বামীজী ও অন্যান্যরা মানুষ তৈরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং দেশবন্ধু চাহিয়াছেন রাজনৈতিক সংগঠন।" ['বাংলার একটি ব্রত আছে' রচনা]

"আমাদের হীন মনোবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না

করিয়া পারি না। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে একপ্রকার লঘুতা ও বিলাসপ্রিয়তা যেন প্রবেশ করিয়াছে—অথচ আজকাল দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কি সত্য? যদি তাহা হয় তবে তাহার কারণ কি? আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন ছাত্রমহলে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের' খুব প্রচার ছিল। আজকাল নাকি তরুণ সমাজের মধ্যে ঐ সাহিত্যের তেমন প্রচার নাই! তার পরিবর্তে নাকি লঘুত্বপূর্ণ এবং সময়ে সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ সাহিত্যের খুব প্রচার হইয়াছে। একথা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কারণ মনুষ্য সমাজ যেরূপ সাহিত্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তার মনোবৃত্তি তদ্রূপ গড়িয়া ওঠে। চরিত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।" ['দলাদলির হোক অবসান' রচনা]

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মত আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য। [৬।৩।৩৬—উদ্বোধন-সম্পাদককে লিখিত]

সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন

এই কলিকাতা নগরী কত প্রতিভার জন্ম দিয়াছে; শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে এবং ধর্মৈষণায় তাঁহারা শ্রেষ্ঠ—কিন্তু তাঁহাদের সকলের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মহাদেশের আত্মার তিনি প্রতিভূ। তিনি ইহার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার ও তাহার পূর্ণতার প্রতীকস্বরূপ। সেই আত্মিক শক্তিই ভক্তের সঙ্গীতে, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত। ভারতের এই চিরন্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়াছেন, বাণী দিয়াছেন।…

বুদ্ধের মতই বিবেকানন্দের জীবনেও একদিন এমন একটি মুহূর্ত আসিয়াছিল যখন তিনি অন্তর্জীবনের আনন্দে আত্মহারা হইতে চাহিয়াছিলেন, ধ্যানের আনন্দে ডুব দিয়া আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ

তাঁহাকে বলিলেন, 'কি লজ্জার কথা, নিজের মুক্তির জন্য এত আকাঙ্ক্ষা কেন ?' 'শিবমাত্মনি পশ্যন্তি।' সেই পরম আছেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে। সকল সৃষ্টিকে সেই ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া দেখিতে হইবে। তাঁহাকে যে নাম দেওয়া হইয়াছিল, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে সেই 'নরেন্দ্রনাথ' নামটি হঠাৎ আসে নাই। তিনি ছিলেন 'নর'-মূর্তি। 'নারায়ণং নরসখাং শরণং প্রপদ্যে'। নরসখা ও নারায়ণ এক। তিনি সর্ব নরের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, প্রত্যেক মানুষ যেন বাঁচিতে পারে, সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়, তাহাই চাহিয়াছিলেন। আমাদের অধিকাংশ শুধু টিকিয়া আছে, কিন্তু বাঁচিয়া নাই। আমরা প্রত্যেকে যেন শক্তিতে, সৌন্দর্যে ও মর্যাদায় ভূষিত হই, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা।..

আজ আমরা এক মহা সঙ্কটের সম্মুখীন—শুধু ভারতের নয়, ইতিহাসের ক্রান্তিক্ষণ! অনেকেরই ধারণা, আমরা সর্বনাশের গহ্বরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছি। জীবনের মূল্যবোধ বিকৃত, জীবনের নৈতিক মান অবনমিত, সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যবাদ এবং সর্বজনীন উন্মত্ততায় আমরা আক্রান্ত,—হতাশায়, উদ্‌ভ্রান্তিতে, পরাজয়ে আমরা অধঃপতিত। কিন্তু মানুষের আত্মার প্রতি এই অবিশ্বাস—মানুষের মর্যাদার প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা। যদি বিবেকানন্দের কোন বাণী এখন আমাদের স্মরণ করিতে হয় তাহা হইল আমাদের আত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার আহ্বান। মানুষের মধ্যে অনন্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা নিহিত আছে। মানুষের আত্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ অদ্বিতীয় অপূর্ব। শুধু আমাদের আশা রাখিতে হইবে। বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়াছেন আশা, নৈরাশ্যের মধ্যে সাহস। ২০.১.৬৩. —ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন—ভারতের রাষ্ট্রপতি

*

আমাদের আধুনিক ইতিহাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে যে-কেহ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে—স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা কত ঋণী! ভারতের আত্মমহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়াছেন। তিনিই ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা। ২০।১।৬৩ —চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী

*

জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করিবার মত মানুষ বিরল, আর যাঁহারা ঐ

নেতাদের নেতৃত্ব দেন, তাঁহারা বিরলতম। এই অতিনেতারা বহুদিনের ব্যবধানে পৃথিবীতে নামিয়া আসেন পতিত মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ অতিমানবিক আত্মাদের অন্যতম। সেই বিবেকানন্দের বিশাল প্রাণের স্মৃতিতে এই ভারতভূমি মহিমায় জাগ্রত,—যিনি এই ভূমিতে সর্বমানবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি ছিলেন অগণ্য যন্ত্রণাকাতর মানবপ্রাণের আধ্যাত্মিক দিশারি, যিনি পৃথিবীকে আলো দিবার জন্য বৈদিক সভ্যতার মহাগৌরব-দ্যুতিতে জ্যোতির্ময় হইয়া বিরাজিত ছিলেন। মাত্র বিবেকানন্দই পশ্চিমের সংশয়ী আত্মাকে অধ্যাত্ম শান্তি দিতে সমর্থ। প্রাচ্যভূমি হইতে তাঁহার পূর্বেও অধ্যাত্মদূত বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু কেহই প্রতীচ্যের কাছে এমন বিশ্বাসের সুরে কথা বলিতে পারেন নাই। যোগ্য গুরুর এই যোগ্য শিষ্য অধ্যাত্মশিখরে উত্থিত হইয়া মানুষের জাতিপার্থক্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য, সর্বজনীন প্রেম এবং সর্ব আত্মার অভেদত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম জগতের এই মহানেতার শতবার্ষিকী আমাদের মানবাত্মার মহিমার কথাই স্মরণ করাইয়া দিবে। স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা বৈদিক সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বড় ব্যাখ্যাতা সম্ভবপর নহে। কেবল ভারতবাসীই নহে, পাশ্চাত্ত্যবাসীরাও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ঋণী, কারণ তিনি ভাবী ইতিহাসের উপর তাঁহার 'বিবেক'-কে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। —ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

*

স্বল্পায়ু এই ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতের সর্বকালের সর্বোত্তম রাষ্ট্রদূত। তিনি এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার ভাব ও ভাবনার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত। তিনি অতীতের মানুষ, কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা ও মানসবিকাশ এত গভীর ও ব্যাপক যে, তিনি সেই সময়ে যে-কথা বলিয়াছিলেন সেগুলি একালেও প্রযোজ্য। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় মনের অধিকারী। স্বামীজীর সমান ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে কমই আছে। তিনি সমগ্র জাতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ইহার গোপন আশা আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়াছিলেন। প্রোজ্জ্বলমনা এই সন্ন্যাসীর মুখের বা লেখার প্রত্যেকটি কথা ছিল অগ্নিশিখার মত। ভারতে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে বিশ্বের নিকট পরিচিত করাইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার চেষ্টা। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহার আশা ছিল, সে আশা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ১৭।১।৬৩

*

স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের নিকট দেশবাসীর সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষণীয় হইল ভয়কে পরিহার করা। তিনি তাঁহার শিক্ষা ও কার্যক্রম দ্বারা জাতির জীবনে

নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যে মানুষ দুর্বল ও ভীরু তাহারা জীবনে কিছুই অর্জন করিতে পারে না। স্বামীজী যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন তাহা ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত; তাঁহার বাণী ও কার্য লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

স্বামীজী চল্লিশ বৎসর পূর্তির পূর্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কালের বালুবেলায় স্থায়ী চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হয় কত গভীরভাবে তিনি বাঁচিয়াছিলেন।

যদি আমাকে বালক ও যুবকদের নিকট একজন আদর্শ পুরুষের নামোল্লেখ করিতে হয় আমি প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দের নাম করিব। তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক। —৩।২।৬৩ —জওহরলাল নেহরু

*

স্বামী বিবেকানন্দ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন। তিনি ভারতের সমগ্র ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম দূত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্য জগৎ যে বস্তুবিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাহার সহিত প্রাচ্যের অতুলনীয় আত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে চাহিয়াছিলেন। যদি স্বামীজীর এই সমন্বয়াদর্শকে কার্যকর না করা হয়, যদি নিছক মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটাইয়া যাওয়া হয় এবং তাহার সঙ্গে একইভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটানো না হয়, তাহা হইলে আমরা অনিবার্যভাবে এক সঙ্কট হইতে অন্য সঙ্কটের দিকে আগাইয়া যাইব। —২৮।৩।৬৩

উ. থাণ্ট—ইউ. এন. ও-র সেক্রেটারী-জেনারেল

*

এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দের তুল্য শাঙ্কর বেদান্তের বোদ্ধা ও আচার্য আমার মতে আর কেহ নাই। মহারাষ্ট্রের জ্ঞানদেব, কর্ণাটকের বিদ্যারণ্য প্রভৃতির নাম মনে পড়ে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ কালে নিজ প্রদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল আচার্যই পুরানো কালের। আমাদের কালে বেদান্তের সুমহান আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কোনো নাম আমাদের মনে আসে না, যিনি সমগ্র জগতের দৃষ্টিকে এমন শক্তির সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

পূজা-উপাসনা এবং অদ্বৈত একই সঙ্গে চলিতে পারে ইহা শঙ্করের শিক্ষার মধ্যেও ছিল। শঙ্কর নিজে সমবেত পূজার ব্যবস্থা করিয়া এ ব্যাপারের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহা তদানীন্তন সমাজের প্রয়োজন পূরণ করিয়াছিল। কিন্তু

আধুনিক যুগে তাহাই যথেষ্ট নহে। তাহা উপলব্ধি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস পুরাতন পদ্ধতির সঙ্গে ঐস্লামিক ও খ্রীষ্টীয় উপাসনাও যুক্ত করিলেন। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্তম শিষ্য।...

এই সমন্বয়ে বিবেকানন্দের বিশেষ দান হইল তিনি অদ্বৈতের সহিত দরিদ্র-নারায়ণকে যুক্ত করিলেন। দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি বিবেকানন্দের সৃষ্টি।...দরিদ্রনারায়ণ শব্দটি লোকমান্য তিলকের নিকট খুবই প্রিয় ছিল, এবং বিবেকানন্দের পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন; মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতের প্রতি গৃহে বহন করিয়া লইয়া যান এবং ইহার অনুসরণে গঠনমূলক কাজ সুরু করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতিভা এক জাতীয়। বহির্জীবনে মহাত্মা গান্ধী লোকমান্য তিলক অপেক্ষা অধিকতর অন্তর্মুখ, এক্ষেত্রে তিনি বিবেকানন্দের নিকটবর্তী।

দুর্গতের সেবাই যে ঈশ্বরের সেবা—এই সত্যকে বাণীতে ও নিজ জীবনে প্রমাণ করার ব্যাপারে যীশুখ্রীষ্টের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ আরও গভীরভাবে ভারতকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার ছিল সর্বাত্মক করুণা—সর্ব জীবে পরিব্যাপ্ত। নিঃসন্দেহে তাহা সুমহান প্রেরণা, কিন্তু মানুষকে প্রত্যক্ষ সেবার যে ব্রতের কথা আমরা বলিয়া থাকি তাহা খ্রীষ্টের শিক্ষার মধ্যে প্রথম ব্যাপক ও বিশিষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আমি খ্রীষ্টকে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী, যদিও শঙ্করাচার্যের মত দার্শনিকভাবে নন।...দার্শনিক বিচার ছাড়িয়া দিলে খ্রীষ্টের প্রকাশ্য ভূমিকা অদ্বৈত বৈদান্তিকের। পলের রচনায় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু ভারতীয় বেদান্তের কথা ভাবিলে একথা বলিতেই হইবে, বিবেকানন্দই বেদান্ত ও অদ্বৈতের মধ্যে সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বিরাট কাজের ফলেই ভারতবর্ষ জীবনের ক্ষেত্রে সমন্বয়াদর্শ লাভ করিয়াছে, যাহাতে অদ্বৈত বিজ্ঞানের সঙ্গে বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি, নরসেবা এবং সর্বজীবসেবা সমন্বিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দ গুরুসেবার আদর্শও দিয়া গিয়াছেন।...গোবিন্দ পূজ্যপাদ ও শঙ্করাচার্য, নিবৃত্তিনাথ এবং জ্ঞানদেব, আসামের মাধবদেব ও শঙ্করদেবের মত আধুনিক যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।...গুরুশিষ্যের সম্পর্কের সর্বোচ্চ আদর্শ আমরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যেই পাইতেছি।

বিবেকানন্দ প্রচারক ছিলেন। সেণ্টপলের মত তাঁহারও সমাধি হইত। সমাধি সত্ত্বেও কি সেণ্টপল, কি বিবেকানন্দ কেহই তাঁদের অন্তরের স্থৈর্য ও শমতা হারান নাই। অদ্বৈতবাদীর কাছে অভাবিত বা আশ্চর্যজনক কিছু থাকিতে পারে না। যে

অদ্বৈতবাদী স্থৈর্য হারান তিনি তাঁহার অদ্বৈতকেই হারাইয়া ফেলেন। প্রতীচ্যে সেণ্টপল ইহা আমাদের দেখাইয়াছেন, প্রাচ্যে দেখাইয়াছেন শঙ্করাচার্য, আমাদের কালে বিবেকানন্দ। —আচার্য বিনোবা ভাবে

*

স্বামী বিবেকানন্দ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। তখন ইংরাজেরা আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থাও এ দেশের মাটিতে তার শিকড় বিস্তার করেছে। রামমোহন-প্রমুখ মনীষীরা আগেই বুঝেছিলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে এই পশ্চিমী ভাবধারার সমন্বয়ের উপর।...পূর্ব এবং পশ্চিমকে মেলানর এই যে প্রচেষ্টা তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সুরু করেছিলেন, তাই পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করেছিল বিবেকানন্দের মধ্যে।...

তাঁর নিজের মধ্যে অসীম শক্তির যে উৎস ছিল, তা সব সময় প্রকাশের পথ খুঁজত। সমস্ত জীবন এই অদম্য শক্তি তাঁকে পৃথিবীময় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। আর যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই মানুষ তাঁর মধ্যে এই প্রাণের প্রবাহ দেখে নিজেরাও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মানুষকে তার মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার কাজে সে যুগে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ ছিলেন না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতের আর এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের মত বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু শঙ্করও যেমন তাঁর সেই স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের মধ্যে সারা ভারত বারবার পরিক্রমা করে ভারতীয়দের মধ্যে এক নতুন প্রাণরস সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন, স্বামীজীও তেমনি উনবিংশ শতাব্দীতে ঝড়ের মত ভারত এবং পশ্চিমের দেশগুলি পরিভ্রমণ করে রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মমত সমন্বয়-সাধনের নতুন বাণী প্রচার করেছিলেন। গোঁড়ামিমুক্ত তাঁর এই নতুন ধর্মমতই শিকাগোতে এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমকে এত অভিভূত করেছিল।

আমরা বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই।

—ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু—জাতীয় অধ্যাপক। [হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউসন পত্রিকা থেকে মুদ্রিত।]

আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ

নিবেদন

বনফুল

দেব,

আজ তোমার জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তোমাকে স্মরণ করিতে গিয়া লজ্জায়, কুণ্ঠায়, সঙ্কোচে শির অবনত হইয়া গিয়াছে। তোমার বাণী আমাদের কর্ণে একদা হয়তো প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু মর্মে প্রবেশ করে নাই। তাহার প্রমাণ, তোমার জীবদ্দশায় বাঙালী জাতির যতটুকু মর্যাদা ছিল, তাহাও আর নাই। কুক্কুরের মতো দলে দলে আমরা আজ মদগর্বিত অসাধু প্রভুর পদলেহন করিতেছি। তোমার আদেশ ছিল, মানুষ হও, আমরা অমানুষ হইয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্মযোগী হও, আমরা কামিনী কাঞ্চনের দাস হইয়া কর্মযোগীর ছদ্মবেশে তস্কর হইয়াছি। বেদ উপনিষদ গীতা পুরাণের মহিমা কীর্তন করিয়া তুমি আমাদের আদর্শ হিন্দু হইবার উপদেশ দিয়াছিলে, আমরা ধিক্কারজনক বিদেশী উপন্যাস পড়িয়া, সিনেমা দেখিয়া, বার-বনিতাদের নামাবলী মুখস্থ করিয়া আধুনিক হইয়াছি। তুমি আমাদের স্বদেশী হইতে বলিয়াছিলে, আমরা নকল সাহেব হইয়াছি। আমাদের ভারতবর্ষ আজ দ্বিধা-বিভক্ত। যাহারা এ দেশের শাসক তাহারা আজ ভিক্ষা-পাত্র হস্তে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের দুর্গতির অন্ত নাই। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, কর্ম নাই। তুমি বলিয়াছিলে, অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে আমাদের মুক্তি নাই। আমরা আজ সকলেই ভীত। আমরা মাতৃভাষায় কথা বলিতে ভয় পাই, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতে ভয় পাই, মাতৃভূমির সুসন্তানদের সম্মান করিতে ভয় পাই। একদিন বাংলাদেশে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় 'রক' স্থাপিত হইয়াছে। তোমার সমকালীন লেখকেরা তাঁহাদের রচনায় সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ প্রচার করিতেন, আজকাল লেখকরা কাম-ক্লিন্ন সাহিত্য রচনা করেন এবং তাহাই জনপ্রিয় হয়।

হে দেব, হে বহ্নি, হে প্রদীপ্ত পাবকশিখা, হে সূর্য-সমুজ্জ্বল মহাপুরুষ, তোমার নাম উচ্চারণেরও আমরা অধিকারী নই। আমরা ঘৃণ্য, পতিত, অন্ত্যজদের সমগোত্র হইয়া তোমার অমর বাণী বিস্মৃত হইয়াছি। তোমার বজ্র এই কর্দমাক্ত প্রস্তরকে বিদীর্ণ করুক।

বেদান্ত ও বিবেকানন্দ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারত-ইতিহাসের সূচনাপর্ব হইতেই বিভিন্ন উপায়ে ভারতবর্ষ মানুষের সেবা করিয়া আসিয়াছে এবং মানুষের আত্মোপলব্ধি ও সুখের জন্য সর্বস্ব দান করিয়াছে, আধুনিক কালের ভারতবাসী ইহার জন্য বিনয়-নম্র গর্ববোধ করিতে পারেন। অন্তর্দৃষ্টি, পরমতসহিষ্ণুতা, অপরের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শান্তি, সহযোগিতা, প্রেম, মানবসেবা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারত একটি বিশেষ পন্থায় তাহার ভবিষ্যৎকে সার্থক ও সফল করিতে চাহিয়াছিল। যে বেদের মধ্যে দেহ, মন ও আত্মাসম্পর্কীয় ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণা নিহিত আছে, সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে এদেশে লোকশিক্ষক, জননেতা, মুনি-ঋষি, সন্ত-সাধক, বস্তুবিজ্ঞানী, মননশীল মনীষী ও কর্মীদের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলের ভাবাদর্শই ভারতের গৌরবময় ঐশ্বর্য্য ও বিস্ময়কর ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। বুদ্ধদেবের উক্তি হইতেছে 'ধর্মদান সর্বদানের উপরে'। মিসর, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, রোম, ঈরান, চীন, আরব, মোঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দেশের মত ভারতবর্ষও বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প; দর্শন, শিল্পকলা, সংগঠন ও কর্মযোগের নানা বিচিত্র ব্যাপার বিশ্ববাসীকে দিয়াছে, কিন্তু চিন্তা ও মানসিক সমন্বয়ের জগতেই ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয়। বৈদিকযুগের প্রারম্ভে এবং উপনিষদের যুগে—অতি প্রাচীন কাল হইতেই, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জগৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব Weltanschanng অর্থাৎ জীবনদর্শন ও আচার-আচরণের বিশেষ বিকাশ সাধন করিয়াছে। এই জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিবার পরই, ভারতবর্ষ ইহাকে বিশ্বে সঞ্চারিত করিবার ব্রত লইয়াছে; এই আদর্শের নাম দেওয়া যায়, Indianism বা ভারতীয়তা অথবা 'ভারত-ধর্ম'—ভারতীয় আদর্শকে কর্মের মধ্য দিয়া উপলব্ধির চেষ্টা। বুদ্ধিগত হেতুবাদ ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের দ্বারা লব্ধ এমন কয়েকটি ধারণা ও আচরণের উপর এই ভারতীয় পন্থা বা 'ভারতধর্ম' প্রতিষ্ঠিত, যাহার উদার প্রয়োগ ও প্রভাব দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ভাগ্যের উত্থানপতন এবং পুনঃপুনঃ আদর্শচ্যুতি সত্ত্বেও চিন্তাশীল লোক-শিক্ষক ও সমাজ-সংগঠকদের কৃপায় 'ভারতধর্ম' বা ভারতীয়ত্বের মর্মবাণীটি আমরা আজও বজায় রাখিতে পারিয়াছি।

যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ 'ভারত-ধর্ম' অনুশীলনের জন্য সমগ্র জীবন দান করিয়াছেন,

তাঁহাদের মতানুসারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভারতীয় জীবনদর্শনের মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে :—

(১) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত, জগদ্ব্যাপী ও জগদাতীত এক অখণ্ড নিত্যবস্তুতে বিশ্বাস।

(২) জীবাত্মা বা ব্যক্তিচৈতন্য এই নিত্যবস্তু বা ব্রহ্মস্বরূপের অংশীভূত, এবং ইহার উপলব্ধিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য।

(৩) ভারতীয় চিন্তাধারা এই নিত্যবস্তু সম্বন্ধে কোন যুক্তিহীন ও বদ্ধমূল মতবাদে বিশ্বাসী নহে, বরং ব্যক্তির বুদ্ধি বা অধ্যাত্মশক্তি এবং সাধনানুসারী বহুবিধ বিভিন্ন মতের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করিয়া থাকে।

(৪) ইহার ফলে, কোন ঐক্যমতাবলম্বী আদর্শ ও ধর্মপন্থা সকলের উপর বলপূর্বক আরোপিত হয় নাই, বরং ইহাতে উদারতম সহনশীলতা এবং চিন্তা, দর্শন ও ঈশ্বরোপাসনার অসীম স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে।

(৫) জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ—ইহাদের যে কোনও একটি বা একাধিক পথের মাধ্যমে নিত্যবস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে।

বহুবিধ জাতিসংমিশ্রণে ভারতের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এমন সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস ও আশ্রমব্যবস্থা, বিশেষ ধরনের ধর্মীয় কৃত্য ও আচার-বিচার বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যেগুলিকে কোনও দিন অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক বলিয়া মনে করা হয় নাই। কর্মবাদ, সংসার অর্থাৎ আত্মার দেহান্তর গ্রহণ ও অহিংসা প্রভৃতি কতকগুলি মতবাদ ও আচরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। জীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাযথ সাধনকেই মানুষের পুরুষার্থ বলা হইয়াছে।

ইহাকেই ভারতীয় জীবনাদর্শ বলে। ভারতীয়-আদর্শ বা ভারত-ধর্মের মূল কথা—নিত্যবস্তুর একত্ববোধ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্তর সমন্বয়, এই বোধের সংজ্ঞা ও সূত্র বেদ-উপনিষদ্ এবং মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্গীতায় পাওয়া যাইবে—ইহাই বাহ্যতঃ ভারতের 'বেদান্তদর্শন'। পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্মবিশ্বাস নাই, যাহাতে পরিস্ফুট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বেদান্তানুসারী তত্ত্বকথার কিছু না কিছু নিহিত নাই। বিগত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া বেদান্ত ও ইহার নানা শাখাপ্রশাখা ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় মধ্যমণি বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ এই দর্শনের মূল তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনে প্রয়োগ করিয়াছে ; ভারতের বাহিরে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও ইহার অর্থ অনুধাবন ও উপলব্ধি করিয়াছেন। নানা দেশের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা বিভিন্ন সময়ে এইরূপ ভাবাদর্শে, বিশেষতঃ চৈতন্যের সর্বব্যাপী একত্বে

উপনীত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ও চিন্তানেতা Aldoux Huxley আলডুস হাক্‌স্‌লি তাঁহার *Perennial Philosophy* অর্থাৎ 'শাশ্বত দর্শন' অথবা 'সনাতন ধর্ম' নির্ণয়ে বেদান্তের এই সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভারত এবং ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট অঞ্চলে একত্বে বিশ্বাসী ভাবাদর্শ ও পরমত-সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমে ইহার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলে অবহিত হইতে পারেন নাই; কারণ সেখানে অলীক গালগল্প সমন্বিত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত ধর্ম এবং যুক্তিবিরোধী জ্ঞানবিশ্বাস লোকচিত্তে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যে মানুষের মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন জিজ্ঞাসা কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষেও আমরা মাঝে-মাঝে এই ভারত্‌-তত্ত্ব বা 'ভারত-ধর্ম'কে হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই আমাদের দেশে যুগে-যুগে এইরূপ লোকশিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছে। ইঁহারা নিজেরা ব্রহ্মের সর্বব্যাপী একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং সাধারণ লেখা, গান ও কথার মাধ্যমেই এই তত্ত্বের জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রচার করিয়া, পরব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্ব-তত্ত্ব, অনির্বাণ দীপশিখায় ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছেন। নিজ নিজ বিশিষ্ট পদ্ধতিতেই তাঁহারা এই সমস্ত তত্ত্বোপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। এক এক যুগের নরনারীগণের ও তাহাদের সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজনানুসারে ইঁহারা উদ্দিষ্ট তত্ত্বকে বিশেষ-বিশেষ অলঙ্কার ও ভাষায় সজ্জিত করিতেন। এইজন্য ভারতে আমরা বিচিত্র প্রতিভাধর ও বিশাল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মুনি-ঋষি, জিন-বুদ্ধ, ভক্ত-যোগী নয়ন্‌মার, অব্‌বার এবং সুফী পীর-মুর্শিদদের লাভ করিয়াছি। অন্যান্য দেশেও Akhenaten আখেন্‌-আতেন, Moses মূসা, Isaiah ইশায়াহ্‌, Lao-tsze লাউ-ৎসে, Confucius কন্‌ফুশিউস্‌, Mo-tsze মো-ৎসে, Zarathushtra জরথুশ্‌ত্র, Pythagorus পিথাগোরাস্‌, Socrates সোক্রাতেশ, Plato প্লাতোন্‌, Jesus Christ যীশু খ্রীষ্ট, নবী মুহম্মদ এবং মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ অধ্যাত্মবাদী লোকশিক্ষকগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

গীতায় আছে, মানব-হিতার্থে জগতে ধর্ম সংরক্ষণের জন্য ও অধর্মের দূরীকরণের জন্য অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ও অজ্ঞান ও পাপের নাশের জন্য, ভগবান্‌ পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হন। ঐশী নির্দেশে গত শতাব্দীতে এই ব্যাপার আর একবার সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুগ্ম সত্তা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া যাওয়ায়, এ যুগে আবার নূতন করিয়া মানুষের জীবনে নিত্যবস্তু-ঘটিত তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন হইল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষায় প্রাচীন মুনিঋষিদের তত্ত্বদর্শন, বেদান্ত এবং অন্যান্য দেশের অনুরূপ চিন্তাপ্রণালী সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

সমগ্র বিশ্ব ও ভারতবর্ষের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যের অন্তরশায়ী নিদ্রিত গুণ ও শক্তিকে জাগরিত করিয়া বাহিরে আনিলেন, নিদ্রিত সিংহকে জাগাইয়া দিয়া তাঁহার আত্মার ক্ষুধা দূর করিলেন। বিবেকানন্দ যেমন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, তেমনি গুরুর নির্দেশে ভারতের সমাজ-নির্যাতিত দীনদুঃখী মানবের সেবায় এবং পাশ্চাত্ত্যদেশের ঈশ্বর-চেতনায় উদাসীন বা অজ্ঞ জনসাধারণের চিত্তের উদ্বোধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তিনি ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, এবং দরিদ্রতম অসহায় ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশা নিজে মর্মে-মর্মে অনুভব করিয়া, তাহার প্রতিবিধানে তাঁহার দেহ ও মনের সমস্ত নিরুদ্ধ কর্মশক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাদিগকে সর্বপ্রথম বাস্তব জীবনে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি, নীতি ও অধ্যাত্ম জগতে মানুষের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। এইভাবে, গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ জননেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন।

আমি যখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি, বিবেকানন্দ আমার জন্য কি করিয়াছেন; আমার দেশবাসীদের সম্বন্ধে তিনি কি করিয়াছেন; এবং সমগ্র মানব-জাতির জন্যই-বা কি করিয়া গিয়াছেন?

তিনি আমার জন্য কি করিয়াছেন, তাহা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, অন্য কোন উপযুক্ত সময়ে তাহার আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে আমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন যে, আমি নিজের সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাণে সচেতন হইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, আমি কি, আমার দেহ-মন-আত্মার দিক হইতে কি হওয়া মানুষ বলিয়া আমার পক্ষে অপেক্ষিত। তাঁহারা আমার চিত্তের ও আত্মার রিক্ততা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ সদ্বস্তুর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, যাহার ফলে আমার মধ্যে চিন্তা ও কর্মের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। উপনিষদ ও গীতায় যাহাকে 'সনাতন ধর্ম বা শাশ্বত দর্শন' (আল্‌ডুস্ হাক্‌স্‌লির *Perennial Philosophy*) বা বেদান্ত বলা হয়, এবং অতীত ভারতের ভূয়োদর্শন ও বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা—ইহারই অভিমুখে তাঁহারা আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন; সংশয় ও নৈরাশ্য এবং আশা ও আশঙ্কার মানসিক সঙ্কটে কেবল এই তত্ত্বই অধ্যাত্ম ও অধিমানসের মধ্যে একপ্রকার সমানুপাত রক্ষা করিতে পারে। সৌভাগ্যবশতঃ কৈশোর হইতেই

আমি স্বামীজীর বাণী ও রচনা পাঠ করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি, তাঁহার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছি,—আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা তাঁহার বাণীর দ্বারাই বিকাশ লাভ করিয়াছে। অনুরূপভাবে আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। পরবর্তী কালে, ১৯১১ সাল হইতে ১৯৪১ সালে কবিগুরুর তিরোধান পর্য্যন্ত, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল ; ইহার ফলে সৌন্দর্য-চেতনা, অধ্যাত্মবোধ ও বিশ্বমানবতার মধ্য দিয়া সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া মনন ও সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব নীরস হইয়া যায় নাই, প্রাণদ সূর্য্যকর ও জলবিন্দুর সহায়তায় চিত্তকুসুমের দলগুলি কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত হইতে পারিয়াছে।

বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশের জন্য কি করিয়াছেন? আজ সারা দেশে স্বতোস্ফূর্তভাবে সর্বশ্রেণীর নরনারী যেভাবে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার দেশবাসীরা কৃতজ্ঞ চিত্তে জানাইতেছে যে, তিনি দেশের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে তিনি দেশবাসীকে ক্লৈব্য হইতে, জড়ধর্মী তমোগুণ হইতে, আত্মঘ্ন আত্মতৃপ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বিশ্বদ্রষ্টা অবতার পুরুষের মত দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে, তিনি বহু শতাব্দী পরে দেখাইয়া দিলেন যে, বেদান্তাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম বর্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ; পরাচেতনা-সম্পর্কিত যে-কোনও নৈষ্ঠিক চিন্তা ইহাতে সাদরে গৃহীত হইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে এই আদর্শ মানুষকে সঞ্জীবনের অভিমুখে পরিচালিত করিবে। তাঁহার অগ্নিবাণীর স্পর্শে আমাদের জড়ত্ব ও নিষ্ক্রিয়তা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। যে দর্শন মানুষকে দেবতা বলিয়াছে, তাহার ভ্রান্তব্যাখ্যার ফলে আমরা আমাদের ভাইয়ের প্রতি, আমাদেরই আত্মার অপর প্রকাশের প্রতি অবিচার করিয়াছি। তাই তিনি এই সমস্ত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমাদের আহ্বান করিয়াছেন। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম তীব্র আবেগের সঙ্গে এই আবেদন করিয়াছেন যে, অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি সুবিচার না করিলে আমাদের আর রক্ষা নাই। আজ যে জনকল্যাণের জন্য নানা চেষ্টা করা হইতেছে, ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার বিদ্যুদ্গর্ভ বক্তৃতা ও উদ্দীপক মন্তব্য। তাঁহার এই-সমস্ত মতামত ও ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাইয়া হয়তো কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, অধ্যাত্মধর্ম অপেক্ষা মানুষের বাস্তব কল্যাণ ও অবহেলিত জনসাধারণের সামাজিক অধিকারের কথাই তিনি বুঝি অধিকতর আবেগের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদ তাঁহাকে এই দীক্ষা দিয়াছে যে, মানবসেবা ও দেবসেবা একে অপরের পরিপূরক।

ইহা যেন একই বস্তুর দুই দিক মাত্র। কর্ম-কেন্দ্রিক করুণা-মৈত্রী, বিশ্বপ্রেম ও মানব-কল্যাণ, ভক্তি ও জ্ঞানের অনুপন্থী মাত্র।

ভারতীয় চিন্তাধারা এবং জীবনবোধকে বিশ্বসভায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং ইহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি আমাদের জন্য একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া, হৃত উদ্দীপনাকে পুনরুজ্জীবিত করাও তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁহার শ্রেষ্ঠা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই দেখাইয়াছিলেন, ভারতের বহু-আকাঙ্ক্ষিত ঐতিহ্য ও দর্শনকে রক্ষা করিতে হইলে শুধু অন্তরঙ্গাশ্রয়ী প্রচেষ্টার এখন আর প্রয়োজন নাই। আত্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান লাভ করিয়া হিন্দুকে আজ নৈষ্ঠিক ও উদ্যমশীল হইতে হইবে, নিজ আদর্শের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ও সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না। অবশ্য এই aggressive অর্থাৎ প্রতিস্পর্ধী মনোভাবের মধ্যে কোন মন্দ জিনিস নাই। এখন এমন এক সময় আসিয়াছে যে, সকলের কল্যাণের জন্য হিন্দুর সংস্কৃতি, চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম ও কর্মপন্থা জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের যুবক-যুবতীরা যাহাতে গভীরভাবে জীবনকে উপলব্ধি করিয়া, মনোবল ও শারীরিক শক্তির অনুশীলন করিতে পারে, লৌহের মত পেশী, ইস্পাতের মত কঠিন স্নায়ুর অধিকারী হয়—ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তিনি যে ত্যাগব্রতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, বহু উৎসাহী যুবকের হৃদয়েও সেই উদ্দীপনা ও ইচ্ছাশক্তি সঞ্চার করিতে পরিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সর্বান্তঃকরণে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং তাহারই সঙ্গে ছিলেন মার্জিতবুদ্ধি আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবতাবাদী, কারণ তাঁহার নিকট প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরেরই অংশমাত্র বলিয়া শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিল।

ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশী আন্দোলন, কর্মপন্থা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পট-ভূমিকায় তাঁহার প্রভাবই বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছিল; তাঁহার তিরোধানের অল্প পরেই সর্বভারতীয় জাতীয় উদ্দীপনার প্রথম সূচনা হয়। তাঁহার আদর্শ ও উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, সশস্ত্র পন্থায় দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য এদেশের যুবকগণ গীতার শ্লোক কণ্ঠে ধারণ করিয়া ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়াছেন। যাঁহারা হিংসার পন্থা অনুমোদন করিতেন না, তাঁহারাও বিবেকানন্দের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে জনসেবা ও দেশসেবার ব্রত উজ্জীবিত করিবার জন্য সর্বপ্রকার দুঃখনির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। ইহাকে মনগড়া ভাবের সহিত অলস লীলা-খেলা বা ভাববিলাস বলা উচিত হইবেন না। তাঁহারই আদর্শে আত্মবিচার ও কর্মৈষণা জাগ্রত হইয়াছে—যাহার পরিণতি 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর প্রতিষ্ঠা। আজ যাট বৎসর ধরিয়া মিশন মানবসেবা ও মানুষকে নবজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব বহন

করিয়া চলিয়াছেন। ইহারই সঙ্গে তাঁহারা মন ও আত্মাকে দীক্ষিত করিয়া ভারতবর্ষকে আত্মধর্মে অবিচল রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন; বিশ্বমানবের বুদ্ধির জগতে সংহতি-সাধনেরও পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

অতঃপর তৃতীয় প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির জন্য কি করিয়াছেন? রামকৃষ্ণ মিশন ও বেদান্ত-কেন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণপন্থী সন্ন্যাসীরা, যাঁহারা বিবেকানন্দের রচনা ও কর্মাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত, এবং য়ুরোপ, আমেরিকা ও এশিয়াতে এই আদর্শ প্রচারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিবেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দের যোগদানের ফলে একটা বিশিষ্ট মানব-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত সমাজে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, তাহা অপক্ষপাত ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন। বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, শিল্পকলা ও সাহিত্যে য়ুরোপ ও আমেরিকা বিশেষ উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু মানবসত্তা ও নিত্যসত্তার সম্পর্কবিষয়ে, দুই একজন জ্ঞানী ও গুণীকে বাদ দিলে, আর সকলে এ বিষয়ে নিতান্ত নিম্নস্তরের অধিবাসী। তাহারা নিজ-নিজ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অনৈসর্গিক, অযৌক্তিক ও সঙ্কীর্ণ ধর্মবিশ্বাসকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট ছিল; কেহ-বা মনে করিত, তাহাদের বিচারধারা ধর্মমত পুরাপুরি গ্রহণ না করিলে, ক্রুদ্ধ ভগবান্ অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি দিবেন। বিবেকানন্দ বেদান্তের অন্তর্ভুক্ত যে সুষম যুক্তিবাদ প্রচার করিলেন, তাহার দ্বারা বিশ্বের সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মানুষ পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়াছে। যেখানে ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত ঔদ্ধত্য ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের যুক্তিহীন প্রতিবাদ, সেখানে বিবেকানন্দ আনিলেন বিশ্বমানবতার পটভূমিকায় উপস্থাপিত বিনয় ও বিচারবুদ্ধি। আত্মানুসন্ধিৎসু ও সত্যসন্ধ ব্যক্তিদের চিত্তলোকে তাঁহার প্রভাব যাদুমন্ত্রের মতো অতি দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া বেদান্তের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর হইতেছে। বেদান্ত গ্রন্থই শুধু প্রচারিত হয় নাই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহাদের গুরুর জীবনের পটভূমিকায় বেদান্তকে কর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম ও অধ্যাত্ম দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্ত্য মানব যে অসহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করিত, এবং নিজেদের ধর্মের প্রতি তাহাদের যেরূপ অন্ধ আসক্তি ছিল, তাহার প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে। বিচক্ষণ পাশ্চাত্ত্য নরনারীর আধুনিক মনোভঙ্গি বিশ্লেষণ করিলেই আজ একথা অতি স্পষ্ট হইবে। অন্যের ধর্ম যথাযথভাবে বুঝিবার জন্য তাঁহাদের মনোভাবও ধীরে-ধীরে সকলের অগোচরেই পরিবর্তিত হইতেছে।

ইহাই বিবেকানন্দের মানবসেবায় সর্বোৎকৃষ্ট দান। য়ুরোপ-আমেরিকার সূক্ষ্ম চিন্তাশীল ও অধ্যাত্মরসের লেখকগণ বিবেকানন্দের এই অবদান শিরোধার্য করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত—য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রকাশিত দুইখানি বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ—*Vedanta for the Modern Man* ও *Vedanta for the West*. এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়া ও জাপানেও জনসাধারণের চিত্তে বিবেকানন্দের প্রভাব পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ ভক্ত ; তিনি বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুই জনেরই রচনাবলী পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি জাপানের জনচিত্তেও বিবেকানন্দের বাণী প্রভাব বিস্তার করিতেছে ; ওদেশে পূর্ব হইতেই বেদান্তের মতই সূক্ষ্ম তত্ত্বে পরিপূর্ণ মহাযান-বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ, ভাষ্য ও আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল, জাপানী ভাষায় গীতা ও উপনিষদের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। এখন বিবেকানন্দের বেদান্তবিষয়ক উপদেশ এখানে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে।

এইভাবে বিবেকানন্দ তাঁহার মাতৃভূমিকে পরম গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন ; তাঁহার কৃপায় ভারতবর্ষ তাহার মৌলিক ভারত-ধর্মকে অনুধাবন করিতে পারিয়াছে, অধ্যাত্ম-চেতনার মধ্য দিয়া জীবসেবা পুনরায় সার্থক হইয়াছে। তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন মূর্ত বেদান্ত, তিনিও তেমনি 'ভারত-ধর্মের' মূর্ত বিগ্রহ ; তাই আজ বিশ্ববাসী কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের সঙ্গে একযোগে এই মহাপ্রাণের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। জ্যোতিঃস্বরূপ বিবেকানন্দের দিব্যবিভা ক্রমশঃ সহস্রমুখী হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতিঃশিখা বিশ্বের দূরতম প্রান্তে পৌছাইবে। এই আলোকের তলেই আমরা মানুষকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি—এ দীপ চিরদিন অনির্বাণ থাকিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা

দিলীপকুমার রায়

আবাল্য শুনে এসেছি মানবচরিত্র সর্বত্রই এক। রটনাটা যে মূলতঃ অসত্য এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু তবু ওদেশের বহু নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করে আমার বারবারই মনে হয়েছে যে, ওদের মনপ্রাণ আমাদের থেকে বেশ একটু আলাদা। সাধারণ ভাবে যে-কোনো সূত্র দিতে গেলেই মুস্কিলে পড়তে হয় মানি, তবু বলব—না, দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি না কেন: ওদের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রতিভার স্ফুরণ সহজ, আমাদের মধ্যে দার্শনিকতার প্রভাব বেশি। ওদের মধ্যে রাজসিকতা প্রবল, আমাদের মধ্যে তামসিকতাই বেশি চোখে পড়ে, অথচ সেই সঙ্গে এ-ও না বলে পারি না যে, আমাদের মধ্যে মহাজনরা যত সহজে সাত্ত্বিক হতে পারেন ওদের মহাজনরা কিছুতেই তত সহজে নিরীহ নিবৃত্তিমার্গী হতে পারেন না। অন্যভাবে বলা যায়—ওরা প্রকৃতিতে ঐহিক, বহির্মুখী, আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বেশ একটু অন্তর্মুখী অনৈহিক—otherworldly। ওদের দেশে পরিবর্তন দ্রুত হলে মানুষ শাঙ্কিত হয় না, আমরা হই। অন্যভাষায়, আমরা ওদের চেয়ে সমাজে ও ধর্মে ঢের বেশি রক্ষণশীল—conservative—অন্ততঃ এ-পর্যন্ত হ'য়ে এসেছি। আর এই জন্যেই হয়ত ইংরাজকে চড়াও হ'তে হয়েছিল এদেশে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগেও ওদের মতিগতির পরিচয় পেতে বিদেশ গেলে আমাদের জাত যেত—একঘরে হ'তে হ'ত। কিন্তু ওরা যখন এদেশে এসে জাঁকিয়ে বসল তখন প্রাণপণে চোখ বুজে থাকতে চাইলেও চোখে পড়ল বৈকি ওদের কীর্তিকলাপ—রেল রে, হোটেল রে, ক্লাব রে, শৈলাবাস রে, গ্রামোফোন রে, মোটর রে, রেডিও রে—কী নয় রে? দেখতে দেখতে আর চম্‌কে উঠতে উঠতে আমাদের একটু একটু করে চৈতন্য হল: তাই তো, এ-ম্লেচ্ছদের দেখি চলার ছন্দ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জলদ—ওদের তুলনায় আমরা চলি যেন প্রায় ঢিমা তেতালায় বা আড়াঠেকায় মনে হল। এ-ও সয়ে ছিলাম—ওদের উঠতে বসতে আমাদের নেটিভ বলা, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটল একটি অঘটন: ওদের প্রাণশক্তির ছোঁয়াচে আমাদের ঘুম ভাঙল, ওদের গতির ছোঁয়াচে আমাদের গজেন্দ্রগমন লজ্জা পেল। ফলে আমাদের প্রাণে না হোক মানে বাঁচতে দীক্ষা নিতে হ'ল ওদের ত্বরিৎগতির; মন্থরকর্মাকে মন্ত্র দিল বিশ্বকর্মার দল—নেটিভকে গাইতে হল:

"আমরা বিলেতফের্তা ক ভাই—সাহেব সেজেছি সবাই—
তাই কি করি ?
নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি সব জবাই !"

জবাই না ক'রে উপায়ও ছিল না—আফিসে চাকরি করতে হ'লে ফার্সি ছেড়ে ইংরাজি শিখলে সুবিধে, ধুতিচাদর ছেড়ে হ্যাটকোট। এ সব হয়ত বাহ্য, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি অঘটন ঘটল—আমরা ইংরাজি ভাষাটায় হঠাৎ চমৎকার পোক্ত হ'য়ে উঠলাম—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষিতরা সত্যিই রসিয়ে উঠলেন এ-আশ্চর্য উদ্দীপনাময়ী, প্রাণদা, বলদা, বরদা ভাষায়। আমরা শুধু শেলি কীট্স্ বাইরন শেক্সপীয়র আওড়ানোই নয়—এমন বক্তৃতা দিতে সুরু করলাম সাহেবি ভাষায় যে, ওদেরও সত্যিই তাক লেগে গেল। এরই ফলে আমরা এসে পড়লাম সেকাল থেকে একালে—হলাম আধুনিক।

সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মিকে অভিনন্দন করে সবপ্রথম উচ্চতম শিখরগুলি। স্বামীজী ছিলেন আমাদের দেশের শিখরচারী পুরুষদের মধ্যেও অগ্রণী। তাই তাঁর মন যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অরুণাভায় সব আগে রঙিয়ে উঠবে এ তো জানাই। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা সজাগ হ'য়ে উঠলাম যে, তিনিই করলেন এক অভিনব, আধুনিক যুগের সূচনা, ওদেশের নানা ভাবধারার শ্রেষ্ঠ রংরাগ নিয়ে অকুতোভয়ে আমাদের মনকেও সে-আভায় রঞ্জিত করে তুললেন। বললেন: ওদের কাছে আমরা শিখব সংঘ গড়তে, কর্মতৎপরতা—efficiency—আর ওরা আমাদের কাছে শিখবে ধ্যান তপস্যা যোগ বেদান্ত। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ— আমরা দেব আমাদের যা দেওয়ার আছে, তোমরা প্রতিদানে দাও তোমাদের যা দেওয়ার আছে। "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ"-এর প্রথম অধ্যায়ে স্বামীজী একথা চমৎকার ফলাও ক'রে বলেছেন—দ্রষ্টব্য।

এ-সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি আজো মনে জেগে আছে, থাকবেও চিরদিন। স্মৃতিটি রবীন্দ্রনাথের একটি দীপ্ত উক্তির—আমার স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে ৪৭০-৪৭১ পৃষ্ঠায় ফলিয়েই লিখেছি। তাই শুধু শেষটুকু উদ্ধৃত করি—যেটুকুতে স্বামীজীর কথা বলেছিলেন তিনি লণ্ডনে ১৯২০ সালে। বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালা-বাগ নিয়ে লণ্ডনে সভা ডাকা সম্পর্কে: "দিলীপ, আমরা এ-স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা হীনতা ভীরুতা প্রচার ক'রে এদের আদর কাড়তে ছুটব? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই

বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদেশে এসে এদের ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বলে—কাঁদুনি গান নি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কী ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্য কীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত, দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেন: 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড়ো ক'রে দেখো না।' আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু ক'রেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'ভুটি ভিক্ষে পাই গো' বলে, তাহলে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।"

তাঁর পরে স্বামী রামতীর্থ, শ্রীরাধাকৃষ্ণন ও কবি নিজেও ঠিক এই কাজই করেছিলেন—এই পারস্পরিক দান-প্রতিদানের সম্বন্ধের বনেদ গেঁথে নিজের নিজের ঢঙে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীই ছিলেন পুরোধা—ভারতের প্রথম ধর্মীয় সংস্কৃতিদূত, ওদেশে বেদান্তের প্রথম উদ্গাতা। তাঁকে এজন্যে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল, বহু নিন্দা সইতে হয়েছিল—সর্বোপরি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু এ হ'ল তাঁর আধুনিক প্রচার-মিশনের মাত্র একটি দিক। ওদেশে এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের হরির লুট বিলিয়ে তিনি দেশে ফিরে, এর পাল্টা—converse—ঘোষণায় লেগে গেলেন এদেশে খানিকটা য়ুরোপীয় ঢঙেই সেবাধর্মকে লোকপ্রিয় ক'রে এবং কুসংস্কারবর্জিত মঠের পত্তন ক'রে। য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে তাঁর আগেও কয়েকজন বরেণ্য মনীষী বরণ করেছেন, যথা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের পত্তন ক'রে, ও মধুসূদন-বঙ্কিম য়ুরোপীয় সাহিত্যের রস বাংলায় আমদানী করে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম তথা কর্মলোকে পাশ্চাত্ত্য প্রাণশক্তিকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেন প্রথম স্বামীজী—তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে, প্রাণোন্মাদী বক্তৃতায় —সর্বোপরি, তাঁর রোমান্টিক নব জাগৃতিমন্ত্রের তথা বহ্নিময় ব্যক্তিরূপের ফুলঝুরিকে। মানুষের ঘুমন্ত শক্তি সবচেয়ে সহজে জেগে ওঠে দিগ্বিজয়ীর টঙ্কারে। স্বামীজী এ-টঙ্কারের সঙ্গে জুড়ে দিলেন পরমহংসদেবের কাছ-থেকে-পাওয়া জ্ঞানভক্তির ওঙ্কার ও ঝঙ্কার। ফলে দেশের ঝিমিয়ে-পড়া মনে উঠল শিহরণ জেগে।

"রোমান্টিক" বিশেষণটি অনুধাবনীয়। কারণ স্বামীজীর চুম্বকশক্তির মধ্যে এই রোমান্টিক উদ্দীপনার মালমশলা ছিল প্রচুর। এ-যুগে আমরা হ'য়ে পড়েছিলাম খানিকটা দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলারই পক্ষপাতী। তাই সুভাষ প্রায়ই বলত: "আমাদের বরণ করতেই হবে স্বামীজীর aggressive Hinduism-এর বাণী—নির্বিবাদী ভালোমানুষির দিন গত—স্বামীজীর কথায় কান দিতে হবে—চড়াও হ'তে

হবে, আর তারই জন্য চাই সব প্রথম স্বাধীন হওয়া।" কিন্তু আমাদের মনে এ-স্বাধীনতার অভীপ্সা ব্যাপক ভাবে জেগে উঠেছিল যখন স্বামীজীর আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের তুরীধ্বনিতে আমরা চমকে উঠলাম—এ-অঘটনের রোমান্সে। স্বামীজী যখন আমেরিকায় দুরবস্থায় পড়েন তখন তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি। কিন্তু তার পরেই যখন শিকাগোর বিশ্বমানবিক ধর্মসভায় স্বামীজীর বিদ্যুৎপ্রবেশে হাজার হাজার মার্কিন নরনারী বিচলিত হ'য়ে উঠল, তখন আমরা বললাম: "তাই তো হে। চিরদিন ওরাই আমাদের চমকে দিয়েছে। এখানে দেখি শোধ তুলল আমাদেরই মতন এক ভেতো বাঙালী—যাকে আমরা কর্মনাশা নাম দিয়ে শাপমন্যি দিয়ে এসেছি অনেকগুলি ভালোমানুষের পো-র মস্তক ভক্ষণ করার অপরাধে। অতএব ও গোঁসাই, এসো হে, চাদর গায়ে দিয়ে ছোটা যাক্, দেখে আসি কী ব্যাপার —শুনে আসি কী বলে নরেন্দর। মনে হচ্ছে বুঝি বা এ-ঘুমের দেশে হঠাৎ একটা কিছু ঘটবার মতন ঘটল! নৈলে কি তোমার আমার মতন ছাপোষা মনিষ্যির বুকেও কেমন যেন ঘরছাড়া ডাক বেজে ওঠে?—চলো চলো!" আমরা বাল্যকালে স্বামীজীর তিরোধানের পরেও এই রোমান্সের কিছু রেশ শুনেছি প্রাণ ভ'রে—এ একটুও অত্যুক্তি নয়।

এই রোমান্সের শিহরণ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে এসে লেগেছিল স্বামীজীর দিগ্বিজয়ী হ'য়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। কান পেতে শুনলে আজও চমকে উঠতে হয় কলম্বোয় ১৬ই জানুয়ারীতে (১৮৯৭) তাঁর প্রথম বক্তৃতার শঙ্খধ্বনিতে। বললেন স্বামীজী সঘনে:

"আগে আগে আমি ভাবতাম যে, ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।...এই পুণ্যভূমি থেকেই ধর্মনায়কেরা বারবার পৃথিবীতে অধ্যাত্ম সত্যের বান বইয়ে দিয়েছেন। এখান থেকেই দর্শনের বিপুল জোয়ার প্রবহমান হ'য়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্লাবিত করেছে, আর এখান থেকেই ফের সে-স্রোত বইবে যার স্পর্শে জগতের বস্তুতান্ত্রিকতা শুদ্ধিলাভ করবে। আপনাদের বলছি আমি—এ হবেই হবে।"

"গেরুয়া-পরা সন্নিসি বলে কি হে?" শুধালেন মুরুব্বি প্রবীণরা চোখ কপালে তুলে। "আমরা জগতের চেহারা বদলে দেব আমাদের অধ্যাত্ম শক্তির পরশ পাথরের ছোঁওয়ায়? অ্যাঁ? আমরা—যারা—ডি এল রায়ের ভাষায়—

পাঁচশো বছর এম্‌নি ক'রে আসছি স'য়ে সমুদায়,
এইটে কি আর সইবে নাকো—দুঘা বেশি জুতোর ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা—দে না বাবা,
দুঘা বেশি, দুঘা কমে—এমনিই কি আসে যায়?

অ গোঁসাই, ছাপোষা মনিষ্যি আমরা—সাতেও নেই পাঁচেও নেই, অথচ নরেন্দর বলে কি: 'The mild Hindu has always been the blessed child of God···Abhih, Abhih! We have to become fearless, and our task will be done'—'নিরীহ হিন্দু ভগবানের মানসপুত্র, আমরা অভীঃ হলেই সিদ্ধিলাভ!' এ কী ব্যাপার, গোঁসাই? শুনে তাক লেগে গেল যে! বলে কি নরেন্দর?—'To the other nations of the world religion is but one among the many occupations of life—' 'অপরদেশে ধর্ম আর পাঁচটা বৃত্তির মধ্যে একটা—রাজনীতি রে, সামাজিকতা রে, অর্থসুখ রে, ক্ষমতা-বিলাস রে, রকমারি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রে—কত কীরে—কেবল ঐ পাঁচ মিশেলের সঙ্গে থাক্ না একটু ধর্মেরও অনুপান। ও দেশের লোককে গিয়ে শুধাও, দেখবে তারা এ-ও-তা অনেক কিছুরই খবর রাখে। কিন্তু যদি ধর্মের কথা পাড়ো, তাহ'লে তারা বলবে যে তারা নিয়মিত গির্জায় যায় ও অমুক খ্রীষ্টীয় অভিধায় অভিহিত। তারা ভাবে এইটুকু জানাই যথেষ্ট'*—শুনছ গা, নরেন্দর বলছে?"

স্বামীজী অতঃপর বক্তৃতার পর বক্তৃতায় আরো কত কীই না বললেন—দেখালেন কত দৃষ্টান্ত দিয়ে যে, ওরা এইভাবে বললেও আমাদের চলার ছন্দ ঠিক উল্টো —অর্থাৎ, আমরা এই আর-পাঁচটার খবর রাখি না; বলি এসব অবান্তর; রাখার মতন খবর কেবল একটি—ধর্ম। মনে পড়ে পরমহংসদেবের বিচিত্র কথিকা:

> চলে পণ্ডিত নৌকায়, মাঝি অদূরে আসীন হালটি ধ'রে।
> পণ্ডিত পুছে: "জানিস কি তুই দর্শন বেদ পুরাণ ওরে?"
> "না ঠাকুর।"—"সে কি? ন্যায়, বেদান্ত?"—"জানি না ঠাকুর।"—"তন্ত্রসার?"
> মাঝি হাসে: "আমি মুখ্য ঠাকুর, কোনো বিদ্যাই নেই আমার।"
> পণ্ডিতও হাসে গোঁফে চাড়া দিয়ে: "তা বটে, এসব কজন জানে?"
> সহসা উঠল ঝড়। মাঝি বলে: "সামাল ঠাকুর! স্রোতের টানে
> নাও বুঝি ডোবে—তবে নিশ্চয় সাঁতার জানেন আপনি, স্বামী?"
> পণ্ডিত বলে: "বলিস কি? ওরে, সাঁতার দিতে তো জানি না আমি।"
> মাঝি বলে: "আমি জানি না পুরাণ বেদ বেদান্ত তন্ত্রসার,
> হাবিজাবি আরো কত কী জানি না, কেবল ঠাকুর, জানি সাঁতার।"

আমার মাতামহ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন পরমহংসদেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে। (কথামৃতে তাঁর নাম আছে।) তিনি আমাকে বলেছিলেন—এ-কথিকাটি তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শোনেন। আরো

* স্বামীজীর "First Public Lecture in the West" দ্রষ্টব্য—Swami Vivekananda's Works. Vol. III p 105-115

বলছিলেন যে, ঠাকুর প্রায় গাইতেন একটি গান; "রামকো জো না জানা সো ক্যা জানা হ্যায় রে?" কলম্বোর ও অন্যত্র স্বামীজীর নানা বক্তৃতার বাদী সুর ছিল এই কথাই: যে, হিন্দু এ-ও-তা হাবিজাবির খবর না রাখলেও একটি জিনিসের খবর রাখে—ধর্ম, যার নাম সে দের পরমার্থ। অর্থাৎ, পরম বস্তু হ'লেন তিনি, তাই তাঁকে জানার নামই জ্ঞান—আর সব জ্ঞান—কিনা ঐহিক জ্ঞান—না হ'লেও চলে, যদি এই জ্ঞানের জ্ঞান একবার অন্তরে আলো জালায়।

এই প্রত্যয় আবহমানকাল ভারতের কাছে পরম ঈপ্সিত ব'লেই গণ্য হয়েছে—"নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ"—তাঁকে জানলে সবই জানা হয়। স্বামীজী তাঁর নানা ভাষণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল এই বাণীরই ভাষ্য করেছেন—ধর্মবুদ্ধির নামই বুদ্ধি, ফন্দির নাম দুর্বুদ্ধি। তাঁর একটি প্রিয় বচন ছিল: "চালাকি ক'রে কোনো মহৎ কাজ হয় না।" প্রায়ই বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি করলে সব ডুববেই ডুববে—যেজন্যে ধর্ম-যে-ধর্ম, সেও ডুবেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন (১৮৯৪ সালে): "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা? জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভ্যালা মোর বাপ!! হে ভগবান্! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।"

এ-যুগের একটি মহৎ প্রবণতা—সব কিছু প'ড়ে পাওয়া বুলির যাচাই করা। স্বামীজীর মধ্যে এ-প্রবণতা দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরের তেজোদীপ্তিতে। বলীয়ান্ মানুষের একটি ধর্ম সব কিছুকেই প্রবল ভাবে অনুভব করে। স্বামীজী ছিলেন বীরসিংহ, কাজেই তাঁর প্রাণ ধিক ধিক ক'রে উঠত চালাকি, ছুঁৎমার্গ ও ভাবের ঘরে চুরি দেখে। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন বৈ কি যে, আমরা ধর্মকেই একান্ত হ'য়ে বরণ করি, কিন্তু চারদিকে কপটতা ও মিথ্যাচার দেখে আহত হ'য়ে আমাদের অধঃপতনের জন্যে আমাদের তিরস্কার করতেন। আর তাঁর প্রাণোচ্ছল মন সবচেয়ে গভীর বেদনায় ছেয়ে যেত যখন তিনি দেখতেন তামসিকতাকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি। তাঁর "ভাববার কথা"য়—তিনি লিখছেন: "দেখিতেছ না সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ সমুদ্রে ডুবিয়া গেল? যেথায় মহাজড় বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে…যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল

পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?”

এখানে কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন যে স্বামীজী তো তাহ'লে অপরের 'পরে যে অভিযোগ আনছেন নিজেই সে অপরাধে অপরাধী, যেহেতু তিনি ভারতের অতীত মহিমা—“পিতৃপুরুষের নামকীর্তন”—যত্র তত্র প্রচার ক'রে এসেছেন,—তিনি তাহ'লে ভুল বলবেন। খ্রীষ্টদেবের একটি কথিকা। এক গৃহস্থের তিনটি চাকর ছিল। তিনি বিদেশে যাবার সময় তাদের হাতে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে যান। ফিরে এলে দুজন চাকর বলে তারা গচ্ছিত মুদ্রা খাটিয়ে বাড়িয়েছে। প্রভু খুসি হ'য়ে তাদের পুরস্কার দেন। তৃতীয় চাকরটি তাঁর দেওয়া মুদ্রাটি ফেরৎ দিয়ে বলে যে টাকাটি সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছে পাছে খোওয়া যায় এই ভয়ে। প্রভু তাকে তামসিক ব'লে তিরস্কার ক'রে শাস্তি দেন, বলেন যে, যে-জন্মালস অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তার কাছ থেকে সে-অল্পও কেড়ে নেওয়া হবে।

(“For every one that hath shall be given : but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.”—St Matthews)

স্বামীজী চাইতেন বৈ কি যে, আমরা অতীত মহিমার জয়ধ্বনি করি—কেবল সেই সঙ্গে বারবার বলেছেন এই মহিমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে হবে, হাতে-পাওয়া পুঁজি খাটিয়ে যে বাড়াতে না চায় সে হয়ই হয় দেউলে। এইখানে তিনি ছিলেন বিশেষ করেই আধুনিক প্রগতিশীলদের দলে যাদের জীবনের মন্ত্র—স্বামীজীর ভাষায়ই বলি : “বল্ অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি ক'রে দেশটা গেল।...প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে হতভাগাগুলো! নেই নেই বলতে বলতে কি কুকুর-বেড়াল হ'য়ে যাবি না কি? কিসের নেই! কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম, রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে আমার জন্ম গেল! ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনাহীনা ভাব—ও হ'ল ব্যারাম—ও কি দীনতা ?...ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।......উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম.........নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। Avalanche এর মতন দুনিয়ার উপর পড়।”*

এই ধরণের উদ্দীপক ভাষণ পত্র কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন তিনি উঠতে বসতে—একদিকে দেবভাষার বীর্যবাণী অন্যদিকে ভর্ৎসনা—দেখ্ কী ছিলি, কী হয়েছিস ? এ-দুই মনোভাব তাঁর তেজস্বী চরিত্রের দুটি দিক—অতীত থেকে প্রেরণা নিতে হবে,

* পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৪২ পৃঃ—আত্মাকে বলহীনেরা পায় না, মানুষকে জগজ্জাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যেমন সিংহ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসে...নিজেকে নিজেই উদ্ধার করতে হবে...ইত্যাদি।

অতীত মহিমাকে মনে প্রাণে বরণ করতে হবে—কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় We do not belong to the past dawns but to the noon of the Future: অতীতের ঊষাবিলাসী হ'লে চলবে না, হ'তে হবে আমাদের ভবিষ্যতের মধ্যাহ্নচারণ। এর কেন্দ্রীয় বাণীটি হ'ল তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের শিরোনামা—বীরবাণী। তাতে "সখার প্রতি" কবিতায় স্বামীজী লিখছেন:

ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হ'য়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও—থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।

তাই শুধু নিজের মুক্তিসাধনায় মুক্তি নেই, মুক্তি সর্বসেবায়, জীবপ্রেমে:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সত্ত্বগুণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি ঠিকই ধরেছিলেন: যে, বাইরে থেকে দেখতে অনেক সময়েই তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা বলে ভুল হয়। তাই বলতেন বারবারই—তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় আরূঢ় হবার পরে তবে সাত্ত্বিকতার নাগাল পাওয়া যায়:

"সত্ত্বগুণ এখানো বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতের আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়?" (ভাববার কথা—বর্তমান সমস্যা)

দ্রষ্টব্য—বরাবরই দুটি আদর্শ পাশাপাশি চলেছে সমতালে—ঐহিকতা ও পারমার্থিকতা, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ, গুরুবাদ ও সোঽহংবাদ। আর সবার প্রেরণা তাঁর বীরাত্মার প্রবল গ্রহণবর্জন: "আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি, আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চাইনি। কোনোপ্রকার রাজনীতিতে আমি বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।"*

আবার সেই সঙ্গে বললেন একনিশ্বাসে [ঐ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা]—

"দাদা, মুক্তি নাই বা হ'ল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। একথা কি মিথ্যে?—

"মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকার শ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণপরমাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥

* পত্রাবলী প্রথম ভাগ ৪৭১ পৃষ্ঠা আলাসিঙ্গাকে লেখা

এমন সাধু জগতে আছে যাঁহারা ত্রিভুবনে
সাধি' নিখিলজনের হিত বাক্যে কায়ে মনে,
পরের অণুগুণও তুলি' শৈলকায় করি'
বিকাশ লাভ করেন প্রীতি-পীযূষ নির্ঝরি'।

(অনুবাদ—সংস্কৃত)

"নাই বা হোলো তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানুষি কথা! রাম রাম!···ও কোন্ দেশী বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন্ দেশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ! ও-রকম দীনাহীনা ভাবকে দূর ক'রে দিতে হবে। আমি জানি নি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জানো না তো এতকাল কল্লে কি? ও সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব, যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চ'লে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের ন'ত কোণে ব'সে মেউ মেউ করবে।"

কী উদ্দীপক কথা! যেন বল্গা মানতে নারাজ তেজী ঘোড়া! মনে পড়ে স্যুইজর্লণ্ডে রোলাঁর কথা: "গায়ে কাঁটা দেয় আমাদেরই তাঁর বীর বাণী শুনে—সোজা গিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই।" এই ভাবের কত কথাই না তিনি বলেছিলেন আমাকে সোচ্ছ্বাসে। একটি পত্রে আমাকে স্বহস্তে লিখেছিলেন (২২. ৮. ১৯২৮):

Lisez la Première conférence de Vivekananda sur Maya et l' Illusion (1896). Combien je me sens proche de sa conception tragique du monde et de son action héroique !···La première qualité du monde pour nous (et ce n'est pas seulement Beethoven qui l'a dit—mais c'est aussi votre Vivakananda) c'est l'Energie. Sans elle rien de grand. Avec elle, rien de faible. Ni vice ni vertu.

[অর্থাৎ বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ পড়ো ১৮৯৬ সালে—মায়ার উপরে। জগৎ সম্বন্ধে তাঁর দুঃখবাদ ও অকুতোভয় কর্মবাদ আমার এত মন টানে!···আমরা মনে করি এজগতে সব আগে চাই শক্তিবাদ (আর এ শুধু বীটোভ্নেরই কথা নয়—তোমাদের বিবেকানন্দের বাণীও এইই) শক্তি ছাড়া মহৎ কিছুর প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে না, আর শক্তি থাকলে ক্ষীণ কিছু টিঁকতে পারে না—না পাপ, না পুণ্য।]

য়ুরোপের একটি শ্রেষ্ঠ অনুভব এই শক্তিবাদ—ভাইটালিটি—এনার্জি। ওদেশে যাবার পরে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে ওদের এই গতিতন্ত্র—চলো চলো চলো—থেমো না। এর ফলে ওরা অনেক সময়েই খানায় পড়ে—চলার মোহ পেয়ে বসলে মানুষ সেই মোহবশে অনেক সময়েই অন্ধ হ'য়ে পড়ে ব'লে। কিন্তু তবু সব জড়িয়ে উদ্ভিদের মতন অনড় হ'য়ে ব'সে থাকায় চেয়ে চলা ভালো—এইই হ'ল আধুনিক যুগের একটি প্রধান বাণী—অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ নয়, প্রবৃত্তিমন্ত্র। স্বামীজীর মধ্যে দেখতে পাই

এ-দুয়ের সামঞ্জস্য : অশ্রান্ত কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগ। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন ভারত পুণ্যভূমি, কর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-পুণ্যভূমিকে নির্মল করতে। তাই তিনি আধুনিক যুগের সাম্যবাদ মেনে নিয়েছিলেন ছুঁৎমার্গের প্রতি আমাদের ঘৃণা জাগাতে এবং লোকাচারের অসারতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি পরম উপভোগ্য নক্সায় তিনি লিখেছেন (ভাববার কথা):

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে-মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেখানে নেই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি-সুয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ—নেই কি?...আমারও কৌতূহল হ'ল, ছুটলুম। গিয়ে দেখি—এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে এক পঞ্চাশমুণ্ড মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরের যে সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে। ঐ যে বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ ও সব মধ্যে মধ্যে শুনলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পালতে হবে এঁর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম, তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এলো, এঁর নাম 'লোকাচার'।"

ধর্মকে মেনে লোকাচারকে তুচ্ছ করার এই যে রোখ, এ আমাদের আগের যুগে ছিল না বললেই হয়। তাই অমন যে তেজস্বী পুরুষ বিদ্যাসাগর তিনিও বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের সময়ে চলতি লোকাচারকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন পরাশর সংহিতার "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ—পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে"—জাতীয় শ্লোকের আশ্রয় নিয়ে, দেখিয়ে যে পুরাকালে বিধবাদের বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ ছিল না। স্বামীজী কিন্তু এ-যুগের যুগধর্মকে অঙ্গীকার ক'রে লোকাচারকে অবান্তর বলেছিলেন—সোজাসুজিই। শাস্ত্র তিনি আওড়ালেন চিরন্তন পরাবিদ্যাকে প্রামাণ্য করতে, আর হেয় লোকাচারকে বরখাস্ত করতে চাইতেন আধুনিকতার সহজ যুক্তিবাদের পথে। তাঁর পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই—তিনি অধ্যাত্মসত্যকে মনে করতেন অমূল্য ফল ফুল, আর গতানুগতিক লোকাচার কুসংস্কার ভয়-পাওয়াকে মনে করতেন আগাছা কাঁটাবন। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি পত্রে লিখেছিলেন (পত্রাবলী ৪৮ পৃঃ):

"আমার মটো—মূলমন্ত্র—এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল ও গোঁড়ার কথা মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্গুরুর অংশ ও আভাস স্বরূপ।"

এখানে লক্ষণীয়—তিনি চিরন্তন সত্যকে মেনেও সাময়িক লোকমতকে উপেক্ষা

করছেন সমান তেজে। এই ভেদজ্ঞানকে বলা যায় চিরন্তন ও অবান্তরের তফাৎ —the difference between the essential and non-essential: ভারত পুণ্যভূমি—এ চিরন্তন সত্য, ভারতীয় লোকাচার অন্য সব লোকাচারের মতনই কখনো শুভ কখনো অশুভ—কাজেই চিরন্তন নয়। বেদান্তের সূত্র চিরন্তন, কেন না তার ভিত্তি অপরোক্ষ অনুভব—কিন্তু লোকাচারকে প্রতি পদেই আধুনিক যুগধর্মের নিকটে যাচিয়ে দেখতে হবে—কখনো কিছু জুড়তে, কখনো কিছু বাদ দিতে। অন্যথা গোঁড়ামির অভিযোগে অভিযুক্ত হ'তে হবে—উদারতার হবে ভরাডুবি। মাষ্টার মহাশয়কেও (শ্রীম) তিনি লিখিয়াছেন এই কথাই (১৪ পৃষ্ঠা): "পূজ্যপাদেষু, আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" এ প্রসঙ্গে গুরুভক্তি সম্বন্ধের তাঁর আধুনিক বলিষ্ঠ মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া অবান্তর হবে না। আমেরিকায় তিনি বলেছিলেন: "Love him (the Guru) heart and soul, but think for yourself. No blind belief can save you; work out your own salvation." *

আমাদের আগের যুগে খুব বেশি জোর দেওয়া হ'ত সব তাতেই শাস্ত্র মেনে চলার পরে। মুনি ঋষি মনু গুরু—বাপ্‌রে! তাঁদের কথা বেদবাক্য। কিন্তু এযুগের একটি প্রধান প্রবণতা হ'ল—যা সবাই মেনে নিয়েছে, একবাক্যে ও না ভেবেচিন্তে, তাকেও ভেবেচিন্তে দেখতে হবে—কতখানি রাখতে হয় আর কতখানি ফেলতে। এ-মনোবৃত্তির একটি বড় চমৎকার পরিচয় মেলে মহামনীষী বার্টরাণ্ড রাসেলের একটি উক্তিতে। তাঁর দাদা তাঁকে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াতে এলে বলেন, প্রথমে কয়েকটি সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ব'লে মেনে নিতে হবে। রাসেল বলেন, তা কেন? প্রমাণ বিনা কিছুই মানতে পারব না। তাতে তাঁর দাদা বলেন, তাহ'লে তোমাকে জ্যামিতি শেখাতে পারব না। এসূত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কে বড় সত্যদিশারি সে দারুণ তর্ক তুলতে চাই না, কেন না তর্কের পথে এ-প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একথা বলা যায় খানিকটা অকুতোভয়েই যে, আধুনিক মনের একটি শুভ প্রবণতা হ'ল ব্যবচ্ছেদ করা, খুঁটিয়ে দেখা, প'ড়ে-পাওয়া ঐতিহ্যকে (tradition) অপৌরুষেয় ব'লে মেনে নেওয়াও নয়, হাতের পাঁচ রূপে ভোগ করাও নয়—খাটিয়ে বাড়ানো। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে

* তাঁকে (গুরুকে) মনেপ্রাণে ভালোবাসতে হবে কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে শিখতে হবে তোমাকে। অন্ধ বিশ্বাসে মুক্তি নৈব নৈব চ। তোমাকে নিজের মুক্তির পথিকৃৎ হ'তে হবে নিজেরই সাধনায়—*Inspired Talks*, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

একবার আমাকে লিখেছিলেন : "The tradition of the past is a great thing in its own place but that is no reason why we should go on repeating the past. A great past should be followed by a greater future."* এক কথায়, গতিবাদ আর শক্তিবাদ—এই দুই বাদ আমাদের মনকে যেমন অভিভূত করে আমাদের পূর্বসূরীদের মনকে তেমন করত না। স্বামীজীর মহান্ ব্যক্তিরূপের পটভূমিকায় এই গতিবাদ ও শক্তিবাদ আশ্চর্য দীপ্যমান্ হ'য়ে উঠেছিল অধ্যাত্ম শক্তির সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে। এ-সমাহারকে পুণ্যভূমি ভারতেরই অবদান বললে অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক যুগের আর একটি অনস্বীকার্য প্রবণতা, জটিলতার বৃদ্ধি—ফলে, শুধু মহত্ত্বের বিকাশ নয়—সুষমার (হার্মনি) সঞ্চরণ। এ-সঞ্চরণের শোভা সবচেয়ে বেশি বিচিত্র হয়ে ওঠে মহাজনদের জীবন পর্যালোচনা করলে। স্বামীজী ছিলেন এযুগে মহাজনদের মধ্যেও মহাজন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় a king among men! তাই তাঁর চরিত্রের মহনীয় বিকাশ একটু পর্যালোচনা করলে আমরা লাভবান্ হব দেখতে পেয়ে একটি চিত্ত চমৎকার দৃশ্য—কতরকম বিরুদ্ধ ভাবধারার সমুচ্চয়ে তাঁর ব্যক্তিরূপ এমন অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।

পয়লা নম্বর : স্বামীজীর মধ্যে দেখতে পাই আশৈশব ধ্যানের প্রবণতা। কৈশোরেও ধ্যান করতে বসতে না বসতে তিনি মগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন তিনি ধ্যানে বসেছেন—সার সার মশায় পিঠ কালো হয়ে গেছে, তবু তাঁর ধ্যান ভাঙে নি। অথচ অন্যদিকে তিনি ছিলেন এমন প্রাণচঞ্চল যে, একদিন তাঁর মাতৃদেবী উত্ত্যক্ত হ'য়ে বলেছিলেন : "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" (শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, ৪পৃঃ)।

দোসরা নম্বর : বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাঁর সহজাত কবচ কুণ্ডল বললেই হয়, অথচ সহজে ভক্তিবিশ্বাস করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। পরমহংসদেব-যে পরমহংসদেব—তাঁকেও তিনি নানাভাবেই পরখ ক'রে তবে গ্রহণ করেছিলেন—এমন কি তাঁর সমাধি সম্বন্ধেও রীতিমত সন্দিহান হয়েছিলেন। অগাধ ভক্তি করতেন গুরুদেবকে অথচ তাঁর কোনো কথাই সহজে মেনে নিতেন না, তিনি জগন্মাতা কালীকে দর্শন করেন শুনে প্রথমে বলেছিলেন—ও মনের ভুল। কথামৃতের তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে পাই (পরমহংসদেবের দেহান্তের পরে বরাহনগর মঠে):

* অতীতের ঐতিহ্য খুবই বড় জিনিস, কিন্তু তাই ব'লে আমরা কেবল তার পুনরাবৃত্তি ক'রেই চলতে পারি না তো। মহৎ অতীতের পরে আবাহন করতে হবে মহত্তর ভবিষ্যতকে।

"বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র বলিলেন: আমি তো কিছুই মানতাম না।

"মাষ্টার: কি, রূপটুপ?

"নরেন্দ্র: তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতাম না। একদিন তিনি বলেছিলেন: 'তবে আসিস কেন?' আমি বললাম: 'আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।'

"মাষ্টার: তিনি কি বললেন?

"নরেন্দ্র: খুব খুসি হ'লেন।"

তেসরা নম্বর: কর্মোত্তম ছিল তাঁর অসামান্য, অথচ তিনি নিবেদিতাকে একদিন বলেছিলেন যে, জগতে তাঁর কাম্য শুধু একটি গাছতলা, যার নীচে তিনি সমাধিস্থ হ'লে থাকতে পারেন। পরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত—যেমন খুব কম মহাপ্রাণেরও প্রাণ কাঁদে, অথচ তাঁর প্রকৃতি ছিল স্বভাববৈরাগী—ঘুরতেন তীর্থে তীর্থে, বনে জঙ্গলে—পদব্রজে। স্বভাব-নিঃসঙ্গ, অথচ শুধু যে বহুকে সঙ্গ দিতেন তাই নয়, বহুর সাহচর্যে তাঁর প্রতিভা হ'য়ে উঠত খরদীপ্ত—তর্কে বিচারে হাসিতে গল্পে।

কিভাবে তিনি বহুলোককে সঙ্গ ও আশ্রয় দিতেন তার আমি বিশদ বর্ণনা করেছি আমার "এদেশে ওদেশে" ভ্রমণ কাহিনীতে—"মাদাম কালভে" নিবন্ধে। সমস্ত প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মাদাম কালভের কথা তাঁর নানা জীবনীতেই আছে। তাই আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিধারা হিসেবে এ-প্রবন্ধটি থেকে অল্প একটু উদ্ধৃত করি দেখাতে—মানুষ এ-জন্মবৈরাগী স্বভাব-নিঃসঙ্গের পুণ্যসঙ্গে কত কী পেত!

আমি ১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা সুন্দরী নীস নগরীতে এক কার্বণ্টেসের ওখানে ফরাসী ভাষায় একটি বক্তৃতা দিই ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে। সেখানে আমার গান শুনে মাদাম কালভে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর নাম আমি জানতাম—বিখ্যাতা গায়িকা—Prima Donna—পরমা সুন্দরী—কীভাবে মনঃকষ্টে পড়ে স্বামীজীর কাছে এসে আলো পান ও পরে ভারতে আসেন—পড়েছিলাম আগেই। এইবার উদ্ধৃতি দেবার সময় এলো। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইভাবে সুরু করেন:

"মাদাম কালভে: স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অলোকসামান্য মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী—বলব কোন্ ভাষায়? তাঁর সঙ্গে সেই জাহাজে তিনমাস থাকা—অবিস্মরণীয়।

"আমি: তাঁর সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হয় কী সূত্রে?

"মাদাম কালভে: সে-সময়ে আমার বড় দুর্দিন। গভীর মনঃকষ্টে আছি।

আমার স্বামী ও মেয়ে মারা যান, আরো নানা উপসর্গ ছিল। সেই সঙ্কট সময়ে হঠাৎ আমার এক বন্ধু বললেন: 'চলো তোমাকে নিয়ে যাই এক হিন্দু মহাত্মার কাছে—তিনি হয়ত তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন।' আমি বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু গেলাম। ভাবলাম, দেখাই যাক না।

"সে সময়ে তিনি মাটিতে বসে ধ্যান করছিলেন। আমি পাশে বসলাম একটি চেয়ারে। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটল। আমি ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কে এ rustre (চাষা), আমার মতন জগদ্বিখ্যাতা গায়িকাকে কিনা ঠায় অপেক্ষা করায় এতক্ষণ! উঠে যাব যাব ভাবছি, এমন সময় তিনি বললেন: 'ব্যস্ত হোয়ো না, আমি ধ্যান ক'রে দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক কোনখানে ব্যথা ও কী প্রয়োজন। মুখে তো তুমি সব বলবে না।' চম্‌কে গেলাম বৈকি—আরো যখন—খানিক বাদে—স্বামীজী আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন সব কথা বললেন যা আমি ছাড়া কেউ জানত না!

"আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ! এ কী ব্যাপার! তারপর তাঁর সঙ্গে তুর্কী, গ্রীস, মিশর—কত জায়গায়ই না ঘুরেছি! আমার সব ব্যথা যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে! তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত—আর মুগ্ধ হ'তাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে—যদিও তখন আমার বয়স কম।

"কার্বণ্টেস (আর্দ্রস্বরে): হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃসম্বোধন করাটা কী সুন্দর!

"মাদাম কালভে: অথচ এমন মানুষেরও আমি নিন্দা শুনেছি মসিয়ে রায়—শুনে সত্যই আমার লজ্জা হ'ত—মন ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠত: কী ক'রে পারে তারা এমন পুণ্যশুভ্র মানুষের নামে কুৎসা রটাতে! য়ুরোপে আমেরিকায় যে তিনি এইভাবে দিয়েছেন কত আর্তকেই দিয়েছেন শান্তি, কত অন্ধকেই দৃষ্টি! তাঁর কাছে শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।"

চৌঠা নম্বর: তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা মঠে তিনি আদৌ চাননি গুরুপূজা, অথচ গুরুভক্তিতে কে পারত তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একবার একটি চিঠিতে তীব্র ভর্ৎসনা ক'রে লিখেছিলেন (পত্রাবলী ৪৮০ পৃষ্ঠা):

"সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!!... তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধুলো পেয়েছিস।......সকল জায়গাতেই ভাবের ঘরে চুরি—কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি রক্ষে করতেন, দেখতে পাচ্ছি যে! ওরে পাগল, পরীর ম'ত সব মেয়ে, লাখ লাখ টাকা—এসব তুচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে, না তিনি রক্ষা করছেন।"

কলকাতায় তাঁর একটি বিখ্যাত ইংরাজি ভাষণে বলেছিলেন—এখানে তার অনুবাদ দিলাম :

"তোমাদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনে আমার হৃদয়ের একটি গভীর তন্ত্রী বেজে উঠল। আমি যদি চিন্তায় কথায় কি কাজে কোনো সিদ্ধিলাভ ক'রে থাকি, যদি আমার মুখ দিয়ে কখনো একটি সার্থক বাণীও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে তবে সে-বাক্য আমার নয়—তাঁর। আর যদি কখনো কাউকে কোনো কটু কথা ব'লে থাকি কি কোনো দ্বেষের বাণী রটিয়ে থাকি তবে সে কুকীর্তি আমার—তাঁর নয়। দুর্বল ক্ষীণ যা কিছু—সব আমার, আর যা কিছু শুচিশুভ্র তার মূলে—তাঁর প্রেরণা, তাঁর বচন, তাঁর ব্যক্তিরূপ।" *

অন্যদিকে এই মানুষটিই আমাদের পদে পদে শাসিয়েছেন, নিষ্করুণ কশাঘাত করেছেন যেখানেই দেখেছেন ভণ্ডামি, জালজালিয়াতি, ভাবের ঘরে চুরি, শুচিবাই, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার উঁকিঝুঁকি। স্বামী-শিষ্য সংবাদ-এ শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন—এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে একবার ধরেন গরুর জন্যে পিঁজরা-পোলে টাকা দিতে। তাতে স্বামীজী বলেন : "মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষে নয় লক্ষ মানুষ মারা গেছে, এ-সব দুর্গতদের জন্যে কী করা যায়?" তাতে ভদ্রলোকটি বলেন : "মানুষ তার কর্মফলে দুঃখ পায়, শাস্ত্রে বলেছে গো-জাতি আমাদের মাতা।" স্বামীজীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, তিনি বলেন : "বটেই তো, নৈলে আর এমন সুপুত্র হয়।"

পাশ্চাত্য দেশ থেকে একটি মস্ত গুণ আমরা পেয়েছি—আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয় স্বামীজীর মধ্যে রূপ নিয়েছিল আত্মবোধের। এ-আত্মবোধের দীপ্তি বিশেষ ক'রে ফুটে উঠত যখন ভারতের কোনো পাশ্চাত্য নিন্দক আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইত। নিবেদিতা লিখেছেন (*My Master as I Saw Him* ২১০ পৃষ্ঠায়): "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কী বোঝায় সে-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। কতবারই না তিনি আমাকে বলেছেন : 'তোমরা ভারতকে বুঝতে পারোনি আজো। আমরা খতিয়ে নরপূজারী। আমাদের

---

* "Brothers, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life—Sri Ramkrishna Paramhansa. If there has been anything achieved by me—by thoughts or words or deeds—if from my lips has ever fallen one word that has helped any one in the world, I lay no claim to it—it was his. But if there have been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me—it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words and he himself." (Address at Calcutta—Swami Vivekananda's Works, Vol. III, p. 312)

নারায়ণ নর।' প্রতিমা পূজার সম্বন্ধেও সমানই স্পষ্টভাষায় বলতেন তাঁর প্রত্যয়ের কথা: 'প্রতিমাকে ভগবান্ বলতে পারো—একশোবার, কেবল ভগবান্ প্রতিমা এই ভুলটি কোরো না।' " শ্রীঅরবিন্দ আমাদের একবার বলেছিলেন যে, তাঁর মনে আশ্চর্য আলো নামত যার ফলে তিনি এমন সব সত্য দেখতে পেতেন যা সে-আলো বিনা দেখা যায় না। ইংরাজিতে এই জাতীয় বাণীকে বলে aphorism—জ্ঞানোক্তি; "Inspired talks" নামে অপূর্ব বইটির ছত্রে ছত্রে পাই এই জ্ঞানোক্তি প্রায় মন্ত্রের মত ঝংকারে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করি—কী চমৎকার:

একদেশদর্শিতায়ই জগৎ ডুবল। নিজের যত দিক বিকশিত হবে তত পাবে যেন নব আত্মা আর দেখতে পাবে জগতকে বহু আত্মার দৃষ্টিতে। (৪২ পৃঃ)

যার কিছুই নেই ভগবান তারই। (৪৮ পৃঃ)

যারা ঈশ্বরৈকান্ত তারা কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি কৃতী। যে নিজেকে নির্মল করেছে প্রচারক-সংঘের চেয়েও বেশী সংসাধিত করেছে। (৫৭ পৃঃ)

সিংহ হ'তে না দিলে মানুষ শৃগাল হবে। (৬৬ পৃঃ)

ভগবানের সন্ধানে মরাও ভালো কিন্তু কুকুর হ'য়ে মাংসের জন্যে কাড়াকাড়ি কোরো না। (১০১ পৃঃ)

এমন অবস্থা লাভ করতে হবে যেখানে তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাস হবে প্রার্থনা। (১০৪ পৃঃ)

অনুমান—আমার তোমার—আনে সংঘর্ষ। বলো তুমি কী দেখেছ, দেখবে তোমার কথা সবাই বরণ করবে। (১৩২ পৃঃ)

যখন মানুষ বোঝে যে, সুখের অন্বেষণ বিড়ম্বনা, তখনই ধর্মের সূচনা হয়। (১৯২ পৃঃ)

মানুষ এগোয় প্রেমের প্রেরণায়, সমালোচনার অঙ্কুশে নয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ চেষ্টা করেছে শাসন ক'রে সমাজ সংস্কার করতে। কিন্তু ফল হয় নি। কারুর দোষ দেখিয়ে তাকে নির্দোষ করা যায় না। (৭৫পৃঃ)

এ-উক্তিগুলি মূল ইংরাজীতে পাঠ্য—বাংলা তর্জমায় এ-জাতীয় ধ্যানলব্ধ বাণীর দীপ্তি ম্লান হ'য়ে আসে। আমি তবু বাংলা তর্জমা দিলাম শুধু আভাস দিতে কি ধরনের মণিমুক্তা তাঁর কথালাপে নিরন্তরই বিচ্ছুরিত হ'ত ফুলঝুরির সোনার ফিনকির ম'ত। এ তিনি পারতেন বুদ্ধিবলে নয়—প্রাতিভ জ্ঞানের প্রেরণায়। এসম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত আলোচনা অবান্তর হবে না।

অনেকদিন আগে একদা আমার মনে প্রশ্ন উঠে—অত্যধিক আত্মপ্রত্যয় সাধকের পক্ষে ভালো কিনা—এর ফলে মনের মধ্যে অহমিকা প্রশ্রয় পায় কি না—যার

গোড়াকার কথা এই যে, আমি আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বড়—ইংরাজীতে যাকে বলে—Sense of superiority। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি গভীর পত্র লিখেন। সেটি তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে ব'লে আমি অনুবাদে তার সারমর্মটুকু পেশ করি। তিনি আমাকে লিখেছেন :

"যখন আমাদের দৃষ্টির সামনে কোনো নব দিগন্ত উদ্ঘাটিত হয় তখন অনেক সময়ে মনে আত্মপ্রত্যয়ের তেজ জেগে ওঠে যাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'তে পারে আত্মাভিমান। স্বামীজীর সঙ্গে এক মাদ্রাজী পণ্ডিতের তর্ক হয় জানো নিশ্চয়ই? পণ্ডিত বলেছিলেন : 'কিন্তু শঙ্করাচার্য তো কই এমন কথা বলেন নি?' বিবেকানন্দ পিঠ পিঠ উত্তর দিয়েছিলেন : 'না। কিন্তু আমি, বিবেকানন্দ, বলছি।' তাঁর এ-উক্তির মূলে অহমিকা ছিল না—ছিল রণবীরের ব্যুত্থান যে দাঁড়ায় নিজের আদর্শের জন্যে লড়তে, যেন না নিজেকে সে মনে করে কোনো মহৎ সত্যের প্রতিভূ যার অমর্যাদা হবে যদি সে হার মানে। ("This is not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, would not allow himself to be put down or belittled.")

বিবেকানন্দের তেজস্বিতার মূলে ছিল যে এই ভাগবত প্রতিভূর প্রাণের প্রত্যয় ও অন্তরের আলো—এই সত্যটি শ্রীঅরবিন্দের এই কয় ছত্রে আমার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই তাঁর পত্রের উল্লেখ করলাম। স্বামীজীর অজস্র নিবন্ধ, ভাষা কথালাপের মাধ্যমে নিত্যই ফুটে উঠত এই আদিষ্ট প্রতিনিধির অঙ্গীকার : "Thou lead and I follow." তিনি ছিলেন ধ্যানে শিবপুজারী, কর্মে কালীর সন্তান। তাঁর "attitude of the fighter"-এর আত্মপ্রত্যয়ী স্বর ফুটে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতার বাণীতে :

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ-ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এরই নাম—"Divine warrior"—কিন্তু শুধু দিব্য প্রেম নয়, সেই সঙ্গে দিব্য শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বারবারই বলতেন জগতে প্রেম ও জ্ঞানের মূল ভিত্তি হ'ল আত্মশক্তির নিত্যপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাই উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের বিদেহী আত্মার পেয়েছিলেন দেখা আলিপুরের কারাগৃহে। একটি চিঠিতে তিনি স্বহস্তে লিখেছিলেন (*Sri Aurobinda and his Ashram* ৪৪ পৃঃ) : "জেলে ধ্যানের মধ্যে আমি ক্রমাগতই শুনতাম বিবেকানন্দের স্বর দু'সপ্তাহ ধ'রে।" এ-অঙ্গীকার

তিনি পরেও করেছিলেন তাঁর কথালাপে (*Mother India, June 1962, pp, 11-12)* : "বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে অতিমানস তত্ত্বের সন্ধান দেন—এই এই ঐ ঐ—নির্দেশ দিয়ে নানা ভাবে। আলিপুর জেলে পনের দিন ধ'রে তিনি আমাকে শেখান ও বোঝান।" অপিচ শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেন (*Mother India, July 1962, p. 12*) : "আলিপুরে তিনি আমার কাছে আসবেন এ আমি মোটেই ভাবি নি, কিন্তু তবু তিনি এসে আমাকে শিখিয়েছিলেন, আর তিনি দিয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ—"I never expected him and yet he came to teach me. And he was exact and precise even in the minutest details."

শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। উভয়কেই তিনি গভীর ভক্তি করতেন। একবার বলেছিলেন একটি অতি চমৎকার কথা : "The capitulation of Vivekananda to Sri Ramakrishna is a capitulation of the West to the East." তিনি দেখেছিলেন তাঁর যোগদৃষ্টিতে—যে কথা স্বামী বিবেকানন্দও বারবারই বলেছেন যে, ভারতই হবে জগতের অধ্যাত্ম দিশারি।

শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের গভীর অনুরাগী ছিলেন আরো একটি কারণে—কর্ম লেখা ও তেজস্বিতার দিক দিয়ে এই দুই মহাপুরুষই ছিলেন সমধর্মী—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমার অবস্থা—বড়-ছোটর প্রশ্ন ওঠে না কেন না উভয়েই ছিলেন ভারত-আত্মার বরেণ্য বাণীবাহ আত্মবোধের আলোকস্তম্ভ। ওদেশে বলে—শুধু খ্রীষ্টই পারেন খ্রীষ্টকে বুঝতে। কথাটা অত্যুক্তি নয়। শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজীর মহিমার মর্মজ্ঞ হ'তে পেরেছিলেন—তিনি নিজেও সেই একই প্রজ্ঞা পারমিতার আলোর প্রসাদ পেয়েছিলেন ব'লে। তাই তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ১৯১৬ সালে "দয়ানন্দ" প্রবন্ধে লিখেছিলেন তাঁর মন্ত্র-ঝঙ্কারিত ভাষায়, যার জুড়ি মেলে না :

> "Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men···We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not will where, in something that is not yet formed, something leoniane, grand, intuitive, upheaving, that has entered the soul of India and we say : 'Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of her children,"

বিবেকানন্দ ছিলেন আত্মশক্তির মূর্ত বিগ্রহ ; নরকেশরী। তাঁর প্রভাব আজো প্রচণ্ড ভাবে সক্রিয় রয়েছে অনুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কী ভাবে ও কোথায়। মনে হয় শুধু—যেন কোন সিংহবিক্রম অন্তর্মুখী ঊর্ধ্বায়িত মহাশক্তি

ভারতের আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে আর আমরা বলি : 'দেখ দেখ বিবেকানন্দ তাঁর চিরজননীর ও তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজো চিরঞ্জীবী।')

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আত্মার একজন দীপ্ত বাণীবাহ একথা আমরা সবাই জানি ও মানি। কিন্তু তাঁর দিব্যকর্মপ্রতিভা যে আজো আমাদের মধ্যে সক্রিয় একথা আমরা সময়ে সময়ে ভুলে ব'সে থাকি ব'লেই শ্রীঅরবিন্দের বিবেকানন্দ-তর্পণ চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁদের কাছে যাঁরা এই দুই বীরকেশরীকে দিতে চান তাঁদের প্রাণের প্রণামী।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এ-তর্পণ শুধু কথা কথা কথা নয়। স্বামীজীর প্রেরণা আজো হাজার হাজার আদর্শবাদী তরুণ তরুণীকে নিষ্কাম কর্মে উদ্বুদ্ধ করছে—যাদের মধ্যে একজনের মাথা আকাশে ঠেকেছিল : আমাদের দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে স্বামীজীর মধ্যে তাঁর তপঃশক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার মনে হয় স্বামীজীর সিংহবিক্রম মহাশক্তি ঠিক তেম্‌নি ভাবেই তাঁর উত্তরসাধক সুভাষচন্দ্রের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে দিয়েছিল তাকে দিব্য উন্মাদনা। এ আমার বন্ধু-প্রীতির কাব্যোচ্ছ্বাস নয়। কারণ যাঁরা একটু গভীরদর্শী তাঁদের চোখে পড়বেই পড়বে যে, স্বামীজীর দুঃসাহসের মন্ত্রে সুভাষ কৈশোরে দীক্ষা নিয়েছিল ব'লেই সে "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" মন্ত্র জপতে জপতে বিশ্বপরিক্রমা করতে পেরেছিল, তাঁর দিব্যপ্রেম তার মনে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল ব'লেই ভারতের দীন দুঃখী দুর্গতদের জন্যে তার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই কল্পনা করতে পারি—যখন সে বর্মায় সৈন্য-বাহিনী গ'ড়ে তুলে মহাবিক্রমী দুঃসাহসে "দিল্লি চলো" রণদুন্দুভি বাজিয়ে তুলেছিল তখন তার দুর্দম অন্তঃশক্তির উদ্বোধন করেছিল স্বামীজীর দিব্য দেশভক্তির প্রাণোন্মাদী তূর্যধ্বনি—কোনো সাবধানী রাজনৈতিক বুলি নয়। স্বামীজীর *My Plan Of Campaign* ভাষণ থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলে একথার ভাষ্য করা হবে। স্বামীজী বলিলেন :

"They talk of patriotism. I believe in patriotism and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achievements. First, feel from the heart what is in the intellect or reason ?...Through the heart comes inspiration. Love opens the most impossible gates ; love is the gate to all the secrets of the universe. Therefore, feel, my would-be reformers, my would-be patriots ! Do you feel ? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and sages are starving today ?.. Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud ? Does it make you restless ? Does it make you sleepless ? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heart-beats ?...

"Yet that is not all. Have you got the will to surmount mountain-high

obstruction ? If the whole world stands against you, sword in hand, would you still dare to do what you think is right ? ..."শেষতঃ, "Have you got steadfastness ? If you have these things, eac i one of you will work miracles · If you live in a cave, your thoughts will permeate even through the rock-walls, will go vibrating all over the world for hundreds of years, may be, until they will fasten on to some brain and work out there. Such is the power of thought, of sincerity and of purity of purpose."

("শুনি দেশভক্তি সম্বন্ধে কত বুলি! আমিও বিশ্বাস করি দেশভক্তিকে, তবে আমার দেশভক্তির আদর্শ অন্য। এজন্যে চাই তিনটি জিনিস : প্রথম অন্তরের দরদ। বুদ্ধি-যুক্তির সাধ্য কতটুকু ? প্রেরণার উৎসমূল—হৃদয়। শুধু প্রেমই খুলে দিতে পারে চিররুদ্ধ দুয়ার, বিশ্বরহস্যের চাবি তারি হাতে। যদি সত্যি সংস্কারক কি দেশভক্ত হ'তে চাও তবে সব আগে হৃদয়ে গভীর ভাবে অনুভব করতে শেখো। বুক ফেটে যায় কি তোমার ভাবতে যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি দেবসন্তান ঋষিসন্তান আজ নিরন্ন—অজ্ঞানের কালো মেঘে দেশ অন্ধকার ? বলতে পারো কি—তোমার রাত্রে ঘুম হয় না, প্রাণ কেঁদে ওঠে একথা ভাবতে। অঙ্গীকার করতে পারো কি যে, পরের ব্যথা তোমার ধমনীর রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ ক'রে হৃৎস্পন্দনে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

"কিন্তু শুধু এইই নয়। পর্বতপ্রমাণ বাধা এলেও তাকে অতিক্রম করবার দৃঢ় সঙ্কল্প আছে কি তোমার ? সমস্ত জগৎ যদি তোমার বিপক্ষে দাঁড়ায় তাহ'লেও তুমি কৃপাণ হাতে একলা চলতে পারো কি কর্তব্য পালন করতে—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের পণ নিয়ে ? শেষতঃ, তোমার নিষ্ঠা আছে কি ? এই তিনটি গুণ যদি থাকে তবেই তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে! এমন কি, যদি গুহাবাসীও হও তাহ'লেও তোমার চিন্তা ও অভীপ্সা পাষাণ ভেঙে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে স্পন্দমান হ'য়ে শত বৎসর ধ'রে যতদিন না তারা এমন কোনো আধার পায় যার মধ্যে দিয়ে তারা মূর্ত হ'য়ে উঠবে পরম সিদ্ধিতে। চিন্তা, অভীপ্সা, আন্তরিকতা ও পুণ্যসঙ্কল্পের মধ্যে এম্‌নিই দিব্যশক্তি নিহিত।")

স্বামীজীর দেশভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষকেও আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছিল এ আমার কথার কথা নয়। বিনিদ্র রাতে কতদিনই তার সঙ্গে এ-আলোচনা হয়েছে আমার, শুধু এদেশে নয় বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি তেম্‌নি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজির দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই। একথার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে—আমি কেবল সুভাষের

রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই সমাপ্তি টানব দেখাতে—স্বামীজীর প্রাণের স্বর তার প্রাণের তারেও কী ভাবে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছিল। সুভাষ বলেছিল :

"আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি বাংলার আনন্দ-উৎসবের মধ্যে নয়, বিত্তবানের শান্তির মধ্যে নয়। আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি দুঃখ দৈন্য নির্যাতনের মধ্যে; অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে; অশান্তি, অবিচার, অনাচারের মধ্যে—সবার উপরে, মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।···

"মনে রাখিবেন যে, আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে।···জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান দিয়াছে—শুধু সে-ই অমৃতের সন্ধান পায়। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, শুধু ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃতসিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদের আজ আহ্বান করিতেছি—আসুন, আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাঁহা যদি করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

'ভারত আবার জগৎসভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

এই কথাই যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন তাঁর অনুপম ভাষণে স্বামীজীর সিংহবিক্রম প্রেরণার চিরস্মরণীয় তর্পণে :

"Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of her children."

আজ এ-মহাভাগ কর্মবীর জ্ঞানশিখরচারী প্রেমব্রতীর শতজন্ম স্মৃতিবার্ষিকী শ্রদ্ধাসভায় এই কথা স্মরণ ক'রে যেন গাইতে পারি আমরা ভক্তিকম্প্র আনন্দের উচ্ছল অঙ্গীকারে :

১

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত
অলোকলোকের অশোক দুলাল, পুণ্যশুভ্র ধর্মনিত্য[১] !
দলি' বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিষ্কাম অমলকান্তি !
কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে—সাহস, শান্তি !

১। ধর্ম যাদের কাছে নিত্যবস্তু। এ কথাটি বাংলায় সম্ভবত নবশব্দ। কিন্তু মহাভারতে আছে। কৃষ্ণ বিপন্না দ্রৌপদীর কাছে এসে বলেছিলেন আশ্বাস দিয়ে 'ধর্মনিত্যাস্তু যে কেচিৎ নতে সীদন্তি কর্হিচিৎ', অর্থাৎ যারা ধর্মনিত্য তারা অবসন্ন হয় না কখনো।

অল্পের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ !

২

তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের দুঃখদৈন্য
ঘুচাতে হে দেবসেনানী, তোমার তুলিলে গড়ি' বেদান্তী সৈন্য !
হীন লোকাচারে মিথ্যাবিহারে ছিল যারা চির পথভ্রান্ত
তোমার অভ্যুদয়ে হ'ল নব-অরুণোজ্জ্বল পথের পান্থ।
অল্পের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ !

৩

হে অপরাজেয় ! বরি দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জানিলে তাঁহার বরে—তুমি চিরজীবন্মুক্ত, শিবের অংশ।
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন, যারা ছিল নগণ্য
তোমার বীর্য-জ্ঞানের পরশমণির ছোঁওয়ায় হ'ল হিরণ্য।
অল্পের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা—অন্ধ !

৪

প্রাচী প্রতীচির মাঝে সেতু বাঁধি' সিন্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত,
ঐন্দ্রজালিক ! জাগালে যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিষুপ্ত।
গীতা ও পুরাণ, ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, উপনিষদ, তন্ত্র,
কণ্ঠে তোমার ঝংকৃত হ'য়ে জগন্মাতার অভয় মন্ত্র।
অল্পের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ !

৫

ব্রহ্মচারী যে স্বাধিকারে তার—শুধু অমৃতেরি জপিল তৃষ্ণা,
প্রেমের মুকুট দেখি শিরে যার লাজে মুখ ঢাকে কামনা কৃষ্ণা,
সে-তুমি বিলালে দু'হাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকারত্ন
স্বার্থ ভুলিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রহিয়া মগ্ন।
অল্পের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ !

সঙ্গীতসাধক স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতনিষ্ঠা ও সঙ্গীতপ্রতিভার বিষয়ই আলোচনা করব তাঁর জীবনের কতকগুলি ঘটনার সহায়তা নিয়ে। এজন্য তাঁর বিভিন্ন জীবনী-লেখকদের লেখা ও বিবরণ থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করেছি বিশেষভাবে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের আলোচনা-প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁর ত্যাগ-তপস্যা, আত্মবিশ্বাস, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, কর্মনিষ্ঠা, মহাপ্রাণতা ও সর্বোপরি গভীর আধ্যাত্মিকতার কথা। সর্বতোমুখী ছিল তাঁর প্রতিভা। রহস্য-বিদ্রূপে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়ায়, সঙ্গীতে—সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন সমান অগ্রণী।[১] ছাত্রাবস্থায় পাঠ্য-পুস্তকেই মাত্র নিবদ্ধ ছিল না তাঁর অধ্যয়ন। নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদির প্রতিও তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। তাছাড়া গণিত, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনেরও তিনি আলোচনা করতেন মনোযোগের সহিত।[২] উচ্চাঙ্গ গণিতের মতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতিও ছিল তাঁর আগ্রহ সমধিক। তাই স্বামী বিবেকানন্দ শুধুই ছিলেন না শাস্ত্রবেত্তা, ধর্মসেবী, পরিব্রাজক, প্রচারক, সাধক ও অধ্যাত্মতত্ত্বদ্রষ্টা, কিন্তু ছিলেন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গীতজ্ঞানকুশলী। তাছাড়া রন্ধনবিদ্যা, দাবাখেলা, নাটকানুষ্ঠান ও অভিনয়, বিভিন্ন ক্রীড়া ও ব্যায়াম, নৌকাচালানো, অসিচালনা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আবাল্য তিনি ছিলেন মেধাবী, তেজস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি, প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন ও সহৃদয় এবং তারি জন্য সকল রকম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পথকে তিনি করেছিলেন সমুজ্জ্বল ও সুষমায়িত।

সঙ্গীতবিদ্যা তিনি শিক্ষা করেছিলেন তদানীন্তন সমাজের হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে। ঊনবিংশ শতকে ও তার পূর্ববর্তী কালের পদাবলীকীর্তন, সহজিয়া গান, বাউলগান, রামায়ণ গান, ঝুমুর, তরজা, হাফ্‌আখড়াই, কথকতা, শ্যামাসঙ্গীত, বাংলা টপ্পা ও টপ্‌খেয়াল প্রভৃতি গীতশ্রেণী তখনকার শিক্ষিত ও সাধারণ সমাজে এনেছিল এক জাগরণ ও আলোড়ন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত,

---

১। প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ (১৩৬২) ১ম ভাগ, পৃঃ ৬৪
২। ঐ

রাজা রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, দেওয়ান রঘুনাথ, নিধুবাবু, মধুকান, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি ভক্ত-সাধক ও চারণ-কবিদের গানও বাঙলার সঙ্গীতসম্পদকে করেছিল সমৃদ্ধ। বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপ ও দুর্গামণ্ডপ মুখরিত থাকত তখন হাস্য-পরিহাস, সঙ্গীত ও বিচিত্র আলোচনা প্রভৃতিতে। হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিক্যাল গানের অনুশীলনও ছিল অব্যাহত অভিজাত বৈঠকগুলি এবং ধনী ও জমিদার প্রভৃতিদের বৈঠকখানায়। বাঙলার সকল রকম গানের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত হিন্দুস্থানী ক্ল্যাসিক্যাল গানের মাধুর্য আকর্ষণ করেছিল বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ) মনকে। তাছাড়া বংশের সঙ্গীত-সংস্কারও করেছিল বিবেকানন্দের সঙ্গীতরুচিকে সচঞ্চল। সিমুলিয়ায় দত্তবংশের অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) তখনকার সময়ে একজন বিখ্যাত বংশীবাদকরূপে পরিচিত ছিলেন। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রথম জীবনে অমৃতলাল দত্তের নিকটই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কুমিল্লার সঙ্গীতশিল্পী শ্রীহরিহর রায় এবং আরো অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পবিদ্‌রা অমৃতলালের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। অমৃতলালের ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ দত্তও (তমুবাবু) একজন বিখ্যাত যন্ত্রশিল্পী নামে পরিচিত ছিলেন।[৩]

বিবেকানন্দ সঙ্গীতানুরাগের সংস্কার ও সঙ্গীতসাধনার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁর পিতা-মাতার কাছ থেকেও। প্রমথনাথবাবু এ' প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলেছেন: "সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রতি তাঁহার পিতা-মাতা উভয়েরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীজী বলিতেন তাঁহার পিতা সুকণ্ঠ ছিলেন এবং নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি গাহিতে পারিতেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী বৈষ্ণব ভিক্ষুক ও রাতভিখারীদিগের ভজনগান একবার মাত্র শুনিয়াই সুর-তাল-লয়ের সহিত আয়ত্ত করিতে পারিতেন।"[৪] তিনি আরও লিখেছেন: "সর্বাপেক্ষা তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল সঙ্গীতে। তিনি আশৈশব সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া যতদিন পর্যন্ত না উৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও সাধনাগুণে উহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।"[৫]

বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের প্রতিভার বিষয় ভালভাবেই জানতেন এবং পুত্রকে তাই বিচিত্র বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা দেবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

৩। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: *Swami Vivekananda : Patriot-Prophet (1954)*, পৃ: ৮৬।
৪। স্বামী বিবেকানন্দ (১৩৬২), পৃ: ৫৭।
৫। ঐ

রামায়ণ, কথকতা, রামপ্রসাদী, কীর্তন যে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানই হোত সিমুলিয়া পল্লীর কোন বাড়ীতে, বিবেকানন্দকে তিনি সুযোগ দান করতেন শোনার জন্য। কণ্ঠ ছিল বিবেকানন্দের সুমিষ্ট ও সাবলীল; স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। তাই যে-কোন গান তিনি শুনতেন একবার, তা প্রকাশ করতে পারতেন অবিকল ভাবে। বিশ্বনাথ দত্তের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি পুত্রকে তাই বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন এবং ব্যবস্থাও তার হোল সুচারুরূপে।

প্রমথনাথ বসু লিখেছেন: "প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই তিনি (বিবেকানন্দ) রীতিমত গীত-বাদ্যের চর্চা আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী গুপ্ত নামে একজন উস্তাদের নিকট তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র (সঙ্গীতবিদ্যা) শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। বিশ্বনাথবাবু বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সম্যক্ অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র উস্তাদের নিকট হইতে রাগ-রাগিণী শিক্ষা করেন ও তান-লয় সম্বন্ধে বিধিমত উপদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে নরেন্দ্র চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়া ঐ উস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যেখানে যাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন,—সকলেই তাঁহাকে উস্তাদের ন্যায় খাতির-যত্ন করিত এবং সঙ্গীতসম্বন্ধে তাঁহাকে একজন 'অথরিটি' (প্রমাণ-স্বরূপ) বলিয়া গণ্য করিত। প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক-বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং শেষে নিজে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।[৬] সঙ্গীতগুরু তাঁহার প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা নিজের মুখোজ্জ্বল হইবে জানিয়া তাঁহাকে শিখাইবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট অনেক হিন্দী, উর্দু এবং ফার্সী গানও শিখিয়াছিলেন।"[৭]

৬। এর পরিচয় পরে দেব।

৭। স্বামী বিবেকানন্দ (১৩৬২), ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৩

স্বামী বিবেকানন্দ সম্ভবত আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণী উস্তাদ ছাড়াও তদানীন্তন কোন কোন প্রসিদ্ধ বাঙালী ও মুসলমান সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বেণী উস্তাদের সঠিক পদবী নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। প্রমথনাথ বসু 'স্বামী বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে লিখেছেন বেণী উস্তাদের আসল নাম 'বেণী গুপ্ত', ও তিনি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদ আহম্মদ খাঁর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মুখে আমরা শুনেছি স্বামীজী উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন বেণী উস্তাদের কাছে, কিন্তু বেণী উস্তাদ ছিলেন বৈরাগী। সুতরাং তাঁর পদবী হওয়া সম্ভব 'দাস' এবং সেদিক থেকে সম্ভবত তাঁর নাম ছিল বেণী দাস। শ্রদ্ধাস্পদ মহিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন: "কি জানি বাবু, বেণী গুপ্ত,—'গুপ্ত' পদবী আমরা শুনিনি, আমরা জানি বেণী বৈরাগী (দাস) বা বেণী উস্তাদ।"

স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন প্রবেশিকা-শ্রেণীতে যখন তিনি পড়েন একথা পূর্বেই বলেছি। শুধু গান নয়, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি চর্মবাদ্য এবং এসরাজ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় কুমুদবন্ধু সেন বলেন, স্বামীজী যে-কোন বাদ্যযন্ত্রই ভালভাবে বাজাতে পারতেন। বেণী উস্তাদের পরিচয় দেবার সময় প্রমথবাবুও লিখেছেন: "ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন।" বিবেকানন্দ সম্ভবত কণ্ঠসঙ্গীতের মতো যন্ত্রসঙ্গীত তথা বাদ্যযন্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বেণী উস্তাদের কাছেই। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীর কাছে শুনেছিলেন, কাশী ঘোষাল নামে বিবেকানন্দের আর একজন সঙ্গীতগুরু ছিলেন। কাশী ঘোষাল আদি-ব্রাহ্ম সমাজে গানের সঙ্গে পাখোয়াজ ও তবলা সঙ্গত করতেন। বিবেকানন্দ সম্ভবত পাখোয়াজ ও তবলা শিক্ষা করেছিলেন কাশী ঘোষালের নিকট। শ্রদ্ধেয় ভূপেনবাবু লিখেছেন: "Narendra was an expert singer in classical music. He inherited that taste from his father who practised it for sometime in his youth. Narendranath learned music from an *Ostad* (teacher), named Beni. The writer has heard from his mother that Kasi Ghosal was also one of his *Ostads*. It is said that Kasi Ghosal used to play *Pakhwaj*, etc. at the Adi Brahmo Samaj. Perhaps he learnt to play on the same instrument and along with it or *banya* and *tabla* from

him,"[৮] তাছাড়া ভূপেনবাবু আরো বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ বাদ্য (তবলা ও পাখোয়াজ) সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও লিখেছিলেন এবং তা বটতলা থেকে বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রকাশ করেছিলেন: "Narendranath wrote a book on how to play on these instruments in Bengalee. It was published by Baishnav Charan Basak of Bartola. The writer has seen a copy of it in the Library of the Belur Math"[৯].

তবে আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ 'সঙ্গীতকল্পতরু' নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন এবং সেটির প্রণেতা-রূপে নাম ছিল 'শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ.'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বটতলা থেকে। পরে তার পুনর্মুদ্রণও হয়েছিল এবং তারই একখানি বেলুড় মঠ গ্রন্থাগারে ছিল। পাখোয়াজ ও তবলা সম্বন্ধে কোন গ্রন্থের কথা আমরা শুনিনি।[১০]

বেণী উস্তাদের বাড়ী ছিল কলকাতায় মস্‌জিদবাড়ী স্ট্রীটে ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ীর কাছে। উস্তাদের বাড়ীর কাছাকাছি ছিল বিখ্যাত অম্বু গুহের বাড়ী ও কুস্তির আখড়া। শিক্ষক বা উস্তাদের খোঁজ-খবর সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ নিজে, আর এ সংগ্রহের কাজে সাহায্য করেছিলেন কুস্তির আখড়ার সতীর্থরা। বিবেকানন্দের শরীর ছিল সবল, বলিষ্ঠ ও সুঠাম। এবং সে স্বাস্থ্য-সম্পদ লাভ করেছিলেন তিনি একদিকে বাল্যকাল থেকে কুস্তি, ডন বৈঠক প্রভৃতি ব্যায়াম শিক্ষা করায় ও অপর দিকে কুস্তিগীর অম্বু গুহের সযত্ন শিক্ষাদানের জন্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দও (যিনি রাখাল মহারাজ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে পরিচিত ছিলেন) অম্বু গুহের কুস্তির আখড়ার ছাত্র ছিলেন এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় লাভ ঘটে এ আখড়ায়ই।

এ ঘটনার চাক্ষুষ প্রমাণস্বরূপ শ্রদ্ধেয় কুমুদবন্ধু সেনের কথার এখানে উল্লেখ করব। কুমুদবাবু লিখেছেন: "বেণী উস্তাদের বাড়ী ছিল মস্‌জিদবাড়ী স্ট্রীটে। ওঁর বাড়ীতে ছিল হাপ্‌-আখড়াইয়ের দল। স্বামীজী (বিবেকানন্দ) মস্‌জিদবাড়ী

৮। Dr. Dutta: *Swami Vivekananda—Patriot-Prophet (1954)*, পৃঃ ১১৫।

৯। ঐ, পৃঃ ১৫৫

১০। প্রমথনাথ বসু 'স্বামী বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে যে বিবরণ দিয়েছেন তার কথা পূর্বেই বলেছি। লিখেছেন: "এমন কি কোন দরিদ্র সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন"। অবশ্য এই 'ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব' রূপ বৃহৎ মুখবন্ধটিই পরে 'সঙ্গীতকল্পতরু' নামে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন।

স্ট্রীটে অম্বু গুহের কাছে রীতিমত তখন কুস্তি-আদি ব্যায়াম শিক্ষা করেন। রাখাল মহারাজও (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিলেন তাঁর সহযাত্রী। অম্বু গুহের পাড়ায় কেন, প্রায় বাড়ীর কাছেই ছিল বেণী উস্তাদের বাড়ী। বিদেশ (বাঙলার বাইরে) থেকে অনেক হিন্দু ও মুসলমান গাইয়েও আসতেন মাঝে মাঝে বেণী উস্তাদের বাড়ী। কাজেই আখড়ার কাছাকাছি হওয়ায় কুস্তি শেখার পর নরেন্দ্রনাথ গান শিখতে যেতেন বেণী উস্তাদের কাছে"।[১১]

অনেকের মতে বিবেকানন্দ বেণী উস্তাদের কাছে প্রায় বার বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করার পর উস্তাদের সঙ্গীতগুরু আহম্মদ খাঁর কাছেও ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন।[১২] বিবেকানন্দের হিন্দী উচ্চারণ ছিল বিশুদ্ধ। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজের অসংখ্য ধ্রুপদাঙ্গ ভজন, বাংলা-টপ্পা ও টপ্‌খেয়ালও তিনি শিক্ষা করেছিলেন ছাত্রাবস্থায়ই। স্বামীজীর কণ্ঠস্বর এতই সতেজ অথচ সুমিষ্ট ছিল যে, যে-কোন রাগের আলাপ ও রূপ যেন রসে ও ভাবে মূর্তিমান হয়ে উঠত।

কলকাতার তদানীন্তন বাঙালীসমাজের নামকরা উস্তাদ বা সঙ্গীতাচার্যদের ভিতর বেণী উস্তাদের নাম অবশ্য সর্বপরিচিত ছিল। উস্তাদ আহম্মদ খাঁ কিছুদিন আন্দুল রাজবাড়ীতে সভাগায়ক হিসাবে ছিলেন। তার পরে কিংবা পূর্বে ঠিক বলা কঠিন, তিনি কলকাতায় কিছুদিন অবস্থান করেন ও বহু হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষার্থীকে সঙ্গীতশিক্ষা দান করেন। তিনি ছিলেন বিশেষভাবে ধ্রুপদ ও খেয়াল গীতরীতির গায়ক, তবে টপ্পা-ঠুংরী প্রভৃতিও জানতেন ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আহম্মদ খাঁ নামে দু'জন উস্তাদের নাম সাধারণত শোনা যায়। তবে যে আহম্মদ খাঁ কিছুদিন আন্দুল রাজবাড়ীতে ছিলেন ও পরে কলকাতায় বসবাস করেন তিনিই ছিলেন বেণী উস্তাদের এবং কারু কারু মতে স্বামী বিবেকানন্দেরও সঙ্গীতগুরু। শোনা যায়, এই আহম্মদ খাঁ ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের শঙ্কর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আহম্মদ খাঁরা দু'ভাই, ছোট ভাইয়ের নাম ছিল মহম্মদ খাঁ।

বিদগ্ধ সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (গৌরীপুর) মতে আহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ খাঁ দু'ভাই ছিলেন। তাঁরা শাহ্ সদারঙ্গের কাওয়াল-শিষ্যবংশীয়। ঐ বংশ এখন লুপ্তপ্রায়। শেষবংশীয় দেলাবর খাঁ (দিলবর বা দিলওয়ার খাঁ ?) রেওয়ার দরবারে ছিলেন।[১৩] ইস্‌সু, হর্দু ও নথু খাঁ—এই তিন

১১। স্বামীজীর সিমুলিয়ার বাড়ীতেও উস্তাদজী গান শেখাতে আসতেন।

১২। অবশ্য এ তথ্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা কঠিন।

১৩। ১৩৪১ সালের আষাঢ়—৩য় সংখ্যা (১৯১ পৃষ্ঠা) 'সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা'-পত্রিকায় আহম্মদ খাঁ ও মহম্মদ খাঁ সম্বন্ধে 'সংবাদ' পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে: "যুক্তপ্রদেশের বান্দাসিটির

ভাই ছিলেন মহম্মদ খাঁর সঙ্গীতশিষ্য। আহম্মদ খাঁ ছিলেন অদ্বিতীয় খেয়ালী ও এবং থাকতেন গোয়ালিয়রে। আহম্মদ খাঁ পরে বারাণসীতে কিছুদিন ছিলেন। কলকাতায়ও মাঝে মাঝে অথবা শেষের দিকে ছিলেন।[১৪] পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আহম্মদ খাঁ বিখ্যাত ধ্রুপদী এবং শাহ সদারঙ্গের শিষ্যবংশীয় প্রসিদ্ধ খেয়ালগানের ধারক। বেণী উস্তাদ আহম্মদ খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং বিবেকানন্দও শিক্ষা করেন আহম্মদ খাঁরই ঘরাণার গান বেণী উস্তাদের কাছে, সুতরাং স্বামীজীর সঙ্গীতের ধারা ও গায়কীপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অনুযায়ী বিশুদ্ধ তথা খান্‌দানী।

এবার স্বামী বিবেকানন্দের ছোটখাট কয়েকটি সঙ্গীতজীবনের ঘটনার উল্লেখ করব যা থেকে প্রমাণ হবে তাঁর সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা, অনুরাগ ও পারদর্শিতার কথা। লীলাপ্রসঙ্গকার পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ উল্লেখ করেছেন—সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের যখন সাক্ষাৎকার তথা প্রথম মিলন হয়[১৫], তখন স্বামীজী দু'চারটি বাংলা গান মাত্র শিক্ষা করেছেন ("গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাঙ্গলা গান সে দুই-চারটি মাত্র তখন শিখিয়াছে")। কিন্তু একথা অতীব সত্য যে, বিবেকানন্দ তারো অনেক আগে থেকেই ব্রাহ্মসমাজে অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। তাছাড়া জেনারেল

অন্তর্গত কলাবৎ মহল্লার গায়কবংশীয় উস্তাদ মহম্মদ খাঁ…। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী উস্তাদ আহম্মদ খাঁ ইঁহারই পিতা ছিলেন।…ইঁহারা বংশানুক্রমিক আদর্শ সঙ্গীতের জন্য গোয়ালিয়র ও দাঁতিয়া মহারাজগণের বৃত্তিভোগী।" অবশ্য এ পরিচিতি কতটুকু সত্য তা নির্ণয় করা কঠিন।

১৪। শোনা যায়, আহম্মদ খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ খাঁও শেষে রেওয়ার দরবারে এক হাজার টাকা বৃত্তি নিয়ে থাকতেন। কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি গোয়ালিয়রে দৌলত খাঁ সিন্ধিয়ার দরবারে ছিলেন।

১৫। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এ'সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ থাকলেও স্বামী সারদানন্দজী ও প্রমথনাথ বসুর বিবরণই ঠিক। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থে (৭ম সং ১৩৫৬, পৃঃ ৫৩) ভুল বশতঃ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে'র ৫ম খণ্ডে 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে (১৩৫৮, পৃঃ ৫৫-৫৬) স্বামী সারদানন্দজী উল্লেখ করেছেন: "তখন ১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ ইং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর হইবে"। "সুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ ঐ দিবসে নিজ প্রতিবেশী…শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের ভজন গাহিবার জন্য নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসহায়ক স্বামী বিবেকানন্দের পরস্পরকে প্রথম দর্শন করা ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছিল।" প্রমথবাবুর 'স্বামী বিবেকানন্দ', ১ম ভাগ, পৃঃ ১০৪-১০৫ দ্রষ্টব্য। *Life of Swami Vivekananda*, vol. 1 (1914) গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।

এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশনে যখন তিনি পড়েন তখন সতীর্থদের অনুরোধে তাঁকে মাঝে মাঝে বাংলা গান গেয়ে শোনাতে হোত। একদিনের এক ঘটনার কথা *Life of Swami Vivekananda*, vol. 1 (1914 পৃঃ ১০৯-১১০) গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে : "Frequently the students at the General Assembly's Institution gathered around Noren for hear him sing. There were two hundred boys in a class on a certain day.···The young men asked Noren to while away the time with a song. He gladly responded."

ডঃ কালিদাস নাগ 'বসুমতী' পত্রিকায় (১৩৫৮ সাল, ফাল্গুন, পৃঃ ৬৩৭) উল্লেখ করেছেন, "১৮৭৯ থেকেই—অর্থাৎ ১৬ বছরের নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজাদি নানা ধর্মসম্প্রদায়ে যাতায়াত শুরু করেন।" তারপর তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ও মেলামেশা করার পূর্বেই বেণী উস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী গানের মতো বাংলা গানও কিছু কিছু শিক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে মেলামেশার জন্য শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, চিরঞ্জীব শর্মা, সঙ্গীতশিল্পী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুঞ্জবিহারী দেব, উমানাথ গুপ্ত, গগনচন্দ্র হোম প্রভৃতির সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় ঘটে। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের 'গায়কাচার্য'-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও সেজন্য তাঁকে বলা হোত 'The Singing Apostle of New Dispensation Church'। কুঞ্জবিহারী দেব ও উমানাথ গুপ্ত এঁরা দুজনেও ছিলেন নববিধানের গায়ক ও গানরচয়িতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিবেকানন্দের পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠভাবে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ও সুর সংযোজিত গান তিনি গাইতেন এবং ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ-বাসরে তাঁর গানই একথা প্রমাণ করে। গানটি ছিল,

> দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
> বল দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়,—প্রভৃতি

রবীন্দ্রনাথ রচনা করে এ'গানটিতে নিজেই সুর যোজনা করেছিলেন এবং কিভাবে গান করা উচিত তাও বিবেকানন্দকে (তখন নরেন্দ্রনাথ) তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমবয়স্ক ছিলেন, তবে স্বামীজী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা এক বৎসর আট মাসের ছোট। "১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দেখি কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর কন্যার বিবাহ সভায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত

'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' গানটি গেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ।" এ'ঘটনাটি পাওয়া গেছে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সহধর্মিণী লিখিত দিনপঞ্জী থেকে। তাছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে বিবেকানন্দের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তখনকার দিনে বাঙ্গলাদেশে বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রাণকেন্দ্র ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গান রচনা করেন। তাতে ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাণ্ডার হয়েছিল সমৃদ্ধ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন বিবেকানন্দের সহপাঠী। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনও ছিলেন বিবেকানন্দের সতীর্থ। ঠাকুরবাড়ীতে বিবেকানন্দের মেলামেশার প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-গ্রন্থে লিখেছেন : "বিবেকানন্দ দীপুদাদার (দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর) class-friend (সহপাঠী) ছিলেন। তখন দু'জনেই পড়তেন কলেজে। আমাদের বাড়ীতে বিবেকানন্দ এলে দীপু দাদা 'কে হে, নরেন?' বলে ছুটে এসে দেখা করতেন। এতই ছিল হৃদ্যতা ও ভালবাসা।"

বিবেকানন্দের পঠদ্দশায় ব্রাহ্মসমাজের গান তাঁকে সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করে রাখত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'অনুপম মহিমপূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান', রবীন্দ্রনাথের 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতা', বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়-রচিত 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি', রবীন্দ্রনাথের '(তাঁরে), আরতি করে চন্দ্র-তপন, দেব মানব বন্দে চরণ' প্রভৃতি গান তিনি প্রায়ই গাইতেন। তাঁর পড়ার ছোট ঘরটির নাম ছিল 'টঙ্'। শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ সিংহ ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'স্বামীজীর স্মৃতি'-শীর্ষক প্রবন্ধে স্বামীজীর টঙের একটি বিবরণ দিয়েছেন। স্বামীজী তথা বিবেকানন্দের সেই টঙের বিবরণ থেকে জানা যায় পাঠ্যাবস্থায়ই কি ধরনের সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাঁর ছিল এবং উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ছাড়াও সকল রকম গান কিভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।*

এ' ধরনের অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি থেকে বিবেকানন্দের সঙ্গীতপ্রতিভার চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথনাথ বসু বিবেকানন্দের কণ্ঠ ও গীতিমাধুর্যের উল্লেখ করে বলেছেন : "স্বয়ং পরমহংসদেবও নরেন্দ্রের এই সুকণ্ঠের সঙ্গীতে একদিন মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট ও সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং খেতড়ি রাজ-সভাতেও তিনি দরবারী কানাড়া, ইমনকল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ

---

* প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকণার জন্য এই গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।”[১৬] তিনি আরো লিখিয়াছেন: “তিনি যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে ‘বীরোচিত কলা’ বলিয়া নৃত্যবিস্তার খুব আদর ছিল এবং ধর্মোৎসবাদির সময় নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। নরেন্দ্র স্বাভাবিক কলানুরাগবশতঃ নৃত্যকালে অঙ্গসঞ্চালনের মাধুর্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, আর সেই সঙ্গে যদি সঙ্গীতটি উচ্চভাবব্যঞ্জক হইত তাহা হইলে ভাবের প্রেরণায় নৃত্যসৌষ্ঠব আরও বর্ধিত হইত। এ বিষয়ে তিনি ঠিক গ্রীকদের মতো ছিলেন। আশৈশব সৌন্দর্যানুরাগী, স্বয়ংও সুন্দরদর্শন, তাহার উপর বহিঃসৌন্দর্যের সহিত অন্তরসৌন্দর্যের সম্বন্ধবেত্তা; সুতরাং তাঁহার সুকণ্ঠের সুধাস্রাবী সঙ্গীত ও তৎসহ ললিত বপুর তরঙ্গায়িত ভঙ্গী যুগপৎ শ্রোতা ও দর্শকের প্রাণ হরণ করিত।”[১৭]

এই ছাত্রাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিলন হয়। তাঁর প্রাণস্পর্শী গানে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হতেন। বিবেকানন্দ হয়তো গান করছেন—‘মন চল নিজ নিকেতনে সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে,’ প্রভৃতি,—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন পার্থিব সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ-সাগরে লীন হোল। বিবেকানন্দ তানপুরা নিয়ে গাইলেন,

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি।
(তুমি) ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিণী।
প্রসুপ্ত ভুজগকায়া, আধারপদ্মবাসিনী॥

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবস্থ হলেন। “গানের স্তরে স্তরে মন উর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্মরমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন।” বিবেকানন্দ শ্যামাবিষয়ক, কৃষ্ণবিষয়ক ও কীর্তনাদি গান করে পরমহংসদেবকে শোনাতেন, পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মানন্দরস পান করতেন। অলৌকিক গুরু ও অলৌকিক শিষ্যের পারস্পরিক মিলনকে সার্থক করে তুলতো গান। ভারতের নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই ললিতকলা অধ্যাত্মভাবের উদ্বোধক এবং বিবেকানন্দ ভারতের আদর্শই গানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারি জন্য ঊনবিংশ শতকের যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের সত্ত্বশুদ্ধ মন বিবেকানন্দের গানে স্পন্দিত ও বিগলিত হত।

১৬। ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ (১৩৬২), পৃঃ ৭৪।
১৭। ঐ, পৃঃ ৭৫।

পরিব্রাজক-জীবনের পূর্বে ও সময়ে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধগয়ার মোহান্তজীর নিকট বিবেকানন্দের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আলোয়ার রাজ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও কীর্তনের সভায় যোগদান,[১৮] রামপুর ও খেতড়ী রাজ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন[১৯] এবং প্রভাস ও পলিটানায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-পরিবেশনে "সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি অর্জন" প্রভৃতি ঘটনা বিবেকানন্দের সঙ্গীত-প্রতিভারই পরিচয় দান করে। স্বামীজী সঙ্গীতের একজন প্রকৃত বোদ্ধাও ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে খেতড়ীরাজ্যে একজন বাইজীর গান তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। গানটি ছিল অন্ধ কবি সুরদাসের সর্বজনপরিচিত গান: "প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো" প্রভৃতি। প্রথমে অনুরোধ সত্ত্বেও বাইজীর গান শুনতে তিনি সম্মত ছিলেন না, কিন্তু পরে গানটি শুনে তিনি "দেখিলেন যে গায়িকা সামান্যা রমণী হইলেও আজ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই সার সত্যটি সুপরিস্ফুটভাবে তাঁহার মর্মবোধ করিয়া দিয়াছে।" ভারতীয় আদর্শ পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন বলেই বাইজীর গান তাঁকে মুগ্ধ ও আত্মোপলব্ধির আনন্দে আত্মহারা করেছিল।

তা ছাড়া পরিব্রাজক জীবনে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন এবং সুযোগ-সুবিধামত দক্ষিণী সঙ্গীতের মর্মবোধ ও হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে সমবেত নরনারীকে মুগ্ধ করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে ভারতভূমি ত্যাগ করে তিনি চিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা রওনা হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন বসে। স্বামী বিবেকানন্দ অলৌকিক আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্যাণ-আশীর্বাদ বরণ করে পাশ্চাত্ত্যের সর্বত্র ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মানুভূতির মর্মকথা প্রচার করলেন। হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের ভিত্তিপ্রস্তর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোল।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মঠ-প্রতিষ্ঠা, ধর্মপ্রচার, সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনগঠন, দেশকল্যাণব্রতে আত্মদান প্রতি বিচিত্র কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতসাধনাকে যে তিনি নিজের কর্তব্যকর্ম থেকে বাদ দেন নি—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বরবাবুর বাগানে সঙ্গীতানুষ্ঠানই তা

১৮। আলোয়ারের পুরবাসীরা স্বামীজীর কণ্ঠে "(আমি) গেরুয়া-বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি" প্রভৃতি কীর্তন গান এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়েছিল।—'স্বামী বিবেকানন্দ'। পৃঃ ২২৭—২২৮

১৯। "তিনি ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে উর্দু গান, ভজন ও বাঙ্গলা কীর্তন এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের পদাবলী গাইতেন।—'স্বামী বিবেকানন্দ।' পৃঃ২২৫

প্রমাণ করে। প্রমথনাথ বসু লিখেছেন: "রামনাম-কীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই'। বাদক ভাল ছিল না বলিয়া স্বামীজীর যেন রসভঙ্গ হইতে লাগিল। অনন্তর স্বামী সারদানন্দকে গাহিতে অনুমতি করিয়া নিজেই পাখোয়াজ ধরিলেন। স্বামী সারদানন্দ প্রথমতঃ স্বামীজী রচিত সৃষ্টিবিষয়ক 'এক রূপ অরূপ নাম বরণ' গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল……।"

স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীত হিসাবে ভালবাসতেন বিশেষ ভাবে ধ্রুপদ ও কীর্তনকে, আবার কখনো কখনো কীর্তনকেও বলতেন মেয়েমানুষী গান, তাই বীরত্বব্যঞ্জক সতেজ সঙ্গীত ধ্রুপদের পুনর্জাগরণই প্রয়োজন। তিনি বলেছেন: "আমাদের দেশে যথার্থ সঙ্গীত কেবল ধ্রুপদ ও কীর্তনে আছে, আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে।" "ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু সত্যকার সঙ্গীত আছে কীর্তনে—মাথুর, বিরহ প্রভৃতি রচনাবলীতে।" "দেশের বর্তমান অবস্থায় ধ্রুপদ গানই একমাত্র উপযোগী। যে সব গীতবাদ্য মানুষের কোমল ভাবসমূহ উদ্দীপিত করে সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখিতে হইবে।" ছাত্রাবস্থায় টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি গানের অনুশীলন করলেও ধ্রুপদ গানের প্রতি ছিল তাঁর অনুরাগ সমধিক ও তারপর খেয়াল সঙ্গীতের প্রতি। কাশীপুর, বরাহনগর প্রভৃতি মঠে যখন ধ্যান-ধারণায় তিনি তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অতিবাহিত করতেন, তখন কতদিন না ধ্রুপদ গানের মহড়া চলত ভজনগীতি হিসাবে এবং কখনো পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন তাঁর সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ তথা কালী তপস্বী। স্বামী অভেদানন্দ কিছুদিন পাখোয়াজ শিক্ষা করেছিলেন গোপাল মল্লিক মহাশয়ের নিকট। সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রায়ই আনন্দের হাট বসতো তাঁদের সাধনজীবনে। স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন অবশ্য সে সকল আনন্দহাটের রাজা। স্বামীজী সঙ্গীত রচনাও করেছিলেন কয়েকটি এবং গানগুলি তাঁর প্রতিভা ও কাব্য সৌন্দর্যেরই সাক্ষ্য দান করে। তিনি আরাত্রিক-ভজন হিসাবে রচনা করেছিলেন 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়' তিনটি তালের ত্রিবেণীসঙ্গমে। 'একরূপ অরূপ নাম-বরণ, অতীত আগামী-কাল-হীন' প্রভৃতি (বড়হংসসারঙ্গ—চৌতাল) গানটি তিনি রচনা করেছিলেন বিরাট বিশ্বসৃষ্টির কল্পনাকে ধ্যান করে, আর 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক-সুন্দর' প্রভৃতি গানটি তিনি রচনা করেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভীষিকাময় প্রলয়ভাবকে চিন্তা করে। তাছাড়া তিনি রচনা করেছিলেন কর্ণাটীরাগে 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা, বোম বব বাজে গাল' প্রভৃতি; সাহানারাগে 'হর হর হর ভূতনাথ

পশুপতি, যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি' প্রভৃতি ; ধানীমিশ্ররাগে 'মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া জানেকো দে' প্রভৃতি গান। শেষোক্ত গানটি তিনি মুলতানরাগেও গাইতেন শুনেছি।

তাই একমুখী অচলায়তন ছিল না কোনদিনই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন। বহুমুখী ছিল তাঁর দৃষ্টি ও প্রতিভা এবং তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিভার বিচিত্র বিকাশধারা ভাবচক্ষে দর্শন করেই অন্তর্দৃষ্টিবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "নরেনের মধ্যে আঠারটা শক্তি খেলা করছে।" অসংখ্য প্রবাহিণীগ্রাসী বিশাল বারিধির মতো বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিকাশকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সন্ন্যাসজীবনে ও সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কর্তব্যের মধ্যে তাই পরিত্যাগ করেননি তিনি সঙ্গীতকে অধ্যাত্ম-সাধনার অন্তরায় ভেবে, বরং সমগ্র জীবনেই বরণ করেছিলেন সঙ্গীতকে নিরাবিল আনন্দ, জাগ্রত প্রেরণা ও সাধনপথের সহায়ক-রূপে। তাই স্বামীজীর ত্যাগদীপ্ত জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুসরণ করা উচিত তাঁর আনন্দোজ্জ্বল সঙ্গীত-জীবনকে ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধানিবিড় দৃষ্টির নিদর্শনকে এবং তবেই মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীতের অনুশীলনধারা হবে আবার উদ্দীপিত তার অতীত অধ্যাত্ম জীবনছন্দকে অনুসরণ করে।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামীজীর মত

প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথা থেকে—

...পূর্বের কথাগুলোই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, এই অদ্ভুত বালক নরেন কখনো হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কখনো-বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নরস্বরে গান করছে। ক্লাসে তো বরাবরই ফার্স্ট হত। খেলাতেও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই,—গানেতে তো কথাই নাই—গন্ধর্বরাজ।

স্বামীজী ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠাণ্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সঙ্গীতের উপর অনেক কথা চলল। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, বিলাতী সঙ্গীত কেমন ?

স্বামীজী। খুব ভাল, হার্মনির চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম,

তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল আর্টেরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটি খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তারপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো আর অন্ধি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইসলামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাবো, ঐ যে বিত্যুতের মত গিঠকিরি দিয়ে নাকি সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি তুনিয়ার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পুর্ণবিকাশ না করলে 'মিউজিক'-এ 'সায়েন্স' থাকে না। পেণ্টিংয়ে 'নেচার' বজায় রেখে যত আর্টিষ্টিক কর না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি মিউজিক-এ সায়েন্স বজায় রেখে যত কারদানি কর ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগরাগিণীগুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে সায়েন্স আর রইল না।

প্রশ্ন। কেন 'সায়েন্স' মারা গেল? টপ্পা জিনিসটা কার না ভাল লাগে?

স্বামীজী। ঝিঁ ঝিঁ পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালেরাও তাদের মিউজিক খুব উৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের উপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য কিছুই থাকে না, উলটে discordance জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation combination নিয়ে এক একটা রাগিণী হয় তো? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার উপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবটা তো একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃষ্টি হয় তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল। আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ করে হচ্ছে।

এইজন্যে যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence (মিড় মুর্চ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের মিউজিক-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইউরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন। ওদের মিউজিকটা কেবল martial (রণবাদ্য) বলে মনে হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজী। আছে আছে। তাতে হার্মনির বড় দরকার। আমাদের হার্মনির বড় অভাব, এই জন্যই ওটা অত দেখা যায় না; আমাদের মিউজিক-এর

খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের মিউজিক খুব উন্নত, করুণরস, বীররস দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হল না।

প্রশ্ন। কোন্ রাগরাগিণীগুলি martial ?

স্বামীজী। সব রাগই martial হয় যদি হার্মনিতে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়। ['বাণী ও রচনা'—নবম খণ্ড]

বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব

হরিকুমার চক্রবর্তী

[হরিকুমার চক্রবর্তী ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক। 'যুগান্তর' দলের সর্বোচ্চ পরিষদের তিনি সদস্য ছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তিনি আবাল্য সুহৃদ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে হরিকুমারের উল্লেখ করেছেন।

হরিকুমার গত ১২.৩.৬৩ তারিখে ৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন।

বিপ্লব আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব পর্যায়ে আমরা হরিকুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধু এবং 'যুগান্তরের' সর্বোচ্চ কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের রচনাও প্রকাশ করছি।]

বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব? উত্তরে একটা কথাই যথেষ্ট—তাঁর প্রভাব ও প্রেরণা সর্বাধিক। তাঁর বাণীর উদ্দীপনা ছাড়া বিপ্লব-আন্দোলন ঐভাবে হত কি না সন্দেহ।

১৯১৮ সালের একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন ঢাকা সেলুলার জেলে বন্দী হয়ে আছি। গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমার কাছে এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বৈদান্তিক? আমি বললুম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবেকানন্দের ভক্ত? আমি বললুম, নিশ্চয়ই।

রোনাল্ডসে অমন জিজ্ঞাসা করলেন কেন আমাকে? মনে হয় তিনি ঠিক করতে চাইছিলেন বিপ্লব আন্দোলনের পিছনে কার প্রভাব আছে। পুলিস সার্চ করে বিপ্লবীদের কাছে সব জায়গায় স্বামীজীর বই পেয়েছে। এমন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়ীতে স্বামীজীর কোনো না কোনো বই ছিল না।

বাংলা দেশের বিপ্লব আন্দোলন ব্যাপারটা কি? কতকগুলো ছেলে ঠিক করল, মরতে হবে। নিজেরা মরে যদি অপরকে বাঁচতে শেখানো যায়! তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাই মরণের আগুনে। বিবেকানন্দ তাদের টেনে ঘরের বাইরে করে দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের কথাগুলো জলছিল আগুনের মত। আমরা তাঁর কথা জপ করতুম আর কাজ করতুম। আমরা গাইতুম 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগোরে সকল দেশ'! আর বলতুম স্বামীজীর কথা—'বলি চাই'।

স্বামীজীর বাণীর শক্তির প্রমাণ দেব? শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য সন্ন্যাসী-শিষ্যদের

সঙ্গে আমাদের চেনা ছিল। বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবং অনুশীলন সমিতিতে (৪১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট) গীতা ক্লাস নিতেন স্বামী সারদানন্দ।* অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যারিস্টার পি. মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শকে কার্যকরী করবার জন্য। অনুশীলন সমিতিতে নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হত। শরীরচর্চার ব্যবস্থা দিল। ইতিহাসের ক্লাস হত, সখারাম গণেশ দেউস্কর ইতিহাস পড়াতেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি শেখাবার জন্য গীতা ক্লাস নিতেন সারদানন্দ। সারদানন্দের গীতা ক্লাস যথেষ্ট উদ্দীপনাপূর্ণ হোত। কিন্তু ক্লাস থেকে বাড়ী ফিরে মনে হোত—স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়লেই কিন্তু অনেক বেশী শক্তি পেতুম।

স্বামীজীর কথাকে আমরা অভ্রান্ত বলে জানতুম। তিনি নাকি যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের (গ্যারিবলডি, ম্যাটসিনির সুবিখ্যাত জীবনীকার) বাড়ীর সদর ঘরে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন—১৯২৫ সালে ভারত স্বাধীন হবে। দেওয়ালে ইটের উপরে সে লেখা ছিল। আমরা বারবার যেতুম সে লেখা দেখতে। স্বামীজী লিখে দিয়ে গেছেন! কথাগুলো মনে হত দৈববাণী।

আর স্বামীজীর ভালবাসা! কে তার মাপ করবে? সে ভালবাসা কত বড় আর-একটি ভালবাসার কাহিনী বলে তা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি। বিপ্লবী শচীন সেন মুরারিপুকুরের বোমার মামলার পরে মুক্তি পেয়ে বেলুড় মঠে যোগদান করল। তাতে আমরা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলুম। কেন সে গেল, কী সে পেল সেখানে? বন্ধু নরেন (এম. এন. রায়) এবং আমি ঠিক করলুম বেলুড়ে গিয়ে শচীনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষে ব্যাপারটা জেনে আসা যাক। কোদালিয়া থেকে দুজনে হেঁটে বেলুড়ে হাজির হলুম। ১৯১০ সালের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজার দিন। পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। হেঁটে ক্লান্ত, পেটে কিছু নেই। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, সামনের ঘরেই শচীন আছে। দরজা ভেজানো, শচীন শুয়ে আছে। তার ঘরে বসে অনেকক্ষণ কথা হল তার সঙ্গে। তারপর ক্লান্তিতে আর ক্ষিদেয় তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

ঘুম ভেঙে গেল দরজায় ধাক্কায় আর চেঁচানিতে। দরজা খুলতেই এক মূর্তি—বগলে পাকানো কাপড়, কৌপীন পরা—বাবুরাম মহারাজ দাঁড়িয়ে। চেঁচিয়ে গালাগালি করে যাচ্ছেন—শূয়াররা, তোমরা এখানে না খেয়ে পড়ে আছ? আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন ঠাকুর ঘরে। খুঁজে পেতে জিলিপি জোগাড় করে খেতে দিলেন। তারপর বললেন, হতভাগারা, আজ বাড়ী যেতে পারবি না; রাত্রে এখানে থাকবি।

---

* ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কি করি, অগত্যা থেকে যেতে হল। রাতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খেতে বসেছি। রুটি, সুজির পায়স আর কি একটা তরকারি। পাশে বসেছেন বাবুরাম মহারাজ। নিজের পাত থেকে রুটি তুলে দিলেন আমার পাতে। আমি নেবোনা কিছুতে, অপরের এঁটো খাবো কেন? বটে—খাবি না? বাবুরাম মহারাজ ঘাড় ধরে মুখে গুঁজে দিলেন।

স্বামীজীর কথা শুনতে চাইলুম তাঁর কাছে। স্বামীজীর কথা বলতে বলতে বাবুরাম মহারাজ যেন ডুবে গেলেন। স্বামীজীর ভালবাসা? ওরে তোদের সে জিনিস কি করে বোঝাবো? বাবুরাম মহারাজ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

আমরা অবাক হয়ে গেলুম, নতুন জিনিস দেখলুম। একজনের ভালবাসার কথা বলতে আর একজন কাঁদে!

১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে আমার জন্ম। কোদালিয়া গ্রামে আমরা তিনজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলুম—নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), শৈলেশ্বর বসু এবং আমি। তিনজন অভেদাত্মা। একটা কিছু করতে হবে বলে ছটফট করছি। সে ১৯০৬ সালের মত সময়। রামদাস বাবাজির সঙ্গে সেইসময় আমাদের পরিচয় হল। তিনি আমাদের সন্ন্যাসী করতে চাইলেন। আমরা দ্বিধায় দুলছি। এমন সময়ে শৈলেশ্বরের কাকা কেদারনাথবাবু আমাদের স্বামীজীর বই এনে দিলেন। তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির সভ্য ছিলেন। প্রথম হাতে পড়ল স্বামীজীর 'কর্মযোগ'। চোখে পড়ল লেখা আছে—It is better to be attached than to be unattached. এ কি কথা! সন্ন্যাসী বলছেন অ্যাটাচমেণ্টের কথা! সারারাত 'কর্মযোগ' পড়লুম—উত্তেজিত হয়ে উঠলুম এমনই যে, রাত্রে ঘুম হল না। কিছুদিন পরে স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' পেলুম। এবার আমাদের জীবনের গতি স্থির হয়ে গেল। স্বামীজীর কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ। কর্মত্যাগের সন্ন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন মতের কথা শুনেছি। যতীন মুখার্জির (বাঘা যতীন) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। চোখের সামনে ভাসছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা হইবেন' সেই স্বপ্ন। বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ', 'বর্তমান ভারত' দিল আমাদের অনুসরণের আদর্শ আর কর্মপন্থা। রামদাস বাবাজি ডেকে পাঠালেন, সারা রাত বোঝালেন, কিন্তু কিছু হল না, স্বামীজীর পথই আমাদের পথ—আমাদের দেবতা আমাদের দেশ। আমাদের বৃহত্তর দলের মধ্যে ধীরেন চক্রবর্তী কেবল বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হয়। তার নাম হয়েছিল গৌরাঙ্গদাস বাবাজি। সে বৃন্দাবনে খুব বড় সন্ন্যাসী হয়েছিল ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

আমরা তিনজনই স্বামীজীর খুব ভক্ত ছিলুম। আর স্বামীজীর ভক্ত ছিলনা কে?

রংপুরের বিখ্যাত যতীন রায়, আশু দাস, যাদুগোপাল, এই সব বড় বড় বিপ্লবীরা সকলেই বিশেষ স্বামীজী-ভক্ত। যারা পরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যতীন মুখার্জির কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লব আন্দোলন যতীনদার সৃষ্টি। তাঁর যে কী আকর্ষণী শক্তি ছিল—সকলকে তিনি কাছে টেনে রাখতে পারতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে তিনি ছিলেন সুপার লীডার। তাঁর নেতৃত্বে যে বিপ্লব পরিষদ গড়ে উঠেছিল তার কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিল যাদুগোপাল, আমরা ছিলুম সদস্য। সে যাই হোক, একবার নরেনের (এম. এন. রায়) সঙ্গে আমার তুমুল তর্ক ও ঝগড়া। আমি স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করেছি, মূর্তিপুজা আর ভগবানে বিশ্বাস করি না, নরেনের মূর্তি এবং ভগবান, দুয়েই বিশ্বাস। আমি বললুম, স্বামীজীর মত ভগবান নেই, নরেন বলল, স্বামীজীর মত ভগবান আছেন। যতীনদা ঝগড়ার কথা শুনলেন। শুনে বললেন, চল আমার গুরুর কাছে। তাঁর গুরু ভোলাগিরি। তিনি কলকাতায় এসে রয়েছেন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ভক্তের বাড়ীতে। যতীনদার সঙ্গে আমরা প্রবেশ করতেই তিনি 'আরে বেটা' বলে যতীনদাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। তাতেই যতীনদার উপর তাঁর ভালবাসার পরিমাণ বোঝা গেল। যতীনদা আমাদের সমস্যার কথা জানালেন। ভোলাগিরি তখন আমার দিকে ফিরে বললেন—বেটা, তোমার কথাই ঠিক, ভগবান নেই। আমার বুক দশহাত—চেয়ে দেখি নরেনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। তারপর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, না, ভগবান আছেন। পরে বললেন, যার যেমন ভাব। আমরা হতভম্ব। বাইরে আসতে আমরা যতীনদাকে বললুম, এ কি হল, উত্তর যে পেলাম না! যতীনদা বললেন, আরে স্বামীজীর কথা নিয়ে কি ঝগড়া করতে আছে? তিনি কত বড় ছিলেন তার ধারণা করবে কে? তাঁর কথা যদি ভারত শোনে ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?

যতীনদা ছিলেন ভোলাগিরির শিষ্য। তবু স্বামীজীর প্রতি তাঁর এই ভাব।

নরেন অবশ্য পরে মেটিরিয়ালিস্ট হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে যুক্তিপ্রবণতা একটা দেখা যেত গোড়া থেকেই। ১৯০৬ সালে আমি বাবার কাছে আসামে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি নরেন সূর্যোপাসক হয়েছে। শিবনারায়ণ স্বামীর দলে ভিড়েছে। আমি বললুম, হাঁরে, তোর বেদান্তের কি হল? সে বলল, দেখ, সৃষ্টির পিছনে কোনো শক্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ শক্তি সূর্যের, তাই সূর্যোপাসক হয়েছি। অবশ্য সূর্যোপাসনায় উৎসাহ পরে তার দেখিনি।

য়ুরোপে যাওয়ার পরে নরেনের প্রত্যক্ষের প্রতি বিশ্বাস আরো বেড়ে যায় এবং

সে জড়বাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার ধারণা তার মেটিরিয়ালিজমের পিছনে একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ছিল। ১৯৪৬ সালে বোম্বাইয়ে র‍্যাডিক্যাল পার্টির বাৎসরিক সভা। নিও-হিউম্যানিজমের থীসিস সেখানে গ্রহণ করা হয়। বিখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী, এম. এন. রায় এবং আমরা কাছাকাছি বসে আছি। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী গান্ধিজীর কাছে ছিলেন, পরে এম. এন. রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। তুজনের মধ্যে দিনের পর দিন গভীর দার্শনিক আলোচনা হয়। কথা হতে হতে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন —Roy, don't you accept Sakti? নরেন হেসে বলল, No, but I want সচ্চিদানন্দ।

নরেন কি অর্থে ঐ কথা বলেছিল আমি সঠিক বলতে পারব না, কারণ সে বিষয়ে পরে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু আমার ধারণা, শক্তি মানলে যে আপাত দ্বৈতবাদ মানতে হয় নরেন তাতে রাজি হয়নি, সে বেদান্তের সচ্চিদানন্দকে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ধরে রেখেছিল।

স্বামীজীর প্রভাব আমাদের মনে নানাভাবে কাজ করেছিল। স্বামীজী অনেককে শক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আমাদের মত অল্পসংখ্যককে তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী করেছিলেন। স্বামীজীর বেদান্ত অনুযায়ী আমি একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ করেছিলুম। অনুশীলন সমিতিতে রক্তের অক্ষরে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হোত। আমি অস্বীকার করলুম যখন সতীশ বসু তাই করতে বললেন। আমি বললুম, আমার মুখের কথা মিথ্যে হয়ে যাবে আর রক্ত দিয়ে লেখা কথা কটা সত্য হবে? তার জন্য আমাকে চার দিন অবরুদ্ধ থাকতে হয়। পরে এই পদ্ধতিটি উঠে যায়। আমি বিবেকানন্দের বেদান্তের মানবমহিমার কথা স্মরণ করেই কথাটা বলেছিলুম।

বিবেকানন্দের আদর্শকে আমরা ভারতীয় রাজনীতিতে সম্পূর্ণ সফল করতে পারিনি একথা ঠিক। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ আমাদের সামনে সব ছেড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আন্দোলন সৃষ্টি করাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। সেই সময় বিবেকানন্দের গণবিপ্লবের কথাটা বড় করা যায়নি, স্বামীজীর আদর্শে চারিত্রশক্তি বৃদ্ধির কথাটাই তুলে ধরা হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন বিপ্লবীদলকে সরকার পীড়নে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, তখন গান্ধী আবির্ভূত হলেন ভারতীয় রাজনীতিতে। তিনি দেশকে মুগ্ধ করে ফেললেন। গান্ধীর মত নেতা আমাদের ছিল না। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করাতেই আমাদের দিনের পর দিন লড়াই করতে হয়েছে। এই অবস্থায়, যখন স্বামীজীর আদর্শে গণবিপ্লবের পরিকল্পনা

প্রস্তুত করা উচিত অথচ তা করা হয়নি, তখন তৈরী আদর্শ চলে এল রাশিয়া থেকে এবং আমাদের একটা বড় দল কমিউনিজমকে গ্রহণ করল। গান্ধীজী জনজাগরণ এনেছেন ঠিকই, সেটা দেশের পক্ষে প্রয়োজনও বটে, কিন্তু আমরা সেই জনজাগরণকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের পথে চালিত করতে চেয়েছিলুম, যেটাকে বিবেকানন্দের আদর্শ বলে আমরা মনে করতুম। গান্ধীজী পূর্ণ স্বাধীনতা গোড়াতে চাইতেন না। তাই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করাতে আমাদের দশ বছর লড়াই করতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে আমাদের এত শক্তিক্ষয় হয়েছিল যে, স্বাধীনতার পূর্বে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে উপস্থিত করতে পারিনি। একবার মাত্র সে চেষ্টা আংশিক সফল হয়। ১৯৩০ সালে জলপাইগুড়িতে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রাদেশিক কনফারেন্সে আমরা সমাজতন্ত্রের প্রস্তাব পাশ করাই, তবে সেও আংশিক সমাজতন্ত্র।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমাজতন্ত্র দেশে দেশে ভিন্নরূপ নেবে। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র তার সভ্যতার ভিত্তিকে ত্যাগ করতে পারে না। সে ভিত্তি আধ্যাত্মিকতার। আমি ১৯৫০ সালে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি ; ভাল হোক মন্দ হোক সেখানে মানুষের যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখেছি, তাকে বাদ দেওয়া যাবে কি করে? ভারতের সভ্যতার গতি অন্তরের দিকে। আমি যুক্তিবাদ স্বীকার করি। কমিউনিজমের ব্যবহারিক পরিকল্পনাতেও আমার আপত্তি নেই সম্পূর্ণভাবে, কিন্তু ভারতের মাটিতে যদি তাকে সফল হতে হয় ভারতের সাধনার সঙ্গে তাকে যুক্ত হতে হবে। স্বামীজী, শ্রীঅরবিন্দ এই সামঞ্জস্যের কথা বলে গেছেন। এই সামঞ্জস্যবিধানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তাই ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর উচিত স্বামীজীর রচনাবলীর মধ্যে ফিরে যাওয়া, দেখতে হবে সেখানে কি আছে, তিনি কোন্ পন্থা নির্দেশ করেছেন। যদি বিবেকানন্দের পথে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন করা যায় তবে তার সফলতা সুনিশ্চিত।

দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজী

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিগত দিনগুলি স্মরণপথে এখনও জেগে ওঠে। শুধু জেগে ওঠে না, মৃদু মধুর গুঞ্জনও তোলে। তার মাধুর্য আজও অনবদ্য। কত লোককে এই মোহনীয় স্বপ্নের আকর্ষণ আবিষ্ট করে ঘরবাড়ীর মিষ্ট পরিবেশ থেকে ছাড়িয়ে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ তুলে দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

পাখীরা বাসা ছাড়ল—নিরুদ্দেশের পথে উড়ে চলল—নতুন নীড়ের আশায়—শুধু আশায়—আর কিছু নয়। দুঃখ কষ্ট, অশেষ যন্ত্রণা, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন, যাযাবরত্ব, কারাবরণ, দ্বীপান্তর ও ফাঁসীর মঞ্চে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ সে যুগে মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল।

ভাবি এটা কি এমনি হয়? রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হয়। কিন্তু অভিনয় করাবার লোক থাকে বলেই নাট্যবিকাশ সম্ভব হয়। বিশ্বমঞ্চে এই যে এতবড় একটা খেলা হয়ে গেল—সে খেলা কে খেলাল? শত শত লোককে এমন নেশায় মশগুল কে করেছিল? কার ইঙ্গিতে এত ব্যক্তি নতুন তীর্থের পথে পাড়ি দিয়েছিল? এখন সে দিন এসেছে যখন ইতিহাসের গতির এই তত্ত্বকে কালের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করতে হবে। অনুসন্ধানে দুটো শক্তি প্রতিভাত হবে—একটা আভ্যন্তরীণ—আর একটা প্রতিবেশ-প্রভাব-জনিত।

নিজেদের কথায় আসি। ১৯০২ সালে ৪ঠা জুলাই ভারতের ভাগ্যাকাশ থেকে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহাশক্তিধর দিক্‌পাল লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। তিনি হচ্ছেন বীর স্বামী বিবেকানন্দ।

"ফিরিঙ্গী ভয়হারী" ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নিজের কথায় বলি—

"দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন—শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ান কথা নয়—ঠিক যেন ছুরি বিঁধিয়া গেল।............ একটা প্রেরণা হইল—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গীজয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব।.........বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়।" (শনিবারের চিঠি, পূজা সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৮)।

১৯০৫ সালে আমি অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্রে যোগ দিই। কলকাতার

৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে এই সমিতির অফিস ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ছিল। এটি দেশের ভাবী মুক্তিকামীদের প্রস্তুত করার ক্ষেত্র ছিল। সারা বাংলায় এটির বহু শাখা গড়ে উঠেছিল।

তখনও কিন্তু প্রধানতর প্লাবনীশক্তি ছিল বিবেকানন্দের। চরিত্র গঠন কর, মানুষ হও, সমাজসেবাব্রতে এগিয়ে পড়, দেশকে মা জ্ঞানে পুজা কর, সমাজের দুর্বলতা দূর কর, কেন্দ্রীভূত হও, অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত হও। সমাজে যারা অনুন্নত, হীন, দরিদ্র, মুর্খ, নিপীড়িত তাদের সেবায় লেগে যাও। এ সবই স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া কর্মতালিকা। এর ওপর ছিল ঋষি বঙ্কিমের সন্তান ধর্ম।

প্রতি রবিবারে আমাদের moral class হত। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। এখানে নীতিকথা, ইতিহাস, ধর্ম, চরিত্রগঠন, রাজনীতি, সেবাব্রত এবং দেশহিতৈষণার বিশেষ অনুষ্ঠান হত। স্বামী সারদানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন সেক্রেটারী—আমাদের গীতাক্লাস নিতেন।

এখানেও যাঁরা বড় ছিলেন তাঁদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দ ও মিশনের প্রভাব প্রবল ছিল। উচ্চ পর্যায়ের সভ্যরা বেলুড়ে যেতেন। বঙ্গভঙ্গ-নিরোধ আন্দোলন ১৯০৫ সালে হয়। অনেকে বলতেন স্বামীজী থাকলে নেতৃত্ব করতেন। ক্রমে আমরা বড় হয়ে উঠতে লাগলাম। বহু বিজ্ঞজনের উপদেশ লাভ করলাম।

আমাদের মনের ক্ষুধা—অর্থাৎ বিপ্লবী জীবনের আত্মিক আহারের প্রয়োজন প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। এর জন্য বিপ্লবী সাহিত্য পাঠের প্রয়োজন খুব জোরদার হল এবং তার তাগিদ মেটানর জন্য দেশবিদেশের ইতিহাস আমাদের অন্বেষণ করতে হত। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালীর বিপ্লবীদের ইতিহাস পড়তে হত অনুপ্রাণনার জন্য। রুশ নিহিলিষ্টদের কথাও জানতে লাগলাম। এত গেল বিদেশের কথা। প্রেরণার জন্য বিদেশ থেকে দেশের দিকে মন ফিরান হল। সেখানে শিখ, রাজপুত, মারাঠা জীবনের ইতিহাস আমাদের প্রয়োজন মেটাত। কিন্তু মনে বড়ই খেদ ও ক্ষোভ হতে লাগল যে, বাঙ্গালীদের অবদান তেমন পাওয়া গেল না। তখন দিশেহারা আমরা স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতা থেকে পর্যাপ্ত প্রেরণা পেতে লাগলাম। স্বামীজী অবশ্য বলছেন না ইংরেজকে ধর, মার, কাট। কিন্তু আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, নতুন যুগের পাগলকরা আগমনী বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যেমন—

"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা। ভারতের বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"

"শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই রোধ করতে পারিবে না। স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হইতেছে।.........আমি যে একজন সোসিয়ালিষ্ট, তার কারণ ইহা নয় যে, আমি এ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে করি,—তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।"

"আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করছে—আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশা করেনি, তাই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—সুদে আসলে।"

"ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণ এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে।"

একদিকে বঙ্কিমের আনন্দমঠ এবং অন্যদিকে স্বামীজীর উৎসাহবাক্য নতুন ভোরের খবর দিতে লাগল। 'পত্রাবলী', 'ভারতে বিবেকানন্দ', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্বামীজীর ইংরাজী বক্তৃতাগুলিও—যেমন *Lectures from Colombo to Almora*—পড়তাম। স্বামীজীর অবদানহিসাবে এসব ত গেল গৌণ (indirect) প্রভাব। আমাদের মনে তার চেয়েও মুখ্য (direct) প্রভাব বিস্তার করল অনুশীলনের স্থাপয়িতা সতীশ বসুর উক্তি। তার সংক্ষিপ্ত সার এইখানে উল্লেখ করছি। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে যুক্ত স্বাধীন ভারত। ভারত আবার বড় হবে এটা তাঁর কাছে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ ছিল।

১৯০২ সালে দোলপূর্ণিমার দিন অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সমাজ-সেবা জন-কল্যাণ থেকে রক্ত বিপ্লবের দুর্মদ কঠোর কার্যকলাপ এ সমিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে আসে। এর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ—দুটি দিক ছিল। অন্তরঙ্গ ছিল একেবারে-গুপ্তসমিতির অন্তর্গত। মাথার ওপর ছিলেন অরবিন্দ, প্রমথনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে নাম হয় স্বামী নিরালম্ব), ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি। একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, ভূপেন দত্ত (স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) প্রভৃতি কর্মীরা সরাসরি বৃটিশ শক্তিকে আক্রমণের কর্মতালিকা নিয়ে অনুশীলনের নাম ব্যতিরেকে দুর্ধর্ষ একটা দল তৈরী করতে অগ্রসর হন। প্রমথনাথ মিত্র সকলের মাথার উপর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে মতান্তর হোল। ১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' নামক একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা এঁরা প্রকাশ করেন। ভূপেনবাবু এটির প্রথম সম্পাদক হন। এমনি করে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বীজ বপন হয়। গুপ্ত সমিতির ইতিহাসের মধ্যে আর অগ্রসর হব না। সতীশচন্দ্র বসু বলেন, দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উৎসাহ স্বামী বিবেকানন্দ দিতেন। এর থেকে বোঝা যায় মঠ ও মিশন (বেলুড়ের) কেন ইংরেজের সন্দেহভাজন হয়েছিল।

স্বামী সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ অনেক চেষ্টায় এটিকে মেঘমুক্ত করেন। ১৯১৬ সালে বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনকে যুবকদের আদর্শ বলে গণ্য করতে উপদেশ দেন। অর্থাৎ সোজাসুজি বিপ্লবী রাজনীতির চেয়ে সমাজ-সেবা বড় ও বাঞ্ছনীয়। ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ডাঃ ভূপেন দত্তকে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার সারাংশ নীচে দিলাম। এই বিবৃতিটি হেমবাবু ১৮. ৫. ১৯৫৪ সালে ভূপেনবাবুকে দেন।—

১৯০১ সালে স্বামীজী ঢাকা সফরে যান। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথা শোনার জন্য অনেক যুবক একত্রিত হন। তাঁদের মধ্যে হেমবাবুও ছিলেন। হেমবাবুর সঙ্গে তাঁর সহযোগী শ্রীশ পালও ছিলেন। [বাংলার প্রথম মৃত্যুঞ্জয়ী বীর প্রফুল্ল চাকীকে (ক্ষুদিরামের সাথী) ১৯০৮ সালে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করার জন্য সাব্-ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীকে শ্রীশ পাল হত্যা করেন—কলকাতার সার্পেন্টাইন লেনে।] স্বামীজী এঁদের "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে সম্বোধন করেন। স্বামীজীর স্পর্শ ও উৎসাহ ও বাণী এঁদের প্রাণে ভেল্কী খেলিয়ে দেয়। তিনি মানবধর্ম ও সাম্যবাদের দীক্ষা এঁদের দেন। শরীর শক্ত করে গড়াকে গীতা পাঠের চেয়ে বড় বলে উল্লেখ করেন। পৌরুষ, বীরনীতি, মাতৃজাতিকে মহামায়ার প্রতীক বলে সম্মান করতে উপদেশ দেন—আর বলেন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। তিনি সংঘবদ্ধ ও সেবাব্রতী হতে বলেন। দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করতে শেখান। আরও বলেন—ভারত আর পুণ্যভূমি নাই—হয়ে গেছে দাসভূমি—যো-হুকুম আর ছুঁয়া-ছুতের দেশে। হে নবীন বঙ্গ—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে আদর্শ কর। অষ্টপাশে যে বিদেশী ভারতকে বেঁধে রেখেছে তাদের বন্ধন ছিন্ন কর। তিনি এ কথাও বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র পড়, তাঁর শেখান দেশভক্তিও গ্রহণ কর। সাধনায় সিদ্ধিলাভ কর। দেশভক্তি ও সন্তানধর্মকে মাথায় করে রাখ। এর থেকে বোঝা যায় দেশের কল্যাণ সাধনায় কোনদিক তাঁর সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারে নি।

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ

বিমানবিহারী মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাসও লেখেন নাই, রাষ্ট্রীয় দর্শন কিংবা রাজনৈতিক কার্যপদ্ধতি লইয়া কোন বৃহৎ পুস্তকাদিও রচনা করেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, রাজনীতির অনুসরণ তাঁহার কাছে একটা গৌণ ব্যাপার (৬।৪০৪)।* তাঁহার ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উক্তিগুলি বেদান্তসূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত এবং ভাবগর্ভ। ঐ সকল উক্তি তাঁহার গ্রন্থ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও কথোপকথনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অ্যারিষ্টটলের ন্যায় তিনি ঐতিহাসিক প্রণালীতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র-বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। স্বতঃপ্রামাণ্য বলিয়া কিছু ধরিয়া তাহা হইতে কোন সিদ্ধান্ত টানা তাঁহার রীতি ছিল না। তিনি ইতিহাসের সন্ধানী আলো ফেলিয়া অতীতকে উন্মোচন, বর্তমানকে বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। অতীত ও বর্তমানের অনুধ্যান করিতে করিতে তিনি সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনবিধি বিষয়ে এমন কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছে। সাধারণ ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সহিত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের এইখানেই পার্থক্য।

স্বামীজী তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে ইতিহাস-প্রীতি পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন (*Swami Vivekananda, Patriot-Prophet*, পৃ ৯৯) যে, তাঁহাদের পিতাঠাকুর বিশ্বনাথের গ্রন্থাগারে কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ রোমের ইতিহাস, জুলিয়াস সীজারের জীবনী, সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। স্বামীজী কলেজে ইতিহাস এবং দর্শনশাস্ত্র পাঠ্যবিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলেজে পড়িবার সময় গ্রীণের লিখিত ইংরাজজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে কলেজপাঠ্য ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ,

---

* বন্ধনীর মধ্যে যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত *Complete Works of Swami Vivekananda*-এর খণ্ড ও পৃষ্ঠার সংখ্যা। যথা—৬।৪০৪, মানে উক্ত সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডের ৪০৪ পৃষ্ঠা।

ও রাজা-উজীরের কাহিনী ছাড়া বড় একটা কিছু থাকিত না। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে তো তখন শুধু সেকেন্দরশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ডালহৌসির শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের ভারতের পরাজয়বৃত্তান্ত বুঝাইত। সেইজন্য ঐ ধরনের ইতিহাস পড়িয়া তিনি তৃপ্তি পান নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতীয়দের গবেষণা অতি সামান্যই বাহির হইয়াছিল। সুতরাং স্বামীজীকে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধান করিবার জন্য বেদ-পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি উৎসের নিকট পৌছিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিকে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে বিদেশাগত ট্রাইব্‌গুলির জাতিতত্ত্বের কথা বলিতেছেন, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে গঙ্গার গতিপরিবর্তনের বিবরণ লিখিতেছেন, বেদ-উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; অন্যদিকে গ্রীক্ ও রোমান্ জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় হইতে ও আরব এবং মুরজাতির দিগ্বিজয়কাহিনী হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শনের সমর্থন করিতেছেন। বাবিলন, আসেরিয়া, মিশর ও প্যালেষ্টাইনের ইতিহাস জানিবার জন্যও তাঁহার আগ্রহ ছিল অসীম। তিনি ফরাসী লেখক মাস্‌পেরোর লিখিত সুদূরপ্রাচ্যের ইতিহাস ইংরাজী অনুবাদ হইতে প্রথমে পড়েন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, অনুবাদক গোঁড়া খ্রীষ্টান বলিয়া মাস্‌পেরোর যে সব উক্তি খ্রীষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে যাইতে পারে সেগুলি তিনি বর্জন অথবা পরিবর্তন করিয়াছেন, তখন তিনি মুল ফরাসীভাষা হইতে উহা অধ্যয়ন করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তথাপি অনর্থক শত্রু বাড়াইলে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত উদ্‌যাপনের বিঘ্ন ঘটিবে আশঙ্কা করিয়া তিনি তাঁহার মনের কথা কিছুটা রাখিয়া ঢাকিয়া, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মিস্ মেরী হেলকে একখানি পত্রে (৮।৪৮৩-৮৫) লিখিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রিটিশ কুশাসনের যে সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন উহা যদি প্রকাশ পায় তাহা হইলে ভারতের ইংরাজ সরকার নবনির্মিত এক আইন বলে তাঁহাকে দেশে লইয়া যাইয়া বিনা বিচারে হত্যা করিবে। তাই ইতিহাসের সমুদ্র হইতে তিনি যে সকল উজ্জ্বল রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন সেগুলি কথাচ্ছলে, প্রসঙ্গক্রমে দেশবাসীর কাছে ছড়াইয়া গিয়াছেন। সরাসরিভাবে রাজনৈতিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লেখার চেয়ে হয়তো ইহাতে কাজ বেশিই হইয়াছে। তিনি বাল্যকাল হইতে জাতীয় মেলায় যোগ দিতেন ও 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের নিকট যাতায়াত করিতেন। ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজমের

প্রভাব কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে সোজাসুজি কিছু না বলিয়া তিনি ইতিহাসের আটটি দৃষ্টান্তের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনি 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বলিলেন যে, জাতীয়তার ভাব আসে দুইটি কারণে। একটি হইতেছে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সহানুভূতি ও অপরটি হইতেছে অপর কোন জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে। এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদাহরণ দিয়া বলিলেন—"একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক্‌জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মাণীর, ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত ('বর্তমান ভারত' পৃঃ ৪১)।" স্বামীজী একবারও বলিলেন না যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বেগ বর্ধিত করিবার জন্য ভারতবাসীকে একদিকে যেমন "একান্ত স্বজাতি বাৎসল্য" করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ কোন বিদেশী শাসকের প্রতি "একান্ত বিদ্বেষের" ভাব পোষণ করিতে হইবে। কিন্তু অতগুলি দৃষ্টান্তের মর্ম যিনি বুঝিতে পারিবেন, তিনি কি আর এটুকু অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন না? এইভাবে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই বিপ্লবের যুগে পুলিশ যেখানেই বিপ্লবীদের বাসা তল্লাস করিয়াছেন সেইখানেই বিবেকানন্দের গ্রন্থরাজি দেখিতে পাইয়াছিলেন। শেষ এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রও বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীর একান্ত অনুরক্ত পাঠক ছিলেন।*

স্বামীজী "পরিব্রাজক" গ্রন্থে (পৃঃ ৮৯) প্রসঙ্গক্রমে ভারতের শ্রমজীবিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে তাহাদের শ্রমজাত বস্তু লইয়া ব্যবসা করিয়া অনেক জাতি ধনী হইয়াছে ও পৃথিবীতে প্রাধান্য করিয়াছে। তিনি একের পর এক পনেরটি জাতির নাম করিয়াছেন—"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব, অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসান্দ্রিয়া, গ্রীস্, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য (৭।৩৪০-৪৬)।" এখানেও বৈদিক যুগে ভারতের সহিত বাবিলনের ব্যবসার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া রোমের সহিত বাণিজ্যের উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস হইতে, ভিনিস হইতে সমরকন্দের কথা মধ্যযুগ হইতে এবং বাকিগুলি আধুনিক যুগের ইতিহাস হইতে লইয়া স্বামীজী তাঁহার সিদ্ধান্তের পোষকতা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, তিনি মূল

* এবিষয়ে সুভাষচন্দ্রের নিজ সাক্ষ্য এই গ্রন্থের 'মনীষী-সঙ্গমে' পর্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কথাটির দিকে একটু ইসারা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেটি হইতেছে এই যে কাহারও আধিপত্য চিরস্থায়ী নহে—সুতরাং ইংরাজেরও নহে।

ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেনেসাঁস বা সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটিয়াছিল। স্বামীজী উহার ইতিহাস বলিতে বলিতে চারশত বৎসর অতিক্রম করিয়া ভারতে ও জাপানে কি করিয়া ঐ আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌছিল তাহা বলিয়াছেন। তুর্কীদের হাতে প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলের পতন ঘটিলে সেখানকার পুথিপত্র লইয়া পণ্ডিতেরা ইতালিতে পলাইয়া আসিলেন। তাহাতে ইতালিতে নব-জাগরণের সূত্রপাত হইল। স্বামীজী বলিতেছেন—"ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময়ে নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা-বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত, নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, পৃঃ ৮২-৮৩)।" স্বামীজীর মতে রেনেসাঁসের সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা গিয়াছিল ফ্রান্সে। "নবীন রক্ত, নবীন জাত—সে তরঙ্গে মহা সাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো, সে একধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইউরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে দেওয়ায় তার বেগ, তার বিস্তার বাড়তে লাগলো। ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগলো; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠলো, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠলো; জাপান এসিয়ার নূতন জাত (ঐ, পৃঃ ৮৩)।" জাপানের নবজাগরণের উপর জোর দিয়া স্বামীজী সমগ্র এশিয়ার পটভূমিকায় ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ভারতে নবজাগরণ ও তাহার ফলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথার উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে তিনি লিখিয়াছেন—

> অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না; কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, পৃঃ ২৯৮)

স্বামী বিবেকানন্দ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ছোটবড় সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। জাহাজে করিয়া গঙ্গার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখাইলেন, কি ভাবে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন হইবার ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের চার বৎসর পরে সপ্তগ্রামের পতন হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং

যথাক্রমে হুগলি, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলিকাতার অভ্যুত্থান হইয়াছে। প্যারি নগরীতে লুভার মিউজিয়াম দেখিবার সময় তাঁহার মনে গ্রীক্‌শিল্পের বিবর্তন কি করিয়া ৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যে চারটি যুগে ঘটিয়াছিল সে কথা মনে উঠিয়াছে ('পরিব্রাজক' পৃঃ ১৬০)। শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি তাঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ ইতিহাসের গতির কথা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি সকলের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা সঞ্চার করিতে এত বেশী আগ্রহশীল ছিলেন যে, কি করিয়া কোন বইয়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাহির করিতে হয় তাহার মূলসূত্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ('পরিব্রাজক' পৃঃ ৯৬-৯৭)।

উপনিষদের ভাবধারায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই পুষ্ট। উভয়েই প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন, স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আর্যেরা বিদেশ হইতে আসেন নাই (৫।৪৩৬-৪৩৯) এবং শূদ্রেরা সকলেই অনার্য ছিলেন না (৩।২৯১-৯৩)। তিনি মহাভারতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথমে সকলেই এক বর্ণভুক্ত ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন জীবিকা গ্রহণের ফলে লোকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল ভারতীয় সমাজের বিকাশধারা ব্যাখ্যার প্রতি; আর স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তি কোন শ্রেণীর হাতে ছিল তাহা আবিষ্কার করা। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৈদিক কর্মকাণ্ডের যুগে পুরোহিতশ্রেণী রাজন্যবর্গের উপর প্রাধান্য করিতেন। পুরোহিতেরা কখনও-বা রাজাদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতেন, কখনও-বা কূটনীতির দ্বারা তাঁহাদিগকে পাশবদ্ধ করিতেন। তাঁহারা প্রায়শঃই রাজশক্তিকে নিজেদের অধীন করিয়া রাখিতেন। রাজা ও প্রজা সকলেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভের আশায় পুরোহিতশ্রেণীর পদানত হইয়া থাকিতেন (৪।৩৭১-৩৮৫)। স্বামীজী পুরোহিত-শ্রেণীর অনেক দোষ দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উপকারিতাও যে ছিল তাহা অস্বীকার করেন নাই। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখাইলেন যে, "চীন, সুমেরু, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরানি, য়াহুদি, আরাব, এই সমস্ত জাতির মধ্যেই, সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে ('বর্তমান ভারত' পৃঃ ১৪)।" পুরোহিতেরাই সর্বপ্রথমে মানবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে অতীন্দ্রিয় জগতের বার্তা দিলেন। তাই স্বামীজী তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া বলিলেন —"পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ

মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু (বর্তমান ভারত, পৃঃ ১৯)।" স্বামীজী যদি মার্কস্‌বাদী কিংবা বামপন্থী হইতেন তাহা হইলে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধান দিবার জন্য পুরোহিত-প্রাধান্যের এই ভাবে স্তবগান করিতেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা স্বামীজীর এই ধরনের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেন নাই, উল্লেখও করেন নাই।

পুরোহিতরা কিন্তু ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া উহা চিরকাল তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার প্রচেষ্টায় ধর্মকে অনুষ্ঠানবহুল করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে ঐসব অনুষ্ঠান সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাই ক্ষত্রিয়শ্রেণী তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান পাইলেন। কর্মকাণ্ড অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডের উপর তখন বেশি জোর দেওয়া হইল। ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে আগেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন; এখন জ্ঞানবলেও তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতে লাগিলেন। স্বামীজী বলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কিন্তু কেহ কেহ যেমন যজ্ঞাদি বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতেন, তেমনি দার্শনিকদিগকেও উপহাস করিতেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হইতেছে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকা। আমাদের দেশে লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের প্রভাব জনসাধারণের উপর কতটা পড়িয়াছিল তাহা কেহ দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু স্বামীজী বলেন যে, দলে দলে লোক জড়বাদীদের সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিল ("The people, tired of ceremonials and wondering at the philosophers, joined in masses the materialists—" (৬।১৩১)। স্বামীজীর অনুমান যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে আমরা ভোগবাদী অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক ধার্মিকের এবং দার্শনিকের সংখ্যা বেশি দেখিতাম। স্বামীজী বলেন যে, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে যে ত্রিকোণ-সংগ্রাম দেখা দিয়াছিল তাহার আজও কোন সমাধান হয় নাই (৬।১৩১)।

ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের যুগে জনসাধারণের কোন স্বাধীনতা বা অধিকার ছিল কি? স্বামীজী বলেন যে, কি হিন্দুরাজাদের সময় কি বৌদ্ধ নৃপতিদের শাসনকালে, প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি (the common subjects-people) তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন না। জনসাধারণের ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষ ও বিশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ পাইবার জন্য চেষ্টা পাইত মাত্র (৪।৩৭১)। স্বামীজীর পরলোকগমনের বহু পরে জয়সোয়াল ইত্যাদি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বৈদিক যুগে 'সমিতি', নামে জনসাধারণের এক জাতীয় পরিষদ ছিল,

এবং 'সভা' ছিল উহার একটি স্থায়ী উপসমিতি (*Hindu Polity* পৃঃ ১৮)। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কানে দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে (১০।১৯১।৩) 'সমিতি' মানে সভাস্থল এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।৩।১) 'সভা' ও 'সমিতি' উভয় শব্দই ধর্মবিষয়ক বিচারসভা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (*History of Dharmasutras*, ৩।৯২)। সত্যাষতে শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যে সভা তিনপ্রকার বলা হইয়াছে—মামলামোকর্দমার বিচারের জন্য ধর্মসভা, যজ্ঞ করিবার স্থানে কর্মসভা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজ-আমাত্য ও অন্যান্য কর্মচারী প্রভৃতি লইয়া রাজসভা। ইহার কোনটিতেই সাধারণ প্রজাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। স্বামীজী যাঁহাদিগকে 'সাধারণ প্রজা' বলিয়াছেন, যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন বলিয়া তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর লোক খাইতে পরিতে পান, তাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাচীন কালে কোন দেশেই ছিল না। পশ্চিমের লোকেরা এথেনীয় গণতন্ত্রের গৌরব করেন, কিন্তু সেখানেও উৎপাদক শ্রেণীকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদের সংখ্যা নাগরিকদের অপেক্ষা বেশি ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত ইতিহাসানুমোদিত। তাঁহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও বিচারগুলির ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিলে একটি সুন্দর ডক্টরেট্ থীসিস হইতে পারে। আশাকরি "বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হইলে এই কার্যে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, সমাজের অবিকশিত অবস্থায় রাজশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে। "শৈশবে পিতার পালনের ন্যায় সমাজের প্রতিপালন রাজার দ্বারা (বর্তমান ভারত পৃঃ ২৮)", কিন্তু ছেলের বয়স যখন ষোল বৎসর হয় তখন যেমন তাহাকে মিত্রের মতন দেখিতে হয়, তেমনি সমাজের বিকাশ ঘটিলে জনসাধারণের মতামত লইয়া রাজকার্য পরিচালনা করা উচিত। ভারতবর্ষে এরূপটি হয় নাই, এবং তাহাই ভারতবর্ষের পরাধীনতার অন্যতম কারণ—"যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান্ অন্যজাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয় (ঐ পৃঃ ৩২)।"

তিনি ভারতবর্ষের অবনতির অন্যান্য কারণের মধ্যে অপর জাতির সহিত মেলামেশা না করা, সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে না পারা, স্ত্রীজাতিকে পদদলিত করা, দরিদ্রদিগকে নিষ্পেষিত করা এবং দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন ('স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' ২২৭ পৃঃ)। শেষোক্ত ব্যাপারটিকে তিনি "আমাদের 'প্রবল জাতীয় পাপ" বলিয়াছেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে

কবিগুরুর

মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান।—

ইত্যাদি স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আট নয় বৎসর পরে রচিত হয়।

স্বামীজী একখানি পত্রে (CXII, ৬৩৪২-৪৪) লিখিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়েরা নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী হইলেও তাঁহারা পুরোহিতশ্রেণীর ন্যায় অতটা সংস্পর্শকাতর ছিলেন না। তাঁহাদের প্রাধান্যের সময়ে চারুকলা এবং সামাজিক সংস্কৃতির চরম উন্নতি হয়। তাঁহাদের পরে আসিল বৈশ্য-প্রাধান্য। ইহার নীরব নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণ ভয়ঙ্কর। কিন্তু ইহার একটি উপকারিতা এই যে, বণিক ব্যবসার জন্য সব জায়গায় যান এবং সেইজন্য পূর্বের দুই যুগে যে সমস্ত ভাবসম্পদ সংগৃহীত হইয়াছে সেইগুলি প্রচারিত হয়। তাঁহাদের প্রাধান্যকালে কিন্তু সংস্কৃতির অবনতি ঘটে। ইহার পর শূদ্র-প্রাধান্য আসিবে। ইহাতে সুবিধা এই হইবে যে, দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িবে, কিন্তু সম্ভবতঃ সংস্কৃতির মান আরও নীচু হইয়া যাইবে। সাধারণ শিক্ষার খুব প্রসার হইবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার উদ্ভব দিনদিন হ্রাস পাইবে। স্বামীজী কি দিব্যদৃষ্টিতে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন ?*

এইভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তির অবস্থান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিভাবে আসে ও কোন জাতির প্রাধান্যে কি ফল হয় তাহা বলিয়া স্বামীজী তাঁহার নিজস্ব আদর্শের কথা বলিতেছেন "If it is possible to form a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial and the ideal of equality of the last can all be kept intact, minus their evils, it will be an ideal state. But is it possible ?" (৬৩৪৩)। অর্থাৎ—যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইত যাহাতে পুরোহিতযুগের জ্ঞান, যোদ্ধযুগের সংস্কৃতি, বৈশ্যযুগের ভাব-সম্পদ বিতরণপ্রবৃত্তি এবং শূদ্রযুগের সাম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা যাইত, অথচ কোনটির কোন অপগুণ না জন্মিত, তাহা হইলে উহা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হইত। কিন্তু এরূপ করা কি সম্ভব ? লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বামীজী ভীষ্ম ও কৌটিল্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক হিসাবে

---

* সোভিয়েট রাশিয়া বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ উন্নতি করিয়াছে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, বিত্ত বাড়াইয়াছে, কিন্তু সেখানকার নেতৃবৃন্দ বা জনসাধারণ নিজেদের চিত্ত জয় করিতে পারে নাই। দর্শনের চর্চা সেখানে হয় নাই বলিলেই চলে। সাহিত্য ও চারুকলাও বাঁধা গণ্ডি ও বাধানিষেধের মধ্যে ভালভাবে ফুটিতেছে না।

দেখিয়াছেন। রাষ্ট্র তাঁহার নিকট উপায় মাত্র, উপেয় নহে। শুক্র এবং হেগেল রাষ্ট্রকে উপেয় বলিয়া ধরিয়াছেন। শূদ্র-প্রাধান্যের যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাম্য স্থাপিত হইবে বলিয়া স্বামীজী আশা করিতেন। বৈশ্য-প্রাধান্যের সময় সামাজিক সাম্য কিছুটা থাকিলেও আর্থিক-সাম্য থাকিতে পারে না—কেন না যাঁহাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁহারা নিজেদের সুখ সুবিধাটা বড় করিয়া দেখেন।

এই ভাবটি তাঁহার 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে (পৃঃ ১০৩) অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা দেবতা ও অসুরের সংগ্রামের রূপক দিয়া বলিয়াছেন—"একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিষটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতন-স্বরূপ সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম করে কতকটা আগ-ভাগ নিলে, অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু'দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিষ তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান্' ডাকতে লাগলো।" স্বামীজী কার্ল মার্কসের গ্রন্থাদি পড়িয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু এই ধরনের উক্তির সহিত সমাজতন্ত্রবাদীদের সিদ্ধান্তের খুব বেশি তফাৎ নাই। স্বামীজীর রচনার মধ্যে সর্বত্র দরিদ্র উৎপাদকশ্রেণীর উপর অসীম সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। বামপন্থী-দের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মিল থাকিলেও, তাঁহার দরিদ্রনারায়ণের ধারণা একান্ত নিজস্ব ও মৌলিক। দরিদ্রকে নারায়ণরূপে দর্শন করিতে হইলে যে প্রজ্ঞার প্রয়োজন তাহা বামপন্থীদের নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জনসাধারণের দুর্গতির জন্য ব্রিটিশ শাসকদিগকে দায়ী করেন নাই, দায়ী করিয়াছেন আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত পূর্বপুরুষগণকে। তাঁহারাই সাধারণ লোকদিগকে এমনভাবে পদদলিত করিয়াছেন যে, তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারা মানুষ। তাহাদের দিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী শ্রমসাধ্য কাজ করাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দাসত্ব করিতেই তাহাদের জন্ম (৩।১৯১-৯২)।

বিবেকানন্দের জীবনের ব্রত ছিল ইহাদিগকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত

করিয়া তোলা। প্রত্যেক জীবই শিব।—বেদান্তের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইতেছে প্রত্যেকের মধ্যে ঐ ধারণার সঞ্চার করা। প্লেটো শুধু শাসক সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন করিবার উপায় বিধান করিয়া পৃথিবীতে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকালেই হয়তো তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার 'রিপাব্লিকে' যে উঁচু সুর দেখা যায় তাহা তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'Laws'-য়ে প্রায় তিরোহিত। বিবেকানন্দ প্রত্যেক মানুষের ভিতর দেবত্ব জাগাইবার সাধনা করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র শ্রেণীবিশেষের নহে। বাহিরের ভোগস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থামাত্র করিয়া যাঁহারা মানুষের মর্যাদা বাড়াইতে চাহেন তিনি তাঁহাদের দলে ছিলেন না। তিনি অবশ্য রুটি জোগাইবার গুরু দায়িত্বের কথা কখনও কম করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু মানুষের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চারিত্রিক উন্নতিসাধন করা, তাহার মধ্যে নারায়ণত্বের উপলব্ধি জাগানো ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে তিনি কখনও নিরাশ হন নাই। বেদান্তদর্শনের তত্ত্ব তাঁহাকে আশাবাদী করিয়াছে। মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণ না হইলে বাহিরের নিয়ম-কানুন বদলাইয়া তাহার আমূল পরিবর্তন সাধন করা অনেকটা আলেয়ার পিছনে ছোটার মতন। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই মানবের স্থায়ী উন্নতিসাধনের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

পশ্চিমে যে গণতন্ত্র তিনি দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি উহার অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংলণ্ড আমেরিকা ও ফ্রান্সে মুখে সাম্যের ও স্বাধীনতার বুলি আওড়ানো হইলেও সে সব দেশে যে বস্তুতঃ শ্রেণী ও ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য পুরা বজায় রহিয়াছে সে কথা তিনি একাধিক স্থানে বলিয়াছেন। আমাদের চিন্তানায়কদের মধ্যে বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই পশ্চিমের গণতন্ত্র যে ভারতের উপযোগী নহে তাহা বলিয়াছেন। স্বামীজী "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ও তোমার 'পার্লামেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল (পৃঃ ২৫)।" কিন্তু শক্তিমানেরা শক্তিকে জনসাধারণের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করার চেয়ে নিজেদের স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বেশি পছন্দ করেন। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—"রাজনীতির নামে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে।" একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপে নামে গণতন্ত্র চলিলেও দেশের ধন ও ক্ষমতা এমন কতিপয় লোকের হাতে যাঁহারা নিজে কাজ করেন না, কেবল লক্ষ লক্ষ

লোককে দিয়া কাজ করাইয়া লন। এই উপায়ে তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী রক্তপ্লাবিত করিতে পারেন (৩।১৫৮)।

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপীয় গণতন্ত্রের মুখসের অন্তরালে সাম্রাজ্য লোলুপতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

—"যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে শুষ্‌ছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে—জিত হলে, তাঁদের ঘরভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো ত সেইখানেই মারা গেল,—হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুল না (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ২৫-২৬ পৃঃ)।"

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রাদে ভারতবর্ষে যাঁহারা রাজনীতি করিতেছিলেন তাঁহাদের রীতি ও নীতির সঙ্গে স্বামীজীর সহানুভূতি অল্প ছিল। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে ক্ষমতা দাবি করিতেছিলেন, তাহা সর্বসাধারণের সঙ্গে বাঁটিয়া ভোগ করিবার জন্য নহে, নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য। তিনি সজোরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাঁহারা অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহারা নিজেরা স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু এদেশে দাসেরা অন্যকে দাস করিবার জন্য ক্ষমতা চাহিতেছে ("Slaves want power to make slaves"—৪।৩১৩)।

বিবেকানন্দ যে নূতন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহা গঠন করিবার ভার লইবে মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কিংবা উচ্চবর্ণের লোক নহে, কিন্তু দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীরা। বলশেভিক দলের প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই স্বামীজী কৃষক ও মজুরের কথা বলিয়াছিলেন (৬।৩৮৬-৮৭)। তাঁহার সেই সুপ্রসিদ্ধ বাণী শতবার উদ্ধৃত হইলেও পুনরায় স্মরণ করা যাইতে পারে—"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন ('পরিব্রাজক,' পৃঃ ৪২-৪৩)।" তাঁহার মতে উচ্চতর শ্রেণীরা, কি শরীরের দিক দিয়া, কি নৈতিকতার দিক দিয়া, মরিয়া গিয়াছে (৫।২৫-২৬), এবং কৃষক, মেথর, চামার প্রভৃতি শীঘ্রই তাহাদের চেয়ে বড় হইবে (৭।১৪৬)।

বিবেকানন্দের উপর হেগেল ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব পড়িয়াছিল, যদিও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইঁহারা দুইজন পরস্পর-বিরোধী মতবাদ পোষণ করিতেন। হেগেলের মতে রাষ্ট্রের অধীনতাতেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। রাষ্ট্র সমষ্টির প্রতীক। স্বামীজী লিখিয়াছেন—"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য" (বর্তমান ভারত, পৃঃ ৩০)।" বেদান্ত-শাস্ত্রেও এই কথা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। হেগেল ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিয়া নাৎসী ডিক্‌টেটরশিপের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ গ্রীণের ন্যায় হেগেলীয় মত অনুসরণ করিয়াও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রচুর অবকাশ রাখিয়াছেন। তিনি জাতীয় ঐক্যস্থাপনের জন্য বলিয়াছেন—"স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ (পৃঃ-৪১)।" এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ হেগেলের ন্যায় সমষ্টির প্রতীক রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দিতে রাজী নহেন। তাঁহার কাছে প্রধান হইতেছে ব্যক্তির স্বার্থ ও ব্যক্তির কল্যাণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমষ্টির প্রতি আনুগত্য। তিনি মিলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়াছেন—"উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা, যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়াদাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক —যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকারে ইচ্ছা, সে প্রকারে ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের সমান সুবিধা যাহাতে সকল সামাজিক ব্যক্তির থাকে তাহাও হওয়া উচিত ('স্বামী বিবেকানন্দের বাণী' পৃঃ ২১১ ; ৫।১০৯-১১০)।" আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের ফলে ব্যক্তির নিজের ধন-সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতা অবশ্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা যে ভুয়া একথা স্বামীজী আরও অনেকস্থানে বলিয়াছেন (৩।২৪৬)।

স্বামীজী প্রত্যেক জাতির অভ্যুদয়ে আস্থাশীল ছিলেন, কেননা এক একটি জাতির এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরাজ জাতির টাকাপয়সার উপর সম্পূর্ণ

কর্তৃত্ব করা আর হিন্দুদের মুক্তি ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পৃঃ ১৯)। তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লস এঞ্জেলেসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"এসিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি সংগঠিত হয় না। তথায় এক ধর্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় হিন্দু মিলিয়া এক জাতি ('ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট', পৃঃ ১১)। স্বামীজীর এই উক্তি যে কত সত্য তাহা পাকিস্তানের উদ্ভব হইতে বুঝা যায়। ভারতে অবশ্য যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ধর্ম-নিরপেক্ষ বা secular।

স্বামী বিবেকানন্দ ঋষিসুলভ দিব্যদৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, "এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে-প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্র ধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে ('বর্তমান ভারত', পৃঃ ৩৬-৩৭)।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা (ঐ পৃঃ ৩৭ এবং ৪।৪১০)।" রোমাঁ রোঁলা সিষ্টার ক্রিষ্টিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা (এখন প্রকাশিত) হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ঐ ভগিনীকে বলিয়াছেন যে, পরবর্তী বিপ্লবে যে নবযুগের আবির্ভাব হইবে উহা রাশিয়া বা চীনে উদ্ভূত হইবে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার স্বামীজী-বিষয়ক গ্রন্থে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বামীজী ঐ ভবিষ্যদ্বাণী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁহাদের নিকটও বলিয়াছিলেন (পৃঃ ৩৩১—৩৫)। স্বামীজী একখানি পত্রে (CXII) নিজেকে স্যোসালিষ্ট বলিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিতে ভুলেন নাই যে, তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে মোটেই দোষহীন মনে করেন না, তবে কিনা কোন রুটি না পাওয়ার চেয়ে আধখানা রুটি ভাল ("I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread"—৬।৩৪২)।" ঐ মন্তব্যকে বিশদ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, অন্যান্য পদ্ধতি তো চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে এবং তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। এইবার এটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্ না কেন—আর কিছুর জন্য না হউক অন্ততঃ উহার নূতনত্বের জন্য।

স্বামীজীর ভবিষ্যৎদৃষ্টির সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি মাদ্রাজে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে। তিনি ঐ বক্তৃতায় বলেন—

আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য

অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন'। ('স্বামী বিবেকানন্দের বাণী', পৃঃ ২৯৭)।

স্বামীজী একেবারে পঞ্চাশ বছরের জন্য দেশমাতৃকার পূজার কথা বলিলেন, পুনরায় মাত্র ঐ কয় বছরের জন্য অন্য দেবতাকে ভুলিতে বলিলেন কেন? তাঁহার তৃতীয় নেত্রের সমক্ষে নিশ্চয়ই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীন ভারতের চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল। না হইলে তিনি ৩০।৪০ বা ৬০।৭০ বছরের কথা না বলিয়া ঠিক ঠিক পঞ্চাশ বছরের কথা কেন বলিলেন?

ভারত স্বাধীন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসমন্ত্রের প্রভাব যে ইহার পিছনে অনেকখানি কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অহিংসনীতির দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে কি? স্বামীজী যেন ১৯৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির সমস্যা প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন—

—"শত্রুগণকে বীর্য প্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে, ইহা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। গৃহস্থকে ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিলে আর "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" বলিয়া বাজে বকিলে চলিবে না। যদি তিনি শত্রুগণের নিকট শৌর্য প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্যের অবহেলা করা হয়" (কর্মযোগ, পৃঃ ৩৩)।

এই কথা স্বামীজী যখন লেখেন তখন আমাদের স্বাধীনভারতের যৌথপরিবারের অদ্বিতীয় গৃহস্থ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন।

আধুনিক ভারতে যাঁহারা রাষ্ট্রীয় চিন্তার মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন এবং কোন না কোন ধর্ম-আন্দোলনের নেতা। রামমোহন, দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রানাডে, টিলক, অরবিন্দ ও গান্ধী ভারতবর্ষের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবাসীর ব্যষ্টিগত জীবন ও সমষ্টিগত সমাজকে সুগঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই সামুহিক পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র; সুতরাং উহাকে তাঁহাদের সমগ্র প্রচেষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে আমরা কেবলমাত্র আংশিক সত্যের সন্ধান পাইব। রামমোহন বেদান্তের ও দয়ানন্দ বৈদিক যুগের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই ভারতের পৌরাণিক যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করিয়াছেন। বিবেকানন্দ পৌরাণিক ভক্তিধর্মের সহিত বেদ-বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করিয়া ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। কোন জাতিকে জানিতে ও বুঝিতে হইলে তাহার কোন যুগকেই অগ্রাহ্য করা চলে না। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের

পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্য যেরূপ ব্যাপক ও উদার চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন সেরূপ অন্যান্য চিন্তানায়কদের মধ্যে বিরল।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যখন ভাল করিয়া বুনিয়াদ পত্তন হয় নাই, সেই সময়ে রামমোহনের পক্ষে এদেশে ইংরাজগণের স্থায়ী ঔপনিবেশিকরূপে বাস ও তাহার ফলে ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রসার অপেক্ষা আর অধিক কিছু কামনা করা কঠিন ছিল। স্বামীজী দয়ানন্দ পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত হন নাই। তিনি বেদ ও স্মৃতি হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বিদ্বৎ-আর্যসভা, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মার্যসভা ও আদর্শচরিত্র লোকদের দ্বারা গঠিত রাজার্যসভা পরস্পরকে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া একদিকে রাজাকে অন্যদিকে প্রজাসাধারণকে সংযত রাখিবে ('সত্যার্থপ্রকাশ', পৃঃ ১৬২-৬৩)। এই মতবাদ মৌলিক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার দ্বারা গণতান্ত্রিক শাসন সুরক্ষিত করা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় রাজকর্মচারীর পক্ষে সাম্যকে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া প্রচার করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে পরায়ত্ত দেখিয়া সমাজের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি সামাজিক সংগঠনকে যাবতীয় কল্যাণকর্মের ভার লইতে বলিয়াছেন। পল্লীসংগঠনের দ্বারা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে দয়ানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী অনেকটা একমত। রানাডে কিন্তু রাষ্ট্রের সাহায্যে জনকল্যাণ সাধন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। হেগেলীয় আদর্শবাদ অনুসরণ করিয়া তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকবর্গকে অধিকতর সুখী, মহৎ ও সম্পদশালী করিতে পারে, কেন না সামূহিকভাবে রাষ্ট্রই তাহার শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণের শক্তি, প্রজ্ঞা, দয়া ও দানবৃত্তির প্রতিনিধি (*Ranade's Miscellaneous Writings*, পৃঃ ৭৮)। স্বামী বিবেকানন্দও সমষ্টির হিতের জন্য ব্যষ্টির আত্মত্যাগের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার মতে "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত" ('বর্তমান ভারত' পৃঃ ৪১)। তাঁহার মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তির উন্নতি, এক সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের যন্ত্রের মধ্যে তাহাকে পিষিয়া ফেলা নহে।

স্বামী বিবেকানন্দের মত শ্রীঅরবিন্দও রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্যসাধনের একটি উপায় মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা বা মহাত্মা গান্ধী পশ্চিমের সংসদীয় গণতন্ত্রকে আদর্শস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের

অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন ; শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে উহার চেয়েও ভয়ঙ্কর হইতেছে গোষ্ঠী ও যূথের উপর আত্মসম্মোহিত জনগণের জবরদস্তি (*The Ideal of Human Units* পৃঃ ২৯১-২)। স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা প্রাচ্যের অথবা পাশ্চাত্ত্যের কোন চিন্তাবীরের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার "বর্তমান ভারত" বেদান্তসূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত এবং ভাবগর্ভ। তাহার এক একটি উক্তির টীকা ও ভাষ্য করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক একখানি বই লেখা যায়। একটি উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি ; "হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় আবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় (পৃঃ ২৪-২৫)।"

স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বর্তমানযুগে সাম্যবাদ রাজনীতি বা সমাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ধর্মের ক্ষেত্রে 'সম'ত্বের কথা সকল যুগে সকল দেশেই বলা হইয়াছে, কিন্তু সেসকল সমত্বের কথাকে আমরা বর্তমান যুগে কিছু আমল দিতেই চাহি না, কারণ আমরা সেটাকে একটা বহুপ্রচলিত 'ভুয়া' কথা বলিয়াই মনে করি, অথবা আমরা বলিয়া থাকি যে এক অধ্যাত্ম সত্যের অংশ বলিয়া বা তাহার সহিত অচ্ছেদ্যসূত্রে যুক্ত বলিয়া—বা স্বরূপ তাহার সহিত এক বলিয়া আমাদের ভিতরে যে সমত্ববোধ, আমাদের বাস্তব সমাজ-জীবনের উপরে তাহার কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। বাস্তবজীবনের সহিত সম্পর্কহীন গালভরা আদর্শকেই আমরা আজকাল 'ভুয়া' বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি।

সমাজজীবনে তথা রাষ্ট্রজীবনে আমরা যে সাম্যের কথা বলি তাহার একটি বিশেষ অর্থ আছে, সে সাম্য হইল উদাসীন নিষ্ক্রিয়ভাবে একটা ঐক্য-বোধমাত্র নয়, সে সাম্যের অর্থ হইল প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিব্যক্তির সম-অধিকার। বিশেষ অধিকারের মতবাদের বিরুদ্ধেই হইল বর্তমান সাম্যবাদের বিদ্রোহ; কারণ এই বিশেষ-অধিকারের মতবাদই হইল সকল প্রকারের শোষণ ও পুঁজিবাদের মূল কথা। সাম্যবাদিগণ বলিবেন, বিশেষ-অধিকারের মতবাদকে অবলম্বন করিয়াই জগতের পুঁজিবাদ ও শোষণ-প্রক্রিয়া গড়িয়া ওঠে নাই। ইতিহাসের বিশেষ উৎপাদন প্রথা লভ্যাংশের মধ্যে বৈষম্য আনিয়াছে। এই লভ্যাংশের বৈষম্য মূলে একটি মানবতা-বিরোধী নীতি,—অপরপক্ষে মানবতার উপাদান আমাদের সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর কিছু রহিয়া গিয়াছে; ফলে আমাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার অনেকখানি স্বাভাবিক স্রোতেই আমাদের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দিয়াছে তাহাকে নৈতিক সমর্থন দান করিবার একটা তাগিদ আমরা সহজাতভাবেই ভিতরে ভিতরে অনুভব করিয়াছি। তখন আমরা আমাদের অনুকূল সকল তথ্য ও যুক্তিতর্কের সমাবেশ করিয়া এই জিনিসটিকেই নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের মূল জীবনসত্যের মধ্যেই এমন কিছু রহিয়াছে যাহা সমাজজীবনের মধ্যে একজন অপেক্ষা অপরজনের জীবনের ভোগ্যসমূহকে অনায়াসে বা অল্পায়াসে অধিক করিয়া ভোগ করিবার বিশেষ অধিকার সমর্থন করে। সাম্যবাদ এই বিশেষ অধিকারের নীতিকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ যে সাম্যবাদের কথা বলিয়াছেন তাহার বৈশিষ্ট্য হইল এইখানে যে, তিনি সাম্যবাদের কথা বলিতে গিয়া শুধু সাধারণ মনুষ্যের আত্মিক ঐক্য বা সমত্বের কথাই বলেন নাই, তিনি শুধু মানুষের জীবন-প্রবাহ এবং জীবন-উদ্দেশ্যকে নয়, বিশ্ব-প্রবাহ এবং বিশ্ব-প্রবাহের চরম উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া এই বিশেষ-অধিকারের নীতিকেই মূলে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার এই সাম্যবাদের ক্ষেত্র শুধু মানবপর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—ইহা নিখিল জীব-পর্যায়ের মধ্যে ব্যাপ্ত। এই নিখিল জীব-পর্যায়ের মধ্যেই কাহারও কোনও বিশেষ-অধিকার নাই—নিম্নতম পর্যায়ের জীব এবং উচ্চতম পর্যায়ের জীব—ইহার কোনও ক্ষেত্রেই কোনও বিশেষ অধিকার (privilege) তিনি স্বীকার করেন নাই। ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি এইরূপ কোন বিশেষ-অধিকার স্বীকার করেন নাই; পরন্তু তিনি স্পষ্টাক্ষরে এই কথা তাঁহার একাধিক ভাষণে ব্যক্ত করিয়াছেন—বিশেষ-অধিকারের প্রমত্ততায় বৈষম্যের কুফল নিকৃষ্টতমরূপে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ধর্মের ক্ষেত্রে। আর্থিক ক্ষেত্রে শোষণবাদী ও পুঁজিবাদী মনোবৃত্তির নিন্দা আমরা উনবিংশ শতকেও দেখিয়াছি; বিংশ শতকে সে নিন্দা চরমে উঠিয়া প্রায় সর্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বিশেষাধিকারবাদে প্রতিষ্ঠিত শোষণবাদী ও পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি যে কত কদর্য হইয়া উঠিতে পারে তাহার কথা উনবিংশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় এমন করিয়া আর কাহাকেও বলিতে দেখি নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের ভিতরে ধর্মের ক্ষেত্রে এই সাম্যবাদের নীতি গড়িয়া উঠিবার একটা ইতিহাস আছে। যৌবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে তিনি ইহার বীজ লাভ করিয়াছেন; পরবর্তী কালে তাঁহার জীবনের উর্বরক্ষেত্রে বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এই বীজকে তিনি পরিবর্ধিত করিয়া শীঘ্রই ইহাকে একটি বিশিষ্ট নিজস্ব রূপ দিয়া লইয়াছেন।

স্বামীজীর এই সাম্যবাদের প্রারম্ভিক অবস্থায় লক্ষ্য করিতে পারি মানুষের প্রতি একটা অসীম শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ স্বাভাবিকভাবেই আসিয়াছে একটি সমত্ববোধ হইতে। সমত্ববোধ জাগায় একত্ব—একত্বই পর্যবসিত হয়—মমত্বে। এই সমত্ব এবং মমত্ববোধ স্বামীজীর সহজাত ছিল; সেই সহজাত সুপ্তবোধ একদিন শুভ উদ্বোধন লাভ করিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কিছু ভাবোক্তিতে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া দুইদিনের দুইটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবদশায় বলিতেছিলেন, 'দয়া—দয়া—জীবে দয়া—ইহাই হইল পরমধর্ম!' কিন্তু সেই ভাবদশাতেই কিছুপরে তাঁহার মনে হইল, দয়া? কে দয়া করিবে? কাহাকে দয়া করিবে? জীবকে দয়া করিবে? কাহার সাধ্য জীবকে দয়া

করে ?—জীব যে পোষাক-পরা শিব ! শিবকে কে দয়া করিতে পারে ? শিবের ত শুধু সেবা করা চলে। জীবে দয়া নয়, জীব সেবা—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা—ইহাই ত পরম ধর্ম। নিকটে ছিলেন পরমজিজ্ঞাসু—পরম শিক্ষার্থী যুবক নরেন ; নরেন বুঝিয়া লইলেন মানুষের ধর্মের মূল কথাটি।

আর একদিন ; আবার নরেনের চিত্তের উদ্বোধন ঘটিল অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলার অসুখ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে ; ঢোক গিলিয়া ঠাকুর আর কিছুই খাইতে পারিতেছেন না। কাশীপুরের বাড়ি, নরেন তাঁহার সাথীদের লইয়া দিনরাত ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। ঠাকুরের আর কিছুই ঢোকতল হইতেছে না, নরেন আর শুশ্রূষাকারী ছেলেদের মনে বেদনা ও বিষাদের শেষ নাই। এমন সময় একদিন ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি। ঠাকুরের কঠিন অবস্থা দেখিয়া তিনি পণ্ডিতজনোচিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার এসব কষ্ট—এত আপনি স্বেচ্ছায় ভোগ করিতেছেন ; শাস্ত্রে এ-কথা তো বহু স্থানেই দেখিয়াছি, এ-অসুখ আপনাদের মতন মহাপুরুষেরা তো ইচ্ছা করিলেই সারাইয়া লইতে পারেন !' কথাটা গেল নরেনের কানে ; পণ্ডিত চলিয়া যাইতেই নরেন ঠাকুরকে ধরিলেন একেবারে নাছোড়বান্দাভাবে—অন্ততঃ কিছু একটু ঢোক গিলিয়া খাইতে পারেন, এটা একটু ইচ্ছা করিয়া লইতেই হইবে। ঠাকুর হাসিয়া বলেন, 'তুই পাগল হয়েছিস্ নরেন ! মানুষের ইচ্ছায় কি কিছু হয় ? ও সব মায়ের ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হয় না।' নরেন আরও শক্ত করিয়া ধরেন, 'তবে মাকেই একটু বলুন না, মা তো আপনার সব কথাই শোনেন।' ঠাকুর হাসিয়া বলেন, 'এই সব নিজের শরীরে অসুখ বিসুখের কথা, এ ত মাকে কোনো দিনই কিছু বলি নি নরেন।' শক্ত অবুঝ ছেলের মতন কঠিন পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন নরেন, 'ওসব আমরা শুনব না, অন্ততঃ কিছু একটু যাতে খেতে পারেন—তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে মাকে বলতেই হবে।' নরেনের সনির্বন্ধ অনুরোধ—এড়াতেই পারেন না নরেন-বৎসল ঠাকুর ; রাজি হন মাকে এ-কথা বলিতে। সন্ধ্যায় নরেন আসিয়া জেরা করেন ঠাকুরকে—'মাকে বলেছেন ?'

ঠাকুর বললেন, 'বলেছি রে নরেন।'

সোৎসাহে নরেন বলেন, 'মা কি বললেন ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'মা যা বলেছেন তাতে লজ্জায় একেবারে আমার মাথা কাটা গেছে রে নরেন।

নরেন বলে,—'কেন, মা কি বলেছেন ?'

ঠাকুর বলেন, 'যখন বললাম, মা, কিছুই যে আর এমুখ দিয়ে খেতে পারছি

নে,—মুখ দিয়ে কিছু একটু খেতে পারি এমন করে দাও। শুনে মা হেসে বললেন, কেন, তুই কি শুধু এই একখানা মুখ দিয়ে খাবি ? এত মুখ যে রয়েছে—এ দিয়ে তোর খাওয়া হয় না ? শুনে আমার একেবারে মাথা হেঁট হয়ে গেছে রে নরেন।'

নরেন আর কোন কথা বলে না, যা পাইবার সে পাইয়া যায়—চিত্তের অপূর্ব উদ্বোধন ঘটে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে পাইয়া যায় সকল ধর্মের মূল কথা—নিজের একখানা মুখ দিয়া খাইতে নাই, জগতে যেখানে যত মুখ রহিয়াছে সেই সকল মুখ দিয়াই খাইতে হয়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে লব্ধ এই শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দের ভিতরে ধীরে ধীরে একটি গভীর অনুভূতি ও বিশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছিল। পরবর্তীকালে তাঁহার একটি ভাষণে তিনি বলিয়াছেন,—"প্রত্যেককে আমি কেন ভালোবাসিব ? কারণ, তাহারা সকলে এবং আমি যে এক। আমার ভাইকে আমি কেন ভালোবাসিব ? কারণ, সে আর আমি এক। সকলের ভিতরে রহিয়াছে এই একত্ব, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে রহিয়াছে এই অখণ্ড ঘনিষ্ঠতা। আমাদের পায়ের নীচে নিম্নতম পর্যায়ের যে পোকাগুলি নড়িতেছে চড়িতেছে, সেইগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোর্দ্ধ্ব জীবসমূহ পর্যন্ত সকলেরই বিভিন্ন দেহ রহিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মা রহিয়াছে একটি। সব মুখ দিয়াই তুমি খাইতেছ, সব হাত দিয়া তুমি কাজ করিতেছ, সব চোখ দিয়া তুমি দেখিতেছ। লক্ষ লক্ষ দেহের ভিতর দিয়া তুমি স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছ, আবার লক্ষ লক্ষ লোকের দেহের ভিতর দিয়া তুমিই রোগ ভোগ করিতেছ।"*

কিন্তু এই সমত্ববোধ বা একত্ববোধ সাম্যবাদের একটি প্রাথমিক কথা হইলেও ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদের সব কথা নয়। এ-জাতীয় সমত্ব বা ঐক্যের কথা আমাদের দেশেও স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে এবং পরে অনেকে বলিয়াছেন ; অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। এই সমত্ববোধ এবং ঐক্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বিশ্বজীবনের প্রবাহ এবং সেই প্রবাহের পিছনকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিশ্বাস-প্রবণতা গড়িয়া উঠিতেছিল ; এই বিশ্বাস-প্রবণতা তাঁহাকে যে স্পষ্ট দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করিল তাহাই তাঁহাকে সর্বপ্রকারের বিশেষাধিকারবাদকে তারস্বরে অস্বীকার করিতে প্রেরণা দান করিয়াছিল।

আমরা আমাদের সমাজজীবনে যেখানেই কোন বিশেষ-অধিকারের দাবীকে

---

* The Way To Blessedness, *Swami Vivekananda's Works*, Vol. II. (Mayavati Ed.)

স্বীকার করি সেখানেই আমরা একজন মানুষ এবং অপর একজন মানুষের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদকে স্বীকার করি। এ ভেদটাকে আমরা নিছক সাময়িক বা কৃত্রিম বলিয়া মনে করি না, এই ভেদকে আমরা স্থায়ী এবং সত্য বলিয়া মনে করি। একজন শিল্পপতি যখন কোটি কোটি টাকার লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং হাজার হাজার শ্রমিক তাঁহার কারখানায় কাজ করিয়া কোনও রকমে গ্রাসাচ্ছাদনেরও ব্যবস্থা করিতে পারে না তখন ঐ শিল্পপতির এই টাকা এইরূপে ভোগকরিবার অধিকার আছে এই কথা স্বীকার করিতে হইলেই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, ঐ শিল্পপতির এই জীবনে বা পূর্ব-পূর্ব জীবনের এমন সব সুকৃতি নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে সুকৃতি তাঁহাকে বিশ্বজীবন বিবর্তনের পরিকল্পনার মধ্যে হাজার হাজার শ্রমশীল অথচ নিরন্ন মজুরের জীবন অপেক্ষা উচ্চস্তরের এবং অধিক মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এই ভেদটাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহি না, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থপ্রণোদিত বিকৃতব্যবস্থার ফলে জাত সম্পূর্ণ একটা কৃত্রিম ভেদ বলিয়া মনে করি। এই ভেদবুদ্ধি দূর করিতে পারিলেই বিশেষ অধিকারের সব দাবীও দূর হইয়া যায় এবং সমাজ হইতে সর্বপ্রকারের পুঁজিবাদী শোষণও দূরীভূত হইয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দও এই বিশেষ-অধিকারের দাবী অস্বীকার করিয়াছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের মৌলিক ভেদের কথা অস্বীকার করিয়া। তিনি ভেদ অস্বীকার করিয়াছেন শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষেরই নয়, তিনি প্রাণি-পর্যায়ের নিম্নতমস্তরে অবস্থিত অ্যামিবার সহিত উচ্চতমস্তরে অবস্থিত কোনও মানুষের ভিতরেও কোনও মৌলিক ভেদ স্বীকার করেন নাই। এই ভেদকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন বেদান্তের দৃষ্টি লইয়া ; সেই দৃষ্টিতে দেখা যায়, একটি অ্যামিবা এবং উচ্চতম স্তরে উন্নীত একজন শ্রেষ্ঠ মানবের ভিতরে স্বরূপে কোনও ভেদ নাই, যাহা কিছু ভেদ সবই রহিয়াছে বাহিরের রূপে। এই বাহিরের রূপটি কি? ইহা হইল স্বরূপ-আচ্ছাদক একটি আবরণ মাত্র ; যে শক্তি দ্বারা স্বরূপ এইভাবে বিভিন্ন রূপাবরণে আবৃত হইয়া পড়ে তাহাই হইল মায়াশক্তি। এই রূপের আবরণের পিছনে যে আত্মারূপ সত্য রহিয়াছে তাহা এক এবং অখণ্ড। যাহা স্বরূপে অখণ্ড তাহা সর্বদাই অখণ্ড। বস্তুর এই অখণ্ড স্বরূপ নিত্যমুক্ত নিত্যপূর্ণ। একটি অ্যামিবা পরমাত্মার কোন অংশ নয় ; পূর্ণস্বরূপের কখনও কোনও অংশও হইতে পারে না, তাহার ভিতরে অপূর্ণত্বও দেখা দিতে পারে না। একটি অ্যামিবার মধ্যেও তাই অসীম পূর্ণতা নিহিত আছে, আবরণহেতু সেই পূর্ণতা অপ্রকাশ রহিয়াছে, আবরণ-ভঙ্গেই তাহার মুক্তি। এই স্বরূপের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িলে তখন

আর মানুষ পশুপাখী বা উদ্ভিদ্ হইতে শ্রেষ্ঠ এমনতর কথার কোনও অর্থই হয় না। ব্যবহারিকভাবে আমরা যেটুকু ভেদ স্বীকার করিতে পারি তাহা হইল এই যে, উদ্ভিদের মধ্যে আত্মস্বরূপ প্রকাশের বাধাগুলি অত্যন্ত প্রবল, ইতরপ্রাণীর মধ্যে এই বাধা আর একটু কম—মানুষের মধ্যে আর একটু কম—সংস্কৃতিবান্ এবং অধ্যাত্মসাধনা-সম্পন্ন মানুষের মধ্যে আরও কম—যে মানুষ পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে এই বাধা আর কিছুই নাই। মুক্তিসাধনার অর্থ হইল আত্মাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা নয়; আত্মা ত নিত্যমুক্ত—নিত্যপূর্ণ; যে সকল আবরণ বা বাধা এই নিত্যমুক্ত স্বরূপের প্রকাশকে বিঘ্নিত করিতেছে—পূর্ণস্বরূপকে সঙ্কুচিত প্রতিভাত করিতেছে সেই সমস্ত দূর করিয়া দেওয়া। ঘনকালো মেঘের দ্বারা স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় সূর্যের স্বরূপ আবৃত হইয়া যায়, যেখানে মেঘ এতটুকু অপসারিত হইয়া যায় সূর্যের প্রকাশ সেখানে ততখানি অবাধিত।

স্বামীজীর ভিতরে এই একটি দৃঢ় বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, শুধু মানুষ নয়—সর্ব জীবই স্বরূপে অমৃতের অধিকারী—পূর্ণতার অধিকারী; তিনি এই সঙ্গে আরও বিশ্বাস করিতেন, এই নির্মল অমৃতস্বরূপকে অনাবৃত করিয়া তুলিবার জন্যে যে সাধনা—সে সাধনা শুধু মানুষের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারটিই এমন যে ইহার ভিতর দিয়া সর্বপ্রাণীরই নিরন্তর চলিতেছে এই আবরণ অপসারণের সাধনা—যতটুকু ঘটিতেছে স্বরূপ হইতে এই আবরণ অপসরণ ততটুকু ঘটিতেছে পূর্ণতালাভ। পূর্ণতালাভের অর্থ অপূর্ণের পূর্ণ হইয়া ওঠা নয়, পূর্ণতালাভের অর্থ পূর্ণস্বরূপকে আবরণমুক্ত করিয়া তোলা। এ-বিষয়ে লণ্ডনের একটি ভাষণে স্বামীজী বলিয়াছেন—

"আমরা তাই দেখিতেছি, জ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক, সমগ্র বিশ্ব সেই লক্ষ্যের দিকেই ছুটিয়া চলিতেছে। চন্দ্র সংগ্রাম করিতেছে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ তারকাদির আকর্ষণের ক্ষেত্র হইয়া সরিয়া যাইবার জন্য, এবং শেষ পর্যন্ত সে এই বন্ধনক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসিবেই। সবাই সেই মুক্তির দিকেই ছুটিতেছে—তবে ইহার মধ্যে যাহারা সচেতনভাবে চেষ্টা করিতেছে তাহারা এ ব্যাপারে সত্বর হইতে পারিতেছে। এই মতবাদ হইতে বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের এই একটা লাভ হয়, যে আমরা বুঝিতে পারি, সত্যকার বিশ্বপ্রেমের ধারণা এই দৃষ্টিতেই সম্ভব। সকলেই আমাদের সহযাত্রী—সবাই আমাদের এক পথের পথিক—প্রাণবন্ত সকল অস্তিত্ব—সকল উদ্ভিদ্—জন্তুসমূহ। সেখানে আমাদের সাথী শুধু আমাদের মানুষ ভাইগণ নয়, আমার পশু ভাই—আমার উদ্ভিদ্ ভাই: শুধু আমার 'ভালো' ভাই নয়—আমার 'মন্দ' ভাই, আমার আধ্যাত্মিক ভাই নয়—আমার দুর্জন ভাই। তাহাদের সবাই এক লক্ষ্যের দিকেই যাত্রা করিয়াছে। সকলেই এক স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রত্যেকেই সেই অসীম মুক্তির দিকে ত্বরান্বিত। এই প্রবাহকে আমরা থামাইতে পারি না, কেহই থামাইতে পারে না, কেহই পিছনে ফিরিয়া যাইতে পারে না—যতই না কেন সে চেষ্টা করুক; তাহাকে সামনের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে—এবং চরমে সে-ও গিয়া মুক্তি লাভ করিবে। সৃষ্টিপ্রবাহের অর্থই হইল সেই অসীম স্বাধীনতাকে আবার ফিরাইয়া পাওয়া—সে স্বাধীনতা

হইল আমাদের সকল সত্তার কেন্দ্র—সেখান হইতে আমরা যেন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। আমরা যে এই সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতরে রহিয়াছি, তাহাতেই বোঝা যায় যে আমরা ধীরে ধীরে কেন্দ্রের প্রতি আমাদের এই যে আকর্ষণ—ইহারই নানাভাবে বহিঃপ্রকাশকে আমরা নাম দিয়া থাকি প্রেম।" (Vedanta And Privilege, *Swami Vivekananda's Works*, Vol. 1—(Mayavati Ed.)

স্বামীজী এখানে আমাদের প্রেমের একটি অতিশয় ব্যাপক এবং গভীর সংজ্ঞা দিলেন। স্বভাবগত ভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরেই রহিয়াছে কেন্দ্রের প্রতি একটি অমোঘ আকর্ষণ। কেন্দ্রের সহিতই যুক্ত হইয়া আছে সকল প্রাণী—সকল পদার্থ; কেন্দ্রের প্রতি যে আকর্ষণ তাহাই গিয়া অনন্ত বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয় অনন্ত প্রাণী এবং পদার্থকে লইয়া—ইহাই হইল বিশ্বপ্রেমের মূল রহস্য। স্বামীজী বলিয়াছেন, কেহ যদি প্রশ্ন করে, এই বিশ্বসৃষ্টি কোথা হইতে আসিল, কাহার ভিতরে বিধৃত আছে—কোথায় আবার প্রয়াণ করিবে,—তবে তাহার উত্তর হইবে এই, প্রেম হইতে আসিয়াছে এই বিশ্বসৃষ্টি, প্রেমে ইহা বিধৃত আছে—প্রেমেই ইহা আবার প্রয়াণ করিবে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, সৃষ্টির বিধানই এই, আমরা চাই আর না চাই, কাহারও দিক হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবার উপায় নাই। যেই যত এদিক ওদিক সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করুক, অমোঘ টানে কেন্দ্রের দিকে যে আমরা বাঁধা আছি—আর সেই কেন্দ্রের বাঁধনেই বাঁধা পড়িয়া আছি প্রতিটি জীবের কাছে—জীব হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবার উপায় কি? যদি জানিয়া বুঝিয়া জীবের প্রতি এই অসীম প্রেম লইয়া সামনের দিকে আগাইয়া চলিতে চেষ্টা করি, আমাদের পথ মসৃণ হইবে, ঝাঁকুনি কম লাগিবে—গতি ত্বরান্বিত হইতে। উল্টা চেষ্টা করিলে পথ বন্ধুর এবং শ্রান্তিকর হইয়া উঠিবে—গতি পদে পদে বিপর্যস্ত হইবে—কিন্তু শেষ অবধি কেন্দ্রের দিকে—অনন্ত স্বাধীনতা ও মুক্তির দিকে আগাইয়া যাইতেই হইবে।

সহজেই বুঝিতে পারি, জগৎ-প্রবাহকে এবং তাহার ভিতরকার আমাদের জীবন-প্রবাহকে যদি এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারি তাহা হইলে মানুষের মধ্যে বিশেষ অধিকারের কথা আদৌ উঠিতে পারে না। এই ধারণাটাই যে মানবজীবনের ভিতরে একটা সর্বনাশা ধারণা। স্বামীজী বলেন, মানুষের মধ্যে যেন দুইটা শক্তি কাজ করিতেছে, একটা শক্তি হইল জাত-গড়ার শক্তি, অপর শক্তি হইল জাত-ভাঙ্গার শক্তি; একটা হইল বিশেষ-অধিকার গড়িবার শক্তি—অপরটি হইল বিশেষ অধিকার খণ্ডনের শক্তি। এই বিশেষ অধিকারের অন্যায় আব্দারকে যতই ভাঙ্গা যায় ততই একটি সমাজ-জীবনে আলো ও উন্নতি দেখা দেয়। আমাদের চারিদিকে আমরা সব সময় এই সংঘর্ষই দেখিতে পাইতেছি। এই বিশেষ-অধিকারের ধারণার মধ্যে স্তরভেদ আছে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "প্রথমে দেখিতে পাই বিশেষ অধিকারের একটা পাশবিক ধারণা,—যাহার গায়ে জোর বেশি সে দুর্বল অপেক্ষা বিশেষ-

অধিকারী। তাহার পরে হইল ধনের বিশেষ অধিকার; যাহার বেশি ধন আছে সমাজে যাহার কম আছে তাহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার অধিকারী। তাহার পরে আছে আরও সূক্ষ্ম কিন্তু প্রতাপশালী বিশেষ অধিকারের দাবী, ইহা হইল বুদ্ধির দাবী। যে অপর অপেক্ষা বেশি জানে সে-ই অপর অপেক্ষা বেশি সুযোগ সুবিধার দাবী পেশ করে। সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা খারাপ বিশেষ অধিকারীর দাবী হইল আধ্যাত্মিকতার দাবী; ইহা সর্বনিকৃষ্ট এইজন্য যে—ইহাই দেখা দেয় সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী রূপে। কোন কোন লোক যদি মনে করেন যে আধ্যাত্মিক সত্যের কথা, ভগবানের কথা—অপর লোক অপেক্ষা তাঁহারা বেশি জানেন অমনিই তাঁহারা অপর সকল উপরে উচ্চতার অভিমানে বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'ওহে ভেড়ার পাল, মাথা নীচু কর, আমাদিগকে পূজা কর; আমরা হইলাম ঈশ্বরের দূত, তোমাদের আমাদিগকে পূজা করিতেই হইবে।' কোনও লোকই একই সময়ে বেদান্তী—আবার অপরের উপরে কায়িক মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক সুযোগ সুবিধার দাবী দাওয়া লইয়া উপস্থিত হইতে পারেন না; কাহারও জন্যেই বিন্দুমাত্র কোন বিশেষ-অধিকারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না; সকল মানুষের মধ্যে একই শক্তি বিরাজমান; কেহ হয়ত সেই শক্তিকে একটু বেশি প্রকাশ করিতেছেন, কেহ কেহ হয়ত একটু কম; কিন্তু সকলের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে একই প্রকাশ সম্ভাবনা।"*

আমরা যেখানে জ্ঞানের অভিমান করি এবং সেই অভিমানে অপর হইতে নিজেকে একটি বিশেষ স্তরের বিশেষ রকমের জীব বলিয়া মনে করি তখন তাহার অর্থ কি? সর্বজ্ঞান প্রত্যেক জীবের আত্মার মধ্যেই নিহিত আছে, মূর্খতমের মধ্যেও নিহিত আছে; সে এখন পর্যন্ত তাহাকে নিজের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই—বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু সে ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে, সে হয়ত এখন পর্যন্ত নিজের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-সম্ভাবনাকে সম্যক্ বিকশিত করিয়া তুলিবার কোনও সুযোগই পায় নাই; তাহার পরিবেশ হয়ত আদৌ অনুকূল নয়, যখনই সে সুযোগ পাইবে তখনই সে নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিবে। একজন মানুষ আর একজন মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে—বেদান্তের মধ্যে এমনতর কথার কোনও অর্থই নাই। দুই জাতির মধ্যে এই জাতি উত্তম এবং এই জাতি অধম—অথবা এই জাতি উচ্চতর এবং এই জাতি নিম্নতর বেদান্তে এমন সব কথা একেবারেই অর্থহীন। উভয়কে একই অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া দেখা যাক—উভয়ের ভিতরেই একটি বিদ্যা-বুদ্ধির উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটে কি না।

* Ibid

এইরূপ সুযোগ দিবার পূর্বে এই জাতি বড় আর এই জাতি ছোট—এমনতর কথা বলিবার কাহারই কোন অধিকার নাই।

অধ্যাত্মজীবনের কথা বলিতে গেলে সেখানে ত বিশেষ অধিকারের কোন কথা তোলাই উচিত নয়। এখানে যদি কোন বিশেষ অধিকার দাবী করিতেই হয় তবে তাহা হইল মানব জাতিকে সেবার মহান্ বিশেষ-অধিকার ; কারণ এই সেবাতেই ত ভগবানের পূজা ; প্রত্যেক জীবের ভিতরে অবস্থান করিয়াই ত তিনি মানুষের পূজা গ্রহণ করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রেরিত কোন বিশেষ দূত থাকিতে পারে না, —কোন দিন ছিলও না—কোন দিন থাকিতেও পারে না। ছোট বড় প্রতিটি জীবই হইল সমভাবে একই ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ,—বিকাশের তারতম্যেই তাহাদের মধ্যে যেটুকু তারতম্য। ভগবান্ মানুষের জন্য যে নিত্যকালের বাণী দিয়া রাখিয়াছেন অনাদি কাল ধরিয়া সেই অমৃত বাণী একটু একটু করিয়া সকল জীবের নিকটেই আসিয়া পৌছিতেছে। তাঁহার সে বাণী তিনি বিশেষ কোন লোকের অন্তরে লিখিয়া রাখেন নাই ; তিনি তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন প্রত্যেক জীবের অন্তরের পরতে পরতে। এ বাণীকে কাহাকেও আর নূতন করিয়া বহন করিয়া আনিতে হইবে কেন ? এ বাণী ত মানুষের মধ্যে রহিয়াছেই—এবং প্রতি হৃদয়ের মধ্যেই ত এই বাণী আত্ম-প্রকাশের জন্য সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতেছে ; এই সংগ্রামে কেহ হয়ত প্রয়োজন মত সুযোগসুবিধা লাভ করিয়া একটু বেশি আগাইয়া গিয়াছে—কেহ হয়ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পিছনে পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহা লইয়াই উচ্চনীচের এত মান অভিমান ? ভগবানের বাণীর বাহক সমভাবে জগতের সকলেই। মানুষের মধ্যে যাহাকে আমরা অজ্ঞতম বলিয়া ঘৃণায় অবজ্ঞায় দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি অতীতে অনাগতে ভগবানের যত দূত আসিয়াছেন বা আসিবেন বলিয়া আমরা কল্পনা করি তাহাদের কাঁহা-অপেক্ষাই এই লোকটি ভগবানের শাশ্বত অমৃতময় বাণীর বাহক কোনও অংশে কম নয়। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যে তাঁর শাশ্বতবাণী চিরকালের জন্যই মুদ্রিত রহিয়াছে ; যেখানেই একটি জীব রহিয়াছে সেইখানেই যে পরম পুরুষের পরম বাণী রহিয়াছে। যে সকল বাধা এই বাণীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে সেই সকল বাধাকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; সেই দূর করিবার চেষ্টায় সর্ববিধ সাহায্যই হইল মানুষের সেবা—সেই চেষ্টাতেই হইল ভগবানের পূজা। এই পূজা সমত্ববোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—আবার সেই সমত্ববোধকে এ পূজা নিরন্তর দৃঢ় করিয়াও তোলে—সেই সমত্ববোধের দৃঢ়তার উপরেই নির্ভর করিবে আমাদের সাম্যবাদের দৃঢ়তা।

বিবেকানন্দ ও সোশ্যালিজম্

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। অনেকের মতে বিবেকানন্দ ছিলেন 'হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্ট'। সরকারী মার্ক্সবাদীরা অর্থাৎ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিকেরা মোটামুটি এই মতেরই সমর্থন করেছেন। বিবেকানন্দের ধর্মমত ও সমাজসংস্কারের কর্মসূচী প্রভৃতি আলোচনা ক'রে এসব তাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সামগ্রিক বিচারে বিবেকানন্দকে প্রগতিশীল ঐতিহ্যের স্রষ্টা বলা চলে না। আবার উনবিংশ শতাব্দীর উপর অনুশীলন করেছেন এমন অন্য অনেকের মতে বিবেকানন্দ 'জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক' ছিলেন। ধর্মকে আশ্রয় করে যদিও বিবেকানন্দ নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন, তবু‌ও একথা অস্বীকার করা চলেনা যে, তাঁর বক্তব্যের সারবস্তু প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদেরই অনুকূল। বেসরকারী মার্ক্সবাদীরা বলেছেন যে, বিবেকানন্দ যে শুধু জাতীয়তার উদ্গাতা তাই নয়, ভারতের প্রথম সোশ্যালিষ্টও বিবেকানন্দ। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদী' দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দের সমাজ বিষয়ক, ধর্মবিষয়ক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য মতামতের বিশ্লেষণ করেছেন। ডাঃ দত্তের মতে বিবেকানন্দ 'patriot and prophet', তদুপরি ভারতের প্রথম সোশ্যালিষ্ট। সরকারী মার্ক্সবাদীদের সমালোচনা করে ডাঃ দত্ত লিখেছেন :

"Now-a-days the youngmen imbued with a smattering of Marxism call him a 'reactionary'. In his life time the social-reformers of the day called him a reactionary as well ; because he did not advocate that only by giving widows to remarriage or by making some inter-caste marriages and such like social reforms India's regeneration would be achieved. The desideratum according to him is to raise the masses, to educate them and to elevate them in the scale of advanced humanity."

॥ ২ ॥

ঐতিহাসিক মহাপুরুষের ঐতিহাসিক কৃতি এত জটিল এবং তাঁদের চিন্তা-ভাবনা-কর্ম এত বিচিত্র যে, কোনও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই শেষ কথা বলা শক্ত। হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের উপাদান বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় বিদ্যমান। স্বামীজীর

মতো মহৎপ্রাণ অকুতোভয় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় রাজনীতিতেও দুর্লভ। এবং একথাও সত্য যে স্বামীজীই ভারতের প্রথম সচেতন সোস্যালিষ্ট।

ব্যক্তি মাত্রেই অনির্বচনীয়। ধরাবাঁধা ছকে ফেলে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপকে বোঝা প্রায় অসম্ভব। মহাপুরুষদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার অনির্বচনীয়তা আরও পূর্ণতা লাভ করে। ফলে ইতিহাস-স্বীকৃত মহাপুরুষদের ভূমিকা বিশ্লেষণে সব সময়ই অতিসরলীকরণের বিপদ থেকে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-আলেখ্য ও কর্মধারা বিচার করলে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে বিবেকানন্দের অকাল-তিরোভাব ঘটে। এশিয়ার জাগরণ তখনও ভাল করে আরম্ভ হয়নি। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রবল জোয়ার তখনও এদেশে অনুপস্থিত। এ' হেন যুগে, যখন ভারতীয় জনসাধারণ ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়নি, মুক্তিসন্ধানী ভারতের প্রকাশ যখন বহুল পরিমাণে অস্ফুট, কেমন করে বিবেকানন্দ ভারতভূমিকে নূতন জীবনবোধে ও চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তুললেন? বিবেকানন্দের ভাষণ, পত্রাবলী ও অন্যান্য লেখা পড়লে আজও পাঠকের শিহরণ জাগে, মনে হয় এই অমিতবীর্য গৈরিকধারী আসলে জনগণমন-অধিনায়কই ছিলেন।

আজ থেকে ষাট বছর পিছন ফিরে বিলীয়মান অতীতের দিকে তাকালে, অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভেবে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের চাইতে দু'বছরের ছোট ছিলেন আর গান্ধীজীর চাইতে ছ'বছরের বড়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এ দুজনেই আমাদের জাতীয় জীবনের মহারথী। এই দুই অসাধারণ ব্যক্তি পুরুষ নানাভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের দীর্ঘ, কর্মবহুল জীবনের ও মননের অভিঘাত আমাদের চিন্তাভাবনা ও কর্মধারায়; মানসে ও অনুভবে মিশে গেছে। এই কিছুদিন আগেও এঁদের সান্নিধ্য আমরা লাভ করেছি, কেননা এঁরা আমাদের যুগেরই মানুষ। স্বামীজী এই দুই মহামনস্বীর সমকালীন হলেও অনেকখানিই ইতিহাসের উপেক্ষিত হয়েই রইলেন। স্বামীজীর স্বল্পপরিসর জীবনের সক্রিয় নেতৃত্বের কাল শুধু পাঁচটি বছর। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে দেশে ফেরেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০২, এই পাঁচ বছরে, স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষের দিশারী হয়ে উঠলেন, নতুন জ্ঞানকর্মযোগে স্বদেশবাসীকে দীক্ষা দিলেন।

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কোনও সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন নানাভাবে বাংলার

তথা সারাভারতের চিত্তভূমিকে সরস করে তুলেছিল. সেই আন্দোলনের সূত্রপাতও বিবেকানন্দ-প্রয়াণের কয়েকবছর পরে। অথচ স্বামীজী জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের যে অঙ্কুর বপন করেছিলেন, সেই অঙ্কুর থেকে অগ্নিযুগের মুক্তিসাধনার বিশাল মহীরুহ উদ্গত হয়েছিল। একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, সেই বিশেষ যুগে স্বামীজী ভারতবর্ষের যে চিন্ময় মূর্তির ধ্যান করেছিলেন, আজও ভারতীয় সামাজিক মুক্তিসন্ধানীরা অন্য ভাবে সেই চিন্ময় মূর্তির সাধনাই করে চলেছেন। আজকের মুক্তিসন্ধানীরা যে সমাজতন্ত্রকে রূপায়িত করতে চান, ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, গৈরিকপরিহিত স্বামীজীই সেই আদর্শের প্রথম ভারতীয় প্রবক্তা।

বাস্তবিকই বর্তমান ভারতে স্বামীজীর মতো আর কেউই বোধ হয় জননেতৃত্বের অনুকূল প্রায় সব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে বিবেকানন্দ অপূর্ব মননশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আন্দোলন, অর্থনৈতিক মতবাদ প্রভৃতি সম্পর্কেও স্বামীজীর জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। এই সব আন্দোলনের আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের সঙ্গেও তিনি অল্পাধিক পরিচিতও ছিলেন। পরিব্রাজক হিসাবে তিনি আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং পরিব্রাজকরূপে দরিদ্রের কুটিরে অবস্থান করে, তাঁদের আহার্য গ্রহণ ক'রে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন। মহৎ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজীর হিন্দুয়ানি ছিল না। বরং ভারতীয় জীবনপ্রবাহে সব ধর্মেরই বিশিষ্ট অবদানকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতেন। হিন্দুদের কূপমণ্ডূকতা, আচারসর্বস্ব মেকি আধ্যাত্মিকতা, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি সম্পর্কে এই বৈদান্তিক-সোশ্যালিষ্টের প্রবল ঘৃণা ছিল। এবং সর্বোপরি বিবেকানন্দ ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, শক্তিশালী লেখক এবং কবি।

ফলে বিবেকানন্দোত্তর যুগে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামীদের কাছে বিবেকানন্দের আবেদন ছিল অপরিসীম। স্বাধীন, স্বতন্ত্র ভারত,—জ্ঞানে বিজ্ঞানে, প্রেমে, শৌর্যে মহীয়ান ভারত—জনসাধারণের ভারত, দারিদ্র্যমুক্ত, মালিন্যহীন এক উদার ভারত—এই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন। এই মহা-ভারত হবে প্রজাসাধারণের ; জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এই নতুন ভারতের বনিয়াদ এবং এই ভারতকে ধারণ করবে বেদান্তের জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব—যে তত্ত্ব থেকেই মনে হয় স্বামীজী সোশ্যালিজমের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

॥ ৩ ॥

আগেই বলেছি স্বামীজী ভারতবর্ষের প্রথম 'সোস্যালিষ্ট'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীতে সাম্যবাদের আলোচনা আছে। তৎকালীন সাম্যবাদী সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবেদ ছিল স্বতন্ত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র সোস্যালিজমের অনিবার্যতায় তাঁর আস্থা ঘোষণা করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এসব বিপ্লবী আন্দোলনের সাহিত্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। কথিত হয় যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রাক্কালে প্রিন্স ক্রপোটকিন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। যে যুগের কথা আমরা বলছি সেটা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যুগ নয়। এ্যানারকিজম, নিহিলিজম, সোস্যালিজম, কমিউনিজম— সেযুগে শৈশব অতিক্রম করে প্রবলপরাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। এসব আন্দোলনের তদানীন্তন নেতারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন ঠিকই, তবে কবে যে বিপ্লব বাস্তবে রূপ নেবে সে সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিবেকানন্দ যখন ঘোষণা করলেন, "কোনও না কোনও ধরনের সোস্যালিজম আসছে" ("Socialism of some form was coming on the boards") এবং "আমি সোস্যালিষ্ট" ("I am a socialist"), তখন এই গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর ইতিহাস-চেতনা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, স্বামীজী মার্ক্সের সূত্র অনুসরণ করে শুধু যে বলেছেন "দরিদ্র আরও দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং ধনী আরও ধনবান হয়ে উঠছে" তাই নয়, তিনি ভবিষ্যৎসমাজে শোষিত জনসাধারণের নয়া সংস্কৃতির (proletocult) কথাও বলেছেন। ডাঃ দত্ত আলোচনা করে আরও প্রতিপন্ন করেছেন যে, স্বামীজী রাশিয়ার জনসাধারণের অভ্যুত্থানের কথা বলে গেছেন এবং ষাট বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "রাশিয়ায় জনসাধারণের শাসন স্থাপিত হবে"। ভারতীয় প্রজাসাধারণের উপর বিত্তবানদের শোষণের তীব্র বিরোধিতা ক'রে স্বামীজী লিখেছিলেন : এ' শোষণ দানবিক ও ঘৃণ্য (demonaical and brutal)। স্বামীজীর মতে দেশপ্রেমিকের প্রথম কাজ হবে, কোটি কোটি নিরন্ন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসা, তাদের জন্য গভীর বেদনা অনুভব করা। কাজেই যুবসমাজকে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী :

"কোনো অন্যায় সুবিধা চেয়ো না, সকলের জন্য সমান সুযোগ চাই। যুবকবৃন্দ, তোমরা সামাজিক উন্নয়নের বাণী ছড়িয়ে দাও, সাম্যের বাণী প্রচার কর।" (No privilege for anyone,

equal chance for all. The youngmen should preach the gospel of social raising up, the gospel of Equality".)

স্বামীজীর বক্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সব রকম শোষণের তিনি ছিলেন বিরোধী। ধর্মের নামে যে শোষণ অব্যাহত থাকে, দেশপ্রেমের পিছনে যে অলক্ষ্যে শ্রেণী-শোষণ ঘটে, স্বামীজীই বোধ হয় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ঐ সত্যকে স্বীকার করেন। স্বামীজী তাই বলেছিলেন :

"আমাদের যুবকেরা সভাসমিতি করে, ইংরেজের হাত থেকে আরও ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে চায়। তবে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে যাঁরা অনিচ্ছুক, স্বাধীনতা তাঁদের প্রাপ্য হবে কেমন করে ?" [Our young folks make meetings to get more power from the English. None deserves liberty who is not ready to give liberty.]

স্বামীজী শুধু উপরতলার মানুষদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন শোষিত, দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। এবং তাঁর মতে "ভারতের একমাত্র আশার স্থলই ভারতীয় জনসাধারণ" ["The only hope of India is from the masses"] ; কেননা জনসাধারণই সমাজের মূল সঞ্চালক শক্তি, সমাজের অগ্রগতির ধারক ও বাহক।

॥ ৪ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের 'সোস্যালিজম্' চিরায়ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছিল। ট্র্যাডিশন ও আধুনিকতাকে মেলাবার জন্যই তিনি বেদান্তের পথে সোস্যালিজমে উপনীত হয়েছিলেন। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ধর্মসম্প্রদায় প্রভৃতিকে নিয়ে ভারতবর্ষ এক বিচিত্রতায় ভরা মহাদেশ। ইংরেজ শাসনে এই বিচিত্রতার মধ্যে অনেকখানি শাসন-ঐক্য ও শোষণ-ঐক্য এসেছিল। তবুও ভারতীয় সমাজবন্ধনের সূত্র ছিল অন্যত্র। যে সমন্বয়ী সূত্রের মাধ্যমে ভারত-ঐক্য যুগযুগ ধরে বেঁচে ছিল, সে সূত্র হোল প্রধানত হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু জীবনবেদ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ যে বিদেশীশাসনেও অপঘাতমৃত্যু বরণ করেনি তার কারণ বোধ হয় এই যে, নৃত্যগীতের মাধ্যমে, অতিকথা ও উপকথার রসাভিষেকে, ভারত-আত্মার বাণী সর্বত্র প্রসারিত হ'ত। শুধু যে উপরতলার জ্ঞানিগুণিজন, পুরোহিত সম্প্রদায় ও অন্যান্য শিক্ষিত বৃত্তিধারী মানুষ ভারতীয় জীবনবেদের সরিক ছিল তাই নয়, যুগযুগ ধরে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষও ভারতীয় দর্শনের মূল বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এ পরিচয় ঘটত সাধুসন্তদের মাধ্যমে, লোক-নাট্য, লোক-সঙ্গীত, লোকগাথা প্রভৃতির মাধ্যমে ও অন্যান্য উপায়ে। ফলে দেখা যায় যে, অদ্বৈতবেদান্তের মত দুরূহ দর্শনপ্রস্থানের সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষের কৃষকের কাছে

একেবারে অপরিচিত নয়। নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় মানসে মহাপুরুষদের চারিত্র-মাহাত্ম্যও প্রভাব বিস্তার করেছিল। মহাত্মাদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রভাব গ্রামীণ মানুষ কিম্বা শহুরে মানুষ, উভয়কেই যুগযুগ ধরে আকর্ষণ করেছে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর অন্যদেশের মানুষের তুলনায় সাধারণ ভারতীয়ের আধ্যাত্মিকতা কিংবা নীতিবোধ বেশী প্রবল। ব্যক্তিজীবনে ভারতীয় মানুষটি হয়তো তার প্রতিবেশীর চাইতে বেশী সৎ নয়। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় সঙ্কট মুহূর্তে কোন্ প্রভাব তার উপর বেশী কার্যকরী হবে, তবে যে উত্তর দেওয়া সম্ভব তা হয়তো একেবারে মিথ্যাও নয়। সার্থক সওদাগর, কিম্বা অমিতবীর্য সেনাপতি, কিংবা কূটবুদ্ধি রাজনৈতিকের যে ভারতীয় সমাজে প্রভাব ছিল না এমনটি নয়। তবে শেষ পর্যন্ত সর্বত্যাগী, মহৎপ্রাণ, নায়কের কাছেই হয়তো ভারতবাসীর হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলেছে এবং খুলবে। ভারতীয় মানসের এই প্রবণতাকে বড় করে দেখবার যেমন কোনো হেতু নেই, তেমনি হিন্দুসমাজের মূল্য বিচারে ঐ প্রবণতাকে ছোট করে দেখাও ভুল। বিবেকানন্দ এ প্রবণতার কথা জানতেন। তাই তিনি সমাজবিপ্লবের তুলনায় আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পূর্ববর্তিতা স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় মানসকে বুঝতে হলে একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে ভারতীয়েরা 'মোক্ষ'কে পরমপুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেছে। সাবেকি মোক্ষ-তত্ত্ব অবশ্যই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। ভারতীয়েরা মনে করেছে যে,—যে-শক্তির বলে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ব্যক্তিমানুষও সেই শক্তিরই অংশ। ফলে সৃষ্টির পশ্চাৎপটে যে সৃষ্টিশক্তি কাজ ক'রে চলেছে সেই শক্তির মানুষও অংশীদার। মানুষ তাই বিদেশ-বিভুঁয়ে নেই, যে জগতে তার স্থিতি, সে জগতে মানুষকে পরবাসীও বলা চলে না। একদিক থেকে মানুষ জগতের সঙ্গে অভিন্ন। ভারতবর্ষের শিক্ষা হোল এই যে, প্রগতির কেন্দ্রবিন্দু ব্যক্তিমানুষ এবং প্রগতির লক্ষ্য সৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করা। ব্যক্তিমানুষটিকে আজ যেভাবে দেখা যাচ্ছে তার এই রূপ হঠাৎ-আমদানী কোনোও তত্ত্ব নয়। এই মানুষটির বর্তমান অতীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, আবার তার ভবিষ্যৎ-ও বর্তমানের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিমানুষের আছে মহৎ-সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটলে দেখা যাবে যে, মানুষ হয়ে উঠেছে পুরুষোত্তম,—বিশ্বলীন সৃষ্টিশক্তির অচ্ছেদ্য অংশ। এর নামই মুক্তি এবং এই মুক্তিই ব্যক্তিমানুষের অভীষ্ট ও পুরুষার্থ।

ভারতীয় দর্শনে ও ধর্মে এটা স্বীকৃত যে, সব মানুষই শেষ পর্যন্ত মুক্ত হবে। কাজেই সব মানুষই ক্ষমতার (potentiality) দিক থেকে সমান। বাস্তবে যে

অসমানতা লক্ষ্য করা যায়, সে অসমানতার কারণ অতীতের কর্ম। অতীত কর্মফলের প্রভাবে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের পার্থক্য ঘটে, কেউ উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করে, কেউ বা নিম্নবর্ণে। আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চিৎপ্রকর্ষগত যে পার্থক্য ও অসমানতা বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়,সে সবেরই মূলকারণ অন্তরালবর্তী অতীত। ট্র্যাডিশন্যাল হিন্দুরা যে যে মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছিল, তা বহুলাংশে বর্ণাশ্রমধর্ম-নির্ভর। যার যেমন অবস্থান, তার পক্ষে সেই অবস্থানানুকুল ইষ্টকেই হিন্দুরা শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করেছে। যোদ্ধা যে, তার কাছে প্রত্যাশিত হোল সাহস, কিন্তু ব্রাহ্মণের বেলায় ত্যাগ। এই রকমের বিভিন্ন কর্তব্যাকর্তব্যের কথা হিন্দুরা আলোচনা করেছে। বিবেকানন্দ এই ট্র্যাডিশন্যাল মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিকতাকে মেশাতে চেয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, হিন্দুজীবনবেদে ব্যক্তিসত্তার স্বকীয়তা, মোক্ষ প্রভৃতি স্বীকৃত। বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, স্থানকালপাত্রভেদে ঐসব গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উপাদানও এর বিপরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আধুনিক ভারতীয় সমাজই এর সাক্ষ্য দেবে। ট্র্যাডিশন্যাল ভারত সহনশীলতাকে অন্যতম গুণ হিসাবে স্বীকার করেছে, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় সহনশীলতা এদেশে নিষ্ক্রিয়তার রূপ নিয়েছিল। বৈরাগ্য ও অকামও তেমনি এদেশে ঔদাসীন্যে পর্যবসিত হয়েছে। বিবেকানন্দ দেখেছেন যে, প্রেম-মৈত্রীর মহৎ আদর্শ এদেশে অনেকসময় তামসিক ভাবালুতার গলিপথে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এবং জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-ভারাক্রান্ত সমাজে ব্যক্তিমুক্তির কথা এক নিরুদ্দেশী সমাজবিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক প্রহেলিকায় বিলীন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেকসময় যে এ রকমটি ঘটেছিল তার প্রভূত সাক্ষ্য বিদ্যমান। দার্শনিক স্তরে সাম্যের সাধনা করেছেন ভারতীয় দার্শনিক, কিন্তু বাস্তব, সামাজিক সাম্যের প্রশ্নে তিনি নীরব। অর্থনৈতিক সাম্যের প্রশ্ন হয়তো সে যুগের অভাবের সমাজে অবান্তরই ছিল এবং হয়তো সেজন্য এ প্রশ্ন অনালোচিতই রয়ে গেছে। তত্ত্বের রাজ্যে ভারতীয়েরা মোক্ষ ছাড়াও ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রভৃতিকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। তবুও একথাও ঠিক যে 'সুখ' ও 'অর্থ'—এর যে স্বকীয় মূল্য আছে, এ' চেতনা ভারতবর্ষে অনেকখানি আধুনিক। হাতে-কলমে কাজ করা, ধনোৎপাদন করা, সমাজহিতে উৎপাদনব্যবস্থাকে সংহত করা, দেশের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি হ'লে গৌরব অনুভব করা—এ সবই নতুন মূল্যবোধের পরিচায়ক। তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক কল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও ভারতীয় সমাজে অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি, জাতীয়তা, সামাজিক সাম্য—এসব ভাবাদর্শ একদিক থেকে বিদেশী। এই বিদেশী ভাবধারা ভারতীয় চিত্তভূমিকে অধুনা সজীব করে

তুলেছে। এবং আজ মনে হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদেশী ভাবধারাকে ভারতীয় দর্শনের জারকরসে জারিয়ে আত্মস্থ করবার প্রয়াসই পেয়েছিলেন।

॥ ৫ ॥

'সোস্যালিজম্' পদটির নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, কেননা পদটি বিদেশী এবং এর অনুরূপ পদ ভারতীয় সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না। ইংরেজিতে 'ন্যাশনালিজম্' বললে যা বোঝায়, বাংলায় জাতীয়তাবাদ বললে ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ পায় না। তেমনি 'সোস্যালিজম্' বললে যা বোঝায় আমাদের দেশে বিশশতকের পূর্বে তার সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না। 'সোস্যালিজম্'-এর ধারণা পাশ্চাত্ত্য থেকে এদেশে আমদানী হয়। বিবেকানন্দের যুগে যে সোস্যালিজমের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটে সে সোস্যালিজম মুখ্যত অ-মার্ক্সবাদী। পরবর্তীকালে, বিশেষত শ্রীজওহারলাল নেহরুর প্রচেষ্টায় মার্ক্সীয় সোস্যালিজমের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে। অনেক মার্ক্সবাদী সোস্যালিষ্ট দাবী করেন যে মার্ক্সবাদই একমাত্র সোস্যালিজম। এই প্রসঙ্গে অন্যতম মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : "It is necessary to remember that the socialism that is worth the name is the socialism of Marx and Engels, and of their incomparable disciple Lenin."

'কমুউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে স্বয়ং মার্ক্স নানাধরনের সোস্যালিজমকে প্রতিক্রিয়াশীল 'সোস্যালিজম্' বলে বাতিল করেছিলেন। তখনকার ইউরোপে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদকে কোনটা, "ফিউড্যালিষ্টিক সোস্যালিজম', কোনটা "পেটি-বুর্জোয়া সোস্যালিজম" কোনটা বা "ক্রিটিক্যাল-ইউটোপিয়ান সোস্যালিজম," এমনি 'নেতি নেতি' ক'রে অগ্রসর হয়ে, স্বকীয় সোস্যালিজমকেই মার্ক্স এক, অদ্বিতীয়, 'বৈজ্ঞানিক সোস্যালিজম' নাম দিয়েছিলেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও তাই তাঁর আলোচনার শিরোনামা দিয়েছেন "Socialism is Marxisn"—অর্থাৎ "সোস্যালিজম্ মানেই মার্ক্সবাদ", অন্য সবই মেকি সোস্যালিজম্।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "আমি সোস্যালিষ্ট। কোন্ সম্প্রদায়ের সোস্যালিষ্ট ছিলেন স্বামীজী? যদি হীরেন্দ্রবাবুর মতো বলা যায় যে মার্ক্সবাদই একমাত্র সোস্যালিজম এবং যদি দেখান যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ মার্ক্সীয় সম্প্রদায়ের সোস্যালিষ্ট ছিলেন না, তাহলে সিদ্ধান্ত করা চলে : স্বামীজী আসলে সোস্যালিষ্ট ছিলেন না। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কথাটা তুলেছিলেন :—

"In making an analysis of his (Swamiji's) sayings a Marxist may say that his 'socialism' does not tally with that of Lenin and may fall short of the

socialist ideal of the West; his was more of the reformistic school. Yet one must not forget that during the time when Swamiji penned these epistles, Socialism did not take a revolutionary attitude."

সোস্যালিজমের ভাবাদর্শ মার্ক্সবাদের একচেটিয়া সম্পত্তি—এ ধরনের মনোভাব মার্ক্সবাদী সোস্যালিষ্টদের মধ্যে বরাবরই আছে। রুশবিপ্লবের সাফল্যের পর সোস্যালিজমের রূপ ও অভিব্যক্তি, গতিপ্রকৃতির একমাত্র ভাষ্যকার হিসাবে রাশিয়ার আবির্ভাব ঘটে এবং বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী দলের প্রচারের ফলে মার্ক্সীয় সোস্যালিজমই (রুশ ভাষ্যসমেত) একমাত্র নির্ভেজাল সোস্যালিজম বলে বন্দিত হতে থাকে। অধুনা চীনা সাম্যবাদী দলের দৌলতে মার্ক্সবাদী সোস্যালিজমেরও দ্বৈতরূপ প্রকট হচ্ছে এবং এই অবস্থায় সোস্যালিজমের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নতুন করে অনুশীলন চলছে।

সোস্যালিজমের মূল প্রেরণা কি? সোস্যালিষ্ট আদর্শের সর্বজনীন মানবিক আবেদন ঠিক কোনখানে? রুশ সোস্যালিষ্ট সমাজের ইতিহাস থেকে সোস্যালিষ্ট মতবাদ ও কর্মধারার যে বিকৃতি প্রত্যক্ষ হয়েছে এবং চীনের আসুরিক সমাজতন্ত্রের নগ্নরূপ সম্প্রতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই সোস্যালিজম সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। এই জিজ্ঞাসা ও সংশয় সত্যপ্রাপ্তির পথ বলেই আমরা মনে করি। এবং ঠিক সেজন্যই সোস্যালিষ্ট কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মান্ধতাকে আমরা পরিহার করিতে চাই। যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক সৌভ্রাত্রে অনুপ্রাণিত, শোষণহীন যে সমাজের কল্পনা সোস্যালিষ্ট চিন্তানায়কেরা করেছিলেন, মানবমুক্তিই ছিল তার প্রধান কথা। বিবেকানন্দও মানবমুক্তির প্রশ্নেই সোস্যালিষ্ট হয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধের সেটাই আলোচ্য।

সব দেশের অফিসিয়াল মার্ক্সবাদীরা লেনিন-ব্যাখ্যাত সোস্যালিজমকে বেদবাক্য হিসাবে গ্রহণ করে, অন্ধ গোঁড়ামি নিয়ে সোস্যালিজমের এক ধরাবাঁধা কাঠামো রচনা করতে চেয়েছেন।

তাঁদের মতে সাচ্চা সোস্যালিষ্ট হতে হলে কতকগুলি মূল প্রত্যয় মেনে নেওয়া প্রয়োজন, এবং যাঁরা এই সব প্রত্যয়কে পরিবর্তিত করতে চান, তাঁরা সবাই শোধনবাদী (Revisionist)—সোস্যালিষ্ট নন।

অফিসিয়াল মার্ক্সীয় সোস্যালিষ্টরা যে প্রত্যয়গুলির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সেগুলি নিম্নরূপ :—

১। সোস্যালিষ্ট হতে হলে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মেনে নিতে হবে।

২। শ্রেণীসংঘাত মানলেই শুধু হবে না, 'ডিকটেটরশিপ্ অব দি প্রলেটারিয়েট' তত্ত্বও মেনে নিতে হবে।

৩। সোস্যালিষ্ট হতে হলে মার্ক্সের ক্রমবর্ধমান দুঃস্থতার তত্ত্ব(pauperisation of the proletariat) মেনে নিতে হবে ; স্বীকার করতে হবে যে, পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্কটের অবিচ্ছেদ্যসম্পর্ক। সঙ্কটবিহীন পুঁজিবাদ যে সম্ভব নয়, ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের আবর্তে পড়ে পুঁজিবাদ যে অনিবার্যভাবে ধ্বংসের পথ নেবে, এ' তত্ত্বজ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকলে সোস্যালিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়।

৪। সোস্যালিষ্ট,—বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবেন না, কেননা তাঁর কাম্য 'প্রলেটরীয় গণতন্ত্র', যেটা কিনা প্রকৃত, "অধিকাংশের গণতন্ত্র"।

৫। সোস্যালিষ্ট যিনি, তাঁর পক্ষে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, দর্শনে, নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হয়ে সাহিত্যে দর্শনে ও অন্যত্র, 'সোস্যালিষ্ট পার্টিজানসিপ নীতি'কে ধরতে হবে।

৬। সাচ্চা সোস্যালিষ্ট স্বীকার করবেন যে, সোস্যালিজমের আবির্ভাব সংস্কারের পথে সম্ভব নয়। সোস্যালিজমের জন্য চাই বিপ্লব—প্রয়োজন হলে সশস্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লব এবং এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রেণী, অন্য কোনো শ্রেণী নয়।

৭। সাচ্চা সোস্যালিষ্ট "জাতীয় সোস্যালিজমের" দাবিদার হতে পারেন না। দেশপ্রেমের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা, স্বদেশের স্বার্থের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, এ কথা স্মরণ রেখে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও কাল্পনিক আন্তর্জাতিকতা, এ দুই বিপদকে পরিহার করে সোস্যালিষ্টকে পথ করে নিতে হবে।

এ সব প্রত্যয় আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী অফিসিয়াল সোস্যালিষ্টরা সোস্যালিষ্ট সমাজের রূপরেখা অঙ্কনের চাইতে অথবা সোস্যালিষ্ট সমাজের মূল্য ও অভীষ্ট নির্ণয়ের প্রচেষ্টার চাইতে সোস্যালিষ্ট সমাজ গড়বার পদ্ধতির উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। অথচ সোস্যালিষ্ট ধর্মান্ধতার ও অমানবিকতার পিচ্ছিল পথ পরিহার করতে হলে আজ আমাদের কর্তব্য হল সোস্যালিষ্টদের সাধারণ বিশ্বাসের উপর জোর দেওয়া, মৌলিক সোস্যালিষ্ট উদ্দেশ্য খুঁজে বার করা।

নানা মতবাদের সংঘাতের মধ্যে সোস্যালিষ্ট মতবাদের সাধারণ সূত্র হোল কতকগুলি মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষা, সম্প্রতি যে মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনেকেই নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করছেন।

সোস্যালিষ্ট মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যেসব উপাদান মিশে আছে তার মধ্যে প্রধান হল—

(ক) দুঃস্থ নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি আত্যন্তিক সহানুভূতি। পুঁজিবাদী

সমাজে, অন্তত, উনিশ শতক পর্যন্ত, অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ও দুঃস্থতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই মনুষ্যকৃত দুঃস্থতার বিরুদ্ধে, জনসাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগে কাছাকাছি এসে দাঁড়ানই সোস্যালিজমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

(খ) ফলে সদর্থকভাবে, সোস্যালিষ্টরা সমাজকল্যাণের দাবি তুলেছিলেন। যারা নিবিত্ত, যারা শোষিত, যে কোনো কারণেই হোক না কেন—যারা দুর্ভাগা, তাদের সম্পর্কে সমাজকে অবহিত হতে হবে, এ' দাবিও তাই সোস্যালিষ্ট দাবির অন্যতম।

(গ) তাছাড়া, সোস্যালিষ্টরা ছিলেন সাম্যের সন্ধানী। ফলে তাঁরা মনে করেছেন যে, "শ্রেণীসমাজ" আদর্শসমাজ নয়। এ সমাজে বিত্তবান-বিত্তহীন, মালিক ও শ্রমিক প্রভৃতির সংঘাত আছে এবং এ সমাজ জনসাধারণকে তাদের সামাজিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সোস্যালিষ্টরা তাই দাবি করেছেন যে, শ্রমজীবী মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদার আসনে বসাতে হবে।

এছাড়াও, সোস্যালিষ্টরা প্রতিযোগিতানির্ভর, সংঘাতমুখর বিরোধকে বরাবরই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা চেয়েছেন এক সৌভ্রাত্রমূলক, সহযোগিতানির্ভর, আদর্শ শোভন সমাজ।

(ঙ) সোস্যালিষ্টরা পুঁজিবাদের সঙ্কট সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করে তাঁরা মনে করেছেন যে, পুঁজিবাদে কর্মদক্ষতা অল্প। এ অবস্থায় জনজীবনে বিবিধ সঙ্কট দেখা দেয় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্লীন প্রবণতার দৌলতে সাধারণ মানুষ বেকারির সঙ্কটে হাবুডুবু খায়।

অর্থাৎ সোস্যালিষ্টরা একদিকে যেমন পুঁজিবাদের বাস্তব ফলাফলের কঠোর সমালোচক, অন্যদিকে তেমনি তাঁরা ন্যায়ানুমোদিত, সহযোগিতানির্ভর শ্রেণীহীন সমাজের প্রবক্তা। অধ্যাপক কোল্ সত্যিই বলেছিলেন যে, সোস্যালিজমের মূল চরিত্রই হল—"A broad human movement on behalf of the bottom dog"। এই প্রসঙ্গে আরও দু একটি বক্তব্য রাখা যেতে পারে। সোস্যালিজমের সামাজিক ও অর্থনীতিক আকুতির কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে এ আকুতিরও পশ্চাৎপটে, সোস্যালিষ্টরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সোস্যালিষ্ট আদি-গুরুদের কাছে 'গণতন্ত্রবিহীন সোস্যালিজম' অসম্ভব বলেই প্রতিভাত হোত। যে রাজনৈতিক সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বকীয় মূল্য অস্বীকৃত, সেই ব্যবস্থাকে তাঁরা 'সোস্যালিজম' হিসাবে স্বীকার করতেন কিনা সন্দেহ।

পূর্বেকার আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে, স্বামী বিবেকানন্দ সোস্যালিষ্ট—কেন না তিনি "A broad human movement for the bottom dog"-এর সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সোস্যালিষ্ট-চেতনার যেসব লক্ষণ আলোচিত হয়েছে, স্বামীজীর চিন্তাভাবনায় ও কর্মপ্রচেষ্টায় সে সব লক্ষণই উপস্থিত ছিল। তবে একথাও স্বীকার্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ মার্ক্সীয়-লেনিনবাদী অর্থে 'সোস্যালিষ্ট' ছিলেন না।

॥ ৬ ॥

প্রশ্ন হবে—স্বামীজী সরাসরি ধর্মকে 'opium of the people'—'জনসাধারণের আফিম' বলেন নি, "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে" তিনি গ্রহণ করেননি, স্বামীজী ছিলেন ব্যবহারিক বৈদান্তিক,—তবে কোন্ দার্শনিক সোপান বেয়ে, স্বামীজী সোস্যালিজমে উপনীত হলেন? সরকারী মার্ক্সবাদীরা মনে করেন যে, 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে' মেনে না নিলে 'সোস্যালিজম'কে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বর্তমান লেখকের অভিমত এই যে, স্বয়ং মার্ক্সের চিন্তা-ভাবনার বিশ্লেষণ ক'রেও এ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা শক্ত। মার্ক্স দার্শনিকভাবে সোস্যালিজমে উপনীত হয়েছিলেন 'আত্মচ্যুতি'-তত্ত্বের পথ বেয়ে (doctrine of self-alienation or self-estrangement)। পাশ্চাত্ত্যে এ তত্ত্বটির প্রতিপাদক হেগেল, অবশ্য হেগেলীয় ব্রহ্মবাদের পটভূমিতে। হেগেলের 'আত্মচ্যুতি ও আত্ম-আবিষ্কারের' তত্ত্বকে (self-alienation and self-discovery) আশ্রয় ক'রে ফয়েরবাখ্ যে মানবিক ধর্মে (anthropological religion) উপনীত হন, তার সারমর্ম হল—মানুষই ঈশ্বর। ফয়েরবাখের মনুষ্যকেন্দ্রিক ধর্মের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ক'রে মার্ক্স যে দাবিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন সেটি হোল এই যে,—মানুষকে ঈশ্বর করতে হবে এবং সেজন্যে সমাজরূপান্তরই একমাত্র পন্থা, অন্য পথ আর নেই। মানুষ আত্মচ্যুত কেন? মার্ক্স বলেছেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়েছে, অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্য থেকেও মানুষ বিচ্যুত। মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের পথ তাই একটিই। যে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে মানুষের আত্মচ্যুতি ঘটে, সেই মালিকানাপদ্ধতির নিষেধ করতে হবে। তবেই মানুষের মুক্তি। মার্ক্সের যুক্তিধারায় অবশ্যই একদেশদর্শিতা ছিল। আত্মচ্যুতির উৎস হিসাবে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথাটাই তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল। তিনি এ-ও মনে করেছিলেন যে, উৎপাদন-উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিষেধ হলে মানুষ তাঁর স্বরূপ ফিরে পাবে। আত্মচ্যুতির রহস্য আবিষ্কার প্রসঙ্গেই, মার্ক্সকে অর্থনীতির আলোচনায় তথা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে মনোযোগ দিতে হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় "আত্মচ্যুতি" কিভাবে নতুন

ধরনের শোষণের রূপ নেয়, 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থে মার্ক্স সেই রহস্যেরই আলোচনা করেন। ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের জন্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিরাকরণ চাই, অর্থাৎ সোশ্যালিজম চাই। মার্ক্সীয় সোশ্যালিজমের দার্শনিক-বুনিয়াদ যে আত্মচ্যুতি ও আত্ম-আবিষ্কার তত্ত্ব, পাশ্চাত্ত্য সমসাময়িক অনেক দার্শনিক এ'দাবি করেছেন।

"In short human self-alienation and the overcoming of it remained always the supreme concern of Marx and the central theme of his thought".

॥ ৭ ॥

মার্ক্সীয় সোশ্যালিজমের অন্যতম উত্তরাধিকার হিসাবে ক্লাসিকাল জার্মান দর্শন স্বীকৃত। ক্লাসিকাল জার্মান বিজ্ঞানবাদের (Idealism) ঐতিহ্যকেই সাম্যবাদ প্রসারিত করে দেবে এ'দাবি স্বয়ং মার্ক্স এঙ্গেলস্‌ও করেছেন।

"...The Germans are a philosophical nation and will not, cannot abandon communism, as soon as it is founded upon, sound philosophical principles; chiefly if it is derived as an unavoidable conclusion from its *own* philosophy. And this is the part we have to perform now. Our party has to prove that either all the philosophical efforts of the German nation, from Kant to Hegel, have been useless—worse than useless, or, that they must end in communism.

অর্থাৎ জার্মান বিজ্ঞানবাদের পরিণত ফল হোল কমিউনিজম—সাম্যবাদ। জার্মান বিজ্ঞানবাদের যদি কোনও মূল্য থাকে তবে সাম্যবাদেই সেই মূল্যের অভিব্যক্তি। জার্মান সাবেকি বিজ্ঞানবাদের আবিষ্কার কি ছিল? সেই আবিষ্কার এই যে, ঈশ্বর ও জীব দ্বৈততত্ত্ব নয়, আসলে জীবই ঈশ্বর। হেগেল-দর্শনে এই তত্ত্বটি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় এবং আত্মসচেতন মানবীয় চৈতন্যকে হেগেল দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। জার্মান নব্য-হেগেলপন্থী ব্রুনো বাউয়ার ও অন্যান্য অনেকে দাবি করেছেন যে, হেগেল নাস্তিক ও খ্রীষ্টধর্মবিরোধী ছিলেন। নব্য-হেগেলপন্থীরা ধর্মের যে সমালোচনা করেছেন, একদিক থেকে সে সমালোচনা হেগেলের দার্শনিক আত্মতত্ত্বেরই নৈয়ায়িক ফলশ্রুতি ছিল। মার্ক্স আরও অগ্রসর হয়ে প্রতিপন্ন করেন যে, মানুষের পক্ষে দিব্য জীবনলাভ সম্ভব, মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে অনুকূল পরিবেশে। সেই অনুকূল পরিবেশ হোল পুনর্বিন্যস্ত শোষণহীন সমাজ।

"As Engels put it, German philosophy's discovery that God is man called for a rearrangement of the world that would make it possible for man to experience himself in it as a godlike being."

সোস্থালিজম ও কমিউনিজমের নিকট-সংস্পর্শে আসবার পূর্বে মার্ক্সও নব্য-হেগেলপন্থীদের "Realisation of philosophy"—'দর্শনকে বাস্তব রূপ দাও'—এই দাবিটির তাৎপর্য বিস্তারিত করেছিলেন। মার্ক্স দেখেছিলেন যে, জগতেরও দ্বৈতসত্তা বিদ্যমান। একদিকে রয়েছে হেগেল-দর্শনের সর্বার্থসাধক সমন্বয়ী মননের জগৎ, অন্যদিকে দর্শনবর্জিত লৌকিক জগৎ। এই দর্শনবর্জিত লৌকিক জগতের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করতে হবে। তবেই দর্শনের মুক্তি—Realisation of philosophy.

"In its original form, the Marxian revolutionary imperative was a demand to 'make the world philosophical'. It expresed a sweeping indictment and rejection of earthly reality on the ground of its 'unphilosophical condition".

ফয়েরবাখের কাছ থেকে মার্ক্স আত্মচ্যুতি-তত্ত্বের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হন। এই পরিচয়ের ফল হিসাবে মার্ক্স বলেন যে, লৌকিক, মানবীয় জগৎকে দার্শনিকতায় মণ্ডিত করতে হলে, দর্শনকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হলে, আত্মচ্যুতিকে পরিহার করতে হবে। আত্মচ্যুতি পরিহার এবং আত্ম-আবিষ্কার, এই দুই হেগেলীয়—তথা ফারারবাখীয় তত্ত্বের পথ বেয়ে, মার্ক্স ইতিহাসের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করবার প্রয়াস পেলেন। মার্ক্স বললেন, মানুষের চরম লক্ষ্য 'মানবীয়' হয়ে ওঠা, সব রকমের আত্মচ্যুতি পরিহার করে মানবধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আত্মচ্যুতি যে শুধু ধর্মের কল্পলোকের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাই নয়, মানবীয় আত্মচ্যুতি ঘটে সমাজের "নানা বাধাবিপত্তির ফলে, রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের মাধ্যমে।" কাজেই মার্ক্স লিখলেন—"The demand to renounce illusions about one's situations is a demand to renounce a situation that required illusions"। মার্ক্সের তাই দাবি—অস্তিত্বের পরিবেশকে আমূল পরিবর্তিত করতে হবে। তবেই মানুষ আত্মস্বরূপ আবিষ্কার করে সার্থক হয়ে উঠবে। এই যে ভ্রমপ্রসবিণী পরিস্থিতিকে পরিহার করবার আহ্বান—demand to renounce a situation that required illusions,—এই আহ্বানের তাৎপর্য এই যে, সব তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান হবে প্রয়োগের মাধ্যমে, কর্মের রথচক্র বেয়ে। 'জার্মান ইডিওলজিতে' মার্ক্স তাই বলেছিলেন—

"All social life is essentially *practical*. All the mysteries which urge theory into mysticism find their rational solution in human practice and in the comprehension of this practice."

ফয়েরবাখ ধর্মজীবনের উপর আলোচনা নিবদ্ধ রেখে বলেছিলেন, আধ্যাত্মিক জীবনে মানুষের আত্মচ্যুতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মার্ক্স আত্মচ্যুতির পরিসরকে শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে সীমাবদ্ধ না করে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সমাজজীবনে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন।

"Now that the *holy form* of human self-alienation has been exposed, the next task of philosophy in the service of history is to expose self-alienation in *unholy* forms. The *criticism* of heaven thus turns into the criticism of earth, the *criticism* of religion into the *criticism of law*, the *criticism of theology* into the *criticism of politics*."

মানুষের মুক্তির জন্যে তাই সবরকমের বন্ধন (alienation) ঘোচাতে হবে। সে বন্ধন ধর্মাশ্রিত; আইনের ক্ষেত্রে, নীতির রাজ্যে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্র, এই বন্ধনের পরিচয়। মানুষের বন্ধনমুক্তির জন্য প্রয়োজন সমাজের আমূল রূপান্তর,—সমাজবিপ্লব। সমাজরূপান্তরের কর্মকাণ্ডকে মার্ক্স নাম দিয়েছেন 'praxis'—প্রয়োগ। এই প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধিকারপ্রাপ্ত মুক্ত মানুষের আবির্ভাব, সোশ্যালিষ্ট সমাজের অভ্যুদয়।

এই দীর্ঘ আলোচনার হেতু এই যে, অনেকটা একইভাবে ক্লাসিকাল হিন্দু বিজ্ঞানবাদ (বেদান্ত) থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌঁছেছেন। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি? ব্রহ্ম (অথবা ঈশ্বর) ও জীব দ্বৈততত্ত্ব নয়, আসলে "জীবই ব্রহ্ম"। 'জীব ও ব্রহ্ম এক', এই তত্ত্বে উপনীত হ'য়ে বেদান্তদর্শন ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব—ধর্মের দ্বৈতবাদ বাতিল করেছেন। ধর্মশাস্ত্র বলে জীব সসীম, ঈশ্বর অসীম, জীব অংশ, ঈশ্বর অংশী, জীব যন্ত্রমাত্র, ঈশ্বর হলেন যন্ত্রী। বেদান্ত ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্যকে খণ্ডন করে বললেন, জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, 'জীবই ব্রহ্ম'। শঙ্করদর্শনে তো ঈশ্বরকে পারমার্থিক তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করাই হয়নি। ঈশ্বর ব্যবহারিক স্তরের তত্ত্ব, নিম্নতর স্তরের কথা। পারমার্থিক স্তরে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ এবং জীবই ব্রহ্ম। ঈশ্বরবাদীরা তাই শঙ্করের বেদান্তের একান্ত বিরোধী। কেননা "জীবই ব্রহ্ম' এই সত্য প্রচার করে শঙ্কর বহুলাংশে ধর্মকে দুর্বলই করেছিলেন।

জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী বললেন, চিৎশক্তিতে, জ্ঞানবলক্রিয়ায়, আনন্দাস্বাদে, মুক্তিস্বরূপতায় জীবাত্মা তুচ্ছ নয়, ক্ষণভঙ্গুর নয়, অনুকম্পার বিষয় নয়, জীব অসীম—জীব ব্রহ্ম।

"You are free, free, free! Oh blessed am I! Freedom am I! I am Infinite! In my soul I can find no beginning and no end. All is my Self.!"

"In its essence, it is free. unbounded, holy pure and perfect."

"No books, no scriptures, no science can ever imagine the glory of the Self that appears as man, the most glorious God that ever was, the only God that ever existed, exists or ever will exist".

"Man, after his vain search after gods outside himself, completes the circle, and comes back to the point from which he started—the human soul, and he finds that the God whom he was searching in hill and dale, whom he was seeking in every brook, in every temple, in churches and heavens, that God whom he was imagining as sitting in heaven and ruling that world, is his own ***SELF***. I am He and He is I. None but I was GOD and this little I never existed." *Complete Works of Swami Vivekananda.*

জীব অসীম, জীবই ব্রহ্ম। তার আনন্দের, জ্ঞানের, সৃষ্টির, কর্মের কোনও সীমা নেই। পারমার্থিক দিক থেকে এ সবই সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক বাধাবিপত্তির জন্য এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি।

"Each man is infinite already, only these bars and bolts and different circumstances shut him out in, but as soon as they are removed, he rushes out and expresses himself." Ibid.

বিবেকানন্দ আত্মচ্যুতির সমস্যাটি বুঝেছিলেন। বেদান্তের কথা হল: জীব ব্রহ্ম ঠিকই, তবে অজ্ঞানের প্রভাবে জীব নিজেকে মনে করে সসীম, তুচ্ছ, রোগশোক-ভারাক্রান্ত ইত্যাদি। বিবেকানন্দ বলছেন, প্রত্যেক জীবসত্তাই অনাদি, অসীম, জীবই ব্রহ্ম। তবে নানারকমের প্রতিকূলতার ফলে জীব জানে না যে, সেই-ই ব্রহ্ম। এই সব প্রতিকূল পরিবেশ ঘোচাও, দেখবে জীবের বিপুল সম্ভাবনার দ্যুতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কারাবন্ধন ভেঙ্গে জীব দিকে দিকে নিজেকে প্রকাশ করবে।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের পিছিয়ে-পড়া সমাজ, অনুন্নত অর্থনীতি, জাতিসম্প্রদায়ের সংঘাত-মুখর অসম-সমাজ জীবকে জীবত্বে, সসীমত্বে আবদ্ধ রেখেছে। ধর্মের নামে আচারসর্বস্ব গোঁড়ামি, উচ্চবর্ণের শোষণ, মূল্যবিভ্রাট, সব মিলিয়ে জীব যে ব্রহ্ম এ সত্য স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠেনি। এই সত্য প্রকাশের জন্য, জীবের আত্ম-আবিষ্কারের জন্য সমাজের নবজন্ম প্রয়োজন। লৌকিক জগৎকে বেদান্ত-দর্শনের আলোকে উদ্ভাসিত করতে হলে, সমাজের পুনর্বিন্যাস চাই। Realisation of Vedantic philosophy—বেদান্তদর্শনের চরিতার্থতা চাই—এটিই বিবেকানন্দের দাবি। "The abstract Advaita must become living-poetic in everyday life".

বিবেকানন্দের কৃতিত্ব এই যে তিনি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বেদান্তদর্শনের একটি মূল সূত্রকে নতুন অবস্থা ও নতুন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। বিদেশে তিনি সোশ্যালিজম, এ্যানারকিজম প্রভৃতি চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার গণতন্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। বিবেকানন্দের মনস্বিতার প্রভাবে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারা নতুনের সংস্পর্শে এল। এবং তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন যে, জনসাধারণই ইতিহাসের মহানায়ক।

যুবক মার্ক্সের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করে অধ্যাপক প্যাসকাল লিখেছেন—

"It is his ideal of human emancipation, of 'humanism', that inspires him. He hates the fetters that pervert the practical and spiritual life of men and drives steadily forward to a definition of the barrier that lie in the way of the achievement of "human society or social humanity"—Socialism. This passionate belief in the dignity of man was his abiding inspiration of work."

বিবেকানন্দও মানবমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। মানবিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের কেন্দ্রীয় ভাববস্তু। মানুষের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শৃঙ্খলকে বিবেকানন্দও ঘৃণা করেছেন। 'কি সেই শৃঙ্খল', এই প্রশ্ন নিয়ে বিবেকানন্দ ভেবেছেন। বিবেকানন্দও শৃঙ্খলমুক্ত 'সামাজিক মানবতা' তথা সোশ্যালিজমের আদর্শ উপস্থাপিত করেছেন। 'The ideal of the Karmayogin'-এ শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন—

'The work that was begun at Dakshineswar is far from finished, it is not even understood. That which Vivekananda received and strove to develop has not yet materialised'.

পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসু লেখেন,

"Vivekananda's teachings have been neglected by his own followers—by the Ramkrishna Mission which he founded—and we are going to give effect to them."

শ্রীঅরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্র, দু'জনেই বলছেন, বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য অবহেলিত রয়ে গেছে, বাস্তবে রূপ পায় নি, অনেকে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। প্রশ্ন হবে, তাহলে বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য কি? আধুনিক ভারতে বিবেকানন্দের শিক্ষার মূল্যই বা কতটুকু? বিবেকানন্দের আরব্ধ কাজ আজই কি সমাপ্তির পথে? শিল্পায়নের পথে, পরিকল্পনার মাধ্যমে, যে ভারত

'আধুনিক' হতে চলেছে, সেই বর্তমান ভারতীয় সমাজে বিবেকানন্দের শিক্ষা কি অনেকখানি তুচ্ছমূল্য হয়ে ওঠেনি ?

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে, সমষ্টিমুক্তি ও ব্যক্তিমুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন একান্তই প্রয়োজন। এই মুক্তির জন্য দারিদ্র্য, অজ্ঞান, লোকাচার, কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম প্রয়োজন। ধর্মমোহ, মেকি আধ্যাত্মিকতা, অন্ধ গোঁড়ামি, শ্রেণীশোষণ—এ সবের নিরসন না হলে মানুষের ভাস্বর মূর্তি যে প্রকাশিত হবে না, বেদান্তদর্শনের সার্থকতা দেখা যাবে না, বিবেকানন্দ এ বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। ভারতীয় মানুষের তামসিক জীবনের মোহাবরণ উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন বিবেকানন্দ জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের পথে। যে পরবশ্যতা ও শোষণ জীবকে তামসিকতায় আচ্ছন্ন রেখেছে, সেই তামসিক উদ্ভিদী জীবন পরিহার করে সত্ত্বের প্রকাশধর্মের ও রাজসিক সামাজিক কর্মের আবাহন করেছেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ যে ভারতের চিন্ময়মূর্তি ধ্যাননেত্রে দেখেছিলেন, সে ভারতে,—কি আর্থিকব্যবস্থায়, কি রাজনীতিতে, কি শিক্ষাসংস্কৃতির ভোজে জনসাধারণের (people) অবাধ অধিকার। বিবেকানন্দ আশ্চর্য দূরদৃষ্টির সাহায্যে বুঝেছিলেন যে, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু উপরতলার মানুষের জন্য নয়, এ সমস্তই জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং জনসাধারণের প্রয়োজনানুকূল হলে তবেই এদের সার্থকতা।

বিবেকানন্দ যে মানুষের বন্দনা করেছেন সে মানুষ বন্ধনমুক্ত—জ্ঞানে, কর্মে, হৃদয়বৃত্তিতে মহীয়ান মানুষ। বন্ধনমুক্ত মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে-ওঠা নতুন সমাজ,—দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও রাজসিক উপাদানে গঠিত নতুন ভারতীয় সমাজ—এই সমাজের অভ্যুদয়ই বিবেকানন্দ কামনা করেছেন। এ সমাজে বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের শক্তির সমন্বয় হবে। এ সমাজে জনসাধারণই হবে ইতিহাসের নায়ক। এ সমাজ বস্তুবাদী সভ্যতার উপকরণ-প্রাচুর্যকে অবহেলা করবার মূঢ়তা পরিহার করবে, বস্তুবাদী সভ্যতাকে সমষ্টিমুক্তি তথা ব্যক্তিমুক্তির উপায় হিসাবে নিয়োগ করবে। "We talk foolishly against material civilisation. The grapes are sour. Material civilisation, nay even luxury, is necessary to create work for the poor. Bread! Bread! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven."

ভারতের নবজন্ম কোন পথে হবে? বিবেকানন্দ বলছেন, এ নবজন্মের পথ

সরল রেখার মতো নয়। একদিকে আধ্যাত্মিক প্রহেলিকায় পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বস্তুপুঞ্জের দাসত্বের সম্ভাবনা। এই দুই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে ভারতকে পথ তৈরী করতে হবে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেছেন যে, বেদান্তদর্শন মানবমহত্বের দর্শন। তবুও পৃথিবীর কোনও ধর্মই হিন্দুধর্মের মতো সাধারণ দরিদ্র মানুষকে এত শোষণ করেনি। 'পারমার্থিক' এবং 'ব্যবহারিক'—এই সব তত্ত্বকথার আড়ালে স্বেচ্ছাচারের যন্ত্র জনসাধারণকে নিষ্পেষিত করেছে, হিন্দুধর্মের সারবস্তু মূল্যবান হলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা অনাচার দেখা গেছে। বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতার নামে ভারতবর্ষ জনজীবনের অভাবকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। কিন্তু বিবেকানন্দ বলছেন, নতুন জীবনবোধ আজ একান্তই প্রয়োজন। এই জীবনবোধে অঙ্গীকৃত হবে এই দাবি—"first bread and then religion" এই জীবনবোধে জনসাধারণের যথাযোগ্য স্বীকৃতি থাকবে, জনশিক্ষা, জনস্বাচ্ছন্দ্য, জনসমৃদ্ধি জাতীয় চেতনায় ইষ্ট হিসাবে গৃহীত হবে।

"I consider that the great national sin is the neglect of the Masses, and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well-educated, well-fed, and well cared for."

আজ বিশশতকের মধ্য ভাগেও ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার লক্ষ্য যে বিবেকানন্দের বক্তব্যকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারে নি একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

ভারতবর্ষের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অন্নবস্ত্র, বাসস্থান দিতে হবে। সেজন্যই আজ জাতি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের লক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় সমাজতন্ত্র কোন পথে অগ্রসর হবে? বিজ্ঞানের নামে, পরিকল্পনার নামে আমরা কি এদেশে সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কতন্ত্র গ্রহণ করব? ব্যক্তিস্বরূপের স্বকীয়তা বিসর্জন দেব সমষ্টির যূপকাষ্ঠে? বিবেকানন্দ-দর্শনে ব্যক্তি ও সমষ্টি, বৈচিত্র্য ও ঐক্য, সংগঠন ও স্বাধীনতা, বৈষয়িক উন্নতি ও আত্মিক উন্নতি—এসবেরই সমন্বয় স্বীকৃত। ইতিহাস-চেতনা বিবেকানন্দের ছিল। ফলে তিনি বুঝেছিলেন রেজিমেন্টেড্ সমাজ সভ্যতার অনুকূল নয়। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রে তাই স্বাধীনতাই মূলকথা। নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত জীবসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যেই বিবেকানন্দ শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ চেয়েছিলেন। ইতিহাসের অনিবার্যতায় অর্বাচীন বিশ্বাস নয়, অসাধারণ মানবিকতাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে ভারতের প্রথম সমাজতান্ত্রিক হিসাবে আবির্ভূত হবার প্রেরণা দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক, মানবমুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজীকে নমস্কার।

বিবেকানন্দের দর্শন

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি পাঠ করলে মনে হয় তাঁর দর্শনখানি গড়ে উঠেছে ছুটি মূল উপাদান হতে। তার একটি হল শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং অপরটি হল বুদ্ধের সার্বজনীন প্রেম। প্রাচীন ভারতের এই দুই মনীষীর চিন্তাধারা যে তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শঙ্করাচার্যের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, দক্ষ বিশ্লেষণনৈপুণ্য এবং যুক্তিসম্মত চিন্তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁর মনে হয়েছিল শঙ্করাচার্য প্রচারিত বেদান্ত বিজ্ঞানসম্মত।

অপর পক্ষে ভগবান বুদ্ধের অহিংস নীতি তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। ঠিক বলতে গেলে বলা উচিত বুদ্ধকে তিনি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। বুদ্ধের চিন্তায় আত্মার স্বীকৃতি নেই, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বরের স্থান নেই। এগুলির তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা হতে মুক্তির জন্য সকল মানুষকে ভিক্ষুর ব্রতে আহ্বান করেছিলেন। তাতেও তাঁর অনুমোদন ছিল না। এই কারণে তিনি তাঁকে গয়াসুর নামে অভিহিত করেছেন।*

তা সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধের চরিত্রের একটি গুণ তাঁর শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তা হল তাঁর সকল জীবের প্রতি সুগভীর প্রেম। তাঁর কারুণিকত্ব বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

---

*স্বামীজী নিজে বুদ্ধকে গয়াসুর বলেন নি, তবে তিনি অগ্নিপুরাণের এই বিষয়ক ব্যাখ্যাকে একসময়ে সমর্থনের ভাবে উল্লেখ করেছিলেন—"বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ) সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শান্ত করেছিলেন।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গয়াসুর ও বুদ্ধদেবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মত পরে পরিবর্তিত হয়। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী স্বামী স্বরূপানন্দকে পত্রে লেখেন—"......সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন আলো পেয়েছি।......অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত) তাতে বুদ্ধদেবকে মোটেই লক্ষ্য করা হয় নি। ওটি কেবল পূর্বপ্রচলিত একটি উপাখ্যান মাত্র। বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্বতে বাস করতে গিয়েছিলেন, তাতেই ঐ স্থানের পূর্বাস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।"

অগ্নিপুরাণের রূপকচ্ছলে বুদ্ধকে গয়াসুর বলা হয়েছে—এ বিষয়ে স্বামীজীর মত বদলালেও বৌদ্ধদের নিছক মোক্ষমার্গ যে ক্ষতিকর, সে নিয়ে স্বামীজীর মত বদলায় নি।—সম্পাদকীয় টীকা।

এই দুই মনীষীর প্রভাব তাঁর উপর কত অধিক ছিল তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হতে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

"তারপর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহগুণ; তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রখর জ্ঞানসূর্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিকভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূত হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হইবে।" (জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ১৬৫)

এই মণিকাঞ্চন যোগ মনে হয়, বিবেকানন্দের দর্শনে সত্যই ঘটেছে। দর্শনের যে আদর্শ তিনি মানসপটে স্থাপন করেছিলেন তা নিশ্চিত তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে আমরা দেখি, তাঁর দর্শনে দুটি মূল ভাগ আছে। তাদের প্রথমটিকে জ্ঞানকাণ্ড বলতে পারি এবং দ্বিতীয়টিকে কর্মকাণ্ড বলতে পারি। প্রথমটির আলোচনা করার বিষয় হল, বিশ্বের স্বরূপ কি। তা জ্ঞানসম্পর্কিত সমস্যার উত্তর দেয়। দ্বিতীয়টির আলোচনার বিষয় ইহজীবনে মানুষের কর্তব্য কি। তা কর্তব্যকর্ম সম্পর্কিত সমস্যার উত্তর দেয়। জ্ঞানকাণ্ডে যে দর্শন রূপ নিয়েছে তার সঙ্গে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের কোন ভেদ নেই। ঠিক বলতে এবিষয় বিবেকানন্দ কোন নূতন দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেন নি। তিনি শঙ্করের বেদান্তকে গ্রহণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এখানে তিনি শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের ভাষ্যকার।

অপর পক্ষে কর্মকাণ্ডে তাঁর যে দার্শনিক চিন্তাধারা বিকাশলাভ করেছে তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মত স্থান পেয়েছে। এখানে তাঁর চিন্তাধারার মৌলিকত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, তাঁর নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রপঞ্চময়, স্বপ্নের মত তা অসার। তাঁর সব থেকে বড় আকর্ষণ হল আত্মার অপরোক্ষানুভূতি। সাধারণত সে ক্ষেত্রে দয়া, মায়া বা মমতাবোধ প্রণোদিত হয়ে সমাজ সেবার প্রতি আকর্ষণ থাকে না। এইখানেই কিন্তু বিবেকানন্দের চিন্তার মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর হৃদয়বৃত্তিও যে খুব প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই জন্যই বোধ হয় তার দাবিকে, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি। ফলে আমরা তাঁর দর্শনে পাই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ। এই ভাবেই তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বিচিত্র হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের দার্শনিক মতের সহিত পরিচিত হতে হলে

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় করতে হবে। তাঁর অদ্বৈতবাদের সহিত আমাদের দেশের মানুষ অল্প-বিস্তর পরিচিত। এমন কি সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও তার সম্বন্ধে একটি ধারণা আছে। শঙ্কর-প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্ব মায়াবাদ নামেই বেশী পরিচিত। মায়াবাদ বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে—এ হল সেই দার্শনিক তত্ত্ব যা বলে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'

কিন্তু শঙ্করাচার্য যে মায়াবাদ প্রচার করেছেন এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তিনি ঠিক এমন কথা বলেন না যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বহু বিশ্লিষ্ট বস্তুসমন্বিত জগৎ সর্বৈব মিথ্যা। তিনি বরং বলেন যে তাও সত্য, তাও ব্রহ্মতেই অধিষ্ঠিত। তবে দেখার ভুলে আমরা তাকে বহু ও বিচিত্র রূপে দেখি। জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও জগৎ একই, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগৎ সম্বন্ধে ঠিক পরিচয় আমাদের এনে দেয় না।

কথাটা অন্যভাবে বুঝতে চেষ্টা করা যাক। বিশ্ব কি বহু, বিশ্লিষ্ট, সম্পর্কহীন বস্তুর সমষ্টি, না একই সত্তার প্রকাশ ? এটি হল দর্শনের একটি মূল সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে বিশ্ব অসংখ্য বিশ্লিষ্ট, বিক্ষিপ্ত, বস্তুর সমষ্টি মাত্র। আমাদের দেশে বৈশেষিক দর্শনে এই ভাবেই বিশ্বের ব্যাখ্যা করেছে। গ্রীস দেশের দার্শনিক ডিমোক্রাইটাসও এর অনুরূপ মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বহু বিশ্লিষ্ট অণু দিয়ে বিশ্ব রচিত।

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ লক্ষ্য করেছে যে, বিশ্বে ঠিক বিশ্লিষ্ট নানা বস্তুর সমাবেশ নেই। যাকে বহু ও বিচিত্ররূপে আপাতদৃষ্টিতে দেখি, তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যধারা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক চিন্তাধারা এক নূতন পথে যায়। ফলে একটি নূতন তত্ত্বের জন্ম হয়, যা বলে বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক। বিশ্ব সরল ভাবে একক বস্তু নয়, তা জটিল ভাবে এক। তার মধ্যে বিভাগ আছে, কিন্তু সেই বিভাগগুলির মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বর্তমান। তাদের বহুত্বকে ব্যাপ্ত করে একত্ব প্রকট।

শঙ্কর এই দুই শ্রেণীর দার্শনিক মতের কোনটিকেই গ্রহণ করতে পারেন নি। বহুবাদকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তো বটেই, এমন কি বহু বিশিষ্ট জটিল একবাদকেও তিনি স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তা স্বরূপ। তার মধ্যে বহুর স্থান নেই। তার মধ্যে বিভাগের অবকাশ নেই। তাকে তিনি ব্রহ্মন্ বা আত্মন্ বলেছেন। তার প্রকৃতি হল চেতনারূপ। তাই তাকে তিনি নির্বিশেষ চিন্মাত্রম্ বলেছেন। তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ চিন্ময়, তার প্রকৃতি

চিন্ময়, যেমন লবণখণ্ডের প্রকৃতি লবণের আস্বাদময়। সাধারণ ক্ষেত্রে চিৎশক্তি-বিশিষ্ট সত্তার চিৎশক্তি প্রকাশ হয় জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে। জানবার বস্তু একটা থাকা চাই, তবেই তো জ্ঞাতার জানবার শক্তি প্রকট হবে। জানবার বস্তু কিছু না থাকলে মানুষের মন জানবে কি? কিন্তু তাঁর মতে ব্রহ্ম সম্পর্কে একথা খাটে না। জ্ঞেয় বস্তু থাক বা না থাক, এই চিৎশক্তি নিত্য বিরাজমান। তিনি বলেন মহাশূন্যে কিরণ গ্রহণ করবার জন্য বস্তু থাক বা নাই থাক, সূর্য যেমন কিরণ বর্ষণ করে, ব্রহ্মের তেমন জ্ঞাতৃরূপ নিত্য প্রকট। তিনি জ্ঞেয়বিহীন জ্ঞাতৃগুণবিশিষ্ট সত্তা।

যিনি চিন্ময় ও অবিভাজ্যরূপে একক সত্তা, তাঁকে তবে কেন আমরা বহু ও বিচিত্ররূপে দেখি? তিনি বলেন, তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি খানিক পরিমাণে দায়ী। তারা তাঁর যে পরিচয় আমাদের কাছে এনে দেয়, তা ভুল পরিচয়। যার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই, যা সম্পূর্ণ অলীক অথচ দেখি—তাকে আমরা ভ্রান্তি বলতে পারি। যার বাস্তব ভিত্তি আছে, অথচ আমরা যাকে তার প্রকৃতি রূপ হতে বিভিন্ন দেখি তাকে আমরা মায়া বলতে পারি। স্বপ্নে যা দেখি তা প্রথমটির উদাহরণ, তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। মরুভূমির তপ্ত বালুস্তরে আমরা জল দেখি। তাকে আমরা মরীচিকা বলি। এটি মতিভ্রমের উদাহরণ। তপ্ত বায়ুস্তরের উপরের বায়ু কাঁপে। তার সেই কম্পনকে আমরা জলের রূপে দেখি। তা ভ্রান্তি নয়, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব নয়, তা হলে তাকে কেবল তপ্ত বালুর উপর না দেখে যেখানে সেখানে দেখতাম। শঙ্করের মতে যা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এক, তাকে যে আমরা বহুরূপে দেখি তাও এই ধরনের অনুভূতি। তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, তা মিথ্যা নয়, তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা তার অপব্যাখ্যা করি। যেমন তপ্ত বায়ুস্তরের কম্পনকে আমরা মরীচিকা বলে ভুল করি।

কেন এমন দেখি? তারও তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন এখানে একটি বিশেষ শক্তি ক্রিয়া করে। তা যা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক তাকে আমাদের নিকট বহুরূপে বিকৃত বা বিবর্তিত ক'রে দেখায়, বালুর তাপ যেমন বালুর স্তরের কম্পনকে বিবর্তিত ক'রে মরীচিকার রূপ দেয় বা একটা সোজা লাঠির খানিক অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে তাকে বাঁকা দেখায়। এখানে জলের সূর্য কিরণকে আংশিক ভাবে বিক্ষিপ্ত করার শক্তি তার রূপকে বিকৃত করে। জলের বিক্ষিপ্ত করবার শক্তি এখানে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটায়। অপব্যাখ্যাই এই ভ্রান্ত উপলব্ধির কারণ। যে শক্তি একক ব্রহ্মকে বহুরূপে বিকৃত করে তাকে তিনি মায়া বলেছেন।

বিবেকানন্দ তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে বেদান্তের যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন

তা শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তর ব্যাখ্যা। বেদান্তের মূলগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র। মহর্ষি বদরায়ণ তা রচনা করেন উপনিষদের যে তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে তার সারমর্ম নিয়ে। কিন্তু তা সূত্রের আকারে রচিত বলে সোজা বোধগম্য হয় না। তাই তার ভাষ্যের প্রয়োজন। তার ওপর ভাষ্য একাধিক মনীষী লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মতের এত পার্থক্য যে, কোন্‌টি ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা তা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। তাদের পার্থক্য এত গভীর যে, তাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশ্বের স্বরূপ কি তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে তা বহু বিশ্লিষ্ট বস্তুর সমষ্টি। তাকে আমরা বহুবাদ বলতে পারি। আর এক ব্যাখ্যা হতে পারে যে বহুকে জড়িয়ে নিয়ে জটিল ভাবে একই শক্তির ব্যাপক বিকাশ হল বিশ্ব। তাকে দার্শনিক ভাষায় সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। আরও ব্যাখ্যা হতে পারে। বিশ্ব একই শক্তির রচনা, কিন্তু তিনি বিশ্ব হতে স্বতন্ত্র। তাকে একেশ্বরবাদ বলা হয়ে থাকে। আর শঙ্করের মত বলা যেতে পারে বিশ্ব অবিচ্ছিন্নভাবে এক বস্তু। তাকে অবিমিশ্র একবাদ বলা যেতে পারে। ব্রহ্মসূত্রের ওপর যে পাঁচজন মনীষী ব্যাখ্যা লিখেছেন তাঁদের মত এই চার শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মাধবাচার্যের ভাষ্য বহুবাদকে গ্রহণ করেছে। বল্লভাচার্যের ভাষ্য গ্রহণ করেছে একবাদকে। আবার দেখি নিম্বার্কের ভাষ্য প্রচার করেছে একেশ্বরবাদকে। সবগুলিই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সবগুলিই বেদান্তদর্শন বলে পরিচিত। এই ভাষ্যগুলি হতে শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যাকে পৃথক করবার জন্য তাকে অদ্বৈতবাদ বলা হয়ে থাকে। তাকেই বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছেন।

এই অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য হল তিনটি। তা বলে যে, বিশ্ব অবিমিশ্রভাবে এক। তাতে একটি মাত্র সত্তা আছেন, তিনি হলেন ব্রহ্মন্ বা আত্মন্। আমাদের ইন্দ্রিয়-নিচয় বহু ও নানার যে বিচিত্র জগতের পরিচয় এনে দেয় তা ভ্রান্ত, তা ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু দেখার ভুলে তাকে বহুরূপে দেখি। তৃতীয়ত এই ব্রহ্মন্ চিৎশক্তি বিশিষ্ট। বিবেকানন্দের লেখায় এই ব্যাখ্যাটিই প্রচারিত হয়েছে। তার দু একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর 'সন্ন্যাসীর গীতি' কবিতায় তিনি বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা অদ্বৈতবাদের সারমর্ম সংক্ষেপে বলে। কবিতার সে অংশটি এইরূপ,

> এক মাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
> অনাম, অরূপ, অক্লেদ, নিশ্চয় ;
> তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
> দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া। (জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃঃ ৪)

এর মধ্যে অদ্বৈতবাদের তিনটি মূল তত্ত্বই পাওয়া যায়। বিশ্বে আছেন একটি মাত্র সত্তা, তিনি হলেন আত্মা। তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তাঁর নাম নেই, রূপ নেই, তিনি জ্ঞাতারূপী। বহু ও নানা রূপে যাকে দেখি তা তাঁরই উপর আশ্রিত, কিন্তু তা মায়ার রচনা, তা স্বপ্নের মত অলীক।

এই কথাগুলিই তিনি সংক্ষেপে অন্যত্র এইভাবে বলেছেন।

অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাহার কখনও পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত হইতেছে।

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ৮৪)

এই আত্মা ব্রহ্মের প্রকৃতি যে চৈতন্যরূপ, তার সমর্থনে তিনি একটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন যে, আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে, যা জড় বস্তু তা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, একটি স্বতন্ত্র চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তুর সহিত সংযোগ স্থাপিত হলেই তা প্রকাশ হয়। সুতরাং যিনি স্বপ্রকাশ সেই ব্রহ্ম কখনো জড়ধর্মী হতে পারেন না। তিনি তাই বলেছেন,

স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ। জড় ভূত কখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না।

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ১৯৩)

মায়াবাদকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, বিশ্ব সত্যই যদি অবিমিশ্রভাবে একটি মাত্র সত্তা নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুর জগতের সব থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হল মায়াবাদ। তার জন্য তার গলায় তিনি বরমাল্য দিয়েছেন। এই সম্পর্কে তিনি মায়াবাদের যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তা এই,

কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল? আর উহার উত্তর—সর্বোত্তম উত্তর ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর মায়াবাদ; বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব কেবল আপাত প্রতীয়মান মাত্র।

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ, ৩১৮)

এই হল তাঁর দর্শনের জ্ঞানকাণ্ড। অপর পক্ষে কর্মকাণ্ডে দেখি একটি স্বতন্ত্র সুর। আপাতদৃষ্টিতে যিনি ত্যাগী, যিনি সন্ন্যাসী, সংসারের মানুষের ব্যাপারে তাঁর কোনো রকম মনঃসংযোগ আশা করা যায় না। বিশেষ ক'রে যিনি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, যাঁর উপলব্ধিতে বহু ও নানার বিচিত্র জগৎ স্বপ্নের মত অলীক, তিনি যে সাধারণ মানুষের দুঃখমোচনের ভার নেবার প্রেরণা পাবেন তা ভাবা আরও দুষ্কর।

কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শনে এই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এ যেন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা কেমন ক'রে ঘটল সেইটিই ভাববার কথা। যাকে স্বপ্নবৎ প্রপঞ্চ বলে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাকে কী যুক্তি প্রয়োগ ক'রে কল্যাণকর্মের ক্ষেত্র হিসাবে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তবে মনে হয়, তাঁর মনে বুদ্ধি-শক্তি যেমন প্রবল ছিল অনুভূতি-শক্তিও তেমন গভীর ছিল। তাই বুদ্ধি-শক্তির আলোকে যাকে মায়া বলে গ্রহণ করেছেন তাকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুভূতিশক্তির প্রেরণায় তারই জন্য তাঁর হৃদয়ে করুণা প্রবাহিত হয়েছে এবং তাই কর্মকাণ্ডে সমাজসেবার এক উচ্চ আদর্শ তিনি স্থাপন ক'রে গেছেন। তিনি সত্যই একটা দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন।

দর্শনের ইতিহাসে এইরূপ দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার দোটানার দৃষ্টান্ত আরও একটি পাওয়া যায়। তা পাওয়া যায় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কান্টের চিন্তাধারার মধ্যে। তাঁর মনেও দুটি বিভিন্নধর্মী ভাবধারা সমানভাবে শক্তিমান ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদী। যুক্তির প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত পাবেন তাকে তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে তাঁর নীতিবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি না—এটি সেকালে একটি মূল দার্শনিক প্রশ্ন ছিল। তাঁর যুক্তিবাদী মন এবিষয় মীমাংসা করতে গিয়ে দেখল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে যতগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাদের কোনটিই টেঁকে না। তিনি তখন সিদ্ধান্ত করলেন এই যুক্তিগুলি অসার। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তখন ও-দিকে তাঁর নীতিবোধ এসে বাধা দিল। ঈশ্বর না থাকলে ন্যায়দণ্ডের ভার কে নেবেন! কাজেই এই নৈতিক যুক্তির দাবিতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার ক'রে নিলেন।

বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেও যেন অনুরূপ একটি দোটানার ইতিহাস আত্মবিকাশ লাভ করেছে। বহু বিভিন্ন মানুষ, তাদের দৈন্য, তাদের দুঃখ, তাদের কষ্ট—এ সবইত বিশ্বপ্রপঞ্চের অংশ। তাঁর যুক্তিবাদী মন বলবে তারা অলীক, তারা মায়ার রচনা। সুতরাং অকাট্য সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত যে তাদের সমস্যা নিয়ে জড়িত হয়ে পড়ার কোন অর্থ হয় না। স্বপ্নে যদি কোন দুঃখ বা দুর্দশা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, তা দূর করবার জন্য কি কেউ মাথা ঘামায়? কিন্তু বিবেকানন্দ তা পারলেন না। তাঁর হৃদয়ে ছিল করুণা। যুক্তির নিষেধকে অগ্রাহ্য ক'রে তিনি সংসারের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি প্রচার করলেন বিশ্বজনীন কল্যাণের ধর্ম।

এ সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি মোটামুটি প্রয়োগ করেছেন তা যেন এই প্রপঞ্চময় জগৎ ও ব্রহ্মের একত্বের উপর স্থাপিত। এই যে নানা জীব, এই যে নানা মানুষ, এরা সবই ত ঈশ্বরের প্রকাশ। সুতরাং সকলেই আমার আপন জন। সে ক্ষেত্রে তাদের সেবা করব না ত কার করব। এই ধরনের দু একটা যুক্তি যেন তাঁর মনে বল সঞ্চার করেছে।

তিনি এক জায়গায় বলেছেন,

"অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই সন্তান সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয়, তিনিই মন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে বর্তমান।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ, ২৬৩)

এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব আর ঠিক প্রপঞ্চময় মনে হয় না, বিশ্ব তখন বিশ্বসত্তার অভিব্যক্তি বলে প্রতিভাত হয়। ফলে অবিমিশ্র একবাদ হতে মন বহুকে জড়িয়ে নিয়ে এক সর্বব্যাপী সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। অবিমিশ্র অদ্বৈতবাদ হতে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ এসে পড়ে। তখন দার্শনিকের উপলব্ধিতে বিশ্বে যা কিছু দেখা যায় সবই ব্রহ্ম বলে অনুভূত হয়। এ সেই উপনিষদেরই বাণী, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এই পথে চিন্তা ক'রে বিবেকানন্দেরও সেই উপলব্ধি হয়েছিল। তিনি বলেছেন,

"যাহা কিছু দেখ, শুন, বা অনুভব কর, সবই তাঁর সৃষ্ট—ঠিক বলিতে গেলে তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয় প্রভু স্বয়ং।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ১৮৭)

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। ঈশ্বরকে কোথায় পাব, এই হল প্রশ্ন। তাঁর ত এক স্থানে কোথাও পৃথক আকারে প্রকাশ নেই। তাঁকে পেতে হলে যার মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান, সেই বিশ্বের মধ্যেই পেতে হবে। তার বাহিরে তাঁকে পাবার চেষ্টা করা বৃথা। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন,

"বেদান্ত বলেন এইরূপ কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকে, ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য—কারণ, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইব?"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ২৬৯)

ঈশ্বর সম্বন্ধে ওপরের মন্তব্য হতে দুটি নীতি পাওয়া যায়। প্রথম, ঈশ্বর সকল

বস্তুকে ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজমান এবং তাঁকে পেতে হলে তাদের মধ্যেই পেতে হবে, কারণ তাঁর ত বিশেষ প্রকাশ কোথাও নেই। এই পথেই তাঁর চিন্তাধারা আর একটু অগ্রসর হয়ে একটি নূতন নীতি উপলব্ধি করেছে দেখতে পাই, যা বলে যে, মানুষের নিকট মানুষরূপেই তিনি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে প্রকট। এটি সমর্থিত হবে তাঁর নিম্নে উদ্ধৃত উক্তি হতে,

"ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তিনি মানুষের ভিতরেই প্রকাশিত।"

(ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ ১২৯)

এখানে আমরা দেখি তাঁর চিন্তাধারা উপনিষদের একটি মূল ভাবধারা অনুসরণ করেছে। নীতির রাজ্যে একটি মূল সমস্যা হল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রতি ব্যক্তি নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে, কাজেই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণেই সচেষ্ট। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থের দ্বন্দ্ব নীতির ক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যা।

উপনিষদ এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছে একটি নূতন পথে। বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তির সংযুক্ত সাহায্যে উপনিষদ তার সমাধান খুঁজেছে। উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ধন চেয়েছে এবং হৃদয়বৃত্তির প্রসারের ভিত্তিতেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হল স্নেহ ও ভালবাসা। এই পথেই মানুষের স্বার্থবোধ পরিশোধিত হতে পরে। ঠিক কথা বলতে কি, মানুষ যে সর্বক্ষণই স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে, তা নয়। সাধারণ মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে স্বার্থত্যাগ করতে সক্ষম। প্রয়োজন হলে বন্ধুর জন্য বন্ধু আত্মত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যেখানে সন্তানের স্বার্থ জড়িত, সেখানে এমন ত্যাগ নেই যা মা করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরার্থবৃত্তি দুর্লভ নয়।

কেন এমন হয়? উপনিষদ বলেন, এই যে জায়ার নিকট পতি প্রিয় হয়, তা পতির কারণে নয়, এই যে মায়ের নিকট সন্তান প্রিয় হয়, তা সন্তানের কারণে নয়; তার কারণ, তাহাদের মধ্যে আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন বলে। "আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" আত্মার কারণেই এরা সকলে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, সাধারণ মানুষ—সকলকে ব্যাপ্ত ক'রে আত্মা বিরাজমান। সেই কারণেই মানুষের নিকট মানুষ প্রিয় হয়ে ওঠে। সর্ব-ব্রহ্মবাদের ভিত্তিই হল এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধি। তার ফলে আসে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতাবোধ এবং সেই ঘনিষ্ঠতাবোধ ভালবাসার বিস্তারকে সম্ভব করে। এই কারণে, উপনিষদের

ঋষি ঘনিষ্ঠতাবোধের ভিত্তিতে আত্মীয়তাবোধের উদ্রেক এবং আত্মীয়তাবোধের ভিত্তিতে স্বার্থে সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের বাণীতেও অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি পাই। তিনি এক জায়গায় বলেছেন,

"ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায় এই 'স্ব'-এর, এই 'অহং'-এর ক্রমশ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক অহং একটা লোক বিবাহিত হইলে দুইটা হইল, ছেলে পুলে হইলে অনেকগুলি হইল—এইরূপে তাহার অহং-এর বিস্তৃতি হইতে থাকে, অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া সার্বজনীন প্রেম অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর এই প্রেমই ঈশ্বর।"

(ভক্তিরহস্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ ১৪৭)

এইভাবে ঘনিষ্ঠতাবোধহেতু প্রীতির বিস্তার ঘটলে সার্বজনীন কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করবার প্রবৃত্তি আপনি আসে। বিবেকানন্দের সমাজকল্যাণের প্রেরণা এই পথেই এসেছিল। তাঁর মনে যুগপৎ জ্ঞাননিষ্ঠা ও করুণার একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। প্রথম কারণে তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর দ্বিতীয় কারণে ভগবান বুদ্ধের করুণা তাঁকে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছিল। সুতরাং যখন তিনি উপলব্ধি করলেন, বিশ্বের মধ্যেই পরমসত্তা বিরাজমান এবং মানুষের রূপে তাঁর প্রকাশ মানুষের নিকট ঘনিষ্ঠতম, তখন তাঁর হৃদয়ে নিরুদ্ধ প্রীতির উৎস মুক্তি পেল। তাইত তিনি ভক্তদের বললেন, ভগবান বুদ্ধ যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথে যাও, বিশ্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ কর। তিনি তাই বলেছেন,

"আমি সেই গৌতম বুদ্ধের মত চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি এই সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তা ছিল।"

(জ্ঞানযোগ, সপ্তদশ সংস্করণ, পৃ ১০৪)

এই ভাবে আমরা দেখি বিবেকানন্দের দর্শনের মধ্যে সত্যই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অদ্বৈতবাদের অবিমিশ্র একত্বকে আশ্রয় ক'রে সর্বজনে প্রীতি ও সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগের একটি আদর্শ গড়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ নিজেই তাকে 'মণিকাঞ্চন যোগ' বলে অভিহিত করেছেন। একরকম মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে বৈকি। অবিমিশ্র অদ্বৈতবাদে যিনি দীক্ষিত তাঁর ত স্বার্থবোধ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার পর সার্বজনীন কল্যাণে আত্মনিয়োগ ত তাঁর পক্ষে সহজ কর্তব্য।

আমাদেরই দেশে আমাদেরই কালে আর এক মনীষীর চিন্তাধারার মধ্যে

অনুরূপ একটি সার্বজনীন কল্যাণের আদর্শ ফুটে উঠেছিল। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরম সত্তাকে বিশ্লিষ্ট আকারে কোথাও পাওয়া যায় না, কারণ তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তিনি তাই তাঁকে অরূপরতন বলেছেন, অন্ধকার ঘরের রাজা বলেছেন। অথচ তাকে নিকটে পাবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা, তাঁর কাছে সেবা নিবেদনের জন্য আকুতি যে মনে রয়ে যায়। তার তৃপ্তি কোন পথে?

তিনিও বিবেকানন্দের মতই বলেছিলেন যে, বিশ্বের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, সন্তানের কাছে নারীর মাতৃরূপ যেমন ঘনিষ্ঠতম, তেমন মানুষের নিকট পরমসত্তার মানুষরূপটি ঘনিষ্ঠতম। সুতরাং তাকে সেবা করতে হবে সার্বজনীন কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়ে। তিনি তাই বলেছেন,

"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃ সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর ও অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি।"

(রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম)

তাই তিনি বলেছেন, দেবতার সঙ্গে তাঁর মিলন বনে নয়, বিজনে নয়, আপন মনে নয়, মন্দিরে নয়, মিলন বিশ্বমানবের মধ্য দিয়ে এবং বিশ্বজনীন কর্মের মধ্য দিয়ে। উভয় মনীষীরই আদর্শ এইভাবে পরিণামে একই হয়ে দাঁড়ায়।

স্বামীজীর শিক্ষাতত্ত্ব

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

"মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশসাধনই শিক্ষা"—স্বামী বিবেকানন্দ যখন এই কথার দ্বারা শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন, তখন অজ্ঞাতসারে তিনি পরবর্তী যুগের শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষণকেন্দ্রের পরিচালকদের মনে একটি চিত্তাকর্ষক বিতর্কিকার উদ্বোধন করেন।

স্বামীজী ইউরো-আমেরিকার বহু নগরে শিক্ষাব্যবস্থা দেখেন।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্বামীজীর সময়ে ছিল সম্পূর্ণ নেতিমূলক, নৈরাশ্যবাদী, কেন না এ-শিক্ষা মানুষগঠনের উপযোগী ছিল না। ভারতের ঐতিহ্যের প্রধান উপাদানগুলি থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে ইতিমূলক, উৎসাহপ্রদ কোন শিক্ষাপদ্ধতি ভারতীয়দের কাছে দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীর চিন্তাশীলতা ব্যাহত হয়, তার চরিত্র পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না। শুধু কতকগুলি তথ্য তাকে আয়ত্ত করতে বলা হয়।

স্বামীজী এরকম শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা বোঝাবার জন্য বলেছেন—"শিক্ষা বলিতে যদি সংবাদসংগ্রহ বুঝাইত তাহা হইলে গ্রন্থাগারগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ মুনি এবং অভিধানসমূহ প্রধান ঋষি বলিয়া গণ্য হইত।"[১]

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি প্রধান ত্রুটি হল এই যে, এই শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার্থীকে সব সময় উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যমে চাকুরীজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখতে বাধ্য করে। ফলে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর যোগসূত্র স্থাপিত হয় বৃত্তির বা জীবিকার মাধ্যমে, মননের বা ঐতিহ্যের মাধ্যমে নয়।

আদর্শ শিক্ষাতত্ত্ব এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে জীবনসংগ্রামে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, এমন কি পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সিংহতুল্য বীর সৈনিক তৈরী করতে পারে। "আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে।

১ শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ পৃঃ ৩; কলিকাতার রায় চৌধুরী এণ্ড্ কোং কর্তৃক ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। এ গ্রন্থখানি মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী টি, এস্, অবিনাশীলিঙ্গম্ "Education" নামে যে বই লেখেন, তারই বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থখানি স্বামীজীর গ্রন্থাবলী থেকে শিক্ষাসম্বন্ধে উক্তিগুলিকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করেছে। এই ইংরাজী বইখানি মাদ্রাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ থেকে প্রকাশিত।

বিদেশীয় শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে স্বদেশীয় সংস্কৃতির সকল শাখা আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, এবং তৎসঙ্গে ইংরাজী ভাষা এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষাও আবশ্যক। আমরা চাই শিল্পশিক্ষা এবং তদনুকূল শিক্ষা যাহার দ্বারা স্বদেশী শিল্প সমৃদ্ধ হয়। শিল্পশিক্ষা পাইলে লোকে চাকুরীর জন্য এত ছুটাছুটি করিবে না এবং অন্য উপায়ে যাহা উপার্জন করিবে তাহার দ্বারা স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিয়াও অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে।······আমাদের দেশের এখন আবশ্যক লোহার মত শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের মত বলশালী স্নায়ু এবং দুর্দমনীয় বিপুল ইচ্ছাশক্তি। এমন ইচ্ছাশক্তি······যাহা বিশ্বের সকল রহস্য এবং গোপনীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া মৃত্যু বরণ করিতেও প্রস্তুত।"[২]

স্বামীজী ছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। তাঁর মতে, মানুষের জ্ঞানরাশি তার অফুরন্ত মনেরই বহিঃপ্রকাশ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ "আবিষ্কার" করার অর্থ তাঁর মনের মধ্যে সুপ্ত একটা উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ—আগে থেকেই তাঁর মনে নিবদ্ধ চিন্তারাশিকে নিউটন শুধু সূত্রে গ্রথিত ও সুসজ্জিত করলেন। প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য মানুষের মনের মধ্যে যে জ্ঞান "প্রস্তরখণ্ডে সুপ্ত অগ্নির ন্যায়" অনাবিষ্কৃত বা আবৃত আছে, সেই জ্ঞানকে নিরাবৃত করতে সাহায্য করা। তাই শিক্ষা যেন মানবাত্মার এক রকমের মুক্তি, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে তমসা থেকে জ্যোতির মধ্যে সমুজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ। তাই বলা যায়, যে "অসাধারণ অপরিমেয় প্রতিভা কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া অণুবৎ জীবকোষে নিহিত থাকে", সেই প্রতিভার সুচারু প্রকাশই শিক্ষা। "মানুষের অন্তঃস্বরূপটি জ্ঞানময়। ইহার উদ্বোধন আবশ্যক। উহাই শিক্ষকের কার্য।"[৩]

বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সুগঠিত হয় না। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত চারাগাছের উদাহরণটির উল্লেখ করেন—শিক্ষার্থী ছোট্ ছোট শিশু, এক একটি চারাগাছের মত। তাদের নিজের নিজের স্বাভাবিক বিকাশে শিক্ষা শুধু সাহায্য করবে, যেমন চারাগাছ বেড়ে ওঠে মাঝে মাঝে একটু মাটি আলগা করে দিলে, বেড়া দিয়ে অঙ্কুরটিকে রক্ষা করলে, দরকার মত গাছটি জলসিক্ত করলে। শিক্ষার্থীদের বেশী শাসন, বা তারা "বোকা", তাই তাদের কিছু হবে না—এরকম ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটি-আস্ফালনের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ নেতিমূলক। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক মননসমৃদ্ধির পথে কেবল হিমালয় সৃষ্টি করে, সিংহশিশু অবশেষে শৃগালে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্তরূপে

২ ঐ—পৃঃ ৪—৫ ৩ ঐ—পৃঃ ৯

স্বামীজীর আদেশ—"যে যে স্থানে দণ্ডায়মান তাহাকে সেই স্থান হইতে অগ্রে ঠেলিয়া দাও।……তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কাহারও কোন ভাব নষ্ট করিতেন না। পতিত অধমকেও তিনি আশা ও উৎসাহ প্রদানে উন্নত করিতেন।"[৪] শিক্ষার অর্থ শিক্ষার্থী নিজের আভ্যন্তরীণ মানসিক ভাবগুলিকে বহির্গত ও জনসেবায় ব্যবহৃত করতে পারছে। "স্বাধীনতাই শিক্ষার প্রথম সোপান"—স্বামীজীর এই উক্তিটির তাৎপর্য অন্য কোনও পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করা যায় না।

মনকে একাগ্র করতে পারাই শিক্ষার্থীর প্রধান লক্ষ্য। তাই শিক্ষাদানের ও শিক্ষাগ্রহণের একমাত্র পদ্ধতি হল যথাক্রমে মনকে একাগ্র করতে শেখানো ও শেখা, ঠিক যতটা একাগ্রতা লাগে ধনার্জনে, ঈশ্বরোপাসনায়। এই একাগ্রতা-শক্তির পার্থক্যই মানুষে, পশুতে এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শক্তির বিভিন্নতার প্রধান কারণ। "জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবিকাঠি হইল একাগ্রতাশক্তি।"[৫] শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের এইখানে গভীর সম্পর্ক। কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধতার অনুশীলনই ব্রহ্মচর্য। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারী এইভাবেই একাগ্রতা লাভ করেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সংযোগস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন স্বামীজী। প্রাচীন ভারতের শিক্ষানুষ্ঠানে গুরুগৃহবাসের ব্যবস্থাটি এই জন্য তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। ঘনিষ্ঠ শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মুল কথা ছিল উভয়পক্ষেরই কয়েকটি বাধ্যতামুলক নীতি অবলম্বন—ছাত্রের পক্ষে, পবিত্রতা, জ্ঞানতৃষ্ণা ও অধ্যবসায়ের অনুশীলন। শিক্ষকের পক্ষে, অযথা বাগাড়ম্বর ত্যাগ, অপাপবিদ্ধতা, চিত্তশুদ্ধি, অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষার বদলে প্রেমপরায়ণতা। গুরুকে অসীম ভক্তি করা ছাত্রের যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি তার দায়িত্ব স্বাধীন চিন্তা করার।

স্বামীজী যে ধর্মশিক্ষা সমর্থন করছেন, সেই ধর্মশিক্ষার আদর্শ হল ঔদার্য ও পরধর্মসহিষ্ণুতার অনুশীলন। এই বিষয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য। তিনি বলছেন—"আমি আমার গুরুর নিকট হইতে এই অপূর্ব সত্য শিখিয়াছি যে, জগতের ধর্মগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ মতাবলম্বী নহে। এক অনন্ত ধর্মের সেগুলি বিভিন্ন স্তরমাত্র।"[৬]

ভারতীয় নারীদের চরম দুরবস্থা দেখে স্বামীজী নারীশিক্ষা সম্বন্ধেও চিন্তা করতে সুরু করেন। এদেশের স্মৃতিগ্রন্থাদির তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, ভারতীয় পুরুষগণ নারীদের কঠোর অনুশাসনে আবদ্ধ করে তাদের শুধু সন্তানোৎপাদনযন্ত্রে পরিণত করেছে। পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির উন্নতির প্রধান

---

৪ ঐ—পৃঃ ১০ ৫ ঐ—পৃঃ ১৩

৬ ঐ—পৃঃ ৩৬

কারণ, তারা নারীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে পেরেছে। "যে জাতি এবং যে দেশ নারীর সম্মান করে না তাহারা কখনও মহৎ হইতে পারে না, ভবিষ্যতেও কখনো পারিবে না।"[৭] মনুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে স্বামীজী বলছেন, "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"[৮] অর্থাৎ পুত্রদের যতটা যত্নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কন্যাদেরও ততটা যত্ন নিয়ে শিক্ষিত করে তোলা উচিত।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, "ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।" ধর্মশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের মাধ্যমেই নারীগণ সতীত্বধর্মের মূল অর্থ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারবে। "ভারতীয় নারীজীবনের নির্মল পরিপূর্ণাঙ্গ আদর্শমালা ঐ এক সীতার জীবন হইতেই উন্মেষিত হইয়াছে।"[৯] সীতা চরিত্র পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, পাতিব্রত্য, সেবা ও ত্যাগের রূপক। তাই স্বামীজীর মতে সীতাচরিত্র ভারতীয়, শুধু ভারতীয় কেন, পৃথিবীর সব দেশের, নারীদের প্রবুদ্ধ করে তোলবার মত চরিত্র।

স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই স্বামীজী মনে করতেন বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বা পুরুষের বহুবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নারীদের এ সম্পর্কে মতামত না জেনে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা অন্যায়। নারীদের স্বাধীন মতামতের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাই স্ত্রীশিক্ষা প্রসার অত্যন্ত দরকার।[১০]

স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্যা নিবেদিতা আদর্শ ভারতীয় নারী সম্পর্কে স্বামীজীর মতামত খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—"ভারতীয় কৃষ্টির, ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলকথা পারিবারিক শুচিতা ও মাধুর্য। স্ত্রী সহধর্মিণী, মাতৃত্ব—উৎকর্ষের চরম শিখর ("Wifehood is a religion, motherhood a dream of perfection")। ......প্রাচ্য নারী নিজের চরিত্রকে এই আদর্শের অনুগামী করে তুলছে, যাতে সে আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যে সুসমৃদ্ধ সুনাগরিকরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।"[১১] স্বামীজী তাঁর ধ্যানদৃষ্টির মধ্য দিয়ে বুঝেছিলেন, সুনাগরিক গড়ে তুলতে গেলে চাই সুমাতা। সেজন্যই তিনি নারীর কল্যাণময় নেত্রীত্বে পরিচালিত শুভ্র, শুচি পারিবারিক জীবনকেই রাষ্ট্রিক বা সামাজিক জীবনের প্রধান অবলম্বন বলে

---

৭ ঐ—পৃঃ ৩৯ ৮ ঐ—পৃঃ ৩৯ ৯ ঐ—পৃঃ ৪১

১০ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ১৩০, ১৩১, ১৯৪

১১ ভগিনী নিবেদিতা—"The Present Position of Woman"—a paper contributed to the first Universal Races Congress, 1911.

মেনে নিয়েছিলেন। শিশু এই পরিবারের অঙ্গীভূত হয়ে ছেলেবেলা থেকে মায়ের আদর্শে ও নেত্রীত্বে সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠুক—তিনি এটাই কামনা করেছিলেন।

ভারতের অগণিত অশিক্ষিত নারীর দুর্দশায় যেমন স্বামীজী ব্যথিত হন, তেমনি তিনি ব্যথিত হন কোটি কোটি অনাহারী, অজ্ঞ ভারতবাসীর কষ্টে। তিনি বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত কোটি কোটি মানব অনাহারে ও অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবনযাপন করিবে ততদিন দেশের প্রত্যেক লোককে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব।"[১২] সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য স্বামীজী বুঝেছিলেন, "ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। ......আমাদের পুঁথিপত্রও মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের অধিকারে রক্ষিত।"[১৩] দেশের এই সঙ্কীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বামীজী বিস্তৃত জনশিক্ষায় পরিবর্তিত করতে চান—"এক কথায় আমি উহাদিগকে (পুঁথিপত্র প্রভৃতিকে) সর্ব্বজনাধিগম্য করাইতে চাই। আমি এই সকল ভাবধারাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চাই; উহা সাধারণ সম্পত্তি হউক; সংস্কৃত জানুক বা নাই জানুক ভারতের প্রত্যেকটি লোকের উহা সাধারণ সম্পত্তি হউক।"[১৪] ভারতের পুরোহিততান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা'র ওপর এর চেয়ে প্রবল কুঠারাঘাত আর কল্পনা করা যায় না।

স্বামীজী জানতেন যে, "দারিদ্র্যই ভারতের সর্ববিধ দুর্গতির মূল নিদান।" কিন্তু তাঁর মত কুশলী সংগঠক এজন্য বিন্দুমাত্রও নিরুৎসাহ হননি। তিনি নির্দেশ দিলেন—

"দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষার জন্য না আসে শিক্ষাকে তাহাদের কাছে যাইতে হইবে।...... আমাদের দেশে সহস্র সহস্র একনিষ্ঠ আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী আছেন। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে যদি লৌকিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্বারে দ্বারে যাইয়া কেবল ধর্মপ্রচার করিবেন না, ব্যবহারিক বিষয়েও শিক্ষা দিবেন। ধরুন, দুইজন সন্ধ্যার দিকে ক্যামেরা, ভূ-গোলক ও অন্যান্য মানচিত্র লইয়া গ্রামে গেলেন। তাঁহারা সাধারণ লোকদিগকে প্রভূত পরিমাণে জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল শিক্ষা দিতে পারেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনী বর্ণনা করিয়া দরিদ্রগণকে তাঁহারা মুখে মুখে শতগুণ অধিক সংবাদ পরিবেশন করিতে পারিবেন। সারা জীবন ধরিয়া বই পড়িলে যে জ্ঞান জন্মিবে, এইভাবে সে জ্ঞান আরও অধিক আয়ত্ত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে—তাহাদের জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে। এইভাবে তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইহার সহিত ধর্মের গভীর সত্যগুলিও শিক্ষা দাও। জীবনযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্মেষের সুযোগ হয় নাই। এতদিন তাহারা কলের মত কাজ করিয়াছে এবং চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের শ্রমের সারাংশ অধিকার করিয়াছে। কিন্তু কালের পরিবর্তন

১২ ঐ—পৃঃ ৪৪ ১৩ ঐ—পৃঃ ৪৪, ৪৫ ১৪ ঐ—পৃঃ ৪৫, ৪৬

হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ক্রমশঃ এ বিষয়ে সচেতন হইতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ করিতেছে।"[১৫]

লোকশিক্ষায় ভারতের পৌরাণিক তত্ত্ব ও তথ্যগুলির গুরুত্ব স্বামীজী ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ভারতের নবজাগৃতির গুরু রাজা রামমোহন পৌরাণিক আদর্শের মধ্যে ধর্মকলহকেই বড় করে দেখেছেন। তাই তিনি ভারতের পৌরাণিক আদর্শগুলির মধ্যে অনুশীলনীয় কোন ভাবগত ঐক্য খুঁজে পান নি। অক্ষয়কুমার দত্তও রামমোহন পন্থী ছিলেন।[১৬] ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কিন্তু ভারতীয় পৌরাণিক যুগের উন্নত রূপকব্যাখ্যা প্রচার করেন। এই ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি ও বিচার গভীরতর অধ্যাত্ম উপলব্ধির ফল। লোক-চরিত্রের বৈচিত্র্যের ওপরেও তাঁর দৃষ্টি খুব প্রখর। তাই তিনি বলেছেন, "পুরাণ সাধারণ মানুষের ধারণার অধিকতর উপযোগী। পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন বা নাই করুন আপনাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই যাঁহার জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐ সকল প্রসিদ্ধ পৌরাণিক মহাত্মাগণের উপাখ্যান-প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।"[১৭]

রম্যাঁ রোলাঁ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে সার্থকভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।[১৮] সক্রেটিসের মত[১৯] স্বামীজী বলছেন, "মানুষ গড়িতে পারে, এমন তত্ত্ব আমরা চাই। এখানেই সত্যের পরীক্ষা—যাহাই তোমাকে দেহে, মনে ও আত্মায় দুর্বল করিবে—তাহাই বিষবৎ পরিত্যাগ করো। সত্য শক্তি দেয়। সত্যই শুদ্ধি। সত্য সর্বজ্ঞান।……সত্য শক্তি দিবে, জ্ঞান দিবে, প্রাণ দিবে। যে সকল অতীন্দ্রিয়বাদ মানুষকে দুর্বল করে, তাহা ত্যাগ করো। শক্তিমান হও।…পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ সত্যই সরল, সহজ,—তোমার নিজের অস্তিত্বের মতই সরল, সহজ।"[২০] স্বামীজীর এই আদর্শ গ্রীক যুগের ব্যক্তির চরম আত্মবিকাশের আদর্শের (Eudaemonism বা perfectionism) সমতুল্য।

রলাঁ ঠিকই ধরেছেন—"চারিপ্রকার যোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের আদর্শই

---

১৫ ঐ—পৃঃ ৪৯—৫০ ; স্বামীজী এইভাবে পরোক্ষে সাম্যবাদী মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন।

১৬ অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়।

১৭ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ৪৫।

১৮ র‍ম্যাঁ রোলাঁ—বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী, অনুবাদক ঋষি দাস।

১৯ সক্রেটিসের মত ছিল সত্যের সার্বভৌমত্ব ('Sovereignty of true knowledge') স্বীকার করা।

২০ রলাঁ—পৃঃ ১০৮ ; স্বামীজীর "আমার অভিযানের পরিকল্পনা" শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত।

বিবেকানন্দ প্রচার করেন।...বিবেকানন্দ চারঘোড়ার গাড়ীর মতো প্রেম, কর্ম, জ্ঞান ও শক্তি—সত্যের এই চারিটি পথের লাগাম ধরিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে একই সঙ্গে চালাইয়া লইয়া ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।"[২১] আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শনের এই সমন্বয় (synthesis) সাধনা রামমোহনের প্রভাবে প্রভাবিত। রামমোহনের মতই স্বামীজী শিক্ষার ক্ষেত্রে, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে, শাস্ত্র ও যুক্তির এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয়ের সন্ধান দেন।[২২] আবার, নিবেদিতার মতে, সমন্বয়ের প্রতি স্বামীজীর নিষ্ঠা তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবেরই মন্ত্রের বলে।[২৩]

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শক্তিবাদের তুটি প্রধান উৎস—উপনিষদের শক্তিবাদ, বাঙ্গলার শাক্ত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা এবং সাধনা। উপনিষদের ভক্তরূপে বারবার স্বামীজী শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান এই মহাবাণী—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। "ওঠো, জাগো" এই বীজমন্ত্রটির ঘোষক স্বামীজী রল্যাঁকে বিখ্যাত শিল্পী রেমব্রাণ্টের আঁকা দণ্ডায়মান খৃষ্টের মহানির্দেশে মৃত লাজারাসের পুনরুত্থানের চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেন।[২৪] রল্যাঁ আবার উপনিষদভক্ত স্বামীজীর বিশ্বপ্রেম ও জাগতিক মহানন্দের মেলায় বিশ্বস্রষ্টার সৌন্দর্যের পূজারীরূপে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার আগ্রহ দেখে অভিভূত হন বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়। তাঁর মতে এই দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যেন অমর জার্মান সুরকার বেঠোফেন ও জার্মান সাহিত্যিক শীল্যার-এর জীবনকথা স্মরণ করিয়ে দেন।[২৫]

শিক্ষাদর্শের সংস্কারের দ্বারা স্বামীজী ভারতবাসীদের শক্তিমান করার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৬] শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এই যে কঠোর তপশ্চর্যার কথা শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান, সেটা প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টার শিক্ষানীতির কথা মনে এনে দেয়, কারণ, স্পার্টার শিক্ষার্থীদের একাগ্র, অবিচলচিত্ত, দৃঢ়, সংযমী ও ধৈর্যশীল হতে শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু স্পার্টার কঠোর শিক্ষানীতি থেকে স্বামীজীর শক্তিবাদী শিক্ষানীতির প্রভেদ আকাশপাতাল। রল্যাঁ বলেছেন, স্বামীজী ব্যক্তিমনের বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

২১। ঐ—পৃঃ ২০৯

২২। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী,

২৩। নিবেদিতা—*The Master as I saw him*, পৃঃ ৭৩

২৪। রল্যাঁ—বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী,

২৫। ঐ—পৃঃ ১—২, ১৮২, বেঠোফেন তাঁর ৯ম সুরসংহতি (সিমফনি) শীলারের রচিত "আনন্দ বন্দনা" মিলিয়ে শেষ করেছেন।

২৬। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ৯৩

"তিনি বাংলাদেশে ভক্তির নিন্দা করেন, আবার যোদ্ধার দেশ পাঞ্জাবে গিয়া ভক্তির প্রশস্তি গাহেন। কলিকাতায় তিনি সঙ্কীর্তন ও নাচগানের শোভাযাত্রাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলেও লাহোরে তিনি সেগুলির প্রবর্তন করিতে চান। কারণ, "এই পঞ্চনদীর দেশ আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে ছিল বিশুষ্ক, সেখানে প্রয়োজন ছিল সিঞ্চন।"[২৭] স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মননশীলতায় সমৃদ্ধ; স্পার্টার মত বা আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধপ্রিয়, স্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট্ রাষ্ট্রের মত একতরফা, ছাঁচে-ঢালা, রাজনৈতিক, সামরিক তাগিদে গড়া কলের পুতুল তৈরী করা তাঁর কল্যাণকামী, উদার ভাবাদর্শের পরিপন্থী। স্বামীজী চান, কলিকাতার সংস্কৃতি পাঞ্জাবী সংস্কৃতির গুণগুলি নিয়ে ধনী হয়ে উঠুক, যেমন হয়ে উঠুক পাঞ্জাবী সংস্কৃতি কলিকাতার সংস্কৃতির গুণরাশি নিয়ে। এইভাবেই চলে সংস্কৃতির মিতালি, শান্তি, প্রেম, মৈত্রীর মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির সঙ্গে মিলন হয় ব্যক্তির, মননের সঙ্গে মননের। রল্ঁ্যা তাই স্বামীজী সম্পর্কে বলছেন, "তিনি সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের সত্যকার প্রসার করিয়া, ভারতীয়দের মনে পশ্চিমী চিন্তাধারাকে প্রবেশ করাইয়া, এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে কেবল ডিগ্রীধারী ও রাজকর্মচারীর দল না গড়িয়া মানুষ গড়িতে পারে, সেভাবে সেগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া হিন্দু চিন্তাকে পুনর্গঠিত করিবার কাজ করিতে থাকেন।"[২৮] স্বামীজী সমন্বয়প্রয়াসী শিক্ষাবিদ্। এই সমন্বয়ের প্রেরণা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রেরণা।

কর্মযোগের আদর্শ ই স্বামীজীকে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মৌলিকভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল আবার সেই চিন্তাধারাকে ফলিত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বামীজীর আমেরিকান ভক্ত শ্রীমতী কোন্গার লিখেছেন যে, আমেরিকায় তাঁর দিদিমার কাছে আতিথ্য গ্রহণ করে স্বামীজী একবার গভীর আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ করেন যে, আমেরিকার জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার ("Organization") প্রচেষ্টা তাঁকে চমৎকৃত করেছিল।[২৯] চারু ও কারু-শিল্পশিক্ষা, ব্যায়ামশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, ঐতিহ্যশিক্ষা, নীতিশিক্ষা—সংক্ষেপে সামগ্রিক শিক্ষানীতি সম্পর্কে স্বামীজীর যে প্রস্তাব তাঁর নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত হয়, রল্ঁ্যা সেই প্রস্তাবের সংক্ষিপ্তসারের কথা উল্লেখ করে তার উৎকর্ষ বিচারের ভার জনসাধারণের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।[৩০]

২৭। রল্ঁ্যা—বিবেকানন্দের জীবনী ও বিশ্ববাণী
২৮। ঐ—পৃঃ ১৩০
২৯। **Marie Louise Burke—*Swami Vivekananda in America.*** পৃঃ ৯৫
৩০। রল্ঁ্যা—বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় পর্যটনরত স্বামীজীর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে সেখানকার একটি সংবাদপত্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিল যে, স্বামীজীর আমেরিকা ভ্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল জনশিক্ষাবিস্তারের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষাদান সম্পর্কে তাদের সুযোগ্য করে গড়ে তোলার কাজে ভারতে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ। ৩১

শিক্ষাসম্বন্ধে স্বামীজী যে তত্ত্ব ও তথ্যের ভাণ্ডার ভবিষ্যতের জন্য রেখে গেছেন, সেগুলি শুধু ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্যই যে প্রয়োজনীয় তা নয়। স্বামীজী বিশ্বের সব মানুষের মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের সন্ধান পেয়েছিলেন। কোন বিশেষ দেশের মানুষের মধ্যে নয়, সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষের মধ্যে এই ব্রহ্মত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধনই ছিল স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের মূল লক্ষ্য। এইজন্যই নিবেদিতা জানিয়েছেন যে, "জাতি" কথাটির ওপর স্বামীজীর একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। ৩২ শিক্ষাকে জাতিগঠনের মাধ্যমরূপে না চিন্তা করে তিনি মানুষগঠনের উপকরণ হিসাবে গণ্য করেছেন। সমন্বয়সাধনার পীঠস্থান পবিত্র আর্যাবর্তেই এই মানুষগঠনের সুমহান প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক—এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সচেতন, জৈবিক, ভাবগত ঐক্য গড়ে তুলতে। এই জন্যই তিনি শিক্ষাদর্শের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন ঐতিহ্যগত আদর্শের ধ্যান ও ধারণা, সমন্বয়প্রয়াসী, উদারপন্থী ধর্মশাস্ত্রালোচনা। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে রাধাকৃষ্ণন কমিশন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি সন্ধান করতে গিয়ে বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেরও ধর্মসম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কোন অর্থ হয় না ("to be secular is not to be religiously illiterate")। ৩৩ উন্নত ধর্মশিক্ষা যা স্বামীজী চেয়েছিলেন তার প্রধান লক্ষ্য হল তুলনামূলক পরধর্মসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচারশক্তি, যুক্তি, বুদ্ধি বাড়িয়ে তোলা। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের মতে উন্নত প্রণালীর ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করলে সামাজিক সংহতি, সাংস্কৃতিক ঐক্য ধ্বংস পায় এবং নীতিবোধ শিক্ষার্থীর চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়। আজকের জগতে যখন শিক্ষার বিনিময়ে ধন, ক্ষমতা ও সাফল্য ইত্যাদি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা শিক্ষার্থীর মনকে অত্যন্ত চঞ্চল, জড়বাদী করে তোলে, তখন স্বামীজীর উপদেশ অনুযায়ী অন্য নানা দিকে শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের

৩১। **Marie Louise Burke—*Swami Vivekananda in America*. পৃঃ ২৪৭**

৩২। প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা—***Sister Nivedita*, পৃঃ ৬৯**

৩৩। শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্ট, পৃঃ ১৬৯

ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের মনগুলিকে নিষ্কাম কর্মযোগীর শান্তি ও তৃপ্তিদানে ধন্য করে তুলবে নিশ্চয়ই।

স্বামীজী ছিলেন সহজ, স্বাভাবিক, ক্রমবিকাশের বা ক্রমোন্নতির প্রতি (evolution) আস্থাবান্। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের এই সার্বিক ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে ঘটতে পারে। এই প্রসঙ্গে নব্যতন্ত্রীদের উগ্র-সংস্কারপ্রিয়তা ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে নিন্দা করেন—"সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু-আধটু সংস্কার করিতে চান—আমি চাই আমূল সংস্কার। আমাদের প্রভেদ কেবল সংস্কার প্রণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা—আমার প্রণালী সংগঠন। আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি—আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"[৩৪] অর্থাৎ সেই শিক্ষাকে স্বামীজী আদর্শ শিক্ষা বলতে চান, যা অনুকরণ নয়, অর্জন।

মানুষের সমাজে যোগ্যতমের উর্দ্ধতনের মত জীবতাত্ত্বিক প্রগতির গুরুত্ব স্বীকার না করলেও স্বামীজী মানবিক বিবর্তনবাদী আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদের অনেক যুক্তি তর্ক এঁদের বহুপূর্বে উপলব্ধি করেন। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি সমাজের মধ্যে আদর্শ শ্রেণীসংহতি (optimum social harmony) স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, জাতিগত বা শ্রেণীগত বিভিন্নতার জন্য সমাজ দায়ী, ধর্ম দায়ী নয় ("In religion, there is no caste; caste is simply a social institution")।[৩৫] জাতিভেদপ্রথার বা অস্পৃশ্যতার জন্য উৎকট দেশাচারই দায়ী। ধর্মের বিকৃতি এই উগ্র দেশাচারের মারফৎ ঘটে থাকে। স্বামীজীর মতে, ভারতের জাতিভেদপ্রথার আদর্শ ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা (social status) দেওয়া এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে সর্বাধিক আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়ে সমাজে আদর্শ শ্রেণীসংহতি স্থাপন করা।[৩৬] শিক্ষার উজ্জল বর্তিকা কুসংস্কার ও বিষাক্ত দেশাচারের ঘনতমসা দূর করতে পারে,—এ বিষয়ে স্বামীজী সম্পূর্ণ দৃঢ়চিত্ত ছিলেন।[৩৭] স্বাধীন ভারতের প্রধান সংগঠক শ্রীনেহেরুও স্বামীজীর এই মত মেনে নিয়েছেন। নেহেরুর মতে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাণবন্যা ধর্ম, তারই প্লাবনে ভারতের কোমল পলিমাটিতে নতুন

৩৪ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দী, পৃঃ ২৮—৩০।

৩৫ *The Complete works of Swami Vivekananda*, Vol. I, p. 20.

৩৬ স্বামীজীর "Caste, Culture and Socialism" পুস্তিকা (পৃঃ ৩৫) দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ সমাজতত্ত্ববিদ্ হবহাউসের (Hobhouse) সামাজিক সংহতির (Social harmony) মতটি তুলনীয়। হবহাউসের *Social Evolution and Political Theory* গ্রন্থের ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৭ *The Complete works of Swami Vivekananda*, Vol. 3, p. 173.

নতুন আদর্শের সমন্বয় ঘটেছে—যুগে যুগে। ভারত বারবার জীর্ণ বাস ত্যাগ করুক, কিন্তু সঙ্কটাপন্ন, সংশয়তাড়িত, সন্দেহে বহুধাবিভক্ত বর্তমান জগতে এই সনাতন ধর্মই তার চিরপুরাতন, চিরনবীন পরিচ্ছেদ।৩৮

আধুনিক অনেক শিক্ষাব্যবস্থায় (যেমন ভারত সরকারের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা) সমাজের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অগ্রাধিকার স্বীকার করা হয়। স্নাতকদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি দেওয়া ইত্যাদি নানারকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। বহু দিন পূর্বে স্বামীজী তাঁর ভাষণে এই কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে গেছেন—"যদি বংশগতভাবে পারিয়াদের অপেক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যে জ্ঞানলাভের প্রতি অধিকতর প্রবণতা থাকে, তবে ব্রাহ্মণদের শিক্ষার জন্য আর অর্থব্যয় করিও না। পারিয়াদের শিক্ষার জন্য সমস্তটুকু ব্যয় করো। দুর্বলকেই দাও, কারণ, দানে তাহার প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলে যদি বুদ্ধিমান হওয়া যায়, তবে বিনা সাহায্যেই ব্রাহ্মণ নিজেকে শিক্ষিত করুক।...আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য অন্যান্য সকল অর্থহীন দেবতাকেই আমাদের মন হইতে বিদায় দিতে হইবে।......যে বিরাট ভগবান্ আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছেন, তাঁহার পূজা না করিয়া আমরা কি অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটিব? আমাদের চতুর্দিকে যাঁহারা আছেন—সে বিরাটের পূজাই আমাদের প্রথম পূজা হইবে।...মানুষ ও প্রাণী, ইহারাই আমাদের দেবতা—সর্বপ্রথম আমরা যে যে দেবতাদের পূজা করিব, তাঁহারা হইলেন আমাদের স্বদেশবাসী।"৩৯ নিম্ন বর্ণের, শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের অনগ্রসর জনসমষ্টিকে অগ্রগামী জনসমষ্টির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য চাই সমাজের সুস্পষ্ট স্তরবিন্যাস; তারপর শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ভাবধারার আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে এক একটি সামাজিক স্তরকে অন্যান্য স্তরের সঙ্গে মেলাবার জন্য প্রত্যেকের মধ্যে গভীর একাত্মবোধের সঞ্চার করা প্রয়োজন—এরকম সামাজিক চলৎশক্তির (social mobility) মতবাদ আধুনিক মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ সোরোকিন (Sorokin), নর্থ্রপ্ (Northrop) এবং প্রখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক টইনবি (Toynbee) পোষণ করেন। স্বামীজীর মতের সঙ্গে এই আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক মতের কি পরিষ্কার মিল!৪০

৩৮। নেহরুর *The discovery of India* পৃঃ ৫৯৮; রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের *Religion and Society* গ্রন্থটিও এই মতের সমর্থক।

৩৯। স্বামীজীর "বেদান্তের আদর্শ" ও "ভারতের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক বক্তৃতাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৪০। Sorokin এর *Social and Cultural Dynamics* এবং *Social Philosophy in an Age of Crisis*", Toynbee র *Civilization on Trial* পুস্তিকা এবং Northrop-এর *Philosophial Anthropology and Practical Politics*" দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দঃ কবির্মনীষী

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কবিতা মানবহৃদয়ের গভীরতম বাণী। তবু বাণীর অতীতকে কতখানি আভাসিত করে, সেই তার সার্থকতার মাপকাঠি। উপনিষদ যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', যে উপলব্ধি সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'—চিরকাল কবিরাই তার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছেন।

আবার কবিমাত্রেই দেশে কালে বিচরণকারী। তাই সমকালীন জীবনধারা তাঁদের কাব্যে অল্পবিস্তর স্পর্শ রেখে যায়। এরই মধ্যে কোন কোন মহাপ্রাণ-হৃদয়ে দেশকাল ও সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে মানবজীবনের চিরন্তন সত্যোপলব্ধির প্রেরণাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। তাঁদের কবিতা বিশেষ যুগে রচিত হলেও, তাঁদের বাণী অনাদি অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যতে প্রসারিত।

আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ—এঁরা এই মানব-উপলব্ধির প্রান্তিক সীমার কবি। তাই দেশকালের বিশেষ চিহ্ন এঁদের কবিতায় অনুপস্থিত। অথচ যুগে যুগান্তে মানবমন এই কবির্মনীষীদের মন্ত্রবাণী অবলম্বন করে আপন উপলব্ধির শিখাটি জ্বালিয়ে তোলে।

নিজের ইংরেজী রচনাবলী সম্বন্ধে প্রিয়শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী বলেছিলেন—

"To put the Hindu ideas into English and make out of dry philosophy and intricate mythology, and queer startling psychology, a religion which shallbe easy, simple, popular, and at the same time meet the requirements of the highest minds is a task which only those can understand who have attempted it."

শুধু ইংরেজীতে রূপান্তরিত করাই নয়, অদ্বৈত বেদান্তকে প্রতিদিনের ব্যবহারের উপযোগী এবং কবিত্বময় করে তোলাও তাঁর লক্ষ্য—

"The abstract Advaita must become living poetic—in everyday life; and out of bewildering yogism. must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it. That is my life's work."

অদ্বৈতানুভূতির কাব্যরূপায়ণের আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকে।

শুধু মননের মহিমায় নয়, বাণীর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের অপরূপ সম্মেলনের উদাহরণরূপে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় ও কথোপকথনে বারংবার উপনিষদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করেছেন।

"আমাদের চোখের সামনে ভূমার ভাব ও ছবি তুলে ধরাই উপনিষদ-সমূহের উদ্দেশ্য। তবু এই অপূর্ব ভাবগাম্ভীর্যের আড়ালে মাঝে মাঝে কবিত্বের আভাস মেলে—যেমন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

এই অপূর্ব চরণদুটির হৃদয়স্পর্শী কবিত্ব শুনতে শুনতে আমরা যেন ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে, এমন কি মনের জগৎ থেকে দূরে অতিদূরে এমন এক জগতে উপনীত হই, যে জগৎ সবসময় আমাদের একান্ত কাছেই রয়েছে, অথচ যা কোনোকালেই আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয়।" [ভক্তি—জ্ঞানযোগ]

"উপনিষদের মত অপূর্ব কাব্য জগতে আর নেই। বেদের সংহিতাভাগেও লক্ষ্য করলে মাঝে মাঝে অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যের পরিচয় পাই। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ-সংহিতার 'নাসদীয়সূক্ত' অংশটি আলোচনা কর। এইখানেই প্রলয়ের গভীর অন্ধকার বর্ণনায় সেই শ্লোকটি আছে—'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে'—ইত্যাদি। "যখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল"—এ অংশটি পড়লেই অপূর্ব গাম্ভীর্যময় কবিত্বের অনুভূতি জাগে।" [সর্বাবয়ব বেদান্ত—জ্ঞানযোগ]

"প্রাচীন উপনিষদসমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এই সব উপনিষদস্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন মহাকবি। তোমাদের অবশ্যই প্লেটোর কথা মনে আছে, কবিত্বের মধ্য দিয়েও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হয়। কবিতার মধ্য দিয়ে মহত্তম সত্যোপলব্ধিরাশি জগৎকে দান করার জন্য বিধাতা উপনিষদের ঋষিদের সাধারণ মানব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে কবিরূপে সৃষ্টি করেছিলেন।"
[ব্রহ্ম ও জগৎ—জ্ঞানযোগ]

উপনিষদের কবিত্বপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ উপনিষদের ভাষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত করেছেন। সাধারণভাবে কবিতার ভাষা সম্বন্ধেও তাঁর এই মন্তব্য স্মরণীয়।

মানবমনের অনন্তানুভবকে ভাষায় রূপায়িত করার যে প্রয়াস উপনিষদে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও এ ধরনের উদাহরণ দুর্লভ নয়। "কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখবে, তারা বহিঃপ্রকৃতির মহান ভাবকে রূপদানের চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমার বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্ত্য-কবির কাব্য আলোচনা করা যাক—তাঁদের কাব্যে মাঝে মাঝে মহান ভাবব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোক দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু সর্বত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণন-চেষ্টা—বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা।"

এ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সৃষ্টিসূক্তের উদাহরণ দিয়েও স্বামীজী দেখিয়েছেন দেশ কালের বিশাল বিপুলতার অনুভবেই এ জাতীয় কবিত্বের সীমা। কিন্তু ভারতবর্ষের

ঋষিকবিরা বুঝেছিলেন—"এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরা যায় না।" তখনই উপনিষদের সৃষ্টি।

"উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, ওই ভাষা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয়রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ; কিন্তু মাঝপথে গিয়ে থেমে গেল। কেবল এক অতীন্দ্রিয় সত্তাকে উদ্দেশে দেখিয়ে দিল ; তবু সেই সত্তাসম্বন্ধে তোমার অসংশয় উপলব্ধি হল।"

কবিত্বের এই মহত্তম আদর্শের উদাহরণরূপে স্বামীজী 'ন তত্র সূর্যো ভাতি', 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া', প্রভৃতি কয়েকটি অমর শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন। স্বামীজীর মতে, জড়ের ভাষায় আত্মাকে কখনো ফুটিয়ে তোলা যায় না। সেকথাই উপনিষদের কবিরা অনুভব করেছিলেন—"যতো বচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" অথবা "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি"। কিন্তু 'বাক্যমনাতীত' বলে উপনিষদের কবিরা চেষ্টা ছাড়লেন না, বরং আপন গভীরে সমাহিত হয়ে পরম সত্যকে প্রকাশের নতুন বাণী আহরণ করে আনলেন। "জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার আর চেষ্টা রইল না।...আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় বর্ণিত হল যে, সেই শব্দগুলি উচ্চারণমাত্রেই এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অগ্রসর করে দেয়।"

[ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা—'ভারতে বিবেকানন্দ']

জন্মমরণের অতীত সত্যকে মানুষ একদা ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধির প্রকাশোপযোগী ভাষায় ধ্বনিত করেছিল। উপনিষদ সেই অতুলনীয় ভাষাসৃষ্টির উদাহরণ। বিবেকানন্দের কবিতার ভাব ও ভাষা—এ দুইই উপনিষদের প্রেরণাপুষ্ট।

স্বামীজীর একটি গানে উপনিষদের ভাব ও ভাষার আদর্শ সবচেয়ে সংহত গভীরতায় মূর্ত—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

নামরূপের জগৎ থেকে আপনাকে সংহরণ করে শুদ্ধমন কেমন করে অহংচৈতন্যের পারে ব্রহ্মস্বরূপে লীন হয়, তার আভাসটুকু এই সঙ্গীতের বাগেশ্রী-গম্ভীর ধ্বনিতরঙ্গে শ্রোতার হৃদয়ে ধ্যানস্পর্শ সঞ্চার করে।

আবার জ্ঞানসূর্যের বিকাশে ওই সৃষ্টিবিকল্প কেমন করে লীন হয়ে যায়, তার এক অপূর্ব চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে স্বামীজীর 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে। তুহিনমেরুর অগণিত তুষারপর্বতের উপর সূর্যোদয়ের উপমায় বিধৃত সে অধ্যাত্ম অনুভব—

মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি প্রকাশ !
উত্তর অয়নে বিবস্বান,
একীভূত সহস্র কিরণ,
কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্চ্ছিত ভাস্বর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খসে' পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।

অনুভবের সেই দিব্যমুহূর্তে কবিহৃদয়ে অনাহত বাণী ধ্বনিত। এ বাণী নিখিল মানবাত্মার উদ্দেশে ভারতবর্ষের অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ।

উপনিষদ-সাহিত্যের একটি মাত্র শব্দে বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন বিধৃত— 'অভীঃ'। নবজাগ্রত ভারতবাসীর হৃদয়ে এই অভীঃমন্ত্র সঞ্চারই ছিল তাঁর কর্মসাধনার মুল প্রেরণা। উপনিষদের ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর আর একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"উপনিষদের ভাব ও ভাষায় কোন জটিলতা নেই, প্রত্যেকটি কথাই তলোয়ারের ফলার মত, হাতুড়ির ঘায়ের মত সোজাসুজি হৃদয়ে আঘাত করে। সেসব কথার অর্থবোধে কিছু মাত্র ভুল হবার সম্ভাবনা নেই, সেই সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরেরই একটা জোর আছে, প্রত্যেকটি কথাই তার সম্পূর্ণ ভাবটি হৃদয়ে মুদ্রিত করে যায়।…যদি এই উপনিষদ মানুষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা এমন এক জাতির সাহিত্য, যে জাতি তার নিজস্ব তেজবীর্য একবিন্দুও হারায় নি।"

উপনিষদ থেকে বিবেকানন্দ একাধারে ধ্যান ও সংগ্রামের বাণী আহরণ করেছেন। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক প্রশান্তির ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টায় অন্তরের সুপ্তশক্তির মহাজাগরণের ক্ষেত্রেও স্বামীজী উপনিষদ থেকেই বাণী আহরণ

করেছিলেন। এ দিক থেকে বিশেষভাবে কঠোপনিষদের নচিকেতা ছিল তাঁর আদর্শ—"সেই অপূর্ব কঠোপনিষদ কাব্যের কথা মনে কর! কি অপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর এ কাব্য!…এর আরম্ভই অপূর্ব! সেই বালক নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব, যমালয়ে যাত্রার সঙ্কল্প, আর সেই 'আশ্চর্য' তত্ত্ববক্তা যম স্বয়ং তাকে জন্মমৃত্যুরহস্যের উপদেশদানরত! বালক নচিকেতা তাঁর কাছে কি জানতে চাইছে?—মৃত্যুরহস্য!"

[সর্বাবয়ব বেদান্ত—জ্ঞানযোগ]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সব চেয়ে বড়ো কথা আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীক জীবনসংগ্রামের প্রেরণা।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

—এই একটি শ্লোকে গীতার সমগ্র বাণী বিধৃত—এই ছিল তাঁর ধারণা। মানবাত্মার অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ কোন দুর্বলহৃদয় আপোষের কথা শুনতে পারতেন না।

এমন কি নেতিবাচক শব্দের প্রতি তাঁর অনীহার ফলে বেলুড় মঠের নিয়মাবলী প্রণয়নে কোন নেতিবাচক শব্দের স্থান দেওয়া হয়নি। বারংবার তিনি বলেছেন ও লিখেছেন—"যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ সে বদ্ধ হবে। দীনহীনভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা।…যে সর্বদা নিজেকে দুর্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান হবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নির্গচ্ছন্তি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'।" [পত্রাবলী]

এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাভাবিক প্রেরণায় উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি—'মেঘনাদবধ' শ্রেষ্ঠ কাব্য। "ঐ একটা অদ্ভুত genius তোদের দেশে জন্মেছিল। 'মেঘনাদবধে'র মত দ্বিতীয় কাব্য বাংলাভাষাতে ত নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।" "মাইকেলই বাংলাদেশে একটা বিশেষ কবি জন্মেছিল।"—এ ধরনের মন্তব্য তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত।

'মেঘনাদবধকাব্যে'র সপ্তম স্বর্গে শত্রুহননে স্থিরসঙ্কল্প রাবণ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। কারণ, " 'যা হবার হোক গে—আমার কর্তব্য আমি ভুলব না, এতে দুনিয়া থাক; আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য।"

উনিশ শতকের বাংলা কাব্যধারায় মধুসূদনের মহাকাব্যের যথার্থ মর্যাদাদানের মধ্যে স্বামীজীর সমুন্নত সাহিত্যরুচির যে পরিচয় পাই, তা কেবল বীররসের মহিমা-কীর্তনে মগ্ন ছিল না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জয়দেব ও ভারতচন্দ্রের শব্দঝঙ্কার

ও আদিরসাধিক্য ততটা সমর্থন না করলেও এঁদের কাব্যগুণের তিনি সমাদর করতেন। মুকুন্দরাম তাঁর মতে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

ইংরাজীসহিত্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কবি ছিলেন মিল্টন; তরুণ বয়সে 'প্যারা-ডাইস লস্টে'র শয়তান চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করত। গম্ভীর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে তাঁর মিল্টন-আবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন অনুজ মহেন্দ্রনাথ। শেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলীর তিনি অভিনিবিষ্ট পাঠক। বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ[১], শেলী—এঁরাও তাঁর প্রিয় কবি। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর রচনাবলী তিনি বিশেষভাবে পড়েছেন, ছোট বেলায় দীনবন্ধুকে তিনি দেখেছেন। মধুসূদন ছাড়া আর একজন সমকালীন কবির তিনি অনুরাগী ছিলেন—তিনি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সুরেন্দ্রনাথের মননধর্মী রচনা ও গম্ভীর ছন্দ তাঁর আকর্ষণের কারণ। গিরিশচন্দ্রের তিনি অনুরাগী বন্ধু ও পাঠক।

কিন্তু সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি অগ্রজ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বাণী ও রচনায় কোন উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের ফলে, বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি চিনতেন নিশ্চয়। ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর আরো পরিচয় ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি যেসব গান গাইতেন, তার মধ্যে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি যে রবীন্দ্রনাথের, এও তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। এ ছাড়া 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' 'আমরা যে শিশু অতি' প্রভৃতি রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি গাইতেন, এমন সাক্ষ্য একাধিক।

বাংলাসাহিত্যের আলোচনাক্ষেত্রে আমরা এ দুই মনীষীর সাধর্ম্য ও স্বাতন্ত্র্যের কথা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য না করে পারি না। বিবেকানন্দের দেহাবসানের কিছুকাল পর থেকেই এ আলোচনার সূত্রপাত। ১৩১৪ সালের নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' প্রবন্ধে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয়ে "যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসার যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ" এই মন্তব্যের মানদণ্ডে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার যে তুলনামূলক আলোচনা করেন—আজকের দিনের পাঠকের কাছে সে আলোচনাটি শুধু কৌতূহলজনক নয়, শ্রদ্ধার্হ।—

"জীবনের প্রসার" শব্দে চৈতন্যের বহুব্যাপিত্ব এবং সেইহেতু কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সূচিত হইয়াছে, মনে করি। এইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যগুলিকে যিনি যত অধিক দিক হইতে উপলব্ধি করিয়া মানবমনের সম্মুখে ধরিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় আমরা দেখিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ সুখের দিক হইতে, সৌন্দর্যসম্ভোগজনিত সুখের অনুভূতিদ্বারা

---

১ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য *Excursion* আলোচনাপ্রসঙ্গেই তদানীন্তন জেনারেল এসেম্বলির অধ্যক্ষ হেষ্টীসাহেবের কাছে তরুণ নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনেছিলেন।

বিশ্বের সনাতন সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি মোহিনীও বটেন, ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই মোহিনী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন—ভীষণাকে বড় একটা দেখেন নাই।”

বিবেকানন্দের রচনায় যে “positive pain” বা “সদ্বস্তু বেদনা”র সন্ধান লেখক পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা পান নি। প্রবন্ধটির শেষ প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—“রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আসিয়া উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠে ;—বিবেকানন্দের উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত শোণিতরাঙা সত্যবেদনার ভিতর দিয়া আসিয়া যুধ্যমান বীরের আপনাতে আপনি পূর্ণ বিরাট হৃদয়ে যন্ত্রণাপীড়িত জীবের প্রতি প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠে।”

১৩১৪ সাল অবধি রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের বিপক্ষে একাধিক উদাহরণ স্থাপন করা গেলেও মোটামুটিভাবে এ দুই কবির দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য অক্ষয়বাবুর রচনায় সুবিশ্লেষিত। কিন্তু তার পর বহুবিস্তৃত রবীন্দ্রসাহিত্য বেদনা ও মৃত্যুর বাস্তব সংস্পর্শে অনেক পরিবর্তিত। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ এক না হ'লেও দুঃখের পরম মূল্য সম্বন্ধে তাঁদের মতপার্থক্য খুব বেশী নয়। তবে বিবেকানন্দের অনুভবে দুঃখবেদনামৃত্যুর মহৎ উপলব্ধির সঙ্গে বেদান্তের সর্বত্যাগী নির্মোহ জীবনাদর্শ সংযুক্ত হওয়ার ফলে জীবনসংগ্রামের সর্বস্তরে তাঁর প্রেরণা আরো গভীর ও ব্যাপক।

বিবেকানন্দের কবিতায় সংগ্রামী চেতনারই আর একটি রূপ তাঁর দুঃখবরণের সাধনা। এ দুঃখচেতনা দুঃখবাদ থেকে সৃষ্টি হয় নি। মহৎ হৃদয়ের ধর্মই জগতের সব বেদনাকে আপন অন্তরের মধ্যে অনুভব করা।*

পত্রাবলীর বিবেকানন্দের মধ্যে এই অনুভূতির ঘাতসংঘাতময় ব্যক্তিসত্তাটির অপূর্ব প্রকাশ পাঠকদের মুগ্ধ করে। সেইসঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসও যে, আদর্শরূপায়ণের সংগ্রাম—এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আমরা ভারতীয় জীবনদর্শনের একটি মুল সত্যকে উপলব্ধি করি। মানবজীবনের ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরায় চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস সর্ববন্ধনবিমুক্ত আত্মোপলব্ধির চরম প্রকাশ। ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে বিরাট বিশ্বে উত্তরণের সে সাধনা আমরা রবীন্দ্রকাব্যের পরিণতির ইতিহাসে ‘শেষ লেখা’ কাব্যের প্রথম গানটিতে রূপায়িত দেখি—

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

* শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬, তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

অথচ রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে সবচেয়ে বড়ো ঘোষণা কি এই নয় ?—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

নৈবেদ্যের যুগেও এই আকাঙ্ক্ষাই আরো অন্তরতম স্বরে উচ্চারিত—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

কিন্তু বন্ধনের অভীপ্সা কখন পরমসত্তার আহ্বানে মুক্তির মহাকাশে বিলীন হয়ে গেছে, শান্তিপারাবারের কর্ণধারের কাছে তাই চিরযাত্রার অভয়প্রার্থনা রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্বে নতুন করে ধ্বনিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদের শান্তি ও ধ্যানতন্ময়তার দীক্ষা তো মহাকবি শৈশবেই পেয়েছিলেন।

কিন্তু শঙ্করের প্রজ্ঞা বিবেকানন্দ-প্রচারিত বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। শঙ্করের অসাধারণ প্রজ্ঞার সঙ্গে সাহিত্যপ্রতিভার সম্মেলন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ উদাহরণ। অদ্বৈতসিদ্ধান্তকে আচার্য শঙ্কর তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি', 'নির্বাণষট্‌কম্', 'মোহমুদ্গর', 'কৌপীনপঞ্চক' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে ভাবগম্ভীর ভাষারূপ দিয়েছেন, তা আত্মজ্ঞানের অন্বেষণকারীদের চিরকালের সম্পদ। বিবেকানন্দের 'The Song of the Free' (১৫ই ফেব্রুয়ারী)[২] এবং 'The Song of the Sannyasin' (জুলাই, ১৮৯৫)[৩] এই দুটি কবিতায় কবির্মনীষী শঙ্করাচার্যের প্রেরণা সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ।

জীবন্মুক্ত সাধকের নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি এ কবিতাটিতে যে বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছে, বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গীর সেই অনন্য শক্তি ও সৌন্দর্য তাঁর ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ—

Have thou no home, what home can hold thee friend ?
The sky thy roof ; the grass thy bed ; and food
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.

---

২ শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা পত্রকাব্যমালার প্রথম পত্র। স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর (*Complete Works*) অষ্টম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩ ১৮৯৫-এর ১৮ই জুন থেকে ৭ই আগষ্ট সেন্ট লরেন্স নদীবক্ষে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island park) বিশ্রাম গ্রহণের সময় একদিন বিকালে শিষ্যশিষ্যাদের কাছে ত্যাগের মহিমা ও গৈরিকের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার কথা বলতে বলতে স্বামীজী নিজের ঘরে চলে যান। যখন ফিরে এলেন তখন কবিতাটি পরিসমাপ্ত।

No food or drink can taint that noble self
Which knows itself. The rolling river be
Thou ever, Sannyasin bold ! say
"Om tat sat Om !" ['The Song of the Sannyasin']

সংসার সুখস্বপ্নবিমুখ মুক্ত আত্মার অভয়বাণীতে চির জাগ্রত এই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে মনে রাখলেই আমরা তাঁর সংগ্রামী সত্তার আর একটি দিককে উপলব্ধি করতে পারব। মানবজীবনকে স্বামীজী পরম বেদনার আলোকে এক অনন্ত প্রেমের বিকাশরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। জীবনের সব ক্ষয়ক্ষতি, লাঞ্ছনা, অসম্মান, ধ্বংস ও মৃত্যু সে মহাপ্রেমের অন্তরালে পরমাশক্তির প্রকাশ। তিনিই মৃত্যুরূপা মহাকালী।

বাংলা সাহিত্যের শক্তিসাধকেরা—বিশেষতঃ রামপ্রসাদ—বীর ভক্তের সংগ্রাম-সাধনার উদাহরণ। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

"আমি কি দুখেরে ডরাই।"

অথবা

"ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলি আমায় লোহা পেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি,
সাবাস আমার বুকের পাটা॥"

বাংলার শাক্ত কবিদের পদাবলীতে মহামায়ার চরণতলে রক্তজবার মতো জীবনযুদ্ধের আরক্ত যন্ত্রণাগুলি গান হয়ে ফুটে উঠেছে।

আবার এই করালীমূর্তির মধ্য দিয়েই শাক্তসাধকেরা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন—

'ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।'

দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে উত্তরণের এই সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও ধ্যানে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণাই বিবেকানন্দের হৃদয়ে একদিন মহাকালীর ধ্যান জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এই বীরভক্তের দিব্যকল্পনায় ভবতারিণীর অভয়াবরদা মূর্তির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনী প্রলয়ঙ্করী রূপ।

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে অমরনাথে তীর্থযাত্রার পরেই জগৎকারণের মাতৃমূর্তিধ্যান বিবেকানন্দ হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। *The Master as I Saw him* গ্রন্থের ক্ষীরভবানী-অধ্যায়ে ভগিনী নিবেদিতা পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, আজীবন সুখদুঃখের অতীতলোকের উত্তরণের আদর্শ প্রচার করলেও এই সময় দুঃখমৃত্যুভয়ঙ্করের মিলিত চেতনাই স্বামীজীর হৃদয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

এমনি সময়ে একদিন দিব্য প্রেরণামুহূর্তে তাঁর লেখনী থেকে "Kali the Mother" কবিতার সৃষ্টি। রচনাসমাপ্তির পর সুতীব্র আবেগের অবসানে স্বামীজীর অবসন্ন দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। রৌদ্র ও ভয়ানক রসের সম্মেলনে এমন পরিপূর্ণ বীররসের কবিতা সাহিত্যজগতে বিরল। 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত কবিতার অনুবাদটিও বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ।

কবিতাটির সূচনায় বিবেকানন্দের চিরপ্রিয় অন্ধকার-বর্ণনা—

> The stars are blotted out
> The clouds are covering clouds,
> It is darkness vibrant sonant.

প্রলয় ঝড়ের এ অন্ধকার ঋগ্বেদের 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে' ও তন্ত্রের 'মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং'-এ দুটি অংশ মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতির উন্মত্ত তাণ্ডব-বর্ণনায় মহাকালীর মরণনৃত্যের ব্যঞ্জনা এ কবিতায় ব্যাপ্ততর—

> In the roaring whirling wind,
> Are the souls of a million lunatics,
> Just loosed from the prison-house,
> Wrenching trees by the roots
> Sweeping all from the path.
> The sea has joined the fray
> And swirls up mountain waves,
> To reach the pitchy sky.
> The flash of lurid light
> Reveals on every side
> A thousand, thousand shades
> of death begrimmed and black,
> Scattering plagues and sorrows,
> Dancing mad with joy,
> Come, Mother, come !

প্রলয়ঝড়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মৃত্যুরূপা মহামায়ার আবির্ভাবকে কী অপূর্ব কাব্য-কৌশলে ধ্বনিত করা হয়েছে, অথচ এ কবিতারচনার ইতিহাসে সচেতন শিল্পপ্রয়াস কিছুই ছিল না। অনুভূতির এমন অখণ্ড রূপায়ণের দৃষ্টান্ত হিসাবেও কবিতার জগতে এ এক বিস্ময়!

মৃত্যুর আহ্বানমন্ত্রে করালরূপিণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে বীরভক্ত মায়ের বন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন—

For Terror is Thy name,
Death is in Thy breath.
And every shaking step
Destroy a world for e'er.
Thou 'Time' the All-Destroyer !
Come, O Mother, come !
Who dares misery love,
And hug the form of death—
Dance in destruction's dance
To him the Mother comes.

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় যেন এ কবিতাটিরই বিস্তৃত কবিতা-ভাষ্য। বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত কাব্যধারার দুটি প্রতীক 'সুখবনমালী' ও 'মৃত্যুরূপা কালী'-র মধ্যে এই সংগ্রামী সন্ন্যাসীর কাছে মৃত্যুরূপাকেই সত্যস্বরূপা মনে হয়েছে। যে দুর্বল আর্তহৃদয় 'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী', সে কাপুরুষতার ভক্তিকে ধিক্কৃত করে বিবেকানন্দ আহ্বান করেছেন ধ্বংসে মৃত্যুতে পরাজয়ে চির-অবিচল সংগ্রামের পতাকাধারী সৈনিকদের—

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।

[উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (১৩০৬-৭) ১ম সংখ্যা]

মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বীররসের মেঘমন্দ্রস্বর আবার আমরা বিবেকানন্দের কণ্ঠেই শুনতে পেলাম।

'Kali the Mother' কবিতাটি লিখবার পর ক্ষীরভবানী দর্শন করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মানস-জীবনে এক আমূল ভাবান্তর ঘটে। বিধর্মীর আক্রমণে বিধ্বস্ত মন্দিরের দুর্দশা দেখে বুঝি ভক্তহৃদয় চঞ্চল হয়ে প্রতিকারচিন্তা করেছিল, ভেবেছিল, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকতাম, তাহলে প্রাণপণ করেও এ মন্দির রক্ষা করতাম ! সেই মুহূর্তে মহামায়ার অনন্ত ইচ্ছাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ বিবেকানন্দ-হৃদয়ে বাণীরূপে উদ্বেল হয়ে উঠল—'যদিই-বা অবিশ্বাসীরা আমার মন্দির ধ্বংস করে প্রতিমা অপবিত্র করে থাকে তাতে তোর কি ? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি ?'

এই উপলব্ধির পর থেকে কিছুকালের জন্য বিবেকানন্দের হৃদয় থেকে সংগ্রামের

প্রেরণার উর্ধ্বে মহামায়ার অপার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের ভাবটিই বড়ো হয়ে উঠেছিল। 'আর হরি ওঁ নয়, এখন থেকে কেবল 'মা'। আমার সব দেশপ্রেম কোথায় চলে গেছে। সব মুছে গেছে। এখন কেবল, মা, মা!'[৪]

অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান, দৃষ্টিমাত্রে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়,—সেই অনন্ত শক্তির কণামাত্র বিকাশে মানবের দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত অপার জ্ঞানসমুদ্র।

Who knows, what soul and when,
The Mother wakes Her throne ?
What law would freedom bind ?
What merit guide her will,
Whose freak is greatest order,
Whose will resistless law ?

('Who Knows How Mother Plays')[৫]

বিবেকানন্দের অন্তরতম ইতিহাসে একদিকে এই সর্বসমর্পণকারী আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা, আর একদিকে সদাসমুদ্যত নির্ভীক জীবনসংগ্রামের প্রেরণা। আপাত-বিপরীত এ দুই প্রান্ত মাঝে মাঝে এসে একটি সুরধ্বনিতে মিলিত। ভ্রাম্যমান জীবনচক্রের সেই মধ্যবিন্দুটিই পরমা শান্তি, সে শান্তি সুপ্তি নয়, জাগরণ নয়, মৃত্যু নয়, জীবনও নয়, সে অন্ধকারের অন্তরতম আলো, আলোর অন্তর্নিহিত অন্ধকার—

It is not joy nor sorrow,
But that which in between
It is not night nor morow,
But that which joins them in.
... ...
It is beauty never seen,
And love that stands alone,
It is song that lives unsung,
And knowledge never known. ('Peace')[৬]

নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারিণী বেশ ধারণের সঙ্কল্প উপলক্ষে লেখা এই কবিতায় সংগ্রামের অন্তর্লীন মহাশান্তির স্তব্ধতা রূপায়িত। তাইতো নিবেদিতার

---

৪ ***The Master As I Saw Him :*** **Kshir Bhowani** অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫ ***Who Khows* How *Mother Plays !*** রচনার স্থানকাল অজ্ঞাত।

৬ **'Peace'** স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকাভ্রমণের সময় (১৮৯৯ সালে) নিউইয়র্কে রচিত।

সাধনাও সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল। স্বামীজী-ব্যাখ্যাত উপনিষদের কাব্যাদর্শের আর একটি সুন্দর নিদর্শন এই 'Peace' কবিতাটি।

বিবেকানন্দের কবিতায় শান্তি ও সংগ্রামের ছায়ারৌদ্রলীলা পাঠকচিত্তকে একই সঙ্গে স্তব্ধ ও সচকিত করে। মুহূর্তে ধ্যানের তন্ময়তা সংগ্রামের একাগ্রতায় পরিণত হয়। তাঁর একাধিক কবিতায় দুঃখ ও সংগ্রামের প্রতীকরূপে অন্ধকার, মৃত্যু, মহাকালীর মিলিত সমাবেশ আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এদিক থেকে 'To An Early Violet', 'The Cup', 'Hold On Yet A while, Brave Heart' [৭] কবিতা তিনটিও উল্লেখযোগ্য।

নির্মম শীতে বসন্তপুষ্প ভায়োলেটের অকাল-জাগরণের চিত্রকল্পে বিবেকানন্দ সাধনা ও সংগ্রামের যে ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন, কবিতা হিসাবে তার নিজস্ব সার্থকতা স্বীকার করেও সংগ্রামীচেতনার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে আমরা 'The Cup' কবিতাটিকেই তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্মান দেব।

খ্রীষ্টজীবনের শেষরজনীতে শেষভোজনের পরিসমাপ্তিতে—'He took up the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it ; for this is my blood for the new testament, which is shed for the remission of sins.'[৮]

যীশুর পানপাত্রটি ছিল মানবাত্মার সমস্ত কলুষগ্লানিমোচনের বেদনারক্তে পরিপূর্ণ। চিরকালের সাধকদের উদ্দেশে এই জীবনমথিত বিষপাত্র তিনি উপহার রেখে গিয়েছিলেন। সে মহাদায়িত্ব বহনের উপযোগী ক'জন সাধক পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে ? বহুদিন পরে সেকথা স্মরণ করে *Imitation of Christ*-এর অমর লেখক টমাস-আ-কেম্পিস বলেছিলেন—'Many follow Jesus unto the breaking of bread but few unto the drinking of the cup of His Passion.' [৯]

বিবেকানন্দ সেই অঙ্গুলিমেয় বেদনাসাধকদের অন্যতম। তাঁর জীবনদেবতা যে তাঁর জন্য সহজ সাধনার রাজপথটি খুলে রাখেন নি, আনন্দের অমৃতলাভ যে তাঁর জন্যে নয়—এ কথাটি জীবনের ঘাটে ঘাটে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন। কলকাতার পথে পথে চাকুরী সন্ধানে উপবাসী নরেন্দ্রনাথের

৭ 'To An Early Violet' ৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৬ নিউইয়র্কে রচিত।
'The Cup'—এর রচনাকাল বা স্থান অজ্ঞাত।
'Hold On Yet A While, Brave Heart' স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ির মহারাজের উদ্দেশে রচিত।

৮ সেন্ট ম্যাথু-লিখিত সুসমাচার।

৯ *The Imitation of Christ*, Book 2, Chap. II

জীবনে দুঃখবেদনার চরম অভিঘাতমুহূর্তে একদিন সহসা অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছিল; শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বেদনাহত হৃদয়ের ধ্বনিস্পন্দনটি নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে এক বিপুল গভীর নব ভৈরবরাগ সৃষ্টি করেছিলেন।

কবিহৃদয়ে মন্ত্রিত তাঁর জীবনদেবতার বাণী—

> **This is your cup—the cup assigned to you from the beginning.**
> ... ...
> **This is your road—a painful road and drear.**
> **I made the stones that never give you rest.**
> **I set your friend in pleasant ways and clear,**
> **And he shall come like you, unto My breast.**
> **But you, My child, must travel here.**

Imitation of Christ-এর ভক্ত-ভগবানের একান্ত-সংলাপের কথা মনে থাকলে এ কবিতায় ভক্তের প্রতি ভগবানের বাণীর তাৎপর্য অনেকটা সহজবোধ্য হয়। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তির জলন্ত উদাহরণ এই মহাগ্রন্থের একটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে স্বামীজীর পত্রাবলীতে। বিবেকানন্দের জীবনসাধনার আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে সহায়করূপে সে বাণী স্মরণ করি—"We have taken up the Cross, Thou hast laid upon us, and grant us strength that we bear it upon earth. Amen."

যীশুর ঐ ক্রুশকাষ্ঠ যুগযুগান্তের মহামানবদের বেদনাবহনের প্রতীক। স্বামীজীর ভাষায়—'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।'

কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ, তারা এই দুঃখের তাৎপর্য বুঝতে চাই, জীবনের ভালমন্দ আলো অন্ধকারের অর্থ খুঁজে বেড়ানো আমাদের স্বভাব। বিবেকানন্দের জীবনদেবতা এ প্রশ্নের কোন উত্তরই দেন নি, শুধু বলেছেন—

> **I do not bid you understand.**
> **I bid you close your eyes and see my face.**

জীবনে দুঃখের সাধনাকে স্বীকার করার অর্থই সত্যের মুখোমুখি হওয়া। সৃষ্টিরহস্যের এর চেয়ে বড়ো উত্তর প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য আজ অবধি দিতে পারে নি।

বিবেকানন্দের জীবনে পরমসত্যের আবির্ভাব হয়েছিল পরিপূর্ণ ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম ও ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর অসংখ্য বক্তৃতাবলীর মধ্যে অতি অল্প ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যখনই করেছেন, তখনই কী অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তিনি এই মহামানবকে আপন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি নিবেদন করেছিলেন সেকথা আমরাও অনুভব করি। তাঁর মতে —"সমগ্র হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরে যে চিন্তা করে এসেছে, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ)

এক জীবনেই সেই সব ভাব উপলব্ধি করেছেন। তাঁর জীবন সব জাতির, সব শাস্ত্রের জীবন্ত টীকাস্বরূপ!"

জ্ঞান ও ভক্তির যে সুসমঞ্জস রূপায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার ফলে গুরু ও ইষ্ট তাঁর হৃদয়ে অভেদসত্তায় মিলিত। তাই বিবেকানন্দের লেখনীতে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী ত্রিভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতামূর্তি গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বিশুদ্ধ বন্দনামূলক রচনা 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন', 'ওঁ হ্রীং ঋতং', 'আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো' প্রভৃতির ভক্তিরস উল্লেখযোগ্য হলেও কবিতার বিচারে 'O'r Hill and dale' শীর্ষক ইংরেজী[১০] ও 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' শীর্ষক বাংলা কবিতাযুগলই শ্রেষ্ঠ। চিকাগো বক্তৃতার মাত্র একসপ্তাহ আগে লেখা (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) 'O'r Hill and dale' কবিতাটি বিবেকানন্দহৃদয়ের এক ব্যাকুল অনুসন্ধান-মুহূর্তের অপূর্ব কাব্যরূপ।

বেদে-বাইবেলে-কোরাণে, মন্দিরে-মসজিদে-গীর্জায়, অরণ্যে-পর্বতে-উপত্যকায়,— তৃষার্ত জিজ্ঞাসায় বিবেকানন্দ পরম সত্যকে খুঁজে ফিরেছেন। বেদনাদীর্ণ চেতনা বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষা করেছে, প্রশ্ন করেছে—

> Where art thou gone, my God my love?

প্রতিটি নিমেষকে মনে হয়েছে যুগ, জীবন অন্তহীন অশ্রুধারা। এমনি পরম বিরহের মধ্য দিয়ে একদা সেই শুভমুহূর্ত দেখা দিল—

> Till one day midst my cries and groans
> Some one seemed calling me
> A gentle soft and soothing voice
> that said, "my son" "my son".

সেইদিন থেকে পরম প্রিয়তমের আনন্দোদ্ভাসিত মুখশ্রী দ্যুলোকে ভূলোকে সব সৌন্দর্য ও পবিত্রতার মধুময় প্রকাশে দীপ্ত হয়ে দেখা দিল।—

> From that day forth whereere I roam
> I feel him standing by
> O'r hill and dale high mount and vale
> Far Far away and high.
> ... ...
> Thou speakest in the mother's lay
> That shuts the babies eye
> When innocent children laugh and play
> I see Thee standing by.

১০শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের *Swami Vivekananda In America: New Discoveries* দ্রষ্টব্য।

সন্ধান ও উপলব্ধির এই মরমী অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্তরগত মিল লক্ষণীয়—সম্ভবত এ কবিতাটি কাছাকাছি সময়েই লেখা—স্বামীজীর 'সখার প্রতি'। 'O'er hill and dale' কবিতায় ব্যক্তিহৃদয়ের জীবনদেবতা ও 'সখার প্রতি'-র নিখিল মানবহৃদয়ের 'প্রেম' মূলতঃ একই সত্যের ছুটি দিক।

'প্রেমে'র ঐ ধ্রুব প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার পিছনে আছে বাস্তব সংসারের উপলসঙ্ঘাতে ক্ষতবিক্ষত পদযাত্রার ইতিহাস। মানবচরিত্র সম্বন্ধে কী মর্মান্তিক তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে এ কবিতার সূচনা—

> হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান ;
> লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর-মূরতি তা কি সয় ?
> হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
> সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান। (সখার প্রতি) ১১

সব পেলব শোভনতার অন্তরালে মানুষের এই স্বার্থগৃধ্নু পরিচয় যে অন্যতম সত্য, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ এগুলি এক হিসাবে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্ন বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত উদ্ধৃতিগুলির অন্যতম। এই চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিবেকানন্দের মূল জীবনদর্শন বিধৃত হলেও সমগ্র কবিতাটির পরিসমাপ্তি হিসাবেই এরা গ্রহণীয়। মানবজীবনের নির্মোহ বাস্তব পরিচয় উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে প্রেমের নিখিলসত্যে উত্তরণের উদাহরণরূপে এ কবিতা বাংলা কবিতার জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী।

বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও জীবনের সখা ও সারথি শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কেউ কেউ মনে করেন, 'সখার প্রতি'-র উদ্দিষ্ট সখা বুঝি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব। 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বিবেকানন্দ বলেছেন—'প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর'। তবু 'সখার প্রতি'-র 'সখা'-র সঙ্গে এই সখা সম্বোধনের পার্থক্য আছে। একজন বিবেকানন্দের সখা ও ইষ্ট, আর একজন সখা ও অন্তরঙ্গ। 'সখার প্রতি'-র সখা গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ (রাখাল) বা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও (শশী) হতে পারেন, কিন্তু কোনমতেই রামকৃষ্ণ ন'ন।

বিবেকানন্দের কবিতাজগতে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' বিশেষভাবে স্মরণীয়। রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ—এ ছুই অতুলনীয় গুরুশিষ্যের হৃদয়সম্বন্ধ কোন্ পরমসত্যের অনাহতবাণীর আলোকে অদ্বৈতসত্তায় উপনীত হয়েছিল, এ কবিতায় তার অর্ধস্ফুট রূপায়ণ। এক হিসাবে এ কবিতা বিবেকানন্দের ব্যক্তিজীবনের অন্তরতম কাহিনী, অন্য দিক থেকে এ কবিতা 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয়' কবিতা ছুটির সগোত্র।

---

১১ উদ্বোধন (১ম বর্ষ ১৩০৫-৬) ২য় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ।

পরিব্রাজকজীবনের সূচনায় স্বামীজী একবার গাজীপুরের বিখ্যাত সাধক পওহারীবাবার সান্নিধ্যে এসে যোগসাধনার জন্য আগ্রহবোধ করেন এবং পওহারী-বাবার কাছে দীক্ষাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণে যাত্রার আগে তাঁর অন্তরপটে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিখানি বারংবার ভেসে উঠতে থাকে। দিনের পর দিন অন্তর্দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন বিবেকানন্দের চিন্তাজগতে অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণই অনন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পওহারীবাবার প্রতি বিবেকানন্দের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় আছে তাঁর উত্তরজীবনের বক্তৃতামালায়। কিন্তু এই চিন্তাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীত হ'ন, তাঁর পরবর্তীজীবন সেই এক সিদ্ধান্তে অবিচলিত ছিল—"...রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense sympathy বদ্ধজীবের জন্য—এ জগতে আর নাই।"

বহুকাল পরে আমেরিকা থেকে জনৈক গুরুভ্রাতাকে লেখা একটি চিঠিতে (১৮৯৪) স্বামীজী 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'[১২] কবিতাটির "একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ" অংশটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের যে ইতিহাস তিনি এ কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন, গুরুভ্রাতাদের পক্ষে সেকথা হৃদয়ঙ্গম করা যত সহজ ছিল, আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবু, এ দুই গুরুশিষ্যের ভাবজগতে একবার মাত্র যে বিচ্ছেদের আভাস দেখা দিয়েছিল তার সকরুণ আভাস মেলে একটি চরণে—

ছেলেখেলা করি তব সনে
কভু ক্রোধ করি তোমা 'পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে ;
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্ভতা ?

এই মানবমনই আপনার অজ্ঞাতে প্রিয়জনের উদ্দেশে আত্মদান করে চলেছে। চরম দুঃখের তপস্যায় বিবেকানন্দ এই মহাসত্যটি 'উপার্জন' করেছিলেন—এই প্রেমেরই স্বার্থমুক্তরূপে মানুষ দেবতা, স্বার্থমগ্নরূপে দানব। জীবনের সুখে দুঃখে, কল্যাণে অকল্যাণে এই প্রেমই 'মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন'।

১২ উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ (১৩০৮-৯) ১০ম সংখ্যা।

তাই পলায়ন নয়, আসক্তিও নয়, সর্বজীবে সেই পরমসত্যকে উপলব্ধির বাণীই বিবেকানন্দের বাণী। সংসার থেকে যারা দূরে গিয়ে নিরাপদ হতে চায় তাদের উদ্দেশে কবি বিবেকানন্দ বলেছেন—

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার—

আর ভিক্ষুকহৃদয়ের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার উদ্দেশে প্রেমিক বিবেকানন্দের বাণী—

অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান
"দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

অতীত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কখন গুরু-শিষ্য অখণ্ডের উপলব্ধিসীমায় উপনীত হ'ন, বিবেকানন্দের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি,
বীণাপাণি কণ্ঠে মোর—

বিবেকানন্দজীবনের সব প্রেরণা ও বাণীর উৎসস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ তখন আর ব্যক্তিমানব নন, বিশ্বচৈতন্যের ধ্বনিমন্ত্র অনাহত বাণী।

কবিতার জগতে কালানুক্রমিক বিচারের ইতিহাস-মূল্য স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে, কবির দৃষ্টি সময়সীমাকে অতিক্রম করেই চলে। বিবেকানন্দের কবিতায় 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার' ঘোষিত হবার অনেক আগেই 'My Play Is done' কবিতার সৃষ্টি। ১৮৯৫-এর বসন্ত ঋতুতে লেখা এই কবিতাটির সঙ্গে স্বামীজীর দেহাবসানের মাত্র দু'বছর আগের বসন্ত ঋতুতে লেখা সেই অতুলনীয় পত্রটির ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে কি আশ্চর্য মিল। ওই বিদায় বেলার রাগিণী তাঁর কর্মজীবনের প্রখর মধ্যাহ্নেই ধ্বনিত হয়েছিল—

Ah, open the gates ;
to me they open must.
Open the gates of light, O Mother, to me Thy tired son.
I long, oh, long to return home !
Mother, my play is done.

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটিতে নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

মন, চল নিজ নিকেতনে!

সেই নিজ-নিকেতনের আহ্বান জীবনের সমগ্র কর্মকলরোলের মধ্যে মাঝে মাঝেই বিবেকানন্দের নিভৃতবাসী ধ্যানীসত্তাকে স্পর্শ করে গেছে।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে যাবার দিন যত আসন্ন হয়েছে, শান্তির পিপাসাও তত তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জীবনের সমস্ত বেদনা ও সংগ্রামের অন্তরালে স্থিরজাগ্রত আত্মার অভয় আলোক তিনি আপন প্রাণে প্রত্যক্ষ করেছেন—

I look behind and after
And find that all is right,
In my deepest sorrows
There is a soul of light. [শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখের পত্রাংশ

জীবনরুদ্রের ঝঞ্ঝাতাণ্ডব ধীরে ধীরে নিমীলিত ধ্যানের নিষ্কম্প দীপশিখায় পরিণত হতে চলেছে, ঋজুকুটিল নানা পথের অবসানে নদী এখন মহাসমুদ্রে মিলনোন্মুখ।

ওই মহাশান্তির আলোকে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দের ধ্যানস্তিমিত মূর্তির সামনে পাঠকচিত্ত স্তব্ধ, তন্ময়, সমাহিত। পরমশ্রদ্ধায় সে বিবেকানন্দকে আমরা পূজার আসনে আদর্শের সুদূরমহিমায় জ্যোতির্ময় সত্তারূপে কল্পনা করি।

কিন্তু আত্মীয় মনে করি সেই বিবেকানন্দকে যিনি মানুষের নারায়ণকে দুঃখদৈন্য বেদনা অপমানের অন্তরাল থেকে অসীম আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে চিরসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বাধীনতার অধিকারকে মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ জেনে স্বদেশ ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বন্ধনমোচনের মহাবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুটি পত্রিকার নামের মধ্যেও জাগরণের আহ্বান— 'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত', ওই নির্ভীক বেদান্তকেশরী একটি সমগ্র জাতির সুপ্তিভঙ্গের নিশ্চিত প্রতীক।

আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস-স্মরণে রচিত 'To The Fourth of July'[১৩] অথবা নবজাগ্রত ভারতাত্মার উদ্দেশে আহ্বান 'To The Awakened India'[১৪] এই দুটি কবিতার মধ্যেই চিরস্বাধীন মানবাত্মার জয়গান। প্রথম কবিতাটিতে সূর্যোদয় ও সূর্যের আকাশ-পরিক্রমার রূপকে যুগ-যুগান্তের স্বাধীনতা-পূজারীদের

---

১৩ ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৮ তারিখে লেখা। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় বিবেকানন্দের দেহত্যাগ—৪ঠা জুলাই, ১৯০২।

১৪ আগষ্ট ১৮৯৮ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা-র উদ্দেশে লেখা।

কবিতা দুটি সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক ভগিনী নিবেদিতার 'Notes from some wanderings with the Swami Vivekananda' বইটির সপ্তম অধ্যায়ে বিশদ তথ্য পাবেন।

আশা ও আনন্দের অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় কবিতাটিতে বহু শতাব্দীর সুপ্তিভঙ্গের পর জাতীয় জাগরণের মহামুহূর্তে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের জয়গান।

স্বাধীনতাসূর্যের উদ্দেশে সংগ্রামী সন্ন্যাসীর বন্দনা—

> Move on, O Lord, in thy resistless path!
> Till thy high noon o'erspreads the world,
> Till every land reflects thy light,
> Till men and women, with uplifted head,
> Behold their shackles broken, and
> Know, in springing joy, their life renewed!

বিবেকানন্দের কবিতালোকে মনন ও আবেগের যে মহিমান্বিত মিলন ঘটেছে, তার সামান্য পরিচয় পাঠকদের কাছে নিবেদনের এই প্রয়াস স্বভাবতঃই দ্বিধান্বিত। যে দীপ্তি ও গভীরতায় এই চিন্তা ও অনুভূতিরাশি কাব্যরূপ লাভ করেছে, তার সামগ্রিক তাৎপর্য-উপলব্ধি শুধু মনন নয়, সাধনসাপেক্ষ। তবু যে তাঁর কবিতা-আলোচনায় সাহসী হয়েছি, তার কারণ, পৃথিবীর সব কবিদের মতো বিবেকানন্দও 'স্বপ্নে' বিশ্বাস করতেন। এই 'স্বপ্ন' বা দিব্য কল্পনার বন্দনাস্তোত্রটি কবির্মনীষী বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচায়ক—

> Thou dream, O blessed dream!
> Spread near and far thy veil of haze,
> Tone down the lines so sharp,
> Make smooth what roughness seems.
>
> No magic but in thee!
> Thy touch makes deserts bloom to life,
> Harsh thunder blessed song,
> Fell death the sweet release. [১৫]

---

১৫ ১৭ই আগষ্ট, ১৯০০ তারিখে প্যারিস থেকে ভগিনী ক্রিষ্টিনকে লেখা পত্রকাব্যের শেষার্ধ।
বিবেকানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :—
অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত *Poems : Swami Vivekananda*
বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রকাশিত 'বীরবাণী' : স্বামী বিবেকানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ড)

বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

> রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে রচিত করাঙ্গুলি-গণনীয় পাঁচখানি পুস্তিকা ('বর্তমান ভারত,' 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পরিব্রাজক', 'পত্রাবলী'র কিছু চিঠি) সম্বন্ধেও সক্ষোভে অনুরূপ মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। স্বামীজী বিশ্ববাসীর কাছে অতন্দ্র কর্মযোগী বলে পরিচিত। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড়জীবনের প্রত্যক্ষীভূত প্রত্যয়ে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বিশ্বের মানবজীবন সম্বন্ধীয় সমস্যাকে বলিষ্ঠ ভৌম সার্থকতার দিকে প্রেরণ করেছেন। আধিমানসিক ও আধিভৌতিক জগৎকে তমোগুণের প্রভাবে পৃথক্ ভাবে দেখা যায়, আবার রজোগুণের স্পর্শে উভয়ের মধ্যে সৌষম্য ও মৈত্রীযোগ স্থাপন করা যায়। মর্ত্যধরিত্রীর বুকে মানুষের মত বেঁচে থাকাও যে একপ্রকার জীবনসাধনা, কোটি কোটি নরকঙ্কালের পঞ্জরাস্থির মধ্যেও যে অমৃত-নিঃস্যন্দী প্রাণধারা বহমান,—এ সব কথা তিনি উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতবাসীর কানে কানে বলেছিলেন—কখনও মৃদু আত্মগত ভাবে, কখনও-বা বজ্রনির্ঘোষে। তাঁকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায়, রচনা করতে হয়েছিল ইংরেজীতে। নিয়মিতভাবে বাংলা অনুশীলনের তাঁর সময় ছিল না ; শুধু প্রয়োজনের জন্য শিষ্য-গুরুভ্রাতাদের প্রতি উপদেশ-নির্দেশ, চিঠি-পত্রাদি, বিদেশী সভ্যতা সম্পর্কে কিছু আলাপ-আলোচনা, অল্প-স্বল্প ডায়েরি রক্ষা—ইত্যাদি কর্মে তিনি যৎসামান্য বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালী বিবেকানন্দের যে বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়, নতুন আলোক লাভ করে, তার অধিকাংশই ইংরেজী রচনা বা ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতার নির্যাস-অনুবাদ—অবশ্য সে অনুবাদ বহুস্থলে মূলের মত অর্থবহ এবং মূলের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে সম্পৃক্ত। তবে স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও

গুণগত উৎকর্ষে তা' ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং প্রসন্ন মনের সহাস্য রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।

যাঁরা ধর্মজগতের অধিবাসী এবং কর্মযোগে নিষণ্ণ, তাঁদের মূর্ত ও অমূর্ত চেতনা নিজ নিজ ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করেই রূপকল্প নির্মাণ করে। অর্থাৎ শিল্প, সৌন্দর্য, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মনন, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ—সব কিছুই তাঁদের কাছে একটা বিশেষ অবধারণার সহায়ক; ইন্দ্রিয়াতীত পরাচেতনাই তাঁদের ইন্দ্রিয়জ অপরা-চেতনার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা সঙ্গীতবিদ্যায় উত্তরস্নাতক হতে পারেন, শিল্প ও রূপবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ হতে পারেন, ভাষা ও সাহিত্যেও পারঙ্গমত্ব অর্জন করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের ভৌমচেতনালব্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি যুধিষ্ঠিরের রথের মত ভূমিচারিতার একটু ঊর্ধ্বলোক দিয়ে গতায়াত করে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনা কর্ণের রথের মত মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে।

বাঙলাদেশ একাধারে নব্যন্যায়ের দেশ, চৈতন্যপ্রবর্তিত উজ্জ্বল রসসাধনা ও শাক্ত পদকারদের বাৎসল্য রসসাধনার দেশ। আবেগের নির্বাধ উৎসার এবং মননের তীক্ষ্ণ তির্যকতা এ দেশেই সম্ভব হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগে আবেগধর্ম ও গণধর্মে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আবেগের মধ্যেই এলোমেলো জনারণ্যের শাখাবিস্তার লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মেলবন্ধনে বদ্ধ বলে একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক মস্তিষ্কজীবী মহলেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য জীবন, সাধনা ও ইতিহাসের প্রভাবে যেমন একদিকে সমাজ, রাজনীতি ও মানবধর্মী উপযোগবাদের প্রতি শিক্ষিত জন আকৃষ্ট হয়েছেন, আবেগোন্মত্ত কণ্ঠে নব-মেসায়ার পথ চেয়ে ভাবী 'সাহস্রিকী'র নান্দীপাঠ করেছেন—তেমনি পাশ্চাত্ত্য ন্যায় ও যুক্তিবাদের নিরিখে মননের নতুন স্বরূপ নির্ধারণেও তাঁরা প্রস্তুত হয়েছেন। উনিশ শতকী য়ুরোপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধিবাদ আমাদের পূর্বসংস্কারকেই যেন খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিল। রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ—এঁদের হাতে বাংলা গদ্য নিশিত অসিধারে পরিণত হল। গদ্য ভাষা যে কী প্রচণ্ড শক্তি ধরে, জাতির মনের আকার আয়তন বিলকুল পাল্টে দিতে পারে, তা উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত বাংলা প্রবন্ধনিবন্ধের পরিচয় নিলেই মোটামুটি বোধগম্য হবে। যাকে শিল্পলক্ষণ বলে, তখনও হয়তো বাংলা গদ্যে তার যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়েনি, কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গেই যে বাঙ্‌ময় সত্তার নাড়ীর যোগ, এবং সে বাক্‌পুঞ্জ মূলতঃ গদ্যাশ্রয়ী ও মননধর্মী—উনিশ শতকের শেষভাগে সে সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহ রইল না। বস্তুতঃ

বাংলা গদ্য অন্ধই হোক, আর খঞ্জই হোক—গত শতকের শেষের দিকে এরই সাহায্যে বাঙালীর চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা গতিবেগ লাভ করেছে, মূর্ত হয়েছে।

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দুচারটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। অবশ্য তখন বাংলা গদ্যের ব্যবহারিক ও শিল্পরূপ গড়ে উঠেছে, অনেকেই গদ্যে সপ্রশংস শিল্পকর্ম নির্বাহ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্যরচনা, শিল্পসৃষ্টি বা নিজের মনোমুকুরতলে প্রতিফলিত নিজেরই মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপ দেখবার কোন বাসনাই স্বামীজীর ছিল না। নিষ্কিঞ্চন পরিব্রাজক, সুকঠোর কর্মযোগী, ভাবোন্মাদ আদর্শবাদী, অকৃপণ মানবপ্রেমী বিবেকানন্দ মৃত্তিকার মানুষকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিলেন। পুঁথিবন্দী আপ্তবাক্য নয়, জীবন্ত মানুষের কথা এত গভীরভাবে ক'জন মানবপ্রেমী ভেবেছেন জানি না। বিবেকানন্দের গদ্য রচনার সবটুকু এই নরদেবতাকে উৎসর্গীকৃত। এদেশে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর বাংলা রচনায় তাই নানা জ্ঞানবিজ্ঞান ইতিহাসের ভূরি সমারোহ যেমন আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের প্রতি অমেয় ভালবাসা, জীবনের প্রতি একটা সরস নিঃস্পৃহ কৌতূহল। তাঁর রচনারীতি বিশ্লেষণ করলে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

॥ ২ ॥

বাংলা গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্বতঃই মনে জাগে যে, এ রীতি মিশনারী সম্প্রদায়ের দানে গড়ে ওঠেনি, টুলোপণ্ডিতের অনুস্বর-বিসর্গ-বর্জিত দেবভাষার ছত্রছায়াতলে এ গদ্য বিবর্ধিত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ পয়ার-ত্রিপদী বাহনে অগ্রচারী হয়েছে, এই পয়ারজাতীয় ছন্দকেই স্বচ্ছন্দে সাধু গদ্যরীতিতে পরিবর্তিত করা যায়; তাই পয়ারের দ্বারাই মধ্যযুগের যে-কোন মননকর্ম নির্বাহ হত। পয়ারের মধ্যে একটা বিপুল শোষকশক্তি আছে, যে-কোন অর্থবহ মননপ্রবাহকে চৌদ্দমাত্রার পয়ারপংক্তির মধ্যে পরিস্থাপনা করা যায়—তা সে মঙ্গলকাব্যের গদ্যাত্মক বিবৃতিই হোক, আর কবিরাজ গোস্বামীর দার্শনিক রচনাই হোক। অবশ্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে গদ্যরীতির ব্যবহার সে যুগে যে দুষ্প্রাপ্য ছিল তা নয়। তবে বৃহৎ সাহিত্যকর্মে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি বড় একটা ব্যবহার করা হত না; কারণ পয়ারের দ্বারাই গদ্যাত্মক কাজ অক্লেশে নির্বাহ হত। উনিশ শতকের বাঙালী বাংলা গদ্যের মধ্যে নিজেকেই আবিষ্কার করেছে; আবিষ্কার করেছে যে, চিঠিপত্র দলিলদস্তাবেজের ভাষাকেই সহজে ও সার্থকভাবে আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যায়। এ আবিষ্কার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর আবিষ্কারের চেয়েও বিপ্লবী। বস্তুতঃ গোটা উনিশ শতকের বাঙালী-মানস যে

আধুনিক হয়েছে, জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পেরেছে, এর মূল দায়িত্ব বাংলা গদ্যের।

আকণ্ঠ কর্মমগ্ন স্বামী বিবেকানন্দকেও বাংলা গদ্যে কিছু কিছু রচনা করতে হয়েছিল প্রয়োজনের তাড়নায়। সাহিত্যসৃষ্টি এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, শুধু নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি মাত্র চারখানি বাংলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন—'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'। এছাড়াও 'পত্রাবলীতে' তাঁর কিছু কিছু বাংলা-চিঠি ছাপা হয়েছে। বাংলা চলিতরীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর প্রাণশক্তি দান করেছিলেন, তা বিশেষজ্ঞগণ জানেন। কিন্তু সাধুরীতিকেও তিনি যে ধ্বনিগম্ভীর চিন্তাঋদ্ধ ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি আলোচনা করলেই দেখা যাবে।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্য-জীবনের পূর্বাপর ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ এবং তামসিক অনীহার গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাচীন ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্যশাসিত সমাজের মূক জনারণ্যে মানসপরিক্রমা করেছেন, এবং অধীতবিদ্য সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। ফলে তাঁকে পুনঃ পুনঃ অতীত ভারতের জীবনের অন্তস্তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এই প্রাচীন জাতির উত্থান ও পতন, উদ্‌গতি ও অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহায্য নিয়েছেন। তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে।

এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি দু'ধরনের বাক্-রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি—তৎসম শব্দবহুল, সমাসসন্ধিসমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা; আর একটি—খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্‌রীতি। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

(ক) সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযুথের ন্যায় নিঃশব্দে আজ্ঞা বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে; কিন্তু যে বৈশ্যকুল রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত, মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চির-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমুসলমান রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়াপুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে…।

(খ) স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব।

'বর্তমান ভারতে'র এ দুটি দৃষ্টান্তই সাধুরীতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু একটির সঙ্গে অপরটির রীতিগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়বে। প্রথমটিতে দীর্ঘবিস্তারী বাক্‌রীতি, গুরুভার শব্দসংযোজনা এবং অনেকগুলি উপবাক্যের সন্নিবেশে এ রচনাটি হয়েছে মন্থর। অপরদিকে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের বাক্যসজ্জা লঘু, উপবাক্যের সংখ্যা ন্যূনতম। এর কারণ—প্রথমটিতে বিরাট ইতিহাসের পটভূমিকায় সমাজবিবর্তনের চিত্র স্থান পেয়েছে। ফলে স্থান-কালের বিশালতা বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল করে তুলেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বুদ্ধিগ্রাহ্য মন্তব্যগুলি ছোট ছোট বাক্যে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, চিন্তার মধ্যে সহজ চলমানতা লক্ষ্য করা যাবে। প্রথমটিতে বাক্যধারা যেন অবারিত বেগে এবং দ্বিতীয়টিতে উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে মৃদু উল্লম্ফনে বয়ে চলেছে। প্রথমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার প্রকাশ—সম্মুখে সহস্র মানুষের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি ; দ্বিতীয়টিতে শিষ্য ও গুরুভাইদের সামনে নরেন্দ্রনাথের মৃদু ভাষণ, যার মূল লক্ষ্য শ্রোতার বুদ্ধিকে দীপিত করা।

কখনও কখনও বীর সন্ন্যাসী প্রচণ্ড আবেগে আবিষ্ট হয়ে মত্ত সিংহগর্জনে বলে উঠেছেন :

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা, দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনও ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের *Egalite liberte fraternite*-এর অশনিনির্ঘোষ প্রতিছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্‌ময় হলেও আসলে তা হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, সর্বতন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ—যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মনঃপ্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।

স্বামীজীর সাধুভাষা প্রয়োগপ্রসঙ্গে এ মন্তব্য অযৌক্তিক নয় যে, যে-ক্লাসিক

গদ্যরীতি, বাক্যগঠন, শব্দসংযোজন প্রভৃতি বাক্‌পদ্ধতি মননধর্মী রচনাকে বহু মনের চিন্তার বাহন করে তুলতে পারে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা'য় পাওয়া যাবে। অতিশয় গুরুগম্ভীর সমাস-সংবদ্ধ অথচ পরিচ্ছন্ন চিন্তার বাহন, তাঁর সাধুভাষায় প্রায়শই এই লক্ষণটি ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ তাঁর সাধুভাষার অনেক জায়গায় চলতি রীতি-ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়। কোন কোন সময় তাঁর আবিষ্ট মুহূর্তের রচনায় একটা দুর্লভ ভাগবত মহিমা ফুটে ওঠে :

> কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর!

এই কয়ছত্র যেন আরণ্যক যুগের আর্ষবাণী, কোন্ অলক্ষ্য থেকে আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

॥ ৩ ॥

স্বামীজী-অবলম্বিত যে রীতিটি বিস্মিত প্রশংসা আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে চলিত ভাষা। এই চলিত ভাষাতেই তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', কিছু চিঠি এবং 'ভাববার কথা'য় সঙ্কলিত দু'একটা বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ—এই কয়টি মাত্র তাঁর চলিত গদ্যরীতির রচনা। কিন্তু সামান্য রচনাতেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা গদ্যের চলিত রীতি আসলে নাগরিক জীবনের বাণীবাহক। সাধুরীতিটি অধিকতর পুরাতন, তা স্বীকার করতে হবে। তিন-চারশ' বছর আগেকার চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজে সাধুরীতিই ব্যবহৃত হত; অবশ্য কাব্য ও গীতিকায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও দুর্লক্ষ্য ছিল না। যাঁরা মনে করেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুন্‌শির দল আর সপারিষদ কেরী সায়েব বাংলা সাধুভাষা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা নয়, ভুঁইফোঁড়ও নয়। বাঙালীর আঞ্চলিক ভাষাভেদ সত্ত্বেও সাধুভাষাই দীর্ঘকাল ধ'রে সমগ্র বাঙালী-মানসকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্যসভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশীমণ্ডলী—যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরাফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্যকামী গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল; যাই হোক উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে

কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস প্রবেশ ঘটল। রঙ্গরস, সাময়িক পত্রে 'আর্যাতর্জা', "ঠন্‌ঠনের হঠাৎ-অবতারগণের"* মর্কটলীলা প্রভৃতি বর্ণিত হতে লাগল কলকাতার ককৃনি ভাষায়। নাটকে ভদ্রেতর ব্যক্তির সংলাপেও কলকাতার বৈঠকী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছিল, উপন্যাস-রমন্যাসেও কলকাতার ভদ্রসমাজের চলিতভাষার অনুপ্রবেশ ঘটল। ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশ করলেন পুরোপুরি উত্তর কলকাতার ককৃনি বুলিতে—মায় ক্রিয়াপদ সর্বনামগুলিও চলিত রীতির বিকৃত উচ্চারণের মত ছাপা হল। প্যারীচাঁদ মিত্র হালকা চালের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন, কলকাতায় ব্যবহৃত সর্বনাম ক্রিয়াপদও ব্যবহার করেছিলেন—কিন্তু পুরোপুরি চলিতভাষায় তিনি কোন গ্রন্থ লেখেননি, তাঁর রচনার বহু স্থলেই সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের গোলমাল থেকে গেছে। ভাষার এ-ব্যাধিটি উনিশ শতক ধরেই বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথের আগে অপরিহার্য বলে সকলেই মেনে নিয়েছিলেন—অনেকটা দুধ ও জলের সংমিশ্রণের মত। মধুসূদন প্যারীচাঁদের ভাষাকে মেছুনীদের ভাষা বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এর কারণ প্যারীচাঁদ উপন্যাস ও কাহিনীর প্রত্যক্ষ উক্তিতে সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি চলিত ভাষার সাহায্য নেননি। হুতোম (কালীপ্রসন্ন) রঙ্গব্যঙ্গের জন্যই কলকাতা ককৃনির সাহায্য নিয়েছিলেন; খুব গভীর ও মননশীলতার ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন হুতোমি জ্যাঠামি ছেড়ে ক্লাসিক সাধুরীতির শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষার মধ্যে কলকাতার পথচারীদের অমসৃণ উক্তি, এমন কি বিকৃত রুচির অশ্লীল শব্দও স্থান পেয়েছে। এ ভাষায় প্রাক্-যৌবনের চাঞ্চল্যই বেশী; কিন্তু সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, একথা বিবেকানন্দের পূর্বে কোন বাঙালী সাহিত্যিক বলেননি। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'Calcutta Review' পত্রে বিশুদ্ধ চলতি ভাষার পক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন; সাধুভাষা বিশেষতঃ তৎসম শব্দের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতামত উগ্র ছিল বলে সরল ভাষার পক্ষপাতী বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেননি। অবশ্য শ্যামাচরণ বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই সর্বকর্মে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন। 'সবুজপত্রে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বকর্মে চলিত ভাষা প্রয়োগে উদারহস্ত হতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে'র মারফতে চলিত ভাষার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নিজেও কলকাতার চলিত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইদানীং কেউ কেউ তাঁকে চলিত ভাষা ব্যবহারের একমাত্র পুরোযায়ী

* 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' দ্রষ্টব্য।

বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহারের গৌরব সর্বাগ্রে বিবেকানন্দের প্রাপ্য।

শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিত ভাষার বৈয়াকরণ ও ব্যবহারিক যৌক্তিকতা আলোচনা করেছিলেন, হুতোম ব্যঙ্গবিদ্রূপে রসান চড়াবার জন্য কলকাতার বুলির সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোন চিন্তার ব্যাপার, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, তত্ত্বালোচনা—সমস্তই চলিতভাষায় চলবে,—একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, এবং নিজেও চলিতভাষা ব্যবহারে যেমন অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি নিজস্ব একটা ভাষারীতিও গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর চলিত ভাষার অনেকস্থলে তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হলেও, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি—সেই ভাষাই মনের ধাত্রী, এরকম একটা স্পষ্টধারণা তাঁর ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি লেখায় তাঁর মনের ভাব চমৎকার ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন—

> চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয়না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?…স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না…। ('ভাববার কথা')

তাই তিনি প্রস্তাব করলেন—"যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথাকওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করবেন।" একথাটাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন আরও একদশক পরে।

স্বামীজী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের হুবহু অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন—

> যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশিকৃত ফুলচন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ্‌রে সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে "রাজা আসীৎ"। আহা-হা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!— ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হল। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই। ('ভাববার কথা')

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরনধারণ, রীতিনীতি ও মুদ্রাদোষগুলিও তিনি পরিত্যাগ করেননি। তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত জীবন্ত; প্রাণবান জীবনরসিক

নিঃস্পৃহ বৈরাগীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে বলে তাঁর ভাষা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছে। হুতোমের স্ল্যাং বাক্‌রীতি বা পৌগণ্ডোচিত ধৃষ্টতা স্বামীজীর চলিত-রীতিতে নেই, অথচ খোলামেলা বৈঠকী রসিকতার প্রাচুর্য তাঁর গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের অন্তরালে অবস্থিত সদাহাস্যময় মনটাকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে। বীরবলের বুদ্ধির মারপ্যাঁচ ও কৃত্রিম কলাকৌশলও তাঁর ভাষায় স্থান পায়নি—যদিও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' এবং 'পরিব্রাজকে' দর্শন-ইতিহাস-সমাজ-সম্বন্ধে বহু মননশীল আলোচনা আছে। যথার্থ বলতে গেলে হুতোম বা বীরবল—কারো ভাষাই প্রকৃত সাহিত্যিক চলিত ভাষা নয়। হুতোমের ভাষা এতটা চলিত, ঘরোয়া ও বে-আব্রু যে, তাঁর ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রসন্ন মন্তব্য খানিকটা স্বীকার করে নিতে হয়।[১] প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও ড্রয়িংরুমবিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধ্যপূর্ণ। হুতোমের ভাষা একেবারে পথের ভাষা, বীরবলের ভাষা বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্রম্ভালাপের বাঙ্‌ময় পায়চারি। এর কোনটাই যথার্থ চলিত ভাষা নয়, স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে'র গদ্যই চলিত ভাষার আদর্শ। 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ষী; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত ঘরোয়া ঢঙটা বেশী ফুটেছে।

বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতি যে বিচিত্রমুখী—অনেকটা সহস্রমুখী বজ্রমাণিকের মত, তা বোঝা যাবে তাঁর উল্লিখিত দু'খানি পুস্তিকা থেকে। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা করি, সিদ্ধান্তে পৌঁছাই—সেই সহজ প্রত্যক্ষ সর্বজনবোধ্য চলিত গদ্যরীতির পক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজেও পত্র ও অন্যান্য রচনায় সাধ্যমত এই রীতি ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটির বৈশিষ্ট্য—শব্দযোজনায় তৎসম শব্দের স্বল্প ব্যবহার, বাক্যগঠন হ্রস্ব, ঢঙটা সংলাপের মত। যেমন:

> আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্তই করে, ত ইদিক-উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করেই হক, সমুদ্রে যাবেই, দু একদিন আগে বা পরে, দুটো ভালো জায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু' একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশহাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, ত আর ত এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই ত নয়। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে লক্ষ্য করতে হবে, এর ভাষাভঙ্গিমা বাধাহীন স্বচ্ছ, অনাবশ্যক তৎসম শব্দের প্রয়োগ নেই, লেখক চলিত ভাষার মুদ্রাদোষগুলিও ('ইদিক উদিকে')

---

১ হুতোমের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য: "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য।"

নিয়েছেন ; তাই বলে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে খড়্‌গহস্ত হননি। এর সঙ্গে বীরবলের রচনার যে কোন অংশ মিলিয়ে পড়লেই 'কৃষ্ণনাগরিক' প্রমথ চৌধুরীর বৈঠকীভাষার কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়বে। যখন প্রমথ চৌধুরী বলেন "প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়।"—তখন এ ভাষার চাকচিক্যে মুগ্ধ হলেও বার বার মনে হয় যে, এ দরবারী ভাষা এবং তা খাস-দরবারের অন্তর্ভুক্ত। "যাঁর বোধ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন ; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতালাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন"—বীরবলের এ সমস্ত উইটের ফুলঝুরি মার্জিত রুচির তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম—কিন্তু এ ভাষা মোজাইকের মত চিত্রবিচিত্র, ঝরণার মত ঝরঝরে নয়। স্বামীজীর ভাষা মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের জন্য নয়, বারোয়ারিতলায় ইতরভদ্রের জন্যই তাঁর ভাষাপ্রবাহে রয়েছে স্নানপানের উদার আহ্বান।

অতঃপর স্বামীজীর বিবৃতিমূলক পরিচ্ছন্ন গদ্যরীতির আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

> এবার ভূমধ্য সাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই—এসিয়া আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর একপ্রকার আকৃতি প্রকৃতি, আহার বিহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, আরম্ভ হল—ইউরোপ এল। শুধু তাই নয়—নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহু শতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে।
>
> ('পরিব্রাজক')

এখানে লেখক দুই সভ্যতার মিলনতীর্থকে নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই এতে ঘটনাবিবৃতি ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক কৌশল নেই। কিন্তু সাদাসিধে বর্ণনাই বিচিত্র রূপময় হয়ে ওঠে যখন আবেগের ছোঁয়া লাগে, তখন সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের কণ্ঠে কল্পনার খেলা শুরু হয়ে যায় :

> জাহাজ একবার সাদা জলের একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাভ, সামনে পেছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল ; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী ; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে।

এ বর্ণনায় তৎসম শব্দঝঙ্কারের প্রয়োজন ছিল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রোল্লাসের রূপধ্বনিময় চিত্রাঙ্কন শুধু তদ্ভব বা দেশজ শব্দেই সার্থক হতে পারে না ; তাই তিনি চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও প্রয়োজনস্থলে অনেক আভাঙা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেননি। যেমন ধরা যাক এই দৃষ্টান্তটি—"সে পর্বতনির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দিকসমুত্থিত ভাববিকাশমোহিনী সঙ্গীত মনীষি-মনঃ-সংঘর্ষসমুত্থিত চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত—তারও শেষ"। (পরিব্রাজক)। এখানে শুধু একটি-দুটি অসমাপিকা আর একটি সমাপিকা ক্রিয়া ভিন্ন আর সমস্ত শব্দই তৎসম, কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষণ ও বিশেষ্য মণিকাঞ্চনের মত দৃঢ়নিষণ্ণ, এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ সহায়ক ; আবার তিনি যখন স্নিগ্ধ মধুর বর্ণনায় লেখনী চালনা করেন, তখন আর এক প্রকার কোমল পেলব পরিচিত ও প্রসন্ন তদ্ভব দেশী শব্দের সাহায্য গ্রহণ করেন। যেমন :

> জলে কি আর রূপ নাই ? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, রাশি রাশি তাল নারিকেল, খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে·সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ—এতে কি রূপ নাই ? সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ, তাল নারিকেল খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে, ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজে কাঁড়ি ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে দুলচে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুর্কিস্তানি গালচে দুলচে কোথায় হার মেনে যায়, সেই ঘাস, যত দুর যাও, সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেছে । ('পরিব্রাজক')

এর মধ্যে বাঙলাদেশের শ্যামায়মান অরণ্যানী, পীত রৌদ্রস্নাত ধানক্ষেত আর নীলাম্বরী আকাশ যেন রঙের বাটিটি উপুড় করে দিয়েছে। স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার, চোখে দেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার আশ্চর্য সমন্বয় বাঙলাদেশের কোন্ গদ্যশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে সার্থক, প্রাণবন্ত, বর্ণধ্বনিময় হতে পেরেছে ? অথচ এ বর্ণনায় স্বামীজী কৃত্রিম কাব্যকলার মায়াঞ্জন একেবারেই ব্যবহার করেননি। চিঠিতে সমুদ্রের বর্ণনা দেবার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যরসসিক্ত বর্ণনা তাঁর ধাতে সয় না—"ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ্ করে স্বভাবের সৌন্দর্য কোথা পাই বল ?" কিন্তু বর্ণনধর্মী রচনায় স্বভাবোক্তি অনুসরণ করেও তিনি যে নিপুণ শিল্পসৃষ্টি করতে পেরেছেন, তার প্রমাণ এই ছত্রক'টি—যদিও এ বাক্‌রীতি বিলম্বিত, উপবাক্যের সমন্বয়ে একটু দীর্ঘ, তবু এর ভঙ্গিমায় শব্দের টঙ্কার ও ঝঙ্কার মিশে গেছে প্রতিদিনের পরিচিত বিবর্ণদৃশ্য বর্ণনার

সঙ্গে, এবং সেটা বেমানান হয়নি, কারণ এতে প্রচ্ছন্নভাবে কৌতুকের সুর মেশানো আছে।

> কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির-নীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুন, ডিঙুলুন, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ান্বিত ধূলিধূসরিত কলকেতার বড় রাস্তার ধারে, কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দেওয়ালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো মুখরিত একতালা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জেলে আঁবকাঠের তক্তায় বসে খেলো হুঁকো টানতে টানতে, কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। ('পরিব্রাজক')

স্বামীজীর বিবৃতিধর্মী চলিতগদ্যে কখনও লক্ষ্য করা যাবে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি (যেমন 'পারিব্রাজকে'র ভ্রমণ বর্ণনা ও ধর্ম-দর্শন আলোচনা), কখনও চলিত ভাষার মধ্যেই তৎসম শব্দের নির্ঘোষ, কখনও তৎসম-তদ্ভব-দেশজ-বিদেশী শব্দের একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে মিলে মিশে থাকার আশ্চর্য দক্ষতা। একই বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—"সেই নির্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্না গোণা যায়"—আবার তারই সঙ্গে, "কর্দমাবিলা হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা সহস্র-পোতবক্ষা কলকেতার গঙ্গার" বর্ণনা অবিরোধে স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি রূপরঙের নেশায় 'গঙ্গামায়ের শোভা' দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কখনও বা কল্পনা করে শিউরে উঠেছেন—"পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিম্নী।"

বিবেকানন্দ বিবৃতি ও বর্ণনাধর্মী চলিত গদ্যরীতির মধ্যে বহুস্থলে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, চলিত ভাষাতে এরকম গাঢ় বাক্‌পদ্ধতি সৃষ্টি তাঁর একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনপিনদ্ধ বা সমাসবদ্ধ দৃঢ়গাঁথুনির বাক্‌পুঞ্জের প্রতি তাঁর কোন অকারণ বিরাগ ছিল না, তিনি চলিত ভাষার অন্বয়ের মধ্যে তৎসম শব্দঝঙ্কারকে এমন চমৎকার মিশিয়ে দিতে পারতেন যে, ইদানীন্তন কালের কোন দুঃসাহসী লেখকও অতটা অগ্রসর হতে সঙ্কুচিত হবেন। যেমন স্বামীজীর এই বর্ণনা :

> ত্রিংশকোটী মানবপ্রায় জীব—বহু শতাব্দীযাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিপীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যৎ-বিহীন, যেনতেন প্রকারেণ বর্তমান প্রাণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ চাতুরী প্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন আশাহীনের সমুচিত কদর্য ভীষণ কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধময় মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের স্থায় ভারত-শরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরাজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

একটি মাত্র বাক্য, সমাসবদ্ধ শব্দের শিকল—যা অনিপুণ কারিগরের হাতে পড়লে জড়ীভূত রোমন্থনে পরিণত হতে পারত, এখানে স্বামীজীর বিচিত্র বয়নকৌশলে সেই ভাষায় ভারতীয়দের বর্তমান জাড্যের প্রতি বলদর্পিত পাশ্চাত্যের ঘৃণাধিক্কার চমৎকার ফুটেছে। এখানে এর চেয়ে হালকাছাঁদের শব্দ ব্যবহার করলে যথেষ্ট তীব্র হত না; তাই চলিত ভাষার মধ্যে তিনি অবলীলাক্রমে দেবভাষার সাহায্য নিয়েছেন; আবার পাশ্চাত্যের প্রতি আমাদের অজ্ঞ মনোভাব কৌতুকঘৃণামিশ্রিত ভাষায় চমৎকার ফুটেছে :

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছ-বিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভালরে বাপু! ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

আমাদের বক্তব্য হল, চলিত রীতিতে তিনি শুধু তদ্ভব ও দেশী শব্দ ব্যবহার করেননি, বহুস্থলে প্রায় মুখের কথার প্রচলিত ঢঙটাকেও নিয়েছিলেন। হুতোম টানা গদ্যরচনায় এই নাটকীয় রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন[২], উত্তর কলকাতার পুরানো বাসিন্দাদের ভাষারীতি, যা হুতোম কলমবন্দী করেছিলেন ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচা দেবার জন্য, বিবেকানন্দ সেই মুখের ভাষাকেই বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন; অবশ্য কোন কোন স্থানে কৌতুকরসের জন্যই তিনি এই মৌখিক সংলাপের ঢঙটা নিয়েছেন। যেমন—"খাবার সময়ে শত ছোরার চক্‌চকানি, আর শত কাঁটার ঠক্‌ঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ায় ত আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘাঁচ করে ছুরিখানা তাঁর গায়েই বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা! বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিকনেস হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের গোঁসাইজী ত কিছুই বলেন না।" এ ভাষার কৌতুক রসটাকে একেবারে আটপৌরে ভাবে পরিবেশন করেছেন, এ ভাষা এখনও ভদ্রাভদ্র সকলেই ব্যবহার করে থাকি। স্বামীজী প্রতিদিনের প্রচলিত মুখের কথাকে কোনও দিন অসম্মান করেননি, চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। তু-চারটির দৃষ্টান্ত—

---

২ কলকাতার চড়ক পার্বণ উপলক্ষে হুতোমের রঙ্গরসপূর্ণ তীক্ষ্ণ উক্তিতে নাটকীয়তা বেশ কৌতুকপূর্ণ হয়েছে—"আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেছেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু করবেন।…আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে, আবার ফি বুধবার সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদভিন্ন অন্যভাষায় তাঁকে ডাকলে তিনি বুজ্‌তে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না?"

থ্যাদা-বোঁচা ভাইবোন; হাঁকোচ-হাঁকোচ গরুর গাড়ী; দ্যাল (দেয়াল); বে (বিয়ে); ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-কায়েতের বাপদাদা করেছে; লাথি ঝাঁটা; হাত চুব্‌ড়ে সপাসপ দালভাত খাই; সোঁদোর বন; যাত্রীরা ন্যাকার করে অস্থির; আদুড় গা; জাতের দফা ঘোলা হচ্ছে; ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পীরিতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন; মাগ; আদাড়ে; মাগী; বিবি পর্যন্ত বে' করা চলে; এঁড়েলাগা ছেলে; গো-বেড়োন দিলে; ছুঁতছাঁতের ন্যাঠা (ল্যাঠা); শোরের মাংসো; চক্কর; পা কেটে চৌচাক্‌লা; হাতপা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে; ভুঁড়িনাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন, কলের জলের তুশো বাপান্ত করে।

এখানে খুব বেছে বেছে উদাহরণ তোলা হয়নি, যেমন চোখে পড়েছে তেমনি তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এ শব্দগুলি অধিকাংশই আমরা ঘরে ব্যবহার করি, বাইরে হয়তো একটু পোষাকী পালিশের সাহায্য নিই। স্বামীজী 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও' পাশ্চাত্ত্যে' লঘু-রসের কথায় এরূপ শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন—এমন কি গম্ভীর আলোচনাতেও কলমের ডগায় নেমে-আসা প্রাকৃত শব্দকে সরিয়ে দেননি। জীবনে তিনি ছুঁতমার্গের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, ভাষাতেও ছুঁই-ছুঁই বাতিক তাঁর একেবারেই ছিল না। প্রমথ চৌধুরী এরকম খিড়কীদরজার শব্দকে কখনও সুসজ্জিত বৈঠকখানায় ঢুকতে দিতেন না। ফরাসী বৈদগ্ধ্যে আযৌবনলালিত বীরবল চলতি ভাষা ব্যবহার করছেন বটে, কিন্তু তাকে 'মে-ফ্লাওয়ারে'র শাসনে সুভব্য করে তুলেছেন।

॥ ৪ ॥

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা রীতিকে যে রকম চমৎকার রসিকতা ও রঙ্গ-ব্যঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সদাগম্ভীর বাঙালী উচ্চ সমাজে তার জুড়ি মেলা ভার। রসিকতা প্রসন্ন মনের ধর্ম, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ক্ষুব্ধ মনের ধর্ম। মাঝে মাঝে স্বামীজী রসিকতা করতে করতে তীব্র বিদ্রূপের ঝাঁঝালো শব্দ নিক্ষেপ করেছেন বটে, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন জীবনরসিক—যে বৈশিষ্ট্যটি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। খুব উদার হিউমার অনেক সময় সাধুভাষাতেই যেন বেশী জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিবেকানন্দের বাংলা রচনার যত্র-তত্র চলিত ভাষার আশ্চর্য পরিহাস ও তির্যক ব্যঙ্গের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাবে। 'পরিব্রাজকে' সুয়েজখালের হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় হাঙ্গরের প্রতি সম্ভ্রম বাচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে সহজ রসিকতাকে তিনি মজলিসী করে তুলেছেন:

> মনে হল উনি বুঝি হাঙরের বাচ্চা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বেনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে ; ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল।

হাঙর ধরা দেখবার জন্য তাঁরা জাহাজের ডেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন :

> আমরা উদগ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য, 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সখি, শ্যাম না এলো।'

তার পর কি ভাবে হাঙর টোপ গিলে কোনও প্রকারে টোপের বঁড়শি খুলে পালাল, অন্য একটা 'বাঘা' হাঙরের আবির্ভাব হল, শূয়োরের মাংসসমেত বঁড়শি গলাধঃকরণ করল, তারপর 'দে টান, দে টান' করে তাকে জাহাজের ডেকে তোলা হল, স্বামীজী তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। "সাদা লাল জরদা" রঙের বঁড়শিবিদ্ধ শূয়োরের মাংসের রঙিন উপমাটিও grotesque রসের আশ্চর্য উদাহরণ—"আসল ইংরেজি শূয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙ-বেরঙ্গের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে—" একেই যথার্থ মজলিসী রসিকতা বলে। তার পর টোপে গাঁথা বিরাট হাঙর ধরা, জাহাজে টেনে তোলা, 'ফৌজিম্যানে'র মুমূর্ষু হাঙরের ওপর দুম্‌দুম্ করে কড়িকাঠ প্রহার করে বীরত্ব প্রকাশ করা এবং সর্বোপরি করুণহৃদয় মহিলাদের শোকার্ত বিলাপ বর্ণনা ("আর মেয়েরা—আহা কি নিষ্ঠুর, মের না, ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল—অথচ দেখতে ছাড়বে না!") অনাবিল রসিকতার সার্থক দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ এই জাতীয় রসিকতা এমন একটি প্রসন্ন অথচ নিঃস্পৃহ মনের ধর্ম, যা বৈরাগ্য-ব্রতীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বামীজী তো গিরিদরীবাসী মুমুক্ষু সাধকমাত্র ছিলেন না, জগৎ ও জীবনের অন্তস্তলেই তিনি তাঁর আসন পেতেছিলেন ; তাই প্রতিদিনের জীবনের অসঙ্গতি, হাস্যপরিহাস তাঁর বিশালহৃদয়কে সুধারসে সিক্ত করেছিল। তাঁর এই ব্যঙ্গরঙ্গ ও পরিহাস কি রকম অর্থবহ হয়েছে, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে :

> ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এদেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড়না কেন? তোমাদের দুচার জনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন করতে হবে বুঝি? ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')

এখানে পরিহাস তীব্র ব্যঙ্গের রূপ ধরেছে। আর্যামির অভিমান আর সমাজের

নিম্ন বর্ণের প্রতি ঘৃণা, স্বামীজীকে রুদ্ররোষে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে বার বার। উচ্চবর্ণের প্রতি তাঁর ধিক্কারবাণী এখনও অর্ধশতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসছে—"আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্‌'৩ বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি!" এই অতীতজীবী আভিজাত্যকে বিদ্রূপ করে তিনি ধারালো কণ্ঠে বলেছেন—"এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরুমরীচিকা, তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূতকাল, লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট সব একসঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন!" বলতে বলতে তিনি ভারতের হীন অন্ত্যজ মানুষের দিকে চেয়ে দেখলেন—দেখলেন ভারতের মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়াহ্‌ গুরু কি ফতে' বলে নতুন ভারত বেরিয়ে আসবে। সেই ভাবী ভারতের নবজাগরণ লক্ষ্য করে স্বামীজী যেন দিব্যদৃষ্টির দ্বারা আগামী কালকে প্রত্যক্ষ করলেন:

> তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপ্‌ড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। ('পরিব্রাজক')

এ যেন স্তোত্র—'প্রাণায় স্বাহা' বলে পূষণের কাছে হবিঃ দানের দিব্যমুহূর্তে উচ্চারিত উজ্জীবন মন্ত্র।

বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করা হয়নি; বাংলা গদ্য গঠনে তিনি যে অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন, তৎসম-তদ্ভব-দেশজ শব্দ, বাইরের ভব্য ভাষা এবং ঘরের আটপৌরে ভাষার আশ্চর্য মিল ঘটিয়েছেন, তার স্বরূপলক্ষণ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে। চলিত-ভাষাকে তথাকথিত বিদগ্ধ ভব্যরূপ না দিয়ে তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ ও রস সঞ্চার করে তিনি চলিত গদ্যকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন, নানা কারণে তার দিকে সে যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ততটা আকৃষ্ট হয়নি। 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পর থেকে প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা চলিত গদ্যরীতি যখন যথার্থ সাহিত্যের দরবারের আসনটিকে জবর দখল করে নিলে, তখনও বড় কেউ

---

৩ আর্যামির নিন্দা করে তিনি 'পরিব্রাজকের' এক জায়গায় এই 'ডম্‌ম্‌ম্‌' এর উল্লেখ করে বলেছেন—"একটা ডোম বল্‌ত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌!"

ভেবে দেখেননি যে, তারও পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলা গদ্যের যথার্থ রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং এর সাহায্যে বাক্‌রীতির নানা বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের লঘুকরণই যে চলিত রীতির প্রধান লক্ষণ নয়, তা স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পড়লেই বোঝা যাবে। চলিত রীতির বড় কথা—চলতিজীবনের ইডিয়ম, বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনের নতুন রীতি, শব্দ বিন্যাসের রূপান্তর। সাধুভাষার ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ছোট করে ছেঁটে দিলেই কিছু চলতি ভাষা হয় না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়?" এই উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, সাধুভাষার ক্রিয়াপদ-সর্বনামকে ছোট করলেই কি চলিত ভাষা হয়? সে কথা বিবেকানন্দ বিশেষভাবে বুঝতেন, এবং বুঝতেন বলেই তাঁর ভাষা যথার্থ মুখের ভাষার সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে, বিদগ্ধ ইষ্টগোষ্ঠীর রসচর্বণায় পর্যবসিত হয়নি।

ভারতে নূতন শিল্পজিজ্ঞাসা ও শিল্পান্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

যে সব বিভিন্ন উপায়ে মানুষ তার প্রতিভার স্বাক্ষরকে চিরায়ত করে রাখবার চেষ্টা করেছে শিল্প তার অন্যতম। ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বকীয়তা বা আত্মস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহনেও শিল্প যুগে যুগে প্রভূত বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। ফলে যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে সেই জাতির রূপশিল্পের পর্যালোচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ইউরোপের নবজাগরণের মূলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জীবন-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের শিল্পকলার সমীক্ষণ এবং অনুধ্যান কতদূর প্রভাববিস্তার করেছিল ইতিহাসের পাঠকের কাছে তা অজানা নয়। ইউরোপের এই নবজাগরণ গোড়ার দিকে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রাচীন গ্রীকোরোমক শিল্পের অনুধ্যান এবং অনুরূপ আদর্শানুগ নূতন শিল্পসৃষ্টির ভেতর দিয়েই ব্যাপকভাবে প্রকাশ হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীকে নানা কারণে ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের উন্মেষকাল বলা হয়ে থাকে।

এই যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয় এবং যুগোপযোগী যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির উপর এই প্রাচীন সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করবার আয়োজন সুরু হয়। এই নবমূল্যায়নে প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্যের অনুশীলনই প্রধান স্থান অধিকার করে। শুধু অনুশীলন নয় সেই আলোকে নূতন পথনির্দেশের প্রয়াসও এই যুগেই আরম্ভ হয়। কিন্তু সংস্কৃতির অন্যতম বাহন শিল্পকলা সম্পর্কে এই নূতন যুগবিন্যাসের আদিতে বড় একটা সচেতনতা দেখা যায় নাই। এদিকে ভারতের শিল্পসম্পদ কিন্তু ইউরোপের তুলনার কম সমৃদ্ধ বা প্রাচুর্যপুর্ণ ছিল না। তা সত্বেও— এদিকে সংস্কৃতির দিকদর্শকদের দৃষ্টি নানা কারণে আকৃষ্ট হয় নাই। প্রধানত কলকাতাই ছিল ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসার, ক্রিয়াশীলতার কেন্দ্র; আর এর প্রসার ছিল প্রধানত উত্তর ভারতে। এই সব অঞ্চলে প্রাচীন সংস্কৃতির সঞ্চয় অসংখ্য পুঁথি-পুস্তকে বিধৃত থাকলেও শিল্পকলার নিদর্শনের দিক থেকে এ অঞ্চল নিতান্তই দরিদ্র। আর বাঙ্গালী সমাজও ধারাবাহী এবং উচ্চ স্তরের শিল্পকলা সম্পর্কে ছিল নিতান্তই অনবহিত। এখানকার শিল্প সচেতনতা যা কিছু ছিল তা ছিল কারুশিল্পে তথা প্রতিমা ও পটশিল্পে বিধৃত। নূতন সভ্যতার আলোকে গড়ে ওঠা কলকাতার

সহুরে সমাজে প্রচলিত এই কারুশিল্প সম্পর্কে বড় একটা দরদ বা সচেতনতা ছিলনা।

ইতিমধ্যে ভারতের শিল্পকলার কিছু কিছু নমুনা পাশ্চাত্ত্যের অনুসন্ধানীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ভারতের সাহিত্য বা দর্শনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু কিছু দরদী ইউরোপীয়ের সহানুভূতিশীল মন্তব্য প্রচারিত হলেও ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে ইউরোপীয় সমালোচকদের মন্তব্য গোড়াতে অনুকূল বা যুক্তিসহ ত হয়ই নাই, বরং তা নিতান্তই প্রতিকূল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক ও শিল্পবেত্তা জন্ রাস্কিনের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতশিল্প সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য আজ আর ইউরোপীয় রসজ্ঞেরা নির্ভরযোগ্য বলে মনে না করলেও ঐ মন্তব্য সে যুগের ইউরোপীয় সমাজের ভারতশিল্প সম্পর্কে মূল্যবোধের মান হিসাবে সহজেই গ্রহণ করা যায়।

এই সময়েই প্রাচীন ভারতের পুরাবস্তু সম্পর্কে ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত সর্বপ্রথম দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী—আলেকজাণ্ডার কানিংহামের নামই সর্বাগ্রগণ্য। অল্প কয়েকজন আগ্রহশীল সহকারীর উৎসাহে এবং আনুকূল্যে কানিংহাম সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর ও পত্তনগুলির অবস্থানস্থলের অন্বেষণ এবং বহু পুরাবস্তুর উদ্ধারসাধন করেন এবং ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট পরিচয় এইভাবে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপনীত হয়। উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি মন্দির ছাড়া প্রাচীন ভারতের শিল্পকীর্তিগুলি স্বভাবতই মানুষের দুরধিগম্য অঞ্চলে থাকায় বিধ্বংসী মুসলিম কোপ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। কানিংহাম ও তাঁর যোগ্য সহকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেগুলির পুনরুদ্ধারের পথ প্রশস্ত হল। এরই ফলে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে চৈতন্যের সঞ্চার হল; প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার ও অনুসন্ধানকল্পে এই শিল্পকলার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধ হল।

পরাজিত ও পরপদানত ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য স্বভাবতই এক শ্রেণীর ইউরোপীয়ের মনঃপূত হয় নাই। এঁদের মধ্যে অনেকে ভারতবাসীদের সাম্প্রতিক দুর্বলতাকেই জোরের সঙ্গে প্রচার করে সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাঁরা ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকেও হীন ও পরনির্ভর প্রতিপন্ন করতে যত্নশীল হয়েছিলেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অনেকে হিন্দুদর্শনে গ্রীকদর্শনের প্রভাব, হিন্দু নাটকে গ্রীকনাটকের প্রভাব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। এর পর ক্রমে ভারতের অপ্রমেয় শিল্পৈশ্বর্য উদ্ঘাটিত হলে তাঁরা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না।

এই শিল্পের মৌলিকতা সম্পর্কে তাঁরা নানাপ্রকার তত্ত্বের অবতারণা করতে শুরু করলেন। এই সব তত্ত্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান তত্ত্ব ছিল যে, আলেকজাণ্ডারের ভারতে আসবার আগে ভারতে শিল্পকলার বিশেষ কোন অস্তিত্ব ছিল না; ভারতীয়দের মধ্যে বেদের আমলে নানা দেবদেবীর পরিকল্পনার প্রচলন থাকলেও বৈদিক আর্যেরা মূর্তিনির্মাণে বা মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ছিল না। ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের কয়েক শত বৎসর পরে গ্রীকোরোমক শিল্পীরা বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করে এবং অন্যান্য ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি এর পরে অনেকটা ঐ গ্রীকোরোমক আদর্শেই নির্মিত হতে থাকে। প্রখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ ফুঁসে ও গ্রুনওয়েডেল এই তত্ত্বের প্রবর্তন করবার পর ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা এই মতের পরিপোষণ করতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতশিল্পের পরিচয় এই ভাবেই অগ্রসর হতে থাকে।

ভারতবাসীদের নিজস্বদৃষ্টিতে এদেশের শিল্পকলার সম্বন্ধে কোন বিস্ময় বা কোন প্রকারের জিজ্ঞাসার ভাব ছিল না। শিল্প ছিল জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তার ধর্ম; আর ধর্মকে পরিব্যক্ত এবং রূপগ্রাহ্য করবার যন্ত্র ছিল তার শিল্প। আত্মতত্ত্বের নানা গূঢ়াতিগূঢ় উপলব্ধি যেমন সাধারণ মানুষের সহজ আয়ত্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তেমনি শিল্পের সহজ আবেদনও —রূপাভিব্যক্তির ব্যাকরণকে অতিক্রম করে সাধারণের অধিগম্য হয়েছিল। অতএব নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করে সমাজ তার শিল্পসম্বন্ধে কলাকৌশল ও তাত্ত্বিক আলোচনাকে পুথির পাতায় তুলে রেখে তার সহজ রসের আবেদন নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল; শিল্পসম্পর্কে তার কোন দ্বিধা বা সংশয় ছিল না। শিল্প তার ধর্মের মতই সহজাত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। সহসা ইউরোপীয় পণ্ডিতের গবেষণায় তার দেবদেবীর রূপ গ্রীকোরোমক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে নির্ণীত হলেও তাকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে নাই।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলে এই নূতন প্রবর্তিত মতে এক ঘোরতর অবিশ্বাস ও সংশয়ের সঞ্চার হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশেষ করে শিল্পসম্পর্কে অনেক ভারতীয় লেখকও বিশেষ কোন অনুসন্ধান বা গবেষণা না করেই—গ্রীকোরোমক প্রভাবের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু এ অবস্থা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিধর্ম নিয়ে নিজেদের শিল্পকলার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম স্মরণ করা যেতে পারে সেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে তিনি অল্পবয়সেই চিন্তাজগতে

আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য করে নেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশী সরকার তাঁকে রাজা উপাধিতেও ভূষিত করেন। সরকারী কাজে তাঁকে উড়িষ্যায় যেতে হয়েছিল। এবং উড়িষ্যার শিল্পসম্পদ তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষের শিল্পকলাসম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দেন। নানা কারণে রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টি একটা সামগ্রিক রূপ নিতে পারে নাই। তা হলেও উড়িষ্যার মন্দিরের গঠনপ্রণালীকে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি এই মন্দির গঠনকৌশলের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আজও দেখা যায় নাই। তিনি তাঁর 'ইন্দোএরিয়ান্স' নামক গ্রন্থে ভারতের মূর্তিশিল্প সম্পর্কেও যথেষ্ট মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর এই সব আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা ও মৌলিকতা থাকলেও তিনি বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করে যেতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের শিল্পকলা নিয়ে তাঁর গবেষণা যথেষ্ট মূল্যবান হলেও—এদেশের শিল্পসংক্রান্ত মৌলিক নানা সমস্যা সম্পর্কে তিনি সমাধান রেখে যেতে পারেন নাই। রাজেন্দ্রলালের পরে অনেকটা তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ও ভারতের শিল্পকলার সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেন। তাঁরও গবেষণার ক্ষেত্র ছিল উড়িষ্যা; কিন্তু ভারতশিল্পের উদ্ভবের মৌলিক সমস্যা নিয়ে তিনিও বিশেষ কিছু আলোকপাত করতে পারেন নাই।

ভারতীয় শিল্পকলার পরিচিতি ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবস্থা যখন এমনি অনিশ্চিত তখন ভারতশিল্পে গ্রীকোরোমক প্রভাব সম্পর্কে যাঁরা প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তাঁরা অবাকবিস্ময়ে শুনলেন ভারতের এক তরুণ সন্ন্যাসীর দৃপ্ত কণ্ঠে তাঁদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। কাল ও স্থানের নির্বাচনে তাঁর এই প্রতিবাদের গূঢ় তাৎপর্যও সহজেই অনুমান করা যায়।

স্বামীজী এই সময়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর ঐতিহাসিক পর্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে জয়মুকুটে বৃত হয়ে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপরে আবার এক পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণে তিনি লণ্ডন হয়ে প্যারীতে উপনীত হন। স্বভাবতই প্যারী তখন ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু—সংস্কৃতির পীঠস্থান। সাধারণ ও মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রেই যে প্যারীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা নয়, ইউরোপীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রেও প্যারী তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার

ক্ষেত্রেও প্যারীর মনীষীদের প্রতিভা যথেষ্ট সচেতন ছিল। আগামী যুগের সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র আমেরিকাতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির জয়পতাকা উড্ডীন করে স্বামীজী ইউরোপে তাঁর বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর এই প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসাবেই প্যারীর এক ধর্মসভায় তিনি ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তার ভারতীয়ত্ব প্রতিপন্ন করেন। ভারতীয় শিল্পের এই মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার জন্য তিনি প্যারীর এই জনসভাকেই কেন বিশেষ-ভাবে নির্বাচিত করেছিলেন তার কোন সুস্পষ্ট কারণের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ভারতশিল্প সম্পর্কে ফরাসী শিল্পসন্ধানীদের আলোচনাই বেশী অগ্রসর ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজদের ভারতসাম্রাজ্যে প্রভূত শিল্পসম্পদ থাকলেও সে সম্পর্কে ইংরাজ অনুসন্ধানীরা যে পরিমাণে অবহিত হয়েছিল, ফরাসীদের প্রাচ্য-সাম্রাজ্য ইন্দোচীনের শিল্পকলা সম্পর্কে তারা অনেক বেশী অবহিত ছিল। ভারতের সংস্কৃতিপুষ্ট চম্পা ও কম্বোজের [তৎকালীন ফরাসী ইন্দোচীন] শিল্পসম্ভার আহরণ করে ফরাসীরা প্যারীর বহু মিউজিয়াম বিশেষ করে Musse Guimet-কে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। সুদূর ইন্দোচীনে সুপ্রাচীনযুগের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্তী এবং তৎসমৃদ্ধ শিল্পসম্ভার দেখে স্বভাবতই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। ভারতসংস্কৃতির এই বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে ফরাসী সভ্যতায় যে হীনমন্যতার সঞ্চার হয়েছিল তারই অপনোদনকল্পে ফরাসী পণ্ডিতেরা ইন্দোচীনে তথা বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধশিল্পের মূলানুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। এই অনুসন্ধানেরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পের আদি বিন্দুর অনুসন্ধান, ও সেই অনুসন্ধানপ্রয়াসে গান্ধারশিল্পে গ্রীকোরোমক শিল্পের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করে তাঁরা কিছু পরিমাণে নিজেদের মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আশ্বস্তি লাভ করে-ছিলেন। এতৎসংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ফুঁসের 'লা আর্ট গ্রীকোবুদ্ধিক' (*La art Greko-buddhique*) ফরাসী ভাষাতে রচিত হয়। এই গ্রন্থ 'বিগিনিংস অফ বুদ্ধিষ্ট আর্ট ইন ইণ্ডিয়া' (*Beginnings of Buddhist Art in India*) নামে ইংরাজীতে পরিবেশিত হলে সেই গ্রন্থই ভারতশিল্প সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ইয়োরোপীয় আদর্শসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে সমস্তযুক্তিবিচারের দ্বারা স্বামীজী ফুঁসের প্রচারিত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি তথা দুরূহ শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন ও মননের পরিধি কত গভীর হলে তাদের গণ্ডীর মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা যায় তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। অবশ্য শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই সহজ পদ-বিক্ষেপ ও সহজ বিচরণ কেবল মাত্র অধ্যয়ন ও মননের ফলেই সম্ভবপর

হয় নাই, এর পেছনে স্বামীজীর সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন এবং ভারতের অসংখ্য শিল্পতীর্থগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বস্তুত এর আগে সচেতন ও বিচারশীল মন নিয়ে কোন ভারতবাসীই ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলি তথা ভারতের শিল্পের অপ্রমেয় ঐশ্বর্যকে চোখ মেলে দেখেন নাই। ফলে স্বামীজীর রচনায় শিল্পকলাসম্পর্কে যে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্য কোন মনীষীর রচনায় তা পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বেই বলেছি যে, বাঙালী মনীষীদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ভারতের শিল্পকলাসম্পর্কে কিছু বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু উড়িষ্যার বাইরে বৃহত্তর ভারতখণ্ডে যে মহান শিল্পৈশ্বর্যের সঞ্চয় রয়েছে সে সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল সামগ্রিকভাবে কোন আলোচনা করেন নাই। ভারতশিল্পের মৌলিকতা নিয়েও তাঁর লেখনী খুব বেশী কিছু রেখে যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজীর ভ্রমণব্যপদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির ও শিল্পকীর্তিগুলি সম্পর্কিত নানা মন্তব্য এবং ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বামীজীর আলোচনা ও নির্দেশদান যে পরে শিল্পের সমালোচনার ক্ষেত্রে যুগবিপ্লব এনেছিল এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে তাকে নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কানিংহাম ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। এই শিল্পকলার বিচার-বিশ্লেষণ করে তার মুল্যায়নের বড় একটা চেষ্টা করেন নাই। তা হলেও তাঁর রচিত *Tree and Serpent worship in India*-তে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগাযোগের সূত্রটিকে এক ভ্রান্ত ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় শিল্পে কানিংহাম বৃক্ষ ও সর্প পূজায় ব্যাপৃত ভারতবাসীর মননকল্পনার প্রতিফলনই লক্ষ্য করেছিলেন। বস্তুত মূর্তির অবর্তমানে বৌদ্ধসমাজে ভগবান বুদ্ধের প্রতীকরূপে বোধিবৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের দৃশ্যসম্বলিত শিলাফলকগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা করা বা অনুরূপ নানা ফলক, আলেখ্যচিত্র এবং প্রতিমার প্রকৃত পরিচয় উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এর পর শিল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ভিন্সেণ্ট স্মিথ। ভারতীয় সিভিল সার্বিসের সভ্য স্মিথ সাহেবই ভারতীয় ইতিহাসের একটি সামগ্রিক পরিচয় গ্রন্থাকারে রচনা করে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু স্মিথ সাহেবের ইতিহাস রচনার পেছনে নিছক ভারতপ্রেম অপেক্ষাও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যে অধিকতর ক্রিয়াশীল ছিল একথা আজ আর গোপন নাই। তিনি ভারত ও সিংহলের [*History of Fine Arts in India & Ceylon*] চারুকলার একখানি ইতিহাসও সংকলন করেছিলেন। ইতিমধ্যে

অজন্তার বিস্ময়কর চিত্রসম্পদও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। গান্ধার ও মথুরার বৌদ্ধশিল্প, ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপ, প্রাচীর, ও স্তূপতোরণে উৎকীর্ণ বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্র-ফলক, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের বিচিত্র আকৃতি এবং মন্দির-প্রাচীরে খচিত মূর্তি, অজন্তার ভিত্তিচিত্রের সমারোহ এবং সিংহলের ডাগোবা ও মূর্তি ইতিমধ্যেই শিল্পরসিক মহলে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। এই সব উপকরণ অবলম্বন করে স্মিথ ভারতশিল্পের এক ধারাবাহিক বিবরণ রচনা করেন। ভারতবাসীদের প্রতীকপ্রীতি ও প্রতীক-মাধ্যমে ভাবপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য কিছুটা স্মিথ সাহেবের জানা থাকলেও এই জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার তিনি করেন নাই। অবশ্য ভারতশিল্পের ব্যাখ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যতটা গভীর জ্ঞান এবং সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন ভিন্সেন্ট স্মিথের তা ছিল না। স্মিথও ভারতশিল্পের বিবর্তনের মৌলিক সূত্রটি সম্বন্ধে গ্রীকোরোমক প্রভাব সম্পর্কিত ইউরোপীয় ধারণা-নিরপেক্ষ কোন স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পারেন নাই।

এর পর ভারতশিল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে হ্যাভেল নামে একজন সংবেদনশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। হ্যাভেল ছিলেন শিল্পী; প্রথমে তিনি ভারতীয় শিক্ষার্থীদের শিল্প-শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাজে আসেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁর মাদ্রাজে থাকা হয় নাই। অচিরেই তাঁকে সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের ভার নেবার জন্য কলকাতায় আনা হয়। ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের তখন ইউরোপীয় ধারার অঙ্কনবিদ্যাই শেখান হত। সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় আদর্শের ছবি আঁকা শেখাবার বা মূর্তিনির্মাণ শেখাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হ্যাভেল সায়েব মাদ্রাজে থাকতে সেখানকার মন্দিরগঠনের বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষিণী মূর্তিকলার কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় তাঁকে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষের পদাধিকার-বলে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের আর্ট সেকসনের কর্মাধ্যক্ষেরও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এইখানে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে ভারতীয় শিল্পের মোহজালে জড়িয়ে পড়তে হয়। আর্ট সেকসন তখন নূতন করে সাজান হচ্ছে; বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রস্থ থেকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে শুধু অত্যন্ত মূল্যবান প্রস্তর-ভাস্কর্যের সমাবেশই করা হয় নাই, তার আর্ট সেকসনে ভারতীয় শিল্পসামগ্রীর, বিশেষ করে রাজপুত ও মুঘলচিত্রকলার এক বিপুল সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। এই শিল্পৈশ্বর্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে হ্যাভেলের মনে ভারতশিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হয়। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে ভারতীয় রীতিতে চিত্রাঙ্কনশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনিই বিশেষ আগ্রহ করে এই সরকারী আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিয়ে আসেন।

ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর পর থেকেই অনুমোদিত শিক্ষণসংস্থায় ভারতীয় রীতির শিল্পচর্চার ব্যবস্থা করা হয় এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় রীতি কিছু পরিমাণে সমর্থন লাভ করে।

কিন্তু প্রবল আগ্রহই কোন কার্যসিদ্ধির পক্ষে একমাত্র উপকরণ বলে গণ্য হতে পারে না। অজন্তা বা ইলোরার প্রাচীরগাত্রের চিত্রকলা, বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা ধরনের মূর্তি বা মুঘল এবং রাজস্থানী কলমের অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাকৌশল এবং এইসব শিল্পের অন্তর্নিহিত আবেদনের সঙ্গে তখনও ভারতশিল্পের আগ্রহশীল অনুশীলনকারীদের সম্যক পরিচয় হয় নাই। বস্তুত শিল্পকলা সম্পর্কে আগ্রহ তখনও প্রারম্ভিক স্তর অতিক্রম করে নাই, কেননা ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য এবং আবেদনসম্পর্কে, এই শিল্পের দর্শন ও তত্ত্বগত দিকটি সম্পর্কে চেতনা তখনও দানা বাঁধে নাই।

ঘটনাচক্রে এই সময় কলকাতায় ভারতশিল্পে আগ্রহশীল কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর সমাবেশ হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন জাপান থেকে সমাগত শিল্পজ্ঞানী ওকাকুরা এবং সিংহলনিবাসী ভারতীয় পিতা ও ইউরোপীয় মাতার সন্তান আনন্দ কুমারস্বামী। সিংহলের শিল্পকলা সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই শিল্পের উৎস সন্ধানে কুমারস্বামী ভারতে আসেন। ইনি ব্যবহারিক জীবনে ছিলেন ভূতত্ত্বের স্নাতকোত্তর উপাধিধারী বৈজ্ঞানিক; শিক্ষার ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্রের ও রসায়ন বিদ্যার জ্ঞান ও ইউরোপের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কুমারস্বামীর পরবর্তী জীবনের পরিণতিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, কিন্তু কলকাতায় ওকাকুরা-চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে এক বিশিষ্ট পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। ওকাকুরা এসেছিলেন প্রত্যক্ষত ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা পৃথিবীখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে স্বদেশে আহ্বান জানাতে এবং সেই সঙ্গে ভারত সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। এখানে গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্তী নবপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর শিষ্যা এবং গভীর অধ্যাত্মশক্তি ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী আইরিশ মহিলা ভগিনী নিবেদিতার ভাব ও আদর্শের বিনিময় ঘটে। জাপানে প্রচলিত শিল্পদর্শন সম্পর্কে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই মনীষী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সাহায্যে ও সাহচর্যে ভারতীয় শিল্পদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয় করেন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভে স্বামীজীর প্রভাবই ছিল ওকাকুরার প্রধান অবলম্বন। ভারতের শিল্প যে, ভারতীয় জীবনাদর্শ তথা ভারতীয় ভাবকল্পনা এবং ভারতীয় দর্শনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং পুষ্ট হয়েছিল এ ধারনাও ওকাকুরা ঐ সূত্র থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন এবিষয়ে আমার কোনোই

সন্দেহ নাই। অবশ্য ওকাকুরাকে আমরা ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগের সন্ধানে জোড়াসাঁকোতে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় এবং পরে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশ্রমেও সমবেত হতে দেখি। কিন্তু এই সূত্রে যে তিনি ভারতীয় শিল্পের তত্ত্বগত বা দার্শনিক দিক সম্পর্কে অবহিত হন নাই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় ধরনে চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হয়ে থাকলেও অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় শিল্পশৈলীতে গোড়ার দিকে ভারতীয় ভাবাদর্শের কোন বিশেষ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। এই সময় নব্যবঙ্গীয় শৈলী, চিত্রের ভারতীয়ত্ব সম্পাদনে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককৌশলের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল—ভারতীয় শিল্পের তত্ত্বগত ভাবাদর্শের দ্বার তখনও এই নূতন পথসন্ধানীদের কাছে ভাল করে খোলে নাই। ক্রমে বিষ্ণুপুরাণে (বিষ্ণু ধর্মোত্তরে) ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ :

> রূপভেদ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম্
> যাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্র ষড়ঙ্গকম্—

এই বিখ্যাত শ্লোকের সঙ্গে পরিচয়[১] এবং ভারতীয় শিল্পের অঙ্গসংযোজনের তাত্ত্বিক ও সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য[২] সম্পর্কে এই গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অজন্তার গুহাপ্রাচীর গায়ে বিস্তৃত ভিত্তিচিত্রের লুপ্তোদ্ধার। এরই ফলে ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে।

ঠাকুর পরিবারে গতানুগতিক ভারতীয় আদর্শের অনেক পরিমার্জনা হয়ে ছিল। এক সময়ে এই পরিবারে ইউরোপীয় আদর্শ প্রবলভাবে শিকড় গজিয়েছিল তা আমরা জানি। (রবীন্দ্রনাথ—জীবনস্মৃতি)। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বসতবাটী থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিমাপূজা অপসারিত হয়; ঐ সঙ্গেই হয়ত পৌত্তলিক আদর্শের পরিপোষক পুরাণ-প্রবচনের অনুশীলনেরও অবসান ঘটে। এদিকে ভারতীয় জীবনপ্রবাহে শিল্প কিন্তু মুখ্যত ধর্মকে অবলম্বন করেই রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, হয়ে উঠেছিল অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম অঙ্গ। পৌত্তলিকতাকে বিদায় করে ঠাকুর পরিবার এইভাবে ভারতীয় ভাবধারার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির এক দীর্ঘ প্রবাহিত জীবনস্রোত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল। এর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অবস্থাপরিবর্তনে তাঁরা স্বাদেশিকতার দিকে ঝুঁকলেও ভারতীয় শিল্পের মূলগত আবেদনে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায় জোড়া-

১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ষড়ঙ্গ; *Six Limbs of Indian Painting*; কুমারস্বামী—*History of Indian & Indonesian Art.*

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—*Indian Artistic Anatomy.*

সাঁকোর বাড়ীতে ধারাবাহী এই শিল্পের আর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশে লালিত হয়ে ওঠেন এবং স্বভাবতই ভারতশিল্পের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর জীবনগত পরিচয় ঘটে নাই। পরে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় কবিচিত্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হলেও তত্ত্বগরিষ্ঠ ধারাবাহী ভারতীয় শিল্প (Indian Traditional art) সম্পর্কে তিনি অপেক্ষাকৃত নীরবই থেকে গিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথও বুদ্ধি দিয়ে এই প্রথাগত শিল্পকে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সত্যিকারের তাত্ত্বিকতার দিক থেকে ভারতশিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার কৃতিত্বের অধিকারী হিসাবে আমি নন্দলালকে শুধু পথিকৃৎ নয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করি। নন্দলাল কি ভগিনী নিবেদিতার মননকল্পনার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন! আমি এ সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ রাখিনা।* শিল্পীসম্পর্কে আমার পরিচয় তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে, কোন শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় থাকলেও তাঁদের শিল্পের সম্পর্কে আমার নিজের মনের অনুধাবনকেই আমি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করি। নন্দলালের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কি না সে সংবাদ আমার জানা না থাকলেও শিল্পতত্ত্বের অনুশীলনে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবে মহিমান্বিত মনীষী ওকাকুরা ও ডাক্তার কুমারস্বামীর সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় ঘটেছিল, নন্দলালের নিজের আঁকা একখানা স্কেচ্ ছবিতে তার প্রমাণ আছে। পিয়ার্সনের কাছেও এই আড্ডা সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ আমি শুনেছি।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তথা স্বদেশী ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার যোগাযোগ সম্পর্কে আমরা আজ অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। এই স্বাদেশিকতার পেছনে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছিল প্রবল আত্মসচেতনতা; স্বামী বিবেকানন্দের স্বাদেশিকতার আবেদন ছিল গণচেতনার উদ্বোধনে। এই গণচেতনার উদ্বোধনে স্বামীজী ভারতের সবকিছু ধারাবাহিক সংস্কৃতির স্রোতেরই সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। কালীমূর্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্বামীজীর ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধিটি অনুধাবন করা যায়। বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রগুলি পরিভ্রমণ করে ভারতশিল্প সম্পর্কে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ করেন তাঁর রচনার এখানে সেখানে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, স্নেহভাজন শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকেও তিনি তাঁর এই উপলব্ধির অংশ দিয়েছিলেন। শিল্পবেত্তা ওকাকুরাকে ভারতশিল্পের অন্তর্নিহিত রসবৈভবের পরিচয় এই সূত্র থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছিল। ওকাকুরার সঙ্গে আনন্দ কুমার-

* এবিষয়ে প্রবন্ধশেষে সংযোজিত তথ্য দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

স্বামীর ঘনিষ্ঠতা হয়; ভারতশিল্পে তাঁর যে অন্তর্দৃষ্টি তা কুমারস্বামী কোথা থেকে লাভ করেন সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলে যান নাই। কিন্তু ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের পর কুমারস্বামী প্রথম যে পুঁথিখানি রচনা করেন তার নামটি এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। *Art and Swadesi* নামে পরিচিত এই বইটিতে তরুণ শিল্পান্বেষীর ভারতীয় স্বাদেশিকতা সম্পর্কে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে কেবল মাত্র স্বাদেশিকতার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেই তাঁর সহানুভূতির স্বাক্ষর নাই, তত্ত্বগতভাবে শিল্পচেতনা কিভাবে এই স্বাদেশিকতাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তারও সন্ধান আছে। এইখানেই কুমারস্বামী ভারত-শিল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে অতিক্রম করে তার তত্ত্বগত ঐতিহ্যটির দিকে—ভারতসভ্যতার প্রাণসত্তার সঙ্গে তার শিল্পের যোগাযোগের দিকটিকে জিজ্ঞাসুদের চোখের সামনে তুলে ধরেন। কুমারস্বামীর এই অনুপ্রেরণার সূত্র যে ওকাকুরা ও নিবেদিতা এবিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এর পরে শিল্পজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রথমে ক্রামরিশ ও পরে আরও কোন কোন পণ্ডিত এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এবং শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে নন্দলালের পর আরও কোন্ কোন শিল্পী এই পথের অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন। ভারতশিল্পের মৌলিক আবেদনের এই সূত্রের উদ্ঘাটন-সম্পর্কিত তথ্য আজকে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর দিনে তাই নূতন করে লোকসমক্ষে তুলে ধরা নিতান্তই প্রয়োজন।

স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পান্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু তথ্য

ভারতীয় শিল্পজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য ও সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়। প্রথমে এ বিষয়ে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

"আমার ধারণা স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই এই চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি [নব্য বঙ্গীয় চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি] সকলের আগে প্রেরণা পাইয়াছিল। সুতরাং ওকাকুরার সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই ভগিনী নিবেদিতা সম্ভবত স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতেই এই চিত্রশিল্প সম্পর্কেও প্রেরণা পাইয়া থাকিবেন।

"চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি খুব গভীর। বর্তমান যুগে চিত্রশিল্পে ইউরোপের অনুকরণ যে ব্যর্থ ও লজ্জাকর, ইহা তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়া সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং চিত্রশিল্পে দেশের প্রাণ কোথায় ফুটিয়াছিল, এবং

কোথা হইতে তাহাকে পুনরায় অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে তাহাও সুস্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"'ওদের নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পটো ভাল। তাদের কাছে তবু…রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।'

"অরবিন্দও রবিবর্মার চিত্রাঙ্কনের উপর ঠিক স্বামীজীর মন্তব্য অনুকরণ করিয়া পরবর্তীকালে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে অরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী।"

ডঃ কালিদাস নাগ ভারতীয় শিল্পজাগরণে বিবেকানন্দ-নিবেদিতা অধ্যায় সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'উদ্বোধন' সুবর্ণ-জয়ন্তী সংখ্যার জন্য। তার অংশবিশেষ—

"নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পাদি অবলম্বন করে যেসব বহুমূল্য প্রবন্ধ লিখেছেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছিল ১৮৯৮ সালে কাশ্মীর ও অমরনাথ ভ্রমণের সময়। আরো বছর দুই আগে ১৮৯৬ খ্রীঃ ডিসেম্বরে দেখি স্বামীজীকে পাশ্চাত্য ভক্ত ও বন্ধুরা এক বিদায়-সভায় সংবর্ধনা করেছেন লণ্ডনের Royal Society of Painters পরিষদে। সুতরাং শিল্পীমহলে যে স্বামীজীর অনেক অনুরাগী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। পরবৎসর স্বামীজী দেশে ফিরেছেন, প্যারিস, মিলান, পীসা, ফ্লরেন্স, রোম, নেপলস্ প্রভৃতি শহরের জগদ্বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহগুলি শিষ্য-শিষ্যাদের দেখিয়ে।

"১৮৯৯ খ্রীঃ জুন মাসে স্বামীজীর প্রেরণায় নিবেদিতা দুটি অধুনা-প্রসিদ্ধ অভিভাষণ দেন (১) ভারতীয় নারী, (২) প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা। ১৯০০ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেসে (Congress of the History of Religions) ভারতের প্রতিনিধিরূপে স্বামীজী অন্যান্য আলোচনার মধ্যে একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন, সেটি "ভারতীয় শিল্পের উপর তথাকথিত গ্রীক প্রভাব' নিয়ে। ঐতিহাসিক সংযোগের ভিতর দিয়ে আদানপ্রদান হওয়া স্বাভাবিক এবং গ্রীকরাও যেমন অনেক কিছু ভারতের কাছ থেকে নিয়েছে, তেমনি ভারতীয় শিল্পীরাও গ্রীক শিল্পীর কাছ থেকে নিয়েছে ; কিন্তু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় শিল্পের প্রাণ গ্রীক প্রভাবে কোন সময়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল। স্বামীজীর একথা ইন্দো-গ্রীক শিল্পবাদী ফরাসী অধ্যাপক

Foucher শুনেছিলেন কিনা জানিনা। এসব কথা ভারত-শিল্পী-বন্ধু হ্যাভেল তখনও স্পষ্ট করে লিখেননি এবং আনন্দ কুমারস্বামী তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী করছেন। অথচ এত বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের গবেষণার পূর্বাভাষ দিয়ে গেলেন—তার সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও Prof. Patric Geddes। স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস থেকে মিস ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন শিল্পতীর্থ পরিক্রমা (Oct-Dec-1900) এবার তিনি চিত্র-ভাস্কর্যাদি শুধু দেখাচ্ছেন না, তুলনামূলক আলোচনা ও মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে ভেসে আসছে পাশ্চাত্য শিল্পধারা,—Austria, Hungery, Servia, Rumania, Bulgeria-র বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করে দেখে স্বামীজী ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য-শিল্প-নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব থেকে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কতভাবে গিয়েছে, কী আগ্রহ সেটি বুঝবার ও বোঝাবার! মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু নিয়ে তিনি এমন মেতে উঠলেন যে, উদার প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস নিয়ে বক্তৃতার কল্পনাও জাগেনি, কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয়, শিল্পও যেন অস্পৃশ্য। স্বামীজী এক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ; অথচ তাঁকে আমরা মনে রাখি না যখন ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণ বিষয়ে আলোচনা করি।

"১৯০১ সালের গোড়ায় দেখি স্বামীজী বেলুড় ফিরেছেন। ১৮৯৮ সালে ঠিক তিন বছর আগে গঙ্গাতীরে জমি কিনে যখন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তখন স্বামীজী নিজেই এক বিরাট মন্দিরের পরিকল্পনা শুধু ধ্যানে নয়, নকসায় তুলেছিলেন।

"এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে, বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পে তাঁর অধিকার পুঁথিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পায়ে হেঁটে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠমন্দির স্বামীজী যেমন তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন, তেমনভাবে কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকরা দেখেছেন।

"১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্মসম্মেলনে যোগ দিতে যাবার পথে তিনি কলম্বো, সিঙ্গাপুর, ক্যান্টন হয়ে জাপানে আসেন এবং চীন ও জাপানী মঠ ও মন্দিরে, শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে ভারতের প্রভাব ও প্রাচ্য চিত্রকলার নব-জাগরণের সম্ভাবনা দেখেন। প্রায় আট বছর পরে (ডিসেম্বর ১৯০১) জাপানী কলাবিৎ ওকাকুরা কাকুজো (Okakura Kakuzo) যখন বাঙলাদেশে প্রথম পদার্পণ করেন তখন তাঁকে দেখি রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর অতিথি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে। স্বামীজীর শরীর তখন ভেঙে পড়েছে এবং তিনি তখন বেলুড় মঠের গঠনমূলক কাজে

তন্ময়। তবু শিল্পরসিক ওকাকুরাকে পেয়ে তিনি আনন্দে ও প্রেরণায় ভরপুর হয়ে তরুণ যুবকের মত উৎসাহে ওকাকুরাকে বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও শিল্পনিদর্শনগুলিকে দেখিয়ে আনতে বেরিয়ে পড়েন। ১৩ই জানুয়ারী ১৯০২ সালে তাঁর ৩৯ বছরের জন্মদিন কাটে বুদ্ধগয়ায়। সঙ্গে ছিলেন মহাবোধি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপাল, ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতা। একদিকে ভগবান বুদ্ধের সাধনা, অন্যদিকে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের শিল্পধারা অনুসরণ করে স্বামীজী বুদ্ধগয়া, নালান্দা হয়ে সারনাথ পর্যন্ত ওকাকুরাকে সব দেখান ও অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন।

"কালের ধর্মে শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা ভিন্নখাতে বইবে সেটা স্বাভাবিক এবং আধুনিক ভারতের শিল্প তার নূতন ভাষা ও ছন্দ খুঁজে নেবে। কিন্তু বিবেকানন্দ নিবেদিতার যুগকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারবে না।" [উদ্বোধন স্বুবর্ণ জয়ন্তী পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ কালিদাস নাগের প্রবন্ধ থেকে সঙ্কলিত।]

ইউরোপীয় শিল্প সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যাবে। 'পরিব্রাজক'-এর পরিশিষ্টের তৃতীয় অংশে গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত নোট আছে। প্যারিসের লুভার মিউজিয়ামে গ্রীক শিল্পকলা দেখে এই নোট তিনি করেছিলেন (তিন পৃষ্ঠার মত) কিন্তু তাকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার সময় তাঁর হয় নি।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর গ্রন্থে শিল্পসম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা ও শিল্প-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি আচার্য নন্দলালের যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, তার কিছু অংশ—

আচার্য নন্দলালকে প্রশ্ন—"স্বামী বিবেকানন্দ কি নিবেদিতার শিল্পচেতনা সঞ্জীবিত করেছিলেন ?"

উত্তর—"ভগিনী নিবেদিতা শিল্পসম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন, তার মূল তত্ত্ব স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া। আবার রামকৃষ্ণদেবের শিল্পবিষয়ক আদর্শকে প্রকাশ করেছেন স্বামীজী। পৌরুষ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে নিজস্ব বলিষ্ঠ ধারণা ছিল, নিবেদিতা তাকে পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। ভগিনীর মুখ থেকে কথা শুনবার সময়ে আমার মনে হত স্বামীজীর অগ্নিবাণী শুনছি যেন।"…

প্রশ্ন—"আপনি স্বয়ং নিবেদিতার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন কিনা ?"

উত্তর—"১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী ব্যক্তিগতভাবে সময়ে সময়ে আমার সঙ্গে

আলোচনা করেছেন। একবার ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসেন। সেই সময়ে তিনি আমার আঁকা কিছু ছবি দেখেন এবং আমাকে উপদেশ দেন।—একটি চিত্রে ছিল, কৃষ্ণ সত্যভামার চরণস্পর্শ করে তাঁর মান ভাঙাচ্ছেন। এই ছবি দেখে তিনি উত্তেজিতভাবে বলেন, 'আর কখনো এমন ছবি আঁকবে না। পুরুষ মেয়েদের মান ভাঙাবে এইভাবে—লজ্জা!' দ্বিতীয় ছবি ছিল কালীর। ভগিনী ছবি দেখে সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু বললেন, 'ছবিতে ঠিকভাবে বিষয়সন্নিবেশ করা হয়নি। কালীর গায়ে এত গয়না চাপিয়েছ কেন? কালী দিগ্‌বসনা, প্রলয়কারিণী।' তারপর তিনি কালী সম্বন্ধে স্বামীজীর রচনা পড়তে আমাকে বললেন।"

নিবেদিতা নন্দলালের আরও কয়েকটি ছবির উপর যেসব মন্তব্য করেছিলেন নন্দলাল একে একে তার উল্লেখ করেছেন। একদিনের ঘটনা—

"সতীর্থ স্থরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে একদিন নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আমরা উপরে উঠে তাঁর বসবার ঘরে গেলুম। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না। টেবিলের পাশে একটি সোফা ছিল। তাতে বসলুম পা ঝুলিয়ে। ভগিনী বাড়ী ফিরে দেখলেন আমরা সেইভাবে বসে। তিনি তখন সোফা থেকে নেমে আমাদের মাটিতে পা মুড়ে বসতে আদেশ দিলেন। টেবিলের উপর রাখা একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধ মূর্তি দেখিয়ে ঐভাবে বসতে বললেন। আমাদের খুব মনে লাগল, ভাবলুম, আমরা নেটিভ, তাই মেমসাহেব মাটিতে বসতে বললেন। মাটিতে পা মুড়ে বসলে তিনি সোফায় বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য করতে করতে বললেন, 'তোমরা সবাই বুদ্ধ।' তখন আমাদের সব রাগ চলে গেল, বুঝলুম কিজন্য ঐভাবে বসতে আমাদের বলেছিলেন। একটা ব্রোঞ্জ মূর্তির দিকে দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কার মূর্তি?' আমরা বললুম, 'কেন বুদ্ধ মূর্তি!' 'না, স্বামীজীর মূর্তি',—ভগিনী বললেন। তারপর তিনি ঐ আসনে বসা স্বামীজীর একটি ছবি আমাকে আঁকতে বললেন। আমি তাঁর জন্য একটা সেই ধরনের ছবি এঁকে দিয়েছিলুম।......

"ভগিনী আমাকে ও অসিত হালদারকে লেডি হ্যারিংহামের সঙ্গে অজন্তায় পাঠিয়েছিলেন ফ্রেস্কো নকল করতে।......ভারতীয় শিল্পের উন্নতির চিন্তা তাঁর মনে সর্বসময় জাগরূক ছিল।"

প্রশ্ন—"ভগিনী নিবেদিতা কি হ্যাভেলকে শিল্পসম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন?"

উত্তর—"হ্যাঁ, ভগিনী মিঃ ই, হ্যাভেলকে শিল্পসম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। আমার ধারণা তিনিই হ্যাভেলকে ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও দর্শন বুঝিয়ে-

ছিলেন। সেই সময়ে মিঃ হ্যাভেল ভারতীয় শিল্পের অন্তর্নিহিত রহস্য ও গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। হ্যাভেলের এই মনোভাব 'Indian Painting and Sculpture', 'Indian Architecture' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যক্ত। হ্যাভেল তাঁর কোনো বইয়ে নিবেদিতার নাম করেছেন কিনা জানিনা।……

"….. স্বামীজী আমাদের শিল্পের জটিলতা ও গতানুগতিক ভঙ্গিমার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর বাণী অনুযায়ী ভবিষ্যতের শিল্প আবার সরল, সবল ও প্রাণময় হয়ে উঠবে।

"শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর দেওয়া আদর্শ শিল্পের মেরুদণ্ডস্বরূপ, যা না থাকলে শিল্প দুর্বল ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। স্বামীজী জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের ও ভাবের মর্মে প্রবেশ করেছেন, ঠাকুর ভাবের মধ্য দিয়ে গেছেন জ্ঞানে। দুজনের মধ্যে ভাব ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ, কেবল পথ ভিন্ন।……

"হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ, ওকাকুরা, জগদীশ বসু প্রভৃতি সবাই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করতেন। সকলেই ভগিনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁদের লেখা পড়লেই তা বোঝা যাবে।…"

স্বামীজীর শিল্পজ্ঞান ও শিল্পবোধের অনেক পরিচয় ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে দিয়েছেন। স্বামীজী কিভাবে স্বয়ং প্রাচীন শিল্প-দৃষ্টান্তগুলিকে বুঝবার চেষ্টা করতেন এবং প্রাচীন শিল্পসম্বন্ধে অন্যান্যদের শিক্ষা দিতেন, তার পরিচয়ও এই বইয়ে আছে। এখানে একটি স্থান মাত্র সংক্ষেপে উদ্ধৃত হল—

"১৮৯৮।১৯শে জুলাই। প্রথম অপরাহ্ণে বিতস্তা নদীতীরে এক বনের মধ্যে আমরা চির অন্বেষিত পাণ্ড্রেস্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম।……

"স্বামীজী ব্যতীত আমাদের সকলেরই পক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এই সবে হাতে খড়ি। সুতরাং স্বামীজী তাঁহার দেখা শেষ হইলে পর আমাদিগকে কিরূপে ভিতরটি দেখিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিলেন।

"ছাদের ভিতর-পিঠের মধ্যস্থলে একটি ক্ষোদিত বৃহৎ সূর্যমূর্তিবিশিষ্ট চক্র এক সমচতুষ্কোণের মধ্যে বসান আছে, তাহার চারিটি কোণ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাদটির চার কোণে চারটি সমান ত্রিভুজ রহিয়া গিয়াছে —সেগুলি সুচারুরূপেকৃত সর্পবেষ্টনাবদ্ধ নরনারীমূর্তির অল্প-তোলা ক্ষোদাইয়ের কাজে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালগুলিতে খালি জায়গা পড়িয়া আছে, সেখানে এক সারি স্তূপ অঙ্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

"বাহিরেও ক্ষোদাইয়ের কাজ ঠিক এই রকম করিয়া স্থানে স্থানে বিন্যস্ত। ত্রিপত্র খিলানগুলির একটিতে—সম্ভবত পূর্ব দরজার উপরে যে খিলান তাহাতে—বুদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার একটি হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত—এই সুন্দর মূর্তিটি রহিয়াছে। দুই পাশে থাম দুইটির শিরোদেশ ব্যাপিয়া আছে বৃক্ষতলে আসীনা এক রমণীমূর্তি। মূর্তিটি অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মূর্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। অপর তিন দরজার খিলানে কোনো নক্সা ছিল না, কিন্তু পুকুরপাড়ে যে পাথরের চাপড়াখানি পড়িয়াছিল, সেটি ওখান হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল মনে হইল। ইহাতে অনিপুণভাবে অঙ্কিত এক রাজার মূর্তি আছে, স্থানীয় লোকে ইহাকে সূর্যের প্রতিমূর্তি বলিল। এই মন্দিরটির গাঁথুনি চমৎকার, এবং এই কারণেই বোধ হয় ইহা এতদিন টিকিয়া আছে। এক একখানি পাথরের চাঙ্গড় এরূপভাবে কাটা হইয়াছে যে, উহা দেওয়ালের এক একখানি ইষ্টকের মত না হইয়া মিস্ত্রী যে নক্সানুযায়ী কাটিবে স্থির করিয়াছে তাহার এক একটি অংশের স্থান অধিকার করিয়াছে।··· স্বামীজীর ধারণা হইয়াছিল যে, কোনো পবিত্র কুণ্ডের স্মৃতিরক্ষার্থে এই মন্দিরটি নির্মিত এবং বোধহয় সেই কুণ্ডের জল ছাপাইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া ইহার চারিপাশের জলরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

""স্বামীজীর চক্ষে স্থানটি অতি মধুর অতীতের উদ্দীপনা করিয়া দিল।··· আমরা বনমধ্যস্থ সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটি ত্যাগ করিয়া আসিলাম।··· তথায় একটি জিনিস ছিল, যাহার সম্মুখে আমরা প্রণত হইতে পারিয়াছিলাম—শিক্ষাদানরত বুদ্ধমূর্তি। আমরা একটি চিত্র মানসনেত্রে ফুটাইতে পারিয়াছিলাম—তাহা হইল, এক বিশাল দারুময় নগর, তাহার কেন্দ্রস্থলে এই মন্দিরটি। সে নগর বহুদিন পরে অগ্নিসাৎ হয় এবং পাঁচ মাইল দূরে তারপর সরিয়া যায়। একটি স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা করিয়া, আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরুরাজির মধ্য দিয়া নদীতীরে ফিরিয়া আসিলাম।

"তখন সূর্যাস্তের সময়—কি অপরূপ! পশ্চিমদিকের পর্বতগুলি গাঢ় রক্তবর্ণে ঝকঝক্ করিতেছে, আরও উত্তরে মেঘে ও তুষারে সেগুলি নীলাভ দেখাইতেছে। নীল-সবুজ মাখা আকাশ, তাহার সহিত ঈষৎ রক্তিমতা—উজ্জ্বল অগ্নিশিখার রঙের মত রাঙা এবং ড্যাফোডিল ফুলের মত হলুদ; তাহার পিছনে. নীল এবং ওপ্যালের মত সাদা জমি। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। তারপরে 'সুলেমানের সিংহাসন' (যে ক্ষুদ্র তক্ত্‌খানি ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল) চোখে পড়িবামাত্র আচার্যদেব বলিয়া উঠিলেন, মন্দিরস্থাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায়। যেখানেই মনোহর দৃশ্য সেই স্থানটিই বাছিয়া লয়। দেখ, এই তক্ত্‌ হইতে সমস্ত কাশ্মীর দেখা যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে উঠিয়াছে

লোহিতাভ হরিপর্বত, যেন মুকুট পরিয়া একটি সিংহ অর্ধশায়িতভাবে অবস্থিত। আর দেখ মার্তণ্ড মন্দিরের পাদমূলে বিস্তীর্ণ একটি উপত্যকা—।"

স্বামীজী ছোট বয়সে ছবি আঁকতেন। ডাঃ রাম দত্তর লেখা নাটক স্বামীজীর বাড়ীর ছেলেরা অভিনয় করত, নরেন্দ্রনাথ তার দৃশ্যাদি আঁকতেন। তখন তাঁর বয়স বার তের বৎসর।

পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী একবার পুনার জনৈক ব্যারিস্টারের বাড়ীতে কিভাবে তখনকার দিনের ভারত-বন্দিত শিল্পী রবি বর্মার ছবির কঠোর সমালোচনা করেন, সে বিষয়ে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের নিকট থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন।

স্বামীজীর নিজস্ব শিল্পচেতনা শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পপ্রতিভার দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েছিল।

শিল্পসম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য নিতান্ত স্বল্প নয়। তার কিছু নির্বাচিত অংশ :

'ভাববার কথা' গ্রন্থের 'বাংলা ভাষা' প্রবন্ধ থেকে—

"যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল, তখন থেকে এই সব চিহ্ন (প্যাঁচানো ভাব) উদয় হল। ওটি শুধু ভাষায় নন, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি ; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিল। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্ম রাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধূম।···এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।"

প্রিয়নাথ সিংহের 'স্বামীজীর স্মৃতি' থেকে—

স্বামীজী আবার খানিক চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললেন, কতকগুলি অবিবাহিত গ্রাজুয়েট পাইতো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা সেখানে কারিগরি শিক্ষা পেয়ে আসে। যদি এরূপ চেষ্টা করা যায়, তা হলে' বেশ হয়!

প্রশ্ন। কেন? বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজী। সহস্রগুণে। আমি বলি, এ দেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার ক'রে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফোটে।

প্রশ্ন। কেন?

স্বামীজী। সেখানে এখানকার মতো বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি। তোদের দেশে যে, সাহেব হওয়া একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি। আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হ'তে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার জো নেই।

স্বামীজী। ঠিক। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic! আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর। ঠাকুর নিজে একজন কতবড় আর্টিস্ট ছিলেন।

প্রশ্ন। সাহেবদের তো আর্ট বেশ।

স্বামীজী—দূর মুর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশশুদ্ধু লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যত দিন এশিয়ায় এসেছে ততদিন ওরা চেষ্টা করছে জীবনে আর্ট ঢোকাতে।

আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়ীগুলো দেখ্ সব সাদা-মাটা। তার কোন মানে পাস্? দেখ্না এই যে এত বড় বড় সব বাড়ী গভর্ণমেণ্টের রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস, বলতে পারিস? তারপর তাদের খাড়া প্যাণ্ট, চোস্ত কোট, আমাদের হিসাবে এক প্রকার ন্যাংটো। না? আর তার যে কি বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ্। কোন্ বিল্ডিংটার মানে না বুঝতে পারিস, আর তাতে কিবা শিল্প! ওদের জলখাবার গেলাস, আমাদের ঘটি—কোন্টায় আর্ট আছে?…পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস?

উত্তর। হ্যাঁ।

স্বামীজী—কি দেখেছিস?

আমি। বেশ নিকন চিকন পরিষ্কার।

স্বামীজী। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট। মেটে ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট। ওদের সমস্ত দ্রব্যেই ইউটিলিটি, আমাদের সর্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের

অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে এনামেলের গেলাস এনেছেন ঘরে। ওই রকমে ইউটিলিটি এমনভাবে আমাদের ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই আর্ট ও ইউটিলিটির কম্বিনেশন। জাপান সেটা বড় চট করে নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে উঠেছে। এখন আবার ওরা তোমাদের সাহেবদের শেখাবে।

ভারতীয় লোকশিল্প সম্বন্ধে ১০.২.১৯০২ খ্রী. মিসেস ওলিবুলকে এক পত্রে লিখছেন (পত্রে ওকাকুরার উল্লেখ আছে)—

"আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে (আঁটপুর ?) কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মত ঘরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়েছে।

"প্রাচীন কালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সেই শিল্প লুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম! তবে এখনও যে কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্তত একটিও।

"ছোটখাট একটু ভ্রমণে মিঃ ওকাকুরা বেরিয়ে পড়েছেন—আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখার অভিপ্রায় নিয়ে।… ওকাকুরা এখানে ভৃত্যদের ব্যবহারের একটি সাধারণ টেরাকোটার জলের পাত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেটির আকৃতি ও ক্ষোদিত কারুকার্য দেখে তিনি একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু এটি একটি সাধারণ মৃৎপাত্র এবং পথের ধাক্কা সহ্য করার অনুপযোগী, তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করে গেছেন, পিতল দিয়ে অবিকল সেইরূপ আর একটি তৈরি করতে। কি করি ভেবে হতবুদ্ধি,—কয়েক ঘণ্টা পরে আমার যুবক বন্ধুটি (বারাণসীর এক ধনী শিল্পোৎসাহী যুবক, যিনি লুপ্ত ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন) আসে, সে সেটা করে দিতে রাজী তো হয়েছেই, আবার বলেছে, ওকাকুরার পছন্দ ওই জিনিসটির চেয়ে বহুগুণ ভাল ক্ষোদিত কারুকার্যবিশিষ্ট কয়েকশো টেরাকোটার পাত্র সে দেখাতে পারে।

"সেই অপূর্ব শৈলীতে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলীও সে দেখাবে বলেছে। প্রাচীন রীতিতে আঁকতে পারে, এরূপ একটিমাত্র পরিবার বারাণসীতে টিকে আছে। তাদের মধ্যে একজন একটি মটর দানার উপর শিকারের একটি সম্পূর্ণ চিত্র এঁকেছে—খুঁটিনাটি বর্ণনাসহ একেবারে নিখুঁত কাজ।"

কলিকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে শিল্পবিষয়ে স্বামীজীর আলোচনা—

"স্বামীজী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন, পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্পসৌন্দর্য দেখে এলুম, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে এদেশে শিল্পকলার যেমন বিকাশ দেখা যায়, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাহের সময়েও ঐ বিদ্যার বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিদ্যার কীর্তিস্তম্ভরূপে আজও তাজমহল, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"মানুষ যে জিনিসটি তৈরী করে, তাতে কোনো একটি idea express করার নামই আর্ট! যাতে আইডিয়ার expression নেই, তাতে রঙ বেরঙের চাকচিক্য, পরিপাট্য থাকলেও তাকে প্রকৃত আর্ট বলা যায় না।. ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ করে তৈরী হওয়া উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলাম। মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা—Art unveiling Nature—অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভিতরের রূপ সৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমন ভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনো স্পষ্ট বেরোয়নি, যতটুকু বেরিয়েছে ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই যেন শিল্পী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। ঐ রকম original কিছু করবার চেষ্টা করবেন।......

স্বামীজী—আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি খাঁটি জিনিষ করতে পারেন, যদি আর্টে একটি ভাবও যথাযথ Express করতে পারেন, কালে নিশ্চয়ই তার appreciation হবে। খাঁটি জিনিষের কখনও জগতে অনাদর হয়নি। এরূপও শোনা যায়, এক এক আর্টিষ্ট মরবার হাজার হাজার বছর পরে হয়ত তার appreciation হল!......

রণদাবাবু—ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর তফাৎ কি দেখলেন?

স্বামীজী—প্রায় সবই সমান, অরিজিন্যালিটি প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ সব দেশে ফটোযন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য নিলেই অরিজিন্যালিটি লোপ হয়ে যায়, নিজের আইডিয়ার Expression দিতে পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ আপনাদের মাথা থেকে নূতন নূতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন। এখন ফটোর অনুরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টা লোপ হয়ে যাচ্ছে।

তবে এক একটা জাতের এক একটা characteristic আছে। আচারে-ব্যবহারে, চিত্রে-ভাস্কর্যে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরুন ওদেশের গান বাজনা নাচের Expressionগুলি সবই Pointed, নাচছে যেন হাত পা ছুঁড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে যেন সঙ্গিনের খোঁচা দিচ্ছে, গানেরও ঐরূপ।' এদেশের নাচ আবার যেন হেলে দুলে তরঙ্গের ন্যায় গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্চ্ছনাতেও ঐরূপ rounded movement দেখা যায়। বাজনাতেও তাই। অতএব আর্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন রূপ বিকাশ হয়। যে জাতটা বড় materialistic তারা নেচারটাকেই আইডিয়াল বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের Expressionই শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব প্রাপ্তিকেই আইডিয়াল বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই 'নেচার'-এর শক্তিসহায়ে শিল্পে Express করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের নেচার-ই হচ্ছে Primary blasis of Art, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাত্‌গুলোর ideality হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধরে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই আপন আপন ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ওসব দেশের এক একটা ছবি আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মত ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাব বিকাশকল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না আপনাদের আর্ট-স্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন Expression নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্যধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক Expression দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

রণদাবাবু—আপনার কথায় হৃদয়ে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা করে দেখব—আপনার কথামত কার্য করতে চেষ্টা করব।

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, "এই মনে করুন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। ঐ ছবির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক Expression দেখা যায় না। তা দূরে থাক—ঐ উভয় ভাবের একটাও চিত্রে ঠিক ঠিক বিকাশ করতে কারুর চেষ্টা নেই। আমি মা কালীর ভীমা মূর্তির কিছু আইডিয়া 'Kali the Mother' নামক আমার ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে Express করতে পারেন কি?

রণদাবাবু—কি ভাব ?

স্বামীজী শিষ্যের পানে তাকাইয়া তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে আনিতে বলিলেন। শিষ্য লইয়া আসিলে স্বামীজী উহা ("The Stars are blotted out" etc) রণদাবাবুকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। স্বামীজী ঐ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিষ্যের মনে হইতে লাগিল, যেন মহাপ্রলয়ের সংহারমূর্তি তাহার কল্পনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাবুও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাবু যেন কল্পনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া 'বাপ্' বলিয়া ভীতচকিত নয়নে স্বামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীজী—কেমন, এই আইডিয়া চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন তো ?

রণদাবাবু—আজ্ঞে, চেষ্টা করব। কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজী—ছবিখানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। তারপর আমি উহা সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন করতে যা যা দরকার তা আপনাকে বলে দেব।......*

অতঃপর স্বামীজী ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যে ভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা তাহারই একখানি চিত্র (ড্রয়িং) আনাইলেন। চিত্রখানি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর পরামর্শমত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন, এই ভাবী মঠ-মন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে। আমি পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যত সব আইডিয়া নিয়ে এসেছি তার সবগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহুসংখ্যক জড়িত স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। উহার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর রামকৃষ্ণ মন্দিরটি ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে, দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে ধারণা হবে। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র মিলিত হয়েছে।...(স্বামী-শিষ্য সংবাদ)

---

* শিষ্য তখন রণদাবাবুর সঙ্গে একত্র থাকিত। তাহার জানা আছে রণদাবাবু বাড়ী ফিরিয়া-পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তাণ্ডবোন্মত্ত চণ্ডীমূর্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। আজিও সেই অর্ধ-অঙ্কিত মূর্তিখানি রণদাবাবুর আর্ট স্কুলে রহিয়াছে। কিন্তু স্বামীজীকে তাহা আর দেখান হয় নাই।

সহাস্য বিবেকানন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামীজী, আপনি এত হাসেন কেন? আপনি না আধ্যাত্মিক মানুষ!

এই খ্রীষ্টীয় প্রশ্ন ও তিরস্কার শুনে স্বামীজী হাসিতে আরও উচ্ছল।—আরে, আধ্যাত্মিক বলেই তো হাসি! আমরা তো পাপী নই, আমরা আনন্দের, অমৃতের সন্তান।

স্বামীজীর হাসিখুসী ভারী চেহারার দিকে যারা তাকিয়ে থাকত, তাদের চোখে একটা অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা—কোথায় সেই আধ্যাত্মিক মানুষের যোগ্য ছুঁচলো মুখ, পাকানো চেহারা? এতখানি সহাস্য মেদ! স্বামীজী বললেন, আধ্যাত্মিক মানুষেরা আনন্দে মোটা হয়; আমি মোটা মানুষ—আমি আধ্যাত্মিক মানুষ।—উত্তর দেবার সময় কৌতুকে ঝিকিয়ে উঠল চোখ।

দুটোই বিবেকানন্দের উত্তর। একটা দেওয়া হয়েছে সত্তার গভীর থেকে, অন্যটি এসেছে চতুর ও মধুর বুদ্ধি থেকে।

বিবেকানন্দ হাসছেন—বলছেন—তোমরা সবাই হাসো। আবার নিজে কেঁদে সবাইকে বলছেন, তোমরা কাঁদো—তোমরা জাগো,—'জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ দুঃখে পুড়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?'—

"কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়।...ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছে?"

ব্রহ্ম বিকশিত হয়ে মানুষকে কাঁদায়, আবার হাসায়।

মহিলাটি কাঁদছিলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি বিবেকানন্দের কথা শুনেছেন। কথা বলতে বলতে স্বামীজীর স্বর মৃদু থেকে মৃদুতর, মৃদুতম হয়ে এসেছিল—অতিদূর অপরিচিত স্বর অজ্ঞাত বেদনার চেতনায় এমনই অভিভূত করেছিল সকলকে যে, চলে যাবার আগে বিদায়সম্ভাষণ জানাতেও তারা ভুলে গিয়েছিল—আর পাশের ঘরে গিয়ে কাঁদছিলেন অজ্ঞেয়বাদী মহিলাটি।—'That man has given me eternal life. I never wish to hear him again.'—অনন্ত জীবনে তুলে দিয়েছে ঐ মানুষটি আমাকে। ওঁর কথা আর আমি শুনতে চাই না।

হা-হা-হা করে হেসে উঠে লোকটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। পাঁচিলের ওপারে

কি-যেন-কি-একটা আছে। সিঁড়ি ভেঙে লোকটি যেই পাঁচিলের উপরে উঠেছে—ওপারে কি দেখল কে জানে, পৃথিবী-কাঁপানো হাসির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল অপর দিকে।

এটি গল্প—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত।

শুধু কি গল্প? হাসির আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে একজন মানুষ কি উঠে আসেননি পাঁচিলের এপারে আবার? হাসির আগুন কি আলো হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়েনি?

হাসির প্রতিযোগিতায় বিবেকানন্দ সেই একটি মানুষের কাছেই হেরে গিয়েছিলেন, তিনি বিবেকানন্দের চেয়ে অনেক বড় মানুষ ছিলেন, বিবেকানন্দের গুরু হবার একমাত্র যোগ্য মানুষ, সেই রামকৃষ্ণের কাছে বুদ্ধি ও বোধি এই দুই জগতের ব্যবধান একেবারেই ছিল না। এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিকতা। বিবেকানন্দ লৌকিক থেকে লোকোত্তরের অভিমুখীন, তাই বিবেকানন্দের চরম প্রকাশ ধ্যানে, বুদ্ধের পরেই যে ধ্যানচিত্র ভারতে শ্রেষ্ঠ; আর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ লোকোত্তর থেকে লোকজগতে, তাই তাঁর অপূর্ব সমাধির হাসি।

সুতরাং বিবেকানন্দ একটি হাসি ও আনন্দের কাছে পরাভূত, পরাভূত একটি ভালবাসার সান্নিধ্যে।—তুমি তো মূর্খ, তুমি জান কি? আমি মিল জানি, হ্যামিলটন জানি,—তুমি আমাকে শেখাবে কি?

তবু তোমার কাছে আসি কেন?—ভালবাসি বলে।

জগতের সকল হাসি এবং কান্নার মূলে আছে এই 'ভালবাসা' কথাটি। বিবেকানন্দের হাসি-কান্না তার ব্যতিক্রম নয়।

আমরা হাসির আলোচনাই এখানে করছি; কত সময়ে দেখব, কান্নার কালো জলের উপরে হাসির শ্বেতপদ্ম—রক্তপদ্ম—ফুটে আছে,—রসশাস্ত্রীরা একেই 'হিউমার' বলেন না,—রাত্রির নীলপদ্ম যখন আলোর ছলনায় রক্তপদ্ম হয়ে ওঠে?

ফিরে যাই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে কিংবা তারও আগে। ভয়াবহ দুরন্ত ছেলে বিশ্বনাথ দত্তের, ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির প্রথম বুদ্বুদ। ত্রাহি ত্রাহি, শিব শিব বলে তার মা ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, সফল হন হয়ত—ব্যর্থতার ক্ষেত্রও যথেষ্ট। বিশ্বনাথ দত্তের কানে গেল কথাগুলো—শ্রীমান্ নরেন্দ্র তাঁর মাকে এমন কিছু বাক্য শুনিয়েছেন যাকে সুন্দর বলা চলে না।—পিতা বিশ্বনাথ পুত্রের শিরে জলাভিষেক না করে ঐ অসুন্দর কথাগুলি নরেন্দ্রনাথের ঘরের সামনে লিখে রাখলেন, শিরোনামা—নরেন্দ্রবাবু গর্ভধারিণী মাতাকে নিম্নলিখিত শব্দাবলীতে সম্মানিত করিয়াছেন, ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ দত্তের হাসি—সভ্য মানুষের দেওয়া সহাস্য শাস্তি। পিতার সে হাসি

বিচিত্র পরিহাসে বর্ণময় হয়ে ওঠে যখন তিনি পুত্রকে বলেন—তোমাকে কি দিয়ে গেলুম ?—যাও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এস।

বিশ্বনাথ দত্তের সুন্দর চেহারার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আত্মা স্থাপিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ্র চেতনার সমুদ্রে স্নান করে না উঠলে নরেন্দ্রনাথের মত 'জন্মবিদ্রোহী কালাপাহাড়' কোনো দিন শুভ্রশীর্ষ হিমালয় হতে পারতেন কি না সন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি ঐ চেতনারই দিব্য আভা—সংসারের নানা অভিজ্ঞতায় রঙিন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা সুরু হয়।—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি ?

নরেন্দ্র—আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) নারে, অতদূর নয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি নরেন্দ্রনাথকে একটি জিনিষ শেখাল,—জীবনের সবটাই বিদ্রোহ নয়—সামঞ্জস্য করতেই হয়। সৃষ্টির মধ্যে মন্দের অস্তিত্ব যখন অনিবার্য তখন মহাযোদ্ধাকেও বিশ্রাম নিতে হয়, অন্তত অশ্বপৃষ্ঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের ক্ষেত্রে উপলব্ধিতে সমন্বয়ী, সংসারের ব্যাপারে অভিজ্ঞতায় সমঞ্জসী। তাঁর সাংসারিক আপোষতত্ত্ব রূপ ধরেছে 'বাঘ নারায়ণ' বা 'হাতী নারায়ণের' গল্পে। বাঘ বা হাতীও নারায়ণ, তাই বলে তাদের আলিঙ্গন করা চলে না। গল্পটা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই বলতেন। একদা জনৈক মেজাজী সাধক বেশ চড়া সুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতে কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে বিশেষ বিনয়ী, কারণ, মাতাল দেখলেই নমস্কার করে বলবে—'কী খুড়ো ! কেমন আছ ?' গরম সাধুটি চলে যাবার পরে তাঁর সম্বন্ধে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মানসিক বিরূপতা দূর করবার চেষ্টা করছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একজনকে বলেছিলুম, ও রজোগুণী সাধু, ওকে সিধে-টিধে দেওয়া কেন ? আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে—'অমন কথা বলো না !—সাধু তিনপ্রকার, সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী।' সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি।"

এই কথা শোনার পরেও নরেন্দ্রনাথ চুপ করে থাকতে পারেন ? শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর কথা ফিরিয়ে দিয়ে রসিকতা করার যে একচ্ছত্র অধিকার ছিল তাঁর, তাকে তিনি গ্রহণ করলেনই—

"নরেন্দ্র—(সহাস্যে)—কি হাতী নারায়ণ ?—সবই নারায়ণ ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে হাসলেন। হাসতে হাসতে সৃষ্টির সুগভীর ও বেদনাময় সত্যকে উন্মোচন করলেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তিনি বিদ্যা অবিদ্যা রূপে লীলা করছেন। দুইই আমি প্রণাম করি। চণ্ডীতে আছে, তিনি লক্ষ্মী, আবার হতভাগাদের ঘরে অলক্ষ্মী।"

নরেন্দ্রনাথের উপর ভালবাসার সীমা ছিল না তাঁর। 'বাপ মাও অমন ভালবাসতে পারে না'—স্বামীজী বলেছেন। কেউ নরেন্দ্রের প্রশংসা করেছে—শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—'ইনি ভাল, যেকালে নরেন্দ্রের প্রশংসা করেছেন।' সে নরেন্দ্র অন্যদের মত আচারী নন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনেন না, মুখের উপর তর্ক করেন, মূর্খ বলেন, অন্য ভক্তরা অসন্তুষ্ট হন—শ্রীরামকৃষ্ণ হাসেন—

"পরমহংস মশাই আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'লরেন আমাকে যত মুক্‌খু বলে আমি তত মুক্‌খু লই।' তিনি বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেন, 'আমি অক্ষর জানি'।"

শুধু প্রশ্রয়—শাসন নয়? যে 'নরেন্দ্রের ভিতর এমন আগুন জ্বলছে যাতে কাঁচা কলাগাছ দিলেও পুড়ে ছাই হয়ে যায়'—নরেন্দ্রের সেই নিত্য জ্বলন্ত অগ্নিতেও তিনি ইন্ধন দিয়েছেন—খুঁচিয়ে আরও জ্বালিয়েছেন তাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

পিতৃবিয়োগের পরে নরেন্দ্রনাথের অন্ন জোটে না। সুন্দর সাজানো দারিদ্র্য নয়—একেবারে পেটের জ্বালা—তবু সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে বিনা বিকারে লড়াই করতে হবে নরেন্দ্রনাথকে—সে না পুরুষ মানুষ! সে কি বিরহিণী নারী? কৌতুকের শরে বিদ্ধ করে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধালেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী। হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার।"

অতঃপর নিতান্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তাঁর পরিহাস। নরেন্দ্রনাথ বাড়ীতে কিছু অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, এই অভিপ্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তীব্র বৈরাগ্য হলে ও সব হিসাব থাকে না। 'বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব তবে সাধনা করব'—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। (সহাস্যে) গোঁসাই লেকচার দিয়েছিল। তা বলে, দশহাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যায়।…

"একটি মেয়ের ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—

তারপর, 'ওগো! আমার কি হল গো!'—বলে আছড়ে পড়ল, কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙে যায়।"

গল্প শুনে সকলে হাসছেন, আর নরেন্দ্রনাথ, যাঁর উদ্দেশ্যে গল্পটি বলা—

"নরেন্দ্র এই সকল শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন।"

এতখানি কঠিন হাসি শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পই হেসেছেন, যে হাসি গিয়ে পুড়িয়েছে তাঁর অপর সত্তাকে—নরেন্দ্রনাথকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে এক পরম নিষ্ঠুর মানুষ ছিল, যে জগতের যজ্ঞে নরেন্দ্রকে বলি দিয়ে তৃপ্ত—যে ভাবছে, ভালই হচ্ছে নরেন্দ্র দুঃখ পাচ্ছে, পেটের জালায় জলছে, নইলে সে কি অপরের দুঃখ বুঝত!

এবং আর একটি মানুষ—শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরশায়ী—যার মনপ্রাণ ভরে আছে বিধাতার প্রতি নিগূঢ় অভিমানে। বেদনামাখা পরিহাসের অনবদ্য ছবিটি—

"নরেন্দ্র মেজের উপর সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্য ও ভক্তদের প্রতি)—দেহের দুঃখ আছেই। দেখনা, নরেন্দ্র—বাপ মারা গেছে, বাড়ীতে বড় কষ্ট, কোন উপায় হচ্ছে না! তিনি কখনও সুখে রাখেন, কখনও দুঃখে।

ত্রৈলোক্য—আজ্ঞে, ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) আর কখন হবে! কাশীতে অন্নপুর্ণার বাড়ী কেউ অভুক্ত থাকেন না বটে, কিন্তু কারো সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হয়। হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছু টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরেজী মত, সে বললে, তোমায় কেন দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হোক কিছু রোজগার করছ। তবে খুব গরীব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু, এদের দিলে কাজ হয়। তখন হৃদে বললে, মহাশয়! আপনি উটা বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন যেন আমায় কানা, খোঁড়া, অতি দরিদ্দীর এসব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।"

মূর্খ মানুষটি—জগতের সর্ব রহস্যের কেন্দ্রে বসে আছেন। তাঁকে প্রণাম করে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়েছেন।

আমেরিকার একটি ঘটনা—

"একদিন স্বামীজী বললেন, আমি এমন একজন মানুষের শিষ্য, যিনি নিজের নামটাও ভাল করে লিখতে পারতেন না, কিন্তু আমি তাঁর পা ছোঁয়ারও যোগ্য নই। আমার এই বুদ্ধিকে উপড়ে যদি গঙ্গায় ফেলে দিতে পারতাম!

"কিন্তু স্বামীজী! এক মহিলা প্রতিবাদ করে ওঠেন—আপনার বুদ্ধির জন্যই তো আপনাকে এত পছন্দ!

"তার কারণ, মহাশয়া আপনি নিতান্তই নির্বোধ,—আমারি মতন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাসি নয়—বিবেকানন্দের হাসির হিসাবই এই রচনার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য পালনে ফিরে যাই। সুরু করা যাক নামগান দিয়ে, সেটাই রীতি বাংলা দেশে ; নামের প্রতি আমাদের আসক্তি শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত—সেখানে গিয়েও শ্মশানবৈরাগ্য কিছু সামলে আমরা মড়া-পোড়ানো কয়লায় নিজের নাম লিখে আসি।

নাম-রহস্যে স্বামীজীর বিশেষ প্রীতি ছিল। মজাদার একটা নতুন নাম না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না। বিবেকানন্দ নামক বিধাতা পরিচিতদের ললাটে নতুন নামাক্ষর লিখে তবে সন্তুষ্ট। বিদ্রূপ-কৌতুক-স্নেহ-শ্রদ্ধা সব কিছু আছে নামগুলির মধ্যে।

আমরা কয়েকটি নির্বাচন করছি।

শোনা যায় গুরুভাইদের সন্ন্যাসী-নাম স্বামীজীর দেওয়া। অদ্ভুত সার্থক সেইসব নাম, কিন্তু যে নামটি তিনি দিয়ে উঠতে পারেন নি সেখানেই গণ্ডগোল। 'ত্রিগুণাতীতানন্দ' নামটি বোধ হয় স্বামীজীর দেওয়া নয়—যারই দেওয়া হোক, ঐ গুরুভার নামটি একটু নাড়াচাড়া করে স্বামীজী খুসী হয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে ত্রিগুণাতীতকে এক অগ্নিময় পত্র লিখলেন—

"লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মত হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব।…তোদের মুখে হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে, দুনিয়া তাক্ হয়ে দেখবে। তোর নামটা একটু ছোটখাট কর দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে হরিনামের ভয়ে যম পালায়,—তা 'হরি', এই নামে নয়, ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম—'অঘভগনরকবিনাশন ত্রিপুরমদভঞ্জন, অশেষনিঃশেষ-কল্যাণকর' প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চোদ্দ পুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল করলে ভাল হয় না কি? এখন বোধহয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারি যমতাড়ানে নামই করেছ।"

একই দমে এমন উদ্বুদ্ধ ও উচ্ছল আর কাউকে দেখা গেছে?

গুরুভাইদের স্বামীজী সংসার-নামেই ডাকতেন। শশীকে শশীই বলতেন, যদিও বরাহনগর মঠে দুই জ্ঞাতিভাই শরৎ ও শশী একত্র হয়ে 'শরৎ-শশী' হয়ে উঠেছিলেন। সারদানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দের মত দুই জোয়ান মানুষের উপযুক্ত নামই বটে।

শরৎ, শশীর সঙ্গে একত্র হয়ে কাব্যময় হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু শরৎ যখন কালী বেদান্তীর সঙ্গে বন্ধনীবদ্ধ হলেন, তখন কাব্যসৃষ্টি হল না। নরেন্দ্রনাথের আদরের চোটে কালী হলেন কেলো, তার থেকে কেলুয়া, সেক্ষেত্রে তাঁর সাথী শরৎ ভুলুয়া না হয়ে যান কোথায়? স্বামীজী তাঁর এই দুই অনুগতকে বরাহনগর মঠে বলতেন, কেলুয়া-ভুলুয়া। ভক্তিভাবময় বাবুরাম নরেন্দ্রনাথের কাছে নাম পেয়েছিলেন 'ভেঁপু', কারণ তিনি ভাবে বেজেই আছেন, কিংবা 'রাধারাণী', যেহেতু কেঁদেই আছেন। অপরদিকে ছাপরা জেলার অশিক্ষিত রাখতুরাম, যাঁর ডাক নাম লাটু এবং তার থেকে লেটো,—সেই লেটো একদিন সহজ সুরে গভীর জ্ঞানের কথা বলে হয়ে উঠলেন প্লেটো। গঙ্গাধর হয়েছিলেন গ্যাঞ্জেস, কিংবা গ্যাঞ্জীস, লাটু মহারাজের বিশুদ্ধ ইংরাজীতে গোঞ্জিস,—স্বামীজী তাঁকে গঙ্গা বলেও ডাকতেন, গঙ্গাধরের হিমালয়প্রীতির জন্য 'বরফানী বাবা' বলতেন, আর এলাহাবাদের এঞ্জিনীয়ার হরিপ্রসন্নকে (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) বলতেন, এলাহাবাদের বিশপ। হরিপ্রসন্নর 'প্রসন্ন' স্বামীজীর আদরে 'পেযন' হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত-শিষ্যেরাও নব নামে বঞ্চিত হননি। সব কটি নাম নরেন্দ্রনাথের দেওয়া না হতে পারে, কিন্তু নামগুলির প্রচারের স্বেচ্ছাদায়িত্ব নরেন্দ্রনাথই নিয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষের নাম জি. সি.। শ্রীরামকৃষ্ণের এক দরিদ্র ভক্ত যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র চন্দ্রের নাম হয়েছিল দমদম মাস্টার, কারণ তিনি একদা দমদমের কোনো স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।

দমদম মাস্টার চলে, তাই বলে শাঁকচুন্নী মাস্টার ?

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেন সগৌরবে নিজ নামকরণের ইতিহাস বিবৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে—

জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।
সৌভাগ্য বিদিত হৈনু শাঁকচুন্নী নামে ॥

'কালীনাম কল্পতরু'—সুতরাং বাংলা দেশে কালী নাম অনেকেরই। কালী বেদান্তীর কথা আগেই বলেছি, এখন 'বুঁটে কালী'র কথা। কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের এমন নাম হওয়ার কারণ তিনি 'অধিক পরিমাণে বুটের (ছোলার) ডাল খাইতেন।' অন্যদিকে সদাগরী অফিসের ভাল চাকরে কালীপদ ঘোষ হয়েছিলেন 'দানা কালী', কোনো দোষের জন্য নয়, গুণের জন্য,—তিনি নির্ভীক ও দানশীল ছিলেন বলে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দানাদত্যিদের মধ্যে ফেলেছিলেন।

ভক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের নাম 'হুটকো গোপাল'। এই অপূর্ব নামটির ইতিহাস আমার জানা নেই, কিন্তু এই হুটকো গোপালের প্রতিবেশী হওয়ার অপরাধে

গড়পারের সতীশচন্দ্র দত্তের নাম হল মুটকো বা মুটুকু। নাম দিলেন নরেন্দ্রনাথই। প্রতাপ হাজরা,—যাঁর সন্দিগ্ধ ও কূট স্বভাবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, জটিলে-কুটিলে, তাঁকে নরেন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন ঐ তর্কপ্রিয়তার জন্যই। 'হাজরা'-র একটা বিচিত্র ইংরাজী অনুবাদও তিনি করেছিলেন—থাউজেণ্ডা : হাজার=থাউজেণ্ড+আ =থাউজেণ্ডা।

প্রতাপ হাজরা জটিল বুদ্ধিতে তর্ক করতেন, সরল প্রাণে সদাই হৈচৈ লাগিয়ে রাখতেন হরমোহন মিত্র। হরমোহনের সশব্দ স্বভাবের জন্য নাম— হারমোনিয়াম।

হিন্দু বা ক্রিশ্চানী নাম ছাড়া স্বামীজী মুসলমানী নামও দিতেন। কিশোরী-মোহন রায়ের মুখে দাড়ি ছিল এবং তিনি মুসলমানী ভাষা নকল করতে পারদর্শী ছিলেন বলে এই ব্রাহ্মণসন্তানকে নরেন্দ্রনাথ 'আব্দুল' বলতেন। কিশোরীমোহনের অনুরূপ যাবনী ভাষায় অধিকার যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের ছিল না, কিন্তু তাঁরও মুখে মুসলমানী দাড়ি ছিল এবং তাঁর ডাক নাম ছিল ফকির—অতএব নরেন্দ্রনাথের নামোন্মেষশালিনী প্রতিভায় ফকির হয়ে দাঁড়াল ফকিরুদ্দিন হায়দার।

স্বামীজী তাঁর দেশী-বিদেশী শিষ্য-শিষ্যা বা ভক্তদের উপরও নামবর্ষণ করেছেন। অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ার হয়েছিলেন কিডি। মহেন্দ্রনাথের মতে তিনি কিছুদিন ফল ও দুধ খেয়ে থেকেছিলেন বলেই কিডি বা টিয়াপাখী নাম পেয়েছিলেন। এই বিষয়ে অন্যত্র আছে—"তিনি পাখীর মত স্বল্পাহারী ছিলেন বলিয়া স্বামীজী তাঁহাকে 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন। তামিল ভাষায় কিডি শব্দের অর্থ, পাখী।" স্বামীজীর পরম উৎসাহী মাদ্রাজী শিষ্য কর্মবীর আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী 'আচিঙ্গা' বলতেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর ভাই 'চিচিঙ্গা' না-হয়ে যায় কোথায়?

চিকাগোর যে হেলদের স্বামীজী একেবারে নিজের বাড়ীর লোক বলে মনে করতেন, সে বাড়ীর কর্তা পরম খ্রীষ্টান জর্জ হেল স্বামীজীর সম্বোধনে 'ফাদার পোপ', এবং তাঁর পত্নী 'মাদার চার্চ'। সুবিখ্যাত মিসেস ওলি বুলকে তাঁর প্রশান্ত স্বভাবের জন্য স্বামীজী বলতেন 'ধীরা মাতা'। নিউইয়র্কের মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট হয়েছিলেন ফ্রাঙ্কিনসেন্স—অর্থাৎ সুগন্ধীবিশেষ, মানুষটির স্বভাব অমনই সৌরভময় ছিল। তাঁর শ্যালিকা, স্বামীজীর ভাবে ও কাজে জীবন উৎসর্গকারিণী জোসেফিন ম্যাকলাউড বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নাম পেয়েছেন। জোসেফিন একেবারে সংক্ষিপ্ত হয়ে জো, সমাদরে দ্বিগুণ হয়ে জো জো, কিংবা জয়া, কিংবা যুম, কিংবা ট্যান্টিন। মার্গারেট নোবল স্বাভাবিকভাবেই মার্গট বা মার্গো হয়েছেন কিংবা মার্গোরাইট। মার্গারেট কন্যা, স্বামীজীর তিরস্কার তাঁকে শুনতে হলেও

কন্যা বলে তাঁর নামটাকে স্বামীজী বিকৃত করেন নি, কিন্তু পুত্র গুডউইন স্বামীজীর রাগের সময়ে হয়ে যেত 'ব্যাডউইন'।

এমনি কত নাম। স্বামীজীর মুখে নামের খই ফুটত। সবগুলোর উল্লেখের দরকার নেই, কিন্তু একটি—ওকাকুরার! জাপানী শিল্পশাস্ত্রী বিশিষ্ট মনীষী ওকাকুরা যদি জানতেন তাঁর নামের কী দুর্দশা হয়েছিল! ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন। তাঁর সেই অক্রূর-ভূমিকার জন্য, ও ধ্বনি-সাদৃশ্যের জন্যও বটে, 'ওকাকুরা' স্বচ্ছন্দে হয়ে দাঁড়াল 'অক্রুর খুড়া'; একবার যদি অক্রূর খুড়া পাওয়া গেল, সেখান থেকে অক্রুর খসে শুধু খুড়া>খুড়ো এমনকি দূর পথ? স্বামীজী চিঠিপত্রে ও নিজেদের মধ্যে আলাপে ওকাকুরাকে 'খুড়োই' বলতেন। ওকাকুরার খর্ব-প্রবীণ জাপানী আকার অধিকন্তু ঐ নামটিকে অনিবার্য করে তুলেছিল কিনা জানিনা।

অন্য সকলকে তো নাম দিলেন কিন্তু নিজের নাম! সেখানেও অস্থির। বাল্যে বীরেশ্বর ও বিলে। তারপর নরেন্দ্রনাথ। পরিব্রাজক কালে বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ এবং বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের গলায় খ্যাতি বরমাল্য পরিয়ে দেওয়ায় ঐ নামটিই ইতিহাসে উঠে গেল। কিন্তু তিনি নিজে কোন্ নামটিকে ভালবাসতেন?

মেরী হেল দেখেছিলেন, ভারত থেকে পাঠান একটি চিঠিতে 'নরেন' নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

নরেন? সে আবার কি?

স্বামীজী ঈষৎ লজ্জিতভাবে লিখছেন তাঁকে—

"ওটা একটা নামের অপভ্রংশ।...নামটা খুবই কাব্যিক। চিঠিতে সংক্ষেপে নামটা লেখা হয়েছে; গোটা নামটা হল নরেন্দ্র, অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্র বা রাজা।—উদ্ভট, নয় কি? কি করা যাবে, আমাদের দেশের নামগুলো ঐরকম। নামটা ছাড়তে পেরে আমি খুশী।"

ছাড়তে পেরে খুশী! স্বামীজী নিশ্চয় জানতেন সকলে তাঁকে কি বলে আমেরিকায়—তাঁর নামের অর্থ না জেনেই—Prince among men।—নিজেরও রাজা হবার ইচ্ছা ছিল বাল্যে—এখন হয়েছেন মহারাজ—স্বামীজী-মহারাজ—

না,—'নরেন' নামটাই। ঐ নামটাই গানের মত। পৃথিবীর খ্যাতির পেরেক বিবেকানন্দ নাম তাঁর ললাটে এঁটে রাখলেও, কলরব যখনি শান্ত হয়েছে ভিতর থেকে তৃষ্ণা জেগেছে একটি নাম ফিরে পাবার জন্য,—অশ্বিনীকুমার দত্তকে বললেন, না না

নরেন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যু হয়নি, আমায় ডাকুন, ঐ নরেন নামেই ডাকুন, ঠাকুর যে নামে ডাকতেন আমায়।

বিবেকানন্দের রসিকতা যেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কঠোর, কিংবা গভীরতায় অতলস্পর্শ, সে প্রসঙ্গে আসবার আগে কিছু মজার কাহিনী বলে নেওয়া যাক। এখানে বিবেকানন্দ কখনো সদানন্দ শিশু, কখনো কৌতুকপরায়ণ দুষ্ট বালক, কখনো বা মজাদার হুল্লোড়ের মুগ্ধ কিশোর। তাঁর চিরকালের বালকস্বভাব তাঁকে কোনো দিন ত্যাগ করেনি বলেই জীবনের ভয়াবহ দিনগুলির মধ্যেও মরূদ্যানের আশ্রয় পেয়েছেন। তাঁর শিষ্য বা ভক্তেরা তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন, তিনিও সানন্দে বিস্মৃতির মায়াফলটি খেতেন, আর সেই সময়ে তাঁকে দেখে 'শিশু ঈশ্বরের' অপরূপ ছবিখানি সকলের চোখের সামনে জেগে উঠত। সন্ধ্যায় আগুনের ধারে বসে 'পাঞ্চ' পত্রিকা পড়ে তিনি হেসে লুটোপুটি খেয়েছেন, তাঁর সঙ্গীরাও তাঁরই মত হেসেছে—কিন্তু তারা একই সময়ে সচেতন থেকেছে—হাসির বাতাসে দুলছে এই যে শিখা,—এখনি হয়ত নিবাত নিষ্কম্প হয়ে যাবে—সে বড় ভয়ঙ্কর নির্জনতা—সকলের সমক্ষে সকলের অপরিচিত কোনো এক আত্মনির্বাসন।

সে কথা থাক, এখন শুধু গাল-গল্প, শুধু ফুর্তি, শুধু মজাদারি।

তেমন কাহিনী অল্প নয়, মাত্র দু'একটি নির্বাচন করতে পারি। যেমন গাজিপুরের ঠাকুর্দাকে বেদ-শোনানো—

"গাজিপুরে এক সরকারী ঠাকুর্দা ছিল, জাতিতে সে ব্রাহ্মণ এবং গাঁজা, গুলি ও চরসে সিদ্ধপুরুষ। কোন কথা উত্থাপন করিবার আগেই ঠাকুর্দা বলিত, 'ও বিষয় আমি জানি'। একদিন শিরীষচন্দ্রের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, এমন সময় সেই ঠাকুর্দা আসিয়া উপস্থিত। সকলে ঠাকুর্দাকে পাইয়া খুব ফূর্তি করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর্দাকে বেদ পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন—'কস্মিংশ্চিৎ বনে ভাস্বরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম"—এই হইল বেদের প্রথম স্তোত্র। বেদের নাম শুনিয়াই ত ঠাকুর্দা আগে থেকে কান্না জুড়িয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ তাহার পর ব্যাখ্যা স্থরু করিলেন।—আহা, কি পদলালিত্য! কি শব্দবিন্যাস! কি ভাবপূর্ণ শ্লোক! নরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিয়া আছেন, আর ঠাকুর্দা মেঝেতে উপু হইয়া বসিয়া বেদের ব্যাখ্যা শুনিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে আর রুদ্ধকণ্ঠে শোকব্যঞ্জক উহু উহু করিতেছে। এমন সময় শিরীষচন্দ্র আসিয়া পড়িল। সে হাসিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ শিরীষচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তুই যা এখন,

এখান থেকে চলে যা, আমি এখন ঠাকুর্দাকে বেদ শোনাচ্ছি। শিরীষচন্দ্র বাড়ীর ভিতরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, আর গেঁজেল ঠাকুর্দা সম্মুখে বসিয়া ব্যাখ্যা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল।" [স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম—মহেন্দ্রনাথ দত্ত]

এবার তাঁর প্রিয় গুরুভাই তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তামাসার গল্প। তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে জাহাজে ইউরোপ যাচ্ছেন। গঙ্গার মুখে ভয়াবহ চড়া—তাতে লাগলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজের পাতাল প্রস্থান। সে সব চড়া এড়িয়ে জাহাজ যখন সমুদ্রে পড়ল তখন খুশী হয়ে স্বামীজীর তু-ভায়া বললেন, পাঁটা মানা উচিত গঙ্গা মাকে। স্বামীজী বললেন, 'তথাস্তু, একদিন কেন প্রত্যহ।' তারপর? স্বামীজীর কথাতেই শোনা যাক—

"পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চল্‌চে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওতো আপনি খাচ্ছেন।' তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হল যে, কোনো গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেথায় খাবার সময়ে চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার; দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা, তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে; এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই, আমি কলকেতার মানুষ, এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না।" [পরিব্রাজক]

তুরীয়ানন্দ তাঁর 'গম্ভীরপ্রকৃতির' গুরুভাই, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য,—তিনিও রসিকতার জন্য সুবিদিত নন। এহেন গুরুগম্ভীর শিষ্যকে স্বামীজী অবিরত মজা করে ওসকাতেন। বাঙাল শিষ্যের মৎস্যপ্রীতি, ম্লেচ্ছস্পর্শ সম্বন্ধে ভয়, অখাদ্য সম্বন্ধে আশঙ্কা ইত্যাদি স্বামীজীকে প্রচুর কৌতুকের খোরাক দিয়েছে। শিষ্যকে বিস্কুট খাইয়ে স্বামীজী বললেন, 'কি খেলি জানিস? ওগুলো মুরগীর ডিমের তৈরী।' আলিপুরের চিড়িয়াখানায় সাপের ঘরে চক্রআঁকা সাপের ছবি দেখিয়ে বললেন, এই সাপই ক্রমে কচ্ছপ হয়েছে, তোরা বাঙাল কচ্ছপ খাস, সুতরাং তোরা সাপও খাস। তারপরে ঐ দিন শিষ্যকে জোর করে ম্লেচ্ছ নিবেদিতার সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়ে নিবেদিতার ছোঁয়া চা ও মিষ্টি খাওয়ালেন, এবং তারপরে মঠে ফিরে এসে সকলের হাটে হাঁড়ি

ভাঙলেন—'আর একটা কথা সকলে শোনেন,—আজ এই ভটচায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টি না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না—কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলি?'

দিশি শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী, সাহেব শিষ্য গুডউইন। স্বামীজী যখন লণ্ডনে তখন গুডউইন সঙ্গে আছেন। গুডউইন আগে গোঁফ কামাতেন, একবার কিছুদিন না কামিয়ে উদ্গত গোঁফের সৌন্দর্যমোহে পড়ে গেলেন। তাই নিয়ে কিছু সংলাপ—

"গুডউইন (গোঁফে হাত বুলিয়ে পরম আহ্লাদে)—A painter will give me ten pounds to make this a model.

"স্বামীজী—Yes, it would be a pair of very nice broom."

গুডউইন গোঁফের এতটা সাফল্য আশা করেনি,—একেবারে সুন্দর ঝাঁটার মডেল! যেখানে 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় কেনা?'

মজাদার গল্প বলতে স্বামীজী খুবই ভালবাসতেন। একটি দুটি মাত্র নমুনা দেব।

আমেরিকায় এক দম্পতি ভূতের ব্যবসা করত। তারা কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে স্বর্গত প্রিয়জনদের (অপ্রিয়জনদেরও) পর্দায় নামাত। সেই ভূত-বাণিজ্যের অংশীদার ছিলেন জনৈক মিসেস উইলিয়ামস—সবিশেষ স্থূলকায়া। একবার এক ইঞ্জিনীয়ার ছোকরা তার ভৌতিক জননীকে দেখতে এল ব্যাকুল হয়ে। মিসেস উইলিয়ামস যখন ঐ ছোকরাটির ক্ষীণকায়া জননীর ভূমিকায় পর্দাসীন হলেন তখন সে অবাক হয়ে চীৎকার করে উঠল—'মা, মা, প্রেতরাজ্যে গিয়ে তুমি কি মোটাই হয়েছ—!'

ছেলেটির বিগড়ানো মাথা ঠিক করবার জন্য স্বামীজী তাকে একটি গল্প বললেন। এক রুশ কৃষক জনৈক চিত্রকরকে তার বাবার ছবি এঁকে দিতে বলেছিল।—'কিন্তু কি দেখে আঁকব?'—'কেন, বললাম তো, তাঁর নাকের উপর একটা আঁচিল ছিল।'

চিত্রকর কি করে, কোনো-এক-কৃষকের ছবি বেশ বড় করে এঁকে একটা আঁচিল বসিয়ে দিলে নাকের উপর। ছবি দেখে পুত্র অভিভূত ও আশ্চর্যান্বিত—'বাবা, বাবা শেষ দেখার পর তুমি কত বদলে গেছ!'

বিয়ের ঘটকালির এক মজাদার কাহিনী।—দুই তরুণ তরুণীর বিয়ের আর কোনো বাধা নেই, শুধু কন্যের বাবার ধনুর্ভঙ্গ পণ,—কোটিপতির হাত ছাড়া কন্যাসম্প্রদান করবেন না। পাত্র-পাত্রী একেবারে ভেঙে পড়ে। তখন এগিয়ে এল ঘটক। সে ছেলেকে বলল, তোমাকে দশলক্ষ ডলার দেব, কিন্তু তোমার নাকটি কেটে নেব—

রাজী? ছোকরা সভয়ে বলে—কদাপি না। সেই শুনে ঘটক সোজা চলে গেল কনের বাবার কাছে, বলল, পাত্রের লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি।—বিয়ে হতে আর দেরী হয়?

ধর্মপ্রচারের সাক্ষাৎ-ফলের একটি উপাদেয় কাহিনী।—বুড়ো বয়সে এক আইরিশ চাষার ধর্মে মতি হল। সে আগে কখনো চার্চে যায়নি বা খ্রীষ্টের কাহিনী শোনেনি। গির্জায় পাদরীর মুখে সে শুনল, ইহুদীরা প্রভু যীশুকে মেরেছে। মহা রাগে গির্জা থেকে বেরিয়েই দেখে, পথে এক ইহুদী। তখনি তাকে ধরে বেদম প্রহার। ইহুদী তো অবাক। কাতর হয়ে বলে, ভাই মারো কেন? কে কার কথা শোনে! নতুন ধর্মপ্রেরণা, সুতরাং পুনঃপুনঃ প্রহার। ইহুদী পুনরায় সকাতরে শুধায়, ভাই মার কেন?—মারবো না? তোরা আমাদের প্রভুকে মেরেছিস কেন?—সে তো ভাই ১৯০০ বছর আগে।—তাতে কি হয়েছে, আমি যে আজ শুনলুম!

গল্পের সংখ্যা আর বাড়াবো না। মনে পড়ছে হরিদ্বারের সাধুটির কথা, তিনি হরি মহারাজকে বলেছিলেন—'এত সাধুর সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু তাঁর মত সাধু কখনও দেখিনি। হাসাতে হাসাতে পেটে ব্যথা করে দিত। অমন ইয়ার সাধু জীবনে দেখিনি।'

বেলগাঁওয়ের ফরেস্ট অফিসার হরিপদ মিত্র স্বামীজীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর ভাবলেন—'এমন নিঃস্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনও দেখি নাই।'

আর হরিমহারাজ বললেন—'এমন একসঙ্গে ধমকাতে, রাগাতে, হাসাতে, ভালবাসা দিয়ে আপনার করে নিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়।'

স্বামীজীর রসিকতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আমি নমুনাবাহুল্যে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি। শুধু খাদ্য সম্বন্ধেই তাঁর অগণ্য রসিকতা। যিনি আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন, তাঁর চিন্তাকে বহুলাংশে গ্রাস করে রাখল খাদ্যতত্ত্ব! সেইখানেই তো বিবেকানন্দের প্রতিভা ও মহিমা। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' করলেই বোধি পাওয়া যায় না, সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করে শ্রীবুদ্ধ তা স্বীকার করে গেছেন। বিবেকানন্দও কথাটাকে গভীর করে বলেছেন,—শরীর যখন ভাল থাকে তখন ব্রহ্মচিন্তা করি, আর পেট কামড়ালে মা ডাকি।

দেশী বিদেশী খাদ্যবিচার নিয়ে স্বামীজীর রসিকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে তাঁর দুটি ব্যক্তিগত বিপরীতপ্রান্তের খাদ্যরুচির কথা উত্থাপন করি। এক প্রান্তে আছে লঙ্কাপ্রীতি। তিনি ভয়াবহরকম লঙ্কা খেতেন। নিজের বাড়ীতে মুসলমানী খানা খেয়ে তাঁর মসলা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পরিব্রাজক জীবনে অনেক

সময়ে হিন্দু-মুসলমান কোনো খানাই জোটেনি। হয়ত শুধু অন্ন জুটেছে, ব্যঞ্জনের কচুপোড়াটা লঙ্কাপোড়া দিয়ে সারতেন, তাতে ব্যঞ্জন এবং মসলা দুয়েরই সমন্বয় হত। পাশ্চাত্ত্যে অনেকদিন থেকেও তিনি সাহেব হতে পারেন নি, লঙ্কাপ্রীতিটা সেখানেও থেকে গিয়েছিল, এবং যখন নিজে রাঁধতেন তখন টেবিলের উপর ভোজ্যপাত্রগুলি লঙ্কা-দ্বীপের মত বিরাজ করত।

রন্ধনে স্বামীজীর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁকে রাঁধতে হয়েছে। যখন ইচ্ছায় রেঁধেছেন, হয়ত হাতে সাদা ন্যাপকিন জড়িয়ে ডাইনিংকারের ওয়েটারের গলার হুবহু নকল করে শিষ্য-বন্ধুদের ডাক দিয়েছেন—'শেষ বারের মত ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদগণকে ডাইনিংকারে ডাক দেওয়া হচ্ছে—আপনারা আসুন— আহার্য পরিবেশিত হয়েছে টেবিলে—।'

পিছন থেকে মরণাপন্নের মত মুখ করে ল্যাণ্ডসবার্গ বললেন—হে ঈশ্বর, বাঁচাও!

বাঁচাও বাঁচাও ভগবান! পেটে হাত চেপে ছটফট করতে লাগল ইউরোপীয় অনুরাগীবৃন্দ। তারা স্বামীজীর রান্না খেয়েছে। খেয়েছে তাঁর প্রস্তুত লঙ্কা-লাভার কিছু অংশ।

খেল কেন? না জেনে?

না, তারা জেনেই খেয়েছে। 'যদি একজন বিবেকানন্দ আমার জন্য রাঁধতে পারেন, আমি অন্তত তা খেতে পারি, তাতে প্রাণ যায় যাক'—একজন লিখেছেন।

'স্বামীজী যদি হাতে করে দেন বিষ খাওয়াও কিছু আশ্চর্য নয়'—অন্য একজনের রচনা।

লঙ্কার উল্টোপিঠে আইসক্রীম। এই দেবভোগ্য পদার্থটি সাহেবরা খান ভোজনান্তে। সাহেবদের বহু অঙ্কে ভোজন। একটি কোর্স, একটি অঙ্ক। কোথাও পঞ্চাঙ্ক, কোথাও সপ্তাঙ্ক, কোথাও বা দশাঙ্ক ভোজন-নাট্য। নাটকের যবনিকাপাত হয় আইসক্রীম-'দৃশ্যের' পরে। স্বামীজী বলেন—সেটা হল—'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।

স্বামীজীর আইসক্রীমপ্রীতি সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন—"স্বামীজী চকোলেট আইসক্রীম খুবই ভালবাসতেন; বলতেন, আমিও চকোলেটের মত, তাই ভালবাসি। একদিন খাবার সময়ে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজী, স্ট্রবেরী আপনার কেমন লাগে? স্বামীজী বললেন, আমি ও জিনিস কখনো খাইনি।—সেকি? আপনি রোজ খাচ্ছেন আইসক্রীমের সঙ্গে!—ও হরি! আইসক্রীমের সঙ্গে? তা বাপু, আইসক্রীমে নুড়ি ডুবিয়ে রাখলেও না দেখে খেয়ে যাব।"

স্বামীজীর জীবনসন্ধ্যার একটি ঘটনা। বেদনাকরুণ মধুরতাভরা কাহিনী। ম্যাকলাউডই লিখছেন—

"একদিন স্বামীজী বললেন, এ জগতে আমার আর কিছু নেই। যা পেয়েছিলুম সবই ফেরৎ দিয়েছি।

আমি বললাম, স্বামীজী, আপনি যতদিন বাঁচবেন, প্রতি মাসে পঞ্চাশ ডলার করে দিয়ে যাব।

স্বামীজী অল্প ভাবলেন, তারপর বললেন, তাতে আমার চলে যাবে তো?

যাবে, কিন্তু বিনা আইসক্রীমে।

আমি তাঁকে দুশো ডলার দিলাম। কিন্তু দুশো ডলারের চারমাস শেষ হবার আগেই তিনি চলে গেলেন।"

জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্থূলতা, এই ভোজন। আহার যে কতখানি জীবন-সত্য সুগভীর বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে স্বামীজী তা প্রকাশ করেছেন।—

এক সন্ধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নরকের কথা তুললেন। 'আমি দান্তের ইনফার্নো তিনবার পড়েছি'—স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'কিন্তু তোমাদের খ্রীষ্টান নরক ও তার শাস্তিবিধি আমার কাছে মোটেই ভয়ঙ্কর মনে হয় না। ভয়ঙ্কর হল হিন্দু নরক। সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি কি জানো—একজন পেটুক হয়ত মারা গেল; নরকে তার চারদিকে যত ভালো খাদ্য সম্ভব সাজিয়ে দিলে। তার পেট হয়ে গেল হাজার হাজার মাইল লম্বা; কিন্তু মুখ?—সূচ্যগ্র আকার।'

সত্যিই এই ভয়ঙ্করতম নরক, যে নরক ট্যান্টেলাসের। তির্যক হাসি মেশানো আর একটি গভীর বক্তব্য—

"মানুষের মধ্যে কিছু বুদ্ধিসঞ্চার হওয়া মানেই তার মৃত্যু। তার জীবন সুরু হয় একটা বিরাট পেট নিয়ে, তার মাথাকে ছাড়িয়ে যায় এমন পেট। যখন তার মধ্যে প্রজ্ঞা আসতে সুরু করে, তখনই তার পেট কমতে কমতে একেবারে মিলিয়ে যায়—শুধু পড়ে থাকে মাথা; তখন তার মরতে দেরী হয় না।"

এবারে নির্বাচনে আমাকে নির্মম হতেই হবে। একেবারে বাদ দেবে ধর্মীয় অসঙ্গতি সম্বন্ধে স্বামীজীর কৌতুক বিদ্রূপগুলিকে। একালের পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম-প্রবক্তা ধর্মকে তার শ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, তাই ধর্মের ভণ্ডামীকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছেন আঘাতে আঘাতে, সে ধর্মের অনাচার হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যেখানেই থাক না কেন। ধর্ম যে কতখানি হাসির উপাদান হয়েছে বিবেকানন্দ বহু হাসিতে তাকে খুলে ধরেছেন, আবার আমরা নিশ্চয় স্মরণ রাখব, ধর্মের সত্যরূপ তাঁর থেকে জীবন্ত করে তুলে ধরতে খুব কম মানুষই

পেরেছেন। ধর্ম বিবেকানন্দের কাছে জীবন্ত বাস্তবতা ছিল বলেই ধর্মক্ষেত্রে প্রেতনৃত্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

ধর্ম-রহস্য বাদ থাক, কিন্তু লেখায় তাঁর রসিকতার প্রকাশভঙ্গি নিয়ে কিছু বলা দরকার। স্বামীজীর বাগ্‌রীতি ও রচনারীতির মধ্যে আশ্চর্য সরস গভীরতা ছিল, যা তাঁর ব্যক্তিত্বেরই রূপ। জগৎ-নাট্যমঞ্চের এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হয়েও বিবেকানন্দ কখনও অভিনয় করেননি; তিনি যা বলেছেন, করেছেন, তার মধ্যে তাঁর জীবন ও ভাবনা অব্যবহিতভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই জন্যই বাংলা সাহিত্যে 'মানুষটাই স্টাইল' এই তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সমর্থক-প্রমাণ বিবেকানন্দ রেখে গেছেন। স্বামীজীর রসিকতার হিসাব সম্পূর্ণ হবে না তাঁর বাগ্‌রীতির অন্তর্নিহিত সরসতার আলোচনা না করলে।

তাঁর রচনার সর্বত্রই তিনি পরিহাসমুখর, প্রাণবন্ত, সর্বত্রই তিনি আমাদের একটি জীবন্ত উষ্ণ মানুষের সম্মুখীন করে দেন, সর্বত্রই অনুভব করা যায়, জগৎ ও জীবনরহস্য সম্বন্ধে কথা বলবার অধিকারী পুরুষ তিনি, এবং ঐ অধিকারী পুরুষ, আমরা সর্বদাই অনুভব করি, আমাদেরই বন্ধু—যিনি আঘাত করবেন, আবার ভালবাসবেন।

দৃষ্টান্তের ব্যাপারে সুবিচার করা সম্ভব নয়, তাহলে স্বামীজীর রচিত 'পরিব্রাজক,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে'র প্রায় সবটা তুলতে হয়, এবং বাকি রচনার অনেকখানি। আমরা অল্প কিছু উল্লেখ করব।

ভ্রমণ-উন্মাদ গঙ্গাধর মহারাজ সম্বন্ধে লিখলেন, 'লাসা না দেখিলে গঙ্গাধরের রক্ত শীতল হইবে না'; নিজেকেও এ ব্যাপারে ছেড়ে দিচ্ছেন না, পায়ে চক্কর থাকলে ভবঘুরে হয়, আমার পা তাহলে চক্করময়; তাঁর ভাষায়, 'ঠাণ্ডার পো' পালিয়ে যায় ধীরে, আর কলকাতায় 'পিলেগ আউছন্তি'। 'ভারতের প্রণম্য ও পবিত্র গাভী', 'শশীর ঘণ্টানাড়া ও ক্লিফট', বোম্বায়ের এক 'উড়ধামারা রামকৃষ্ণ-শিষ্য', কিংবা হরমোহনের 'Lord রামকৃষ্ণ', যার বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন, ইংলিশ লর্ড না ডিউক? মাদ্রাজের হাতীর চেয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধি বৃহস্পতি কিংবা দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গের 'দশ বৎসরের বেটা বিউনিরা'। রাজাকে (ব্রহ্মানন্দকে) তাঁর লাঠিবৎ যষ্টিবৎ প্রণাম, আর নিজের কাণ্ড দেখে বিস্ময়—'মধো, তোর পেটে এত ?' বাঙালের গানের গলা নিয়ে ঠাট্টা, 'মা গঙ্গার জল পেটে না পড়লে গলা মিষ্টি হয় না', কিংবা বাঙাল মাঝির নৌকা নিয়ে কৌতুক, যাতে চড়লে সামান্য তুফানেই ছাবৃতার নাম স্মরণ। ভারতবর্ষীয় কর্মতৎপরতার প্রশংসা—'ভক্তিযোগ প্রকাশের জন্য মহাপ্রলয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে', হঠাৎ-অবতারদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা—'কোন্ অবতার হে তুমি বাপু, কূর্ম না বরাহ,' এবং বাড়াবাড়ি-মায়াবাদীদের ধমক—'মুক্তিটাও তো মায়ার অন্তর্গত।'

সারদানন্দ ইংরেজী বলেন 'চণ্ডীপাঠের মত করে', 'শুল্কের ভয়ে উপহার দেবার ইচ্ছে উড়ে যায় মেয়েদের যৌবন এবং ভিখিরির স্বপ্নের মত', 'জ্ঞান জিনিসটা এমন নয় যে, তাকে 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে দেওয়া যাবে।' দক্ষ (পরিচিত ব্যক্তি) যখন সেই সোনা তৈরীর জ্ঞান পায়, তখন, 'বল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ', 'ইঁদুরের গর্তে গুহার সাধ মিটিয়ে নিও', কিংবা 'পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানে আকচা-আকচি থাকায় শোর খাওয়াটা ধর্মের মধ্যে', কিংবা একটি গুরুতর প্রশ্ন—সমুদ্র-লঙ্ঘনের সময় হনুমানের সী-সিকনেস হয়েছিল কিনা, কিংবা তদনুরূপ সিদ্ধান্ত, মা গঙ্গা যেবার শুকিয়ে যান তখন নিশ্চয় বারবেলা ছিল না, নচেৎ মাতা আবার জলময়ী হলেন কি করে! 'গরমের চোটে তরলমূর্তি', 'জার্মান উচ্চারণে জিভ জখম', 'ইংলণ্ড কি যমল্যাণ্ড জানি না,' 'মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ', কাঁটা চামচধারী রক্তমুখ রাক্ষস-রাক্ষসীবৎ সাহেব-মেম। নিজের সম্বন্ধে—কপর্দকশূন্য হিন্দুরাজা, আলাসিঙ্গার সম্বন্ধে—'সে বলে সে কখনও কখনও জুতা পায়ে দেয়', ইংরেজদের সম্বন্ধে—তাদের 'ওলবাটা মুখ।' ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে মাকে চার্চে যেতেই হয়, প্রত্যাশিত পুত্রের বদলে মেয়ে হলে—তাহলে গোপাল গোপালী হল, পদচিকিৎসকের স্মরণে পায়ের যন্ত্রণাবৃদ্ধি, রাজা রিচার্ডের মুসলমান মাংসপ্রীতি, দেশী চচ্চড়ির জন্য পুনর্জন্মের অভিলাষ, এবং 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুজব ক্যামনে?'

আগেই বলেছি সবকিছু উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তাই বলে আমাদের পরম শ্রদ্ধার সত্যযুগের ছবি স্বামীজীর দৃষ্টিতে দেখব না?—"অনেক পুরাণ কালের মানুষ অর্থাৎ সত্যযুগের, যখন আপামর সাধারণ এমনই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, ভেতরে একখান ও বাহিরে একখান হয় বলে কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। পাছে স্বার্থপরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়ালুড়ির সহায়ে সর্বদাই পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ ব্যবহার করতেন।" "সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে, এ জন্মে ত আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা।"

স্বামীজীর বলবার ভঙ্গি বা ভাষারীতির যেসব বিক্ষিপ্ত নমুনা দিলাম, তারই বিস্তৃততর পরিচয় পাওয়া যাবে যদি আমি তাঁর রচনা থেকে কিছু রসচিত্র উপস্থিত করি। দুটি মাত্র ক্ষুদ্র নমুনা। যথা, বাঙালী-চিত্র—

"লণ্ডনে কতকগুলো কাফ্রীর মত—আবার টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কালো হাতে খানা ছুঁলে ইংরেজরা খায় না—এই আদর! ঝি-চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রস্রাবসুবাসিত পুকুর জল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা, এবং

ছেলেদের মলমূত্রমিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাঁকচুন্নির সঙ্গে, বেশ দিগম্বর-কৌপীন, মুখে যত জোর।"

কিংবা উত্তর ভারতের চাষার ছবি—

"আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাসপাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটাভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে, তারপরে পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে, জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বের করে দিই লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা বল? দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা?"

ছবিটি সম্পূর্ণ হয় স্বামীজীর নিজের একটি ছবি দিলে। ধর্মমহাসভাপূর্বে তাঁর আমেরিকা-জীবনের একাংশ—

"এখানকার লোক বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য।...আমি এখন বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথি। রেল গাড়িতে ইহার সহিত হঠাৎ আলাপ। ইনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকটে রাখিয়াছেন। এখানে থাকার আমার এই সুবিধা—প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার লাভ—তিনি বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতের এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!...আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজ আমাকে দেখিতে আসিবেন।"

বিবেকানন্দের হিউমারের অধিকার পূর্ণতা পেয়েছে এই নিজেকে নিয়ে রসিকতার সামর্থ্যে। তিনিই সর্বোত্তম রসিক যিনি রসিকতার বিষয়ের মধ্যে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেন। নির্লিপ্ততা চাই রসিকতার জন্য, নিজের সম্বন্ধেও—

"দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি!...দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি চাল ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়াহুড়ি, চাবুকের সপাসপ—পালা পালা—সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা।...আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে, 'ও চেহারা এখানে চলবে না'। মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি মাথায়, গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া বস্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না, তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস এক ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে, বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোক কিছু বলবে না, কিন্তু ইউরোপী পোষাক পরলেই মুসকিল, সকলেই তাড়া দেবে। ...খিদেয় পেট জলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও', বললে,

'নেই।' 'ঐ যে রয়েচে।' 'ওহে বাপু, সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার যায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগল।"

স্বামীজি যখন সকলকে হাসাচ্ছিলেন, সকলে যখন হেসে কুটিপাটি, তখন নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি কি ভাবছিলেন?

"দুর্ভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে আমায় নিজেকে সার্কাসের ক্লাউনের মত মনে হয়, যে কেবল অন্যকে হাসায় কিন্তু যার নিজের দশা সকরুণ।"

জনৈক মিস বেল ধর্মোপদেশ দেবার সময়ে বলেছিলেন, এ পৃথিবী একটা স্কুলের মত, এখানে আমরা আমাদের পাঠ নিতে এসেছি।

স্বামীজী বললেন, কে তোমাকে বলেছে পৃথিবীটা স্কুলের মত?

মিস বেল চুপ করে রইলেন।

স্বামীজী বললেন, পৃথিবীটা সার্কাস, আমরা সবাই ক্লাউন, ডিগবাজি খাবার জন্য এসেছি।

আমরা ডিগবাজি খাই কেন?

কারণ আমরা ডিগবাজি খেতে ভালবাসি। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, মঞ্চ ছেড়ে চলে যাই।

জগৎটা মঞ্চ, তার মধ্যে বিবেকানন্দের জন্য আর একটা বিশেষ মঞ্চ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ থাকলে বলতেন, সেটা মঞ্চ নয়, গবাক্ষ, সেখান দিয়েই অন্য জগতের আলো এসে পড়ে।

বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য।

কিন্তু স্বামীজী, যদি ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, আমাদের ব্যক্তিত্বের কি হবে?

স্বামীজী শুনে হেসে ফেললেন। কথাটা নিয়ে খেলা সুরু করলেন, 'এদেশে তোমরা বড্ডই ভীত তোমাদের ব্য-ক্তি-ত্ব হারাতে!' 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটা ব্যঙ্গভরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, তার পরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল কণ্ঠে—তোমাদের আবার ব্যক্তিত্ব—তোমার ব্যক্তিই হয়ে ওঠনি। ঈশ্বরকে না জেনে, নিজের স্বরূপ না জেনে কে কবে ব্যক্তি হয়েছে?

গভীর প্রশ্ন থাক, সোজা জিজ্ঞাসা—স্বামীজী,আপনি ভগবানকে দেখেছেন?

পরমানন্দে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, বারে, আমাকে দেখে

তাই মনে হয় বুঝি—আমার মত প্রচণ্ড মোটা মানুষ ভগবানকে দেখতে পারে বুঝি ?

মোটা মানুষটির বয়স কত ?—সকলেরই কৌতূহল। মুখ শিশুর মত স্বচ্ছ অথচ দেহধারী চিরন্তন সভ্যতা। স্বামীজী একদিন নিজের বয়স সম্বন্ধে আলোকপাত করতেই সকলে ঔৎসুক্যে খাড়া হয়ে বসে—'আমার বয়স'—কৌতূহলে সকলের দম বন্ধ—

'খুব বেশী নয়।'

তুষ্ট উত্তরে সকলে হতাশ হয়ে হেসে ফেলে।

স্বামীজী শ্রোতাদের যেমন উচ্চ ভাবলোকে তুলে দিতেন, তেমনি মাঝে মাঝে মই কেড়েও নিতেন। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন।—

'আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি বিয়ে করেছি কি না ?'— বলে একটু থামলেন, সহাস্য মুখে শ্রোতাদের দিকে তাকালেন, সমস্ত হল গুঞ্জনে মুখর,—স্বামীজীর মুখের হাসি হঠাৎ সরে গিয়ে সেখানে ভয়ানক আতঙ্কের ছায়া—'আমি বিয়ে করব ? কদাপি না—শয়তানের ফাঁদে পড়ব ?'—একটু থামলেন, যাতে কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া ভালভাবে হতে পারে, তারপরে সমর্থনের যে গুঞ্জন উঠেছিল তাকে হাত তুলে থামালেন,—দেহের প্রত্যেক রেখায় এখন কঠোরতম গাম্ভীর্য,—'তবে সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে আমার একটা বিশেষ আপত্তি আছে,—তা হল,'—স্বামীজী আবার থামলেন, সকলেই প্রতীক্ষায় ঘনীভূত,—'সন্ন্যাস সমাজের সেরা মানুষগুলিকে সরিয়ে নেয়।'

অট্টহাসিতে হল ফেটে পড়ল।

বিবেকানন্দের হাসি একটা চ্যালেঞ্জ বা চ্যালেঞ্জের উত্তর। জগতের এত দুঃখ, নিজ জীবনের এত দুঃখ—এর মধ্যেও কি তিনি হাসতে পারেন ? এই দুঃখের সামনে দাঁড়িয়ে ধার্মিকেরা বিমর্ষ হয়ে পড়েন, তাঁরা পৃথিবীর মুগ্ধ মায়ায় ধরা পড়তে চান না, একটু আবরণ সরালেই দেখেন অতল অশ্রু, তাই তো তাঁরা বুক চাপড়ান, মানুষকে বেদনার দীক্ষা দিতে চান, দগ্ধ পৃথিবীর অঙ্গার গায়ে মেখে হাজির হন মানুষের কাছে। বিবেকানন্দ যে বলেন, মানুষ অমৃতের সন্তান, তাই সে আনন্দে থাকবে, হাসবে—বিবেকানন্দ দুঃখের গভীরকে কতখানি স্পর্শ করেছেন ?

স্বামীজী শুনে আরও হাসবেন। তুরীয়ানন্দ দেখেছিলেন, নির্জনে ছাতে পায়চারি করতে করতে তিনি গান গাইছেন, আপন মনে বলছেন, আমার দুঃখ কেউ যে বোঝে না—তারপর আলসেয় মাথা রেখে কাঁদছেন, জগতের বেদনায় তাঁর অশ্রুর রক্তনিষেক —সে বিবেকানন্দ হাসির আলো মাখিয়ে তাঁর বেদনাবিন্দুগুলিকে সকলের সামনে

তুলে এনেছেন। তাঁর স্নেহের বোন মেরী হেলের পিতার মৃত্যুতে (স্বামীজীর 'ফাদার পোপ') একটি চিঠি লিখেছিলেন, পত্রসাহিত্যের সম্পদ সেই চিঠিখানি কয়েকছত্রে গভীরতম বেদনাকে ধারণ করেছে,—সেই পত্রে তিনি লিখেছিলেন, —কী যে গভীর দুঃখ পেয়েছি—আমি সন্ন্যাসী—তবু! I am sorry because inspite of monastic training the heart lives on. মেরী, তোমার জীবনে এই তো প্রথম দুঃখ, কিন্তু আমার জীবন? কতজনকে হারিয়েছি, কত সহ্য করেছি,—সবচেয়ে বিচিত্র যাতনা কিসে জানো,—যখন কেউ চলে যেত আমার মনে হত, আমি তার যোগ্য ছিলাম না। বাবা যখন মারা গেলেন, মাসের পর মাস এই দংশন—আমি তাঁর কথা শুনিনি।

তারপর স্বামীজী লিখেছেন, মেরী, তোমার সঠিক জীবন সুরু হল এই দুঃখের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে—we learn through smiles and tears we learn. মেরী, তুমি আচ্ছাদনের তলায় কাটিয়েছ, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে জ্বলেছি পুড়েছি—দারিদ্র্যে, অন্যের বিশ্বাসঘাতকতায়, আর নিজের নির্বুদ্ধিতায়।

সবশেষে অপরূপ করুণা ঝরেছে অপরূপ ভাষায়—যদি আমার আনন্দভরা মন থাকত তা হলে মেরী, নিশ্চয় জেনো, সে মন তোমার সঙ্গে বিনিময় করে নিতাম —কিন্তু হায়—! If it were possible to exchange grief, and I had a cheerful mind, I would exchange mine for your grief ever and always.

তবু বিবেকানন্দ হাসবেন—কারণ প্রকৃতিকে আমাদের জয় করতেই হবে। প্রকৃতি বলবে কাঁদো, আর আমরা তার নির্দেশ মেনে কাঁদতে সুরু করে দেব—মেনে নেব আত্মার এত বড় পরাজয়?

প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে চ্যালেঞ্জ বিবেকানন্দ গ্রহণ করেছিলেন, একজন অদ্বৈত বেদান্তীর পক্ষেই তা নেওয়া সম্ভব। সাধারণ মায়াবাদীর মত নেতির বালিতে বিবেকানন্দ মুখ গুঁজে থাকেন নি, রুখে দাঁড়িয়ে তৃতীয় নয়নের আগুনে প্রকৃতি-মায়াকে ভস্মীভূত করেছেন, তারপরে তিন নয়নে হেসেছেন,—জ্ঞানের আর প্রেমের নয়ন একসঙ্গে আলোয় ঝলমল করেছে।

আধ্যাত্মিক মানুষই যথার্থ হিউমারে অধিকারী। যেহেতু তাঁর আছে অনাসক্তি। বিশেষত যদি বিবেকানন্দের মত আধ্যাত্মিক পুরুষ হন, যাঁর পক্ষে প্রকৃতিজয় সহজসিদ্ধ। এক্ষেত্রে তিনি কেবল জীবন নিয়ে রসিকতা করবেন তাই নয়, অধ্যাত্মজীবন নিয়েও।

সর্বোচ্চ হিউমার জীবনবোধ, জীবন্মুক্তি ও জিনিয়াসের সমন্বয়ে গঠিত।

বিবেকানন্দের মধ্যে তিন বস্তুই ছিল। একদিকে তাঁর জিনিয়াস তাঁকে বস্তুসত্যের গভীরে নিয়ে গেছে, সেখানে দেখেছেন বস্তুসম্পর্কের রহস্য, দেখেছেন সম্পর্কের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি, তাঁর জীবনবোধ ঐ অসঙ্গতিসহ সম্পর্ককে পরম প্রেমে আলিঙ্গন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তারপর তাঁর জীবন্মুক্তি—সে দেখেছে ঐ আলিঙ্গনের আবেগজড়িত চেহারা, আর হেসে উঠেছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিবেকানন্দীয় রচনা উদ্ধৃত করি—

"বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু হায়! এজগতে লব্ধ জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। যে মুহূর্তে মনে হয় কিছু শিখেছি, তখনই রঙ্গমঞ্চ থেকে দ্রুত বিদায় নিতে হয়।

"এই খেলার জগৎ কোথায় থাকত, আর খেলাই বা কেমন করে চলত যদি এই খেলার মর্ম আমাদের আগে থেকে জানা থাকত? চোখ বেঁধে আমাদের খেলা। এ খেলায় আমাদের মধ্যে কেউ শয়তানের ভূমিকায়, কেউ পুণ্যবান বীরের, কিন্তু জেনো সবই নিছক খেলা। রঙ্গমঞ্চে সিংহ-ব্যাঘ্র, দৈত্য-দানব, এবং আরও কতনা জীব আছে কিন্তু সকলেরই মুখে জালবাঁধা, তারা তীব্র শব্দ করে কিন্তু কামড়াতে পারে না···।"

সারাজীবন যে জগতের জন্য খেটেছেন, সে জগৎ 'দেহের এক খাবলা মাংস তুলে না নিয়ে এক টুকরো রুটিও ছুঁড়ে দেয়নি' সত্য,—কিন্তু দেহেরই বা মূল্য কি, কোথায়? মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে দেহবস্ত্র ত্যাগ করবার কালে মৃত্যুমুকুরে নিজের নগ্নসত্তাকে দেখে অলজ্জ আনন্দে বিবেকানন্দ হাসছেন—

"তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ রোগটা আর দু'তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে।··· আমার কোনো খেদ নেই। কেবল কাজটাকে গুছিয়ে নেবার জন্য সর্বক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করছি,—শুধু এইজন্য যে, আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যাব, তখন যেন যন্ত্রটি সামনের দিকে এগিয়ে চলে। বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জন দিয়েছি, সেদিনই মৃত্যুকে জয় করেছি।"

আবার—

"হাঁ, সুদীর্ঘকাল তুমি আমাকে চিঠি লেখনি। এ চিঠি তোমার প্রাপ্য নয়, কিন্তু দেখছ—আমি কত ভালমানুষ, কারও সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, বিশেষ করে মৃত্যু যখন দ্বারে।"

মৃত্যু নিয়ে জীবিত মানুষ এমন করে হাসে!

নিবেদিতা বিবেকানন্দের মুখে sistine child-এর হাসি দেখেছিলেন।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে শিশু হাসছে।

মৃত্যুর সম্বন্ধে কী অপূর্ব ক্যালাসনেস !

তাই বলে জীবনকে ভালবাসা কিছু কম ? জীবন ও মৃত্যু যে একই মুখের দুই দিক।

হাতরাসের স্টেশনমাস্টার শরৎ গুপ্ত সমবয়সী সন্ন্যাসীকে ডেকে এনেছেন বাড়ীতে, কথাবার্তায় বড় মুগ্ধ—সন্ন্যাসীর সঙ্গ নেবার বাসনা। সন্ন্যাসী রঙ্গ করে গান ধরলেন,—চাঁদ মুখে মাখ ছাই—।

শরৎ গুপ্ত সত্যই ছাই মেখে এসে হাজির।

ছাই মাখিয়ে সন্ন্যাসী তাঁকে সংসার ছাড়ালেন, কিন্তু হাজির করলেন বড় ভালবাসার শ্মশানে।

শরৎ গুপ্ত সন্ন্যাসী হয়ে সদানন্দ হয়েছেন। তাঁর গুরু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আগেই; এবার সদানন্দের যাবার পালা—সেবারত ছেলেদের, 'সদানন্দের কুকুরদের' ডেকে বলছেন—বলতে বলতে তাঁর চোখে জল ঝরছে—তোরা আমায় কী ভালবাসিস আর ! জানিস, আমার গুরু আমার জুতো বয়েছিল মাথায় করে !

নরেন দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে আমেরিকা থেকে ফেরবার পরে সদানন্দ বলেছিলেন, এই বিরাট মানুষকে আমি চিনি না, এই বিবেকানন্দকে আমার ভয় করে, আমি নরেন দত্তকে চিনি, যে আমার জুতো বয়েছিল মাথায় করে—।

কিন্তু বিবেকানন্দ কোনোদিন নরেন দত্তকে বিদায় দেননি। ২রা জুলাই, ১৯০২, শিষ্যা নিবেদিতাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, খাওয়াশেষে হাতে জল ঢেলে হাত মুছিয়ে দিলেন।

সন্ত্রস্ত নিবেদিতা বললেন, একি করছেন ?

বিবেকানন্দ বললেন, যীশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।

গুরুর তাই কাজ, শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেওয়া, জুতো বয়ে নিয়ে যাওয়া।

যিনি বিশ্বগুরু তিনি সারা পৃথিবীর পাদুকা বহন করেন।

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করতে চাননি, কিন্তু—

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ক্রুশ কাঠটিকে চাপিয়ে দিলেন পুত্রের ঘাড়ে। তারপর দিব্য নিষ্ঠুরতায়, নিষ্ঠুর প্রসন্নতায় তাঁর মুখ স্নিগ্ধোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রক্তাক্ত দেহে সেই ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, কষ্টে কাঁদছেন, বলছেন,—পিতা, একি করলে, আমাকে ত্যাগ করলে কেন ?—হঠাৎ খ্রীষ্ট দেখলেন, পথের ধারে জুডাস দাঁড়িয়ে—

জুডাস—! বিশ্বাস ঘাতক!

একি—বিশ্বাসঘাতক জুডাস কোথায়! জুডাসের মধ্যে হাসছে আমার স্বর্গস্থ পিতা!! পিতা, আমার পিতা,—যে পিতার সঙ্গে আমি এক!!! I and my father are one.

বিবেকানন্দ অট্টহাস্য করতে লাগলেন—'হাঃ হাঃ হাঃ···আমিই জুডাস···আমিই জিসাস···তুইই আমার মজা, আমার খেলা ···।'

'Ha! ha! you silly girl, all is good! Nonsense!······I enjoy good and I enjoy the evil. I was Jesus and I was Judas Iscariot; both my play, my fun.'

'Now I am going to be truly Vivekananda!'

অদ্বৈত বেদান্তের এই হল শ্রেষ্ঠ নাটকীয় রূপ। আর এখানেই হিউমারের চরম।

গিরিশচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ

ইন্দ্রমিত্র

পরমহংসদেব সেদিন থিয়েটারে এসেছেন। কিছু লুচি প্রসাদ করে দিয়েছেন। কে জানে কেন, সেদিন গিরিশচন্দ্রের মনে হল : আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরের সেবা করতে পারব না, কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহলে তাঁর শুশ্রূষা করতে পারব।

মনের কথা মুখে আনতে দেরি হল না। মদমত্ত গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবকে বললেন—তুমি আমার ছেলে হও।

—তা কেন রে।—পরমহংসদেব বললেন—আমি তোর গুরু। ইষ্ট হয়ে থাকব।

গিরিশচন্দ্র বললেন—না, ঠাকুর, তোমাকে আমার ছেলে হতেই হবে। বলো, কবে আমার ছেলে হবে?

পরমহংসদেব বললেন—আমি তোর ছেলে হব কেন রে? জানিস, আমার বাপ কত নির্মল ছিলেন।

পরমহংসদেব কিছুতেই গিরিশচন্দ্রের ছেলে হতে রাজি হলেন না। মদমত্ত গিরিশচন্দ্র অতএব পরমহংসদেবকে অবাক্য-কুবাক্য বলতে লাগলেন।

সেদিন হরিপদ চট্টোপাধ্যায় আগাগোড়া গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আছেন। তিনি বললেন—গিরিশদাদা, কাজটা বড়ো অন্যায় হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কোনটার কথা বলছিস?

—এই যে আপনি আজ ঠাকুরকে বড়ো গালাগাল দিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে এখনি ক্ষমা চাওয়া উচিত। গিরিশচন্দ্র বললেন—বলিস কি রে। তাঁর কি নিন্দাগাল আছে। তিনি কি আমার অপরাধ ধরতে পারেন, তাহলে তো আমি রেণুর রেণু হয়ে যাই!

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই যেন সংবিৎ ফিরে এল গিরিশচন্দ্রের। না, কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। অনুতাপের আগুন জ্বলল অন্তরে। অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। মার্জনার অযোগ্য অপরাধ। একবার বারান্দায় আসেন, একবার ঘরে আসেন—গিরিশচন্দ্র ছটফট করতে লাগলেন। বুকের রক্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওদিকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কি হচ্ছে? পরমহংসদেব যাকে সামনে পাচ্ছেন

তাকেই বলছেন—শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা নয় তাই বলে গালাগালি দিয়েছে।

শুনে অনেকেই বললেন—জানি ওটা একটা পাষণ্ড। ওর কাছেও আপনি যান!

কিন্তু পরমহংসদেব কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না।

রামচন্দ্র দত্ত সেই সকালেই কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। কলকাতা থেকেই রামচন্দ্র সবিস্তারে শুনে এসেছেন গতরাত্রের ঘটনা। শুনে এসেছেন—যে-গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবকে একমুহূর্তে অবাক্য-কুবাক্য বলেছেন, সেই গিরিশচন্দ্রই পরমুহূর্তে কর্দমাক্ত কলেবরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন পরমহংসদেবকে।

পরমহংসদেব রামচন্দ্রকে বললেন—ছাখ, গিরিশ আমায় গাল দিয়েছে।

রামচন্দ্র অক্লেশে বললেন—বেশ তো করেছে।

পরমহংসদেব আর সকলকে বললেন—শোন, শোন, রাম কী বলে শোন, আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করেছে, তবু বলে বেশ করেছে।

রামচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ তো। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে বলেছিলেন, 'তুমি বিষ উদ্‌গিরণ করো কেন?' কালীয়নাগ উত্তর দিয়েছিল, 'তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, আমি সুধা উদ্‌গিরণ করব কোত্থেকে?' আপনিও থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যা দিয়েছেন, তাই দিয়েই সে আপনার পুজো করেছে।

পরমহংসদেব বললেন—যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভালো?

অনেকেই সমস্বরে আপত্তি করে উঠলেন, কিন্তু রামচন্দ্র বললেন—যেতে হবে বৈকি।

পরমহংসদেব বললেন—রাম, তবে গাড়ি আনতে বল, চল, তার বাড়ি যাই।

কিন্তু এই দুপুরের রোদে যেতে পরমহংসদেবের নিশ্চয়ই কষ্ট হবে, কোনো-কোনো ভক্ত তাই আপত্তি করলেন। কিন্তু পরমহংসদেব কোন কথা শুনলেন না, কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে সরাসরি চলে এলেন কলকাতায়, গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমেই পরমহংসদেব বললেন—ঈশ্বর-ইচ্ছায় এলুম।

সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ—তখন পর্যন্ত অবশ্যি তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হননি, তখনো তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত—ছিলেন পরমহংসদেবের সঙ্গে; দৃশ্য দেখে তিনি গিরিশচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিলেন, বললেন—জি. সি., ধন্য তোমার বিশ্বাস।

হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ 'জি. সি.' বলে ডাকতেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র আর স্বামী বিবেকানন্দ—একই পরমগুরুর শিষ্য দুজনে।

১৮৮৫ সালের ১-মার্চ—দোলপুর্ণিমা। বিবেকানন্দ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। পরমহংসদেব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন—তুই নাকি গিরিশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে যাই।

একা স্বামী বিবেকানন্দ নন, পরমহংসদেবের আরো অনেক ভক্ত প্রায়ই সেসময়ে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে যান। গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকেন, ভক্তদের সঙ্গে কেবল পরমহংসদেবের কথা বলেন। গিরিশচন্দ্রের বদ্ধমূল বিশ্বাস, পরমহংসদেব অবতার। গিরিশচন্দ্র সকলকে আপন বিশ্বাসের কথা বলেন।

পরমহংসদেব স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—গিরিশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিলল ?

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—আমি কিছু বলিনি। তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললাম না।

গিরিশচন্দ্র আর স্বামী বিবেকানন্দ—বলরামবাবুর বাড়িতে তুজনে খেতে বসেছেন পাশাপাশি। আম খেতে বসেছেন। গিরিশচন্দ্রের পাতে যত আম পড়ছে, সব মিষ্টি। আর স্বামী বিবেকানন্দের পাতে যত আম পড়ছে, সব টক।

স্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রকে বললেন—জি. সি., তোর পাতে যত মিষ্টি আম, আর আমার পাতে যত টক। নিশ্চয়ই তুই বাড়ির ভিতর গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছিস।

গিরিশচন্দ্র বললেন—আমরা গৃহী, সংসারী, আমরাই মজা মারব। তুই সন্ন্যাসী-ফকির, পথে-পথে ঘুরে বেড়াবি, তোদের কপালে তো স্থঁটকো টোকো জুটবে।

তুজনে ঝগড়া লেগে গেল। তারপর তুজনে খুব খানিকক্ষণ হাসলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কারো সঙ্গে ঝগড়া করে বুঝি গিরিশচন্দ্র এমন সুখ পাননি।

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র বলেছেন ঃ

"কি অশুভক্ষণে তুজনে দেখা হয়েছিল যে, একদিনও একটি মিষ্টি কথা বলতে পারলুম না। বরাবর কেবল ঝগড়াই করলাম, গালমন্দ করলাম। তার সঙ্গে ঝগড়া গালমন্দ না করলে যেন আমার সোয়াস্তি হত না, বুকটা যেন খোলসা হত না। এমন লোক খুব কম পাওয়া যায় যে, একটা কথা কয়ে সুখ হয়—মিষ্টি কথাই হোক আর রুক্ষ কথাই হোক, সবই যেন মিষ্টি।"

স্বামী বিবেকানন্দ তখন আমেরিকার নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিস্তর সুখ্যাতি হচ্ছে চতুর্দিকে। বাঙলাদেশেও একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র একদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন—এ হল কি। এ যে miracle-এর দিন আবার ফিরে এল। বহু শতাব্দী আগে miracle হয়েছিল, এখন যে চোখের সামনে miracle দেখছি। এ যে বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে গেল। এ

কি তর্কযুক্তিতে হয়! একটা শক্তি পেছনে না দাঁড়ালে এসব কাজ কি কেউ করতে পারে?

বলে গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে প্রণাম করতে লাগলেন। পরমহংসদেবের জয়ধ্বনি করতে লাগলেন।

বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে এসেছেন একদিন। অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের ধুলো নিলেন। গিরিশচন্দ্রও নিচু হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পায়ের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছেন, সেই মুহূর্তেই গিরিশচন্দ্রের দু-হাত ধরে ফেললেন স্বামী বিবেকানন্দ। বললেন—কি করো ঘোষজা, আমার যে অকল্যাণ হবে!

১৮৯৭ সালের একদিন। গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। গিরিশচন্দ্রকে বললেন—জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িয়ে দিই। আবার ভাবি, এতে না ভারতে আরেকটা সম্প্রদায় হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কখনো ভাবি, সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কখনো কারো ভাব নষ্ট করেননি, তিনি সমদর্শী। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বলো?

—আমি আর কি বলব?—গিরিশচন্দ্র বললেন—তুমি তাঁর হাতের যন্ত্র। যা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অতশত বুঝি না। আমি দেখছি, প্রভুর শক্তি তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সাদা চোখে দেখছি।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—আমি দেখছি, আমরা নিজের খেয়ালে কাজ করে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিদ্র্যে তিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান—ওটি দেখতে পেয়েছি কিন্তু প্রভুর শক্তির কিছুমাত্র ইয়ত্তা করে উঠতে পারলাম না।

গিরিশচন্দ্র বললেন—তিনি বলেছিলেন, 'সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কাকেই বা করাবে।'

কথায়-কথায় আমেরিকার কথা উঠল। যেন গিরিশচন্দ্রই ইচ্ছে করে স্বামীজীর মন সেদিকে ফিরিয়ে দিলেন। কেন গিরিশচন্দ্র এমন করলেন? কেননা, পরমহংসদেবের কথা বেশি বলতে-বলতে সংসারবৈরাগ্য ও ঈশ্বরোদ্দীপনা হয়ে স্বামীজী যদি একবার নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারেন, তাহলে আর এক মুহূর্তও তাঁর দেহ থাকবে না। স্বয়ং পরমহংসদেবের মুখে গিরিশচন্দ্র একথা শুনেছেন।

১৮৯৭ সালের আরেক দিন।

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে বসে স্বামী বিবেকানন্দ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বেদ পড়াচ্ছেন। এমন সময় গিরিশচন্দ্র সেখানে এসে উপস্থিত। গিরিশচন্দ্র বিমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন স্বামী বিবেকানন্দের বেদব্যাখ্যা।

গিরিশচন্দ্র বললেন—কি আর পড়ব ভাই? অত অবসরও নেই বুদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের কৃপায় ওসব বেদবেদান্ত মাথায় রেখে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন বলে ওসব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ওসব দরকার নেই।

সামনে একখানা প্রকাণ্ড ঋগ্বেদ। সেখানাকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন গিরিশচন্দ্র। বলতে লাগলেন—জয় বেদরূপী রামকৃষ্ণের জয়।

তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছিলেন স্বামীজী। গিরিশচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ-বেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ওই অমুকের বাড়ির গিন্নী, এককালে যার বাড়িতে পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায়নি; ওই অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুণ্ডারা অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ওই অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে; অমুক জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব নিয়ে গেছে;—এসব বন্ধ করার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন স্বামীজী। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবতে-ভাবতে স্বামীজীর চোখে জল এসে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

গিরিশচন্দ্র তখন শরচ্চন্দ্রকে বললেন—দেখলি বাঙাল, কত বড়ো প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না। কিন্তু ওই যে জীবের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে স্বামীজী ফিরে এলেন।

দু-চার কথার পর শরচ্চন্দ্র স্বামীজীকে বললেন— নানা লোকের নানা কথায় মাথা ঠিক থাকে না। গিরিশবাবু বলেন, 'কি হবে ওসব পড়ে?' আর আপনি বলেন, বিচার করতে।

স্বামীজী শরচ্চন্দ্রকে বললেন—আমাদের দুজনের কথাই সত্যি। তবে দুই স্ট্যাণ্ড-পয়েণ্ট থেকে আমাদের দুজনের কথাগুলো বলা হচ্ছে, এই পর্যন্ত।

একটু পরেই স্বামী সদানন্দ এলেন। তাঁকে দেখেই বিবেকানন্দ বললেন—ওরে,

এই জি. সি.-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস ?

—মহারাজ ! যো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

বিবেকানন্দ তাঁকে বললেন—প্রথমে ছোটো-খাটো স্কেলে একটা রিলিফ-সেণ্টার খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে—যাদের কেউ দেখবার নেই এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে—বুঝলি ?

—যো হুকুম মহারাজ।

স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। ঠিক-ঠিক সেবা করতে পারলে, অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—মুক্তিঃ করফলায়তে।

তারপর গিরিশচন্দ্রকে বললেন—দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়, এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমার যদি হাজার জন্ম নিতে হয়, তাও নেব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে ? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ওই পথে যেতে হবে। কেন, বলো দেখি, এমন ভাব ওঠে ?

গিরিশচন্দ্র বললেন—তা না হলে আর ঠাকুর তোমায় সকলের চেয়ে বড়ো আধার বলতেন !

গিরিশচন্দ্র আর স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের অনৈক্য সম্পর্কে অজস্র উক্তি করা চলে। কিন্তু দুই চরিত্রের ঐক্য কোথায় ? দুজনেই শক্তিশালী পুরুষ, দুজনেই প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দুজনেই পরমহংসদেবে সমর্পিতচিত্ত। আর কোনো আশ্চর্য ঐক্য ?

মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন :

"দার্শনিক মতে গিরিশচন্দ্রের ভাবসকল বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার মনটা অতি উচ্চ স্তরে যাইতে পারিত। এইরূপ কথিত আছে—'A great man is one who can transform himself in various forms,' অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ ইচ্ছানুযায়ী নিজের দেহ-মনকে বহুরূপে পরিবর্তিত করিতে পারেন। স্বামীজী সর্বদাই বলিতেন—'If I meditate on the brain of Śankara, I become Sankara. If I meditate on the brain of Buddha, I become Buddha,' অর্থাৎ শঙ্করের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন শঙ্কর হয়ে যাই, আবার বুদ্ধের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন আমি বুদ্ধ হয়ে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের ভিতর দেখা যাইত যে, একই দেহের ভিতর বহুবিধ বিবেকানন্দ ও বহুবিধ গিরিশচন্দ্র ভাবানুযায়ী বাস করিতেছে।"

তুই পুরুষের চরিত্রের এই এক সত্যসুন্দর ব্যাখ্যা।

১৮৯৮ সাল। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে পরমহংসদেবের জন্মতিথি পূজার বিপুল আয়োজন। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ সবকিছু তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন।

যথাসময়ে গিরিশচন্দ্র এলেন।

মঠের সন্ন্যাসীরা স্বামী বিবেকানন্দকে মহানন্দে সাজাচ্ছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল বিভূতি, কানে শঙ্খের কুণ্ডল, মাথায় জটাভার, বাঁ-হাতে ত্রিশূল, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলায় আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত রুদ্রাক্ষমালা।

কিছুক্ষণ পরে, অত্যাশ্চর্য কাণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ আপন বেশভূষা খুলে নিজের হাতে গিরিশচন্দ্রকে সাজাতে লাগলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজের হাতে গিরিশ-চন্দ্রের শরীরে ভস্ম মাখিয়ে দিলেন ; কানে দিলেন কুণ্ডল, মাথায় দিলেন জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ, দুই বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়।

এই আরেকরকম মূর্তি গিরিশচন্দ্রের।

সাজিয়ে-গুজিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার। আমাদের সঙ্গে এঁর কোনো প্রভেদ নেই।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন গিরিশচন্দ্র।

স্বামী বিবেকানন্দ একখানা গেরুয়া কাপড় আনালেন। গেরুয়া পরানো হল গিরিশচন্দ্রকে। অবাক্যব্যয়ে গিরিশচন্দ্র গেরুয়া পরলেন।

তারপর স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—জি. সি., তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের কথা শোনাবে।

সকলে স্থির হয়ে বসলেন স্বামী বিবেকানন্দের কথায়। গিরিশচন্দ্রের মুখে সকলে আজ পরমহংসদেবের কথা শুনবেন।

কিন্তু, হায়, গিরিশচন্দ্রের মুখে কোনো কথা নেই।

আনন্দে পাথর হয়ে আছেন গিরিশচন্দ্র।

যাই হোক, পরমহংসদেবের কথা আজ গিরিশচন্দ্রকে বলতেই হবে, অবশ্যই বলতে হবে।

শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র বললেন—দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলব? তোমাদের মতো কামকাঞ্চনত্যাগী বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এই অধমকে একাসনে বসবার অধিকার দিয়েছেন, এতেই তাঁর অপার করুণা অনুভব করি।

বলতে বলতে গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আর কিছুই বলতে পারলেন না তিনি।

দিব্যজীবন : দেববাণী

মায়া বসু (সিংহ)

অরণ্য, অন্ধকার, অশ্রান্ত বর্ষণ। তারি মাঝ দিয়ে চলেছেন মিস গ্রীনসটাইডেল, ও মিসেস ফাঙ্কি। তাঁরা শুনেছেন এই সহস্রদ্বীপোদ্যানেই আছেন মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ, যাঁর দর্শন-আশায় দূর দেশ হতে বহু অনুসন্ধান করে তাঁরা এখানে এসেছেন। পার্বত্য পিচ্ছিল পথে পা যাচ্ছে বেধে, কাদায় ক্লিন্ন বাস, কাঁটায় বেধে যায় পোষাকের প্রান্তসীমা, পদে পদে বিঘ্ন বিলম্বিত করে গতি, কিন্তু মন ছুটে চলেছে তাঁরি দিকে। তিনি কে? জানি না। কেমন তাঁকে দেখতে? তাও জানি না। শুধু শুনেছি তিনি ঊর্ধ্বলোকের পরম আবির্ভাবের আশীর্বাদ। তাঁকে জন্মদানের মহান পুণ্য তাঁর দেশের, তাঁকে বহন করার পরম আনন্দ সমগ্র জগতের, আর তাঁর চরণ-প্রান্তে যারা পৌঁছেছে, তাদের সৌভাগ্য জন্ম-জন্মান্তরের। সেই চরণাশ্রয়ের আশাতেই ছুটে এসেছে এই দুই তীর্থযাত্রী।

সামনে পথ দেখিয়ে চলেছে একটি লোক। তার হাতের লণ্ঠন উঠছে দুলে। মনও উঠছে দুলে আশায় নিরাশায়। পথের অন্তে পাব কি পরম আনন্দের আশ্রয়? সিক্ত নিবিড় পত্রগুচ্ছ ঘিরে ধরেছে অঙ্গ, ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। আত্ম-নিবেদনের তন্ময়তা বাজে চলার ছন্দে। অবশেষে ক্লান্ত অবসন্ন দুটি দেহ পৌঁছল কুটীরসীমায়। দ্বারপ্রান্তে স্বয়ং স্বামীজী! অপরূপ আবির্ভাব! ঘরের আলো এসে পড়েছে তাঁর প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে। করুণাঘন আয়ত নয়ন। উজ্জ্বল গৈরিক বেশ আলোর স্পর্শে অগ্নিবরণ। তাম্রাভ জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ। তাঁকে দেখে কথা গেল হারিয়ে, আবেগ উঠল ফেনিয়ে, তাঁর চরণ-প্রান্তে নতজানু হয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু মাত্র বলতে পারলেন তাঁরা—'আমরা ডেট্রয়েট থেকে আসছি, ভগবান ঈশা থাকলে আমরা যেমন তাঁর পদপ্রান্তে শরণাগত হতাম, আপনার পদপ্রান্তে আমরা সেই রকম শরণাগত হয়ে এসেছি।' করুণায় প্রেমে অতল হয়ে উঠল মহাপুরুষের নয়ন। গভীর সঙ্গীতের সুরে বললেন,—'খ্রীষ্টের মতই আমি যদি এখনি তোমাদের মুক্ত করতে পারতাম।'

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্রাম নিতে এসেছেন থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তাঁর ছাত্রী

মিস ডাচারের ছোট কুটীরে। অশ্রান্ত কর্মে কেটেছে কয়েক বছর আমেরিকায়। শুধু কাজ কাজ কাজ, কিছু বিশ্রাম নইলে দেহ চলে না, যে বিশ্রাম আসলে অবিক্ষুব্ধ আত্মায় প্রত্যাবর্তন।

অরণ্য সমুদ্রের মাঝে বাতিঘরের মত কুটীরটি। সেণ্টলরেন্সের লীলা প্রবাহিণীর একটি জলধারা ঢাল ছুঁয়ে বাড়ীর পিছনে হ্রদের সৃষ্টি করেছে। সুনীল নভোমণ্ডল, দিগন্তবিস্তৃত পর্বতরেখা, প্রস্তরাকীর্ণ ধরণীর নির্মল নির্জনতায় স্বামীজীর ক্লান্ত দেহমন ডুব দিয়েছিল প্রশান্তির আনন্দলোকে। তাঁর পুণ্য-সঙ্গ লাভের আশায় যাঁরা সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, সেই শিষ্য-শিষ্যারাও দৈবক্রমে সংখ্যায় ছিলেন বারোজন। অধ্যাত্মজীবন নিয়ে একটা উৎসাহের ঢেউ খেলছিল সকলের মনে। স্বামীজী পিতার মতই কোমল স্নেহে অসীম ধৈর্যে শিক্ষা দিয়ে সেই উদ্দীপনাকে জ্বলন্ত করে তুলতেন—"ব্যক্তিত্বই আমার লক্ষ্য, ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলার চেয়ে আর কোনো উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।" "আমি যদি আমার জীবনে একটি মাত্র ব্যক্তিকে স্বাধীনতা লাভ করতে সাহায্য করতে পারি তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।" "একটি ব্যক্তির মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব নিহিত আছে।"

দোতলার প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরটিতে সকালের ক্লাশ হত। সোনার রোদের প্লাবন ঘরে। আলোর আভা পড়ত তাঁর ললাটে। তাঁর উপবেশনের ভঙ্গিতে রাজর্ষির মহিমা। তাঁকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে বসতেন শিষ্য-শিষ্যার দলটি। স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হোত দেববাণী :—

"আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিত বিদ্যমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের দুটো বিকাশ, একটা এই প্রকৃতি, এইটেই সাধারণ বিকাশ। আর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুরুষগণ। সেই তিনি ব্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞেয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুকে আমরা জানতে পারি না। পরম পিতাকে (God the father) জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়কে (God the Son) জানতে পারি।

"এই সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তাঁরা ঈশ্বর—তাঁরা আজন্ম এটা জানেন, তাঁরা যেন সেই সব অভিনেতাদের মত, যাঁদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—নিজেদের আর প্রয়োজন নেই, তবু তাঁরা অপরকে আনন্দ দেবার জন্যে রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন।"

"সেই পরমেশ্বরই পরম প্রভু, সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকেই যথার্থ ভক্তি বলা যায়।

"ভক্তি ঈশ্বরে পরম প্রেমস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ—যা লাভ করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয়।—যা পেলে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কারও প্রতি দ্বেষ করে না। ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে।

"ভক্তিকে কোন বাসনাপূরণের সহায়স্বরূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কারণ ভক্তিই সমুদয় বাসনানিরোধের কারণস্বরূপ।

"ভক্তি অহৈতুকী হওয়া চাই। এমন কি আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি তখনও সেই প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা। প্রেমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, প্রেম কিন্তু স্বভাবতই শান্তি ও আনন্দস্বরূপ।......হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে তখন সে ভালবাসা ছাড়া আর সব ভুলে যায়। ভক্ত হবার জন্যে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া।—এই যে সব স্বর্গে যাবার কামনা—এ ভোগ সুখেরই কামনা। এ কামনা ত্যাগ করতে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—নিজের জন্যে ইহলোক বা পরলোক কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্যে প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ।......ভগবান রাজার রাজা, আমরা তাঁর সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না।"

গ্রীষ্মের আর এক সুন্দর সকাল। বাতাসটা গরম। স্বামীজী ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পায়চারী করছেন। হাত মুষ্টিবদ্ধ, উদ্‌ভাসিত মুখমণ্ডল, কণ্ঠস্বর গভীর ব্যঞ্জনাময়,—"......কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে পূজা করো না, কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তাঁকেই উপাসনা কর।"

"আত্মা যার যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা চাই সুখ দুঃখ উভয়ের অতীত অবস্থায় যেতে।

"আমাদের চাই মুক্তি ;......সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে—তার আদিও নেই অন্তও নেই—যেন একটা অগাধ হ্রদের উপরকার সদাগতিশীল তরঙ্গ। ঐ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌছতে পারিনি। জীবন ও মৃত্যু একই ব্যাপারেরই বিভিন্ন নাম মাত্র, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

"অন্তর্জগৎ, যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড়। বহির্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, এটা সত্যের ছায়াস্বরূপ মাত্র। কবি বলেছেন, কল্পনা—'সত্যের সোনালী ছায়া।'

"আমি আমার আত্মাকে নমস্কার করি। স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি, আমি নিজেকেই নমস্কার করি। আমি ব্রহ্ম। এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর ; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি তখনই তা আলোকিত হয়ে উঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়।

"তত্ত্বমসি—তুমিই সেই। অহং ব্রহ্মাস্মি—আমিই ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটে উপলব্ধি করে, তখন ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।—তার সব হৃদয়-গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশয় ছিন্ন হয়। যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থা লাভ হতে পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে।"

স্বামীজী নিজের সত্তাকে উন্মোচন করেছেন তাঁর বাণীর মধ্যে,—একমেবাদ্বিতীয়মের মন্ত্র বাজছে সকলের চেতনার গভীরে, তখন তিনি হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন, যাবার সময়ে বলে গেলেন, আমি তোমাদের জন্যে রান্না করতে যাচ্ছি।

বিচিত্র জীবন। নিত্যে লীলায় জড়াজড়ি।

আর একদিন মাতৃভাবনায় স্বামীজী ভরপুর। জননী ও জগৎজননীর মন্ত্রোচ্চারণ করছেন—

"জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ। মা নাম করলেই, শক্তির ভাব, সর্ব শক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে,—শিশু যেমন আপনার মাকে সর্বশক্তিমতী মনে করে থাকে—মা সব করতে পারে। সেই জগৎজননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী, তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারিনা।

"সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিত্ব ও অনন্ত দয়া সেই জগৎজননী ভগবতীর গুণ, জগতে যত শক্তি আছে তিনিই তার সমষ্টিস্বরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই জগদম্বা, তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী, তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

"মাতঃ, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয় ; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্যে দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। আলোক অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী, সকল প্রাণীর পিছনেই সেই সৌম্যাৎ সৌম্যতরা, নিত্য শুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

"মায়ের কাজ মাই করছেন ;……আমার মত ক্ষুদ্র কীট প্রতি মুহূর্তে হাজার মরছে ; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলে যাচ্ছে। জয় মা,……মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক……আমি মুক্ত। ……মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, মায়েরই সব লীলা।……মা-ই ত যন্ত্রী, আমরা তার হাতের যন্ত্র ছাড়া কি ?"

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে এমনই ছিল বিবেকানন্দের জীবন। তার সবটাই আনন্দ, সবটাই আত্মা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি গড়িয়ে যেত অনন্তের অভিমুখে। সন্ধ্যার সময়ে স্বামীজী পায়েচলা পথ, যার নাম রেখেছেন সান্ধ এভিনিউ —সেটি ধরে হাঁটতেন। পথটি নেমে গেছে নদীর দিকে। প্রায় প্রত্যহই বিকালে এখানে বেড়াতে আসতেন স্বামীজী, তন্ময় হয়ে যেতেন প্রকৃতির মাঝে। সিগার খেতেন ঘন ঘন, দেশী বিদেশী কত কবিতা পড়তেন, তার একটির সুন্দর কথাকটি মনে পড়ে,—'তাঁর নয়ন যেন পদ্মমাঝে ভ্রমরসম।' সদানন্দময় বালকের মত কৌতুকে পরিহাসে উছল হয়ে উঠতেন কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতেন না। বেড়াতে বেড়াতে বলতেন কত গাথা ও পুরাণের কাহিনী—তপোবনকন্যা শকুন্তলার কথা। অতুলনীয় তাঁর প্রেমের কাব্যমাধুর্য, প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের সম্পর্ক, তাই তাঁর পতিগৃহযাত্রার বিচ্ছেদে সমস্ত প্রকৃতি, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, হরিণ কান্নার উচ্ছ্বাসে আকুল হয়ে উঠেছিল।

একদিন সন্ধ্যায় বর্ষণ নামল অজস্রধারে। জানালার কাঁচে আছড়ে পড়তে লাগল অজস্র অবিরল ধারা, সমস্ত বাইরের জগৎ বিবর্ণ, হু হু করে ছুটে আসে সিক্ত বায়ুর গর্জন, ঘরের বাতাসে সিগারের গন্ধ ভাসছে, মোমবাতির কোমল শিখাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে, দেওয়ালের গায়ে আঁকছে দীঘল ছায়ার ছবি ; সমস্ত সোফা কার্পেট জুড়ে ছাত্র ছাত্রীর দল। স্বামীজী সোফায় বসে আছেন রাজর্ষির মহিমায়, শোনাতে লাগলেন চিরস্মরণীয় ভারতীয় নারীর কাহিনী। সাবিত্রী, যাঁর প্রেম মৃত্যুর দেবতাকেও অতিক্রম করেছিল, সতী, যিনি পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করেছিলেন, উমা যিনি জন্মে জন্মান্তরে মহাতপস্বিনী,—আর ধরিত্রীকন্যা সীতা,—তাঁর কথা বলতে গিয়ে অপরিসীম শ্রদ্ধার আবেগে স্বামীজীর মন্দ্র কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধকোমল হয়ে উঠে, উদ্দীপনায় জ্বলে উঠে বিশাল নয়ন।……সীতা মহাশুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা, জ্যোতির্ময়ী পূর্ণস্বরূপা, তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি, মহত্ত্বের প্রতিমা, সাধ্বী সহধর্মিণী, অতুলনীয়া, নারীকুলের চিরন্তন আদর্শ,—সীতা আমাদের সকলের মাতৃস্বরূপা, বিশ্বজননী। "সীতার কথা আর কি বলব! অতীতের যত সাহিত্য আছে সব পড়ে নিঃশেষ কর, আর পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যত সাহিত্য রচিত হবে তাও যদি মথিত কর, তবু নিঃসংশয়ে বলছি,

দ্বিতীয় সীতাকে পাবে না। সীতা অনন্যা, ও শুধু একবারই আঁকা হয়েছে। রাম হয়ত আরো হবে, সীতা কদাপি না। ঐ একটি জীবনের উৎস থেকে ভারতীয় নারীর যত কিছু আদর্শের ধারা নেমে এসেছে, ভারতীয় নারীর পূর্ণ প্রতীক তিনি। এই হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত আর্যাবর্তের প্রতিটি নর-নারীর পূজাবেদীতে তিনি প্রতিষ্ঠিতা হয়ে আছেন, থাকবেন চিরকাল—অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত ক্ষমা, পবিত্রতার মূলাধার—মহিমান্বিতা সীতা। জীবনব্যাপী যন্ত্রণাকে বিনাবাক্যে পরম প্রশান্তিতে যিনি বরণ করেছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্যশুদ্ধা সীতা কেবল নরলোকের নন, দেবালোকেরও আদর্শ প্রতিমা।......আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় তিনি প্রবেশ করেছেন, তিনি হিন্দু নরনারীর হৃদয়-শোণিতের তুল্য। সীতা আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমরা সকলে তাঁর সন্তান।"

শুক্লপক্ষের রাত্রি। দক্ষিণের বারান্দায় চাঁদের আলো। সকলে জড়ো হয়েছেন রাতের ক্লাশে। স্বামীজী বড় চেয়ারটাতে আসন করে বসেছেন। জ্যোৎস্না পড়েছে তাঁর রাজকীয় ললাটে, অপাপ্ন মাধুরীতে ভরা অপার্থিব নির্লিপ্ততা।

আলো আর কুয়াশার আবরণে অস্পষ্ট বাইরের জগৎ। সমস্ত দ্বীপটাই যেন নৈঃশব্দ্যের মায়ালোক। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে আসে আরণ্যক সুবাস। পাতায় পাতায় বাজে শিশিরপাতের ছন্দ। স্তব্ধতায় ডুবে যায় চন্দ্রাহত পাখীর অস্ফুট স্বর-মর্মর। কুটীরের পিছনে হ্রদের জলে স্থির হয়ে ভাসে চাঁদের প্রতিবিম্ব। এর মাঝে জেগে উঠে স্বামীজীর কণ্ঠস্বরে দূরাগত মন্দিরের সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি—

"মহারণ্যে পথহারানো নিঃসঙ্গ বালকের মত কেঁদে কেঁদে ফিরেছি—কোথায় সেই পরম প্রভু? তাঁর অন্বেষণে কেটেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। সংশয়ের জ্বালায় পাগলের মত পথে পথে খুঁজে মরেছি আকুল বেদনায়। ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় ছুটে গেছি সাধুসন্ত জ্ঞানীদের দ্বারে দ্বারে। কাতর অনুনয়ে বলেছি—কে পেয়েছ তোমরা অসীম জ্যোতির্লোকের সন্ধান? আমায় পথ দেখাও!

"কত মাস কত বছর পার হয়ে গেছে, তারপর একদিন দুঃখের রাত্রি হোল শেষ। অনন্ত করুণায় প্রেমে তিনি ডাক দিলেন,—তিনিই আমার আত্মা, আমার প্রভু, প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা, অনন্ত জগৎ-পারাবারে একমাত্র দিশারী—শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁরি আশীর্বাদে সহস্র মৃত্যুর মাঝেও আমি নির্ভয়।"

"তাঁর কাছেও আমি সহজে আত্মসমর্পণ করিনি। দিনের পর দিন কঠিন নির্মমতায় যাচিয়েছি প্রতিটি আচার-আচরণ, গুরুর যুক্তি অগ্রাহ্য করেছি দুর্বিনীত তার্কিকতায়। কিন্তু তাঁর মহাপবিত্রতার বন্যায় ভেসে গেছে আমার সকল প্রতিরোধ।

"এমন মানুষ আর কখনও দেখব না। কি অগাধ তাঁর ভালবাসা! এমন করে বাপমাও ভালবাসতে পারে না।

"শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে একটুও বিশ্রাম পাননি—চাননি। অসুস্থ অবস্থাতেও কাউকে ফেরাতেন না। আমরা যদি বাধা দিতাম, তিনি করুণাভরা নয়নে হাসতেন, বলতেন, কি শরীর? শরীরের কষ্ট? আমার কত শরীর হল গেল! যদি একটি মানুষের যথার্থ উপকারে আসতে পারি, হাজার হাজার শরীর আমি দিয়ে দিতে পারি।

"তাঁকে একজন বলেছিল, আপনি ত মহাযোগী, দেহের উপর মন স্থাপন করে অসুখটা সারিয়ে ফেলুন না! তিনি বললেন, যে মন ভগবানের চরণকমলে নিবেদিত, তাকে তুলে নিয়ে এই তুচ্ছ দেহটার পরে রাখব কেমন করে?"

"কথার স্রোতে আমরা ভেসে গেছি শেষরাত্রের কুলে। চাঁদ ডুবে গেছে পাহাড়ের ওপারে; অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নার ধূসরাভাস জেগে আছে আকাশের পটে, নিভু নিভু বিদায়ী তারার দল, হিম হিম বাতাসে উঠেছে গাছের মাথায়, রাত্রিশেষের বিদায়ী শুকতারা জল জল করে পুব আকাশে।"—মিসেস ফাঙ্কি সে রাত্রের কথা লিখলেন তাঁর পত্রে।

যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। দীর্ঘ সাত সপ্তাহের আনন্দনিকেতন থেকে স্বামীজী চলে যাবেন। বিচ্ছেদবেদনা বাজছে সকলের বুকে। স্বামীজী ক্রিশ্চিন ও ফাঙ্কিকে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে বললেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর কাছে একান্তে, শেষবারের মত এরা কিছু বলতে চায়। বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা পার্বত্য পথ ধরে বনের গভীরে গিয়ে পৌছলেন। দু'পাশে নিবিড় গাছের সারি, নিস্তব্ধ নিথর বনভূমি। তখনও ঘাসের উপর, ফার্নের পাতায় শিশির জড়িয়ে আছে। পায়ের সামান্য শব্দটুকুও কানে বাজে। একটি নীচু শাখাঘেরা গাছের তলে বসে পড়লেন স্বামীজী, প্রত্যাশিত কিছু বলার পূর্বেই অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন—বোধিবৃক্ষতলে যেমন বুদ্ধ ধ্যান করেছিলেন, এস আমরা তেমনি করে এখানে ধ্যান করি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ধ্যানস্থ বুদ্ধের ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তির মতই স্থির নিশ্চল হয়ে গেলেন।

কী যে অপরূপ দর্শন! ক্রিশ্চিন ও মেরী সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে গুরুর আবেশভঙ্গের অপেক্ষায় স্থির হয়ে রইলেন। তাঁদের অলক্ষ্যে মেঘ উঠেছে ঘন হয়ে, আকাশে জলে উঠেছে বিদ্যুৎলেখা, ঝড়ো হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে অরণ্যের বুকে, শুকনো পাতার রাশি উড়ছে পাগল হাওয়ায়, ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে বৃষ্টিধারা। স্বামীজী নির্বিকার, অচঞ্চল। ঝড়ের বেগে ছাতা রাখা দুষ্কর, তবু শিষ্যা দু'জনে প্রাণপণে তাঁকে ছাতার

আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছেন—দূর থেকে ডাক আসছে ভেসে, সকলে তাঁদের খুঁজতে বেরিয়েছেন। তাঁদের কোলাহলে স্বামীজী চোখ মেলে তাকালেন, লজ্জিত হলেন, উঠে পড়লেন।

স্বামীজী চলে যাচ্ছেন। সন্ধ্যা তখন রাত্রির কূলে। আকাশে ঝক ঝক্ করছে সপ্তর্ষির অনন্ত জিজ্ঞাসা। নদীর কালো জল নিস্তরঙ্গ। ষ্টিমারের বাঁশীতে বাজল সুদূরের ডাক, শূন্য হৃদয়ের কান্না ফুলে উঠে বুকের মাঝে—নদীর বাঁকে শেষবারের মত দেখা গেল স্বামীজীর দীর্ঘ দেহ। বালকের মত পরম উৎসাহে টুপি নেড়ে জানাচ্ছেন সম্ভাষণ।

"Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived on this earth at the same time, and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet."

—Sister Christine

বিবেকবাণী

শংকর

সেক্রেটারি—স্যর !

গ্রেটম্যান [বিরক্তভাবে]—আঃ, আবার কী হলো ? আবার কেউ দেখা করতে এসেছে নাকি ? তোমাকে স্ট্যাণ্ডিং ইন্‌সট্রাকশন—ও হরি, ওটার পরিভাষা কী হয়েছে বলো তো ?—চুলোর ছাই সব বেঙ্গলীতে হয়ে যা অসুবিধেয় ফেলছে।

সে—ইনসট্রাকশন হলো অনুদেশ।

গ্রে—হ্যাঁ হাঁ ওটা তো জানি. প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় ইস্যু করছি। স্ট্যাণ্ডিংটা নিয়েই তো গোলমাল। ইস্কুলে তো বহুবার শুধু স্ট্যাণ্ড নয়, স্ট্যাণ্ডআপ অন দি বেঞ্চও হয়েছি। এই ডামাডোলের বাজারে আমার অনুদেশও তোমরা দাঁড় করিয়ে রাখছো নাকি ? কতবার বলেছি, কোন কিছু ফেলে রাখবে না— সব পাওয়া মাত্রেই ছেড়ে দেবে।

সে—স্ট্যাণ্ডিং অর্থে স্থায়ী।

গ্রে—ঠিক তাই। আমি তো স্থায়ী অনুদেশ দিয়েছি, যার-তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। সব বাই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট। আমার হাতে তো চব্বিশ ঘণ্টার বেশী সময় নেই। টাইম ইজ্ শর্ট, বাট আর্ট ইজ লং। তোমাদের, অর্থাৎ কিনা আমাদের সংস্কৃতেই বলছে: অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং, স্বল্পায়ু তথা বহবশ্চ বিঘ্না। কাণ্ট্রির সবাইয়ের গ্যাজর গ্যাজর শোনবার মতো টাইম আমার নেই।

সে—তা তো আগেই নোট করে নিয়েছি স্যর ; এবং সেই অনুযায়ী···

গ্রে—অ্যাঁ ! সেই অনুযায়ী কাউকে হটিয়ে দিয়েছো নাকি ? তোমাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। হয়তো সেবারের মতো কোনো ইম্পর্টাণ্ট লোককে তাড়িয়ে দিয়েছো। ব্যুরোক্রাসি সব সময়ই তো আমাদের এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দেবার, যাকে বাংলায় বলে কিনা ওয়াল তুলে দেবার চেষ্টা করছে।

সে—সেবার যাঁকে ঢুকতে দিইনি, লোকে তাঁকে হারু গুণ্ডা বলে জানে—দু'তিনবার জেলে গিয়েছেন।

গ্রে—জেলে তো মহাত্মা গান্ধীও গিয়েছিলেন, জওহরলাল গিয়েছিলেন, সুভাষ বোসও গিয়েছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। যাননি শুধু ওই দু'জন—যাঁদের

নিয়ে এখন সবাই হৈ হৈ করছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর স্বামী বিবেকানন্দ। হারুর আসল নাম হারাধন তরফদার—নির্যাতিত দেশকর্মী। পাবলিকের অনেকে তাকে গুণ্ডা বলে বটে, কিন্তু এদের না হলে আমাদের ডেমক্র্যাসি চলে না। গণতন্ত্রের এরা একটা এসেনশিয়াল কণ্ডিশন—যেমন বাক্‌স্বাধীনতা—সোজা বাংলায় যাকে বলে কিনা ফ্রিডম অফ স্পিচ; সংবাদপত্র, শিক্ষা ইত্যাদি। হারুরা না থাকলে, জনসাধারণের উপর আমাদের যে হোল্ড আছে সেটা হোল্ড-অলে পুরে ফেলে, স্টেশনে টিকিট কেটে, কেটে পড়তে হতো। তোমাদের নিয়ে আর পারি না। হারুকে তোমরা আবার ইনসাল্ট করলে নাকি? সেবারে তোমাদের পই পই করে বলেছি স্বয়ং ভগবানও যদি আমার সঙ্গে কনফারেন্সে আলোচনারত থাকেন তাহলেও ওকে আটকাবে না।

সে—না স্যর, উনি আসেননি, ফোন করেছিলেন।

গ্রে—ফোন? তা, আমার ফোন আমাকে না দেবার পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি তোমাদের কে দিয়েছে?

সে—আপনি তখন ট্রাঙ্ক কলে রাজধানীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মিস্টার ভোগীলালের ওই লাইসেন্সটা সম্বন্ধে। তিনবার এক্সটেনশন নিয়ে মোট বত্রিশ মিনিট পনেরো সেকেণ্ড কল।

গ্রে—যাক, হারু কী বলছিল?

সে—কালকের স্বামীজী শতবার্ষিকী উৎসব সম্বন্ধে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন। সকালে প্রভাত ফেরি···

গ্রে—প্রভাত ফেরি—স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত অনেক করেছি। এখন আর ওসব পারবো না। লোকে কেন যে ভুলে যায়, উই আর টু বিগ ফর দোজ প্রভাত ফেরিজ। তাছাড়া আমি সাড়ে আটটার আগে আজকাল উঠতে পারি না।

সে—আমিও সেই কথা বলে দিয়েছি।

গ্রে—অ্যাঁ—আমি যে লেট রাইজার তা তুমি বলে দিয়েছো! ওটা না টপ সিক্রেট? সিক্রেসি অ্যাক্ট অনুযায়ী তোমাকে প্রসিকিউট করা যায় জানো? তাছাড়া, সেদিন মাসিক জনচিত্তর বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতকারে বলা হলো, স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী আমি অন্ধকার থাকতে উঠে পড়ি। ভোরবেলায় আমার স্তোত্র পাঠের একটা ফটোও কাগজে ছাপানো হয়েছে।

সে—আপনি চিন্তা করবেন না স্যর, আমি ওসব কিছুই বলিনি। আমি বলেছি, প্রভাত ফেরিতে যোগ দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়—ওই সময় আপনার মিটিং আছে।

গ্রে—ভেরিগুড্। সত্যি, খাশা বুদ্ধি তোমার। তা তোমার প্রমোশনের ব্যাপারটা কী হলো? সিলেকশন গ্রেড দেবার জন্যে তো স্ট্রং রেকমেণ্ডশন করেছিলাম। যদি দরকার হয়, একটা এক্সট্রা স্ট্রং রেকমেণ্ডশন পুট আপ কোরো, সই করে দেবোখন।

সে—আপনার অশেষ করুণা স্যর। মিস্টার তরফদার আপনাকে…

গ্রে—আঃ, কতবার বলবো। মিস্টার নয়, শ্রী। রবিঠাকুর পর্যন্ত কোনদিন মিস্টার ছিলেন না—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে আবার শ্রীও লিখতেন না, সেদিন সাহিত্যিক নগেন পালের কাছে শুনলাম। যখন দেশ থেকে শ্রীও উঠে যাবে তখন কী যে হবে। সেদিকে বিবেকানন্দর কোন ভয় নেই—স্যরও নয়, মিস্টারও নয়, শ্রীও নয়, রায়বাহাদুর নয়, স্বামী বিবেকানন্দ।

সে—শ্রীতরফদার সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সভায় আপনার সভাপতিত্ব করবার কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। ভোগীলালজী প্রধান অতিথি, আর উদ্বোধন করবেন শ্রীতরফদার নিজেই।

গ্রে—অ্যাঁ। তাই তো বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। ক'দিন আগে একদল ছেলে এসেছিল বটে—'হতে পারি দীন মোরা, নহি কভু হীন' সঙ্ঘ। হারুই রেকমেণ্ড করে পাঠিয়েছিল। আমি যে আবার ওদের প্যাটরন তাই জানতাম না। ইস্কুল কলেজের আদর্শবাদী ছেলে, ওদের দোষ নেই। হারুর কথামতো ওরা প্যাড ছাপিয়েছিল। হারু অথচ আমাকে বলেনি। প্রথমে শুনে একটু রাগ করেছিলুম। কিন্তু হারুর উপর রাগ করে লাভ নেই; ওর হাতে অনেক স্বেচ্ছাসেবক, যাকে সারা জন্ম ধরে আমরা ভলেণ্টিয়ার বলে এসেছিলুম।

সে—তা হলে স্যর?

গ্রে—মানে এখন বড়ই বিপদ। ডায়েরীতে লিখতে ভুলে গিয়ে কী সর্বনাশই যে করেছি।

সে—কেন স্যর, বিপদ কী? কত মিটিঙে যাচ্ছেন? চিত্রকলা ভবনে যাচ্ছেন আজ বিকেলে, তারপর সঙ্গীত সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে, তারপর দার্শনিক সভার ত্রৈমাসিক ডিনারে।

গ্রে—বুঝছো না, ডুবিয়েছে আমার স্পীচ রাইটার দেবিদাস রায়। ওকে যে ছুটি দিয়ে বসে আছি। ছুটিতে যাবার আগে অন্য সব স্পীচগুলোর ড্রাফট পুট আপ করে গিয়েছে। কিন্তু বিবেকানন্দ। এখন উপায়? লাইন নাও—হারুকে যদি পাওয়া যায়।

সে—আচ্ছা স্যর।

গ্রে—হ্যালো, ভাই হারু, তুমি একটু আগে টেলিফোন করেছিলে ?…হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো বটেই…স্বামীজীর জন্মোৎসব বলে কথা, আর তার ওপর 'হতে পারি হীন মোরা' সঙ্ঘের ফাংশন…ওহো ভেরি স্যরি, কিছু মনে কোরো না ভাই, বলতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি। 'হতে পারি দীন মোরা, নহি কভু হীন' সঙ্ঘের ফাংশন। ওখানে সভাপতিত্ব করবার সুযোগ। তবে কিনা শরীরটা এই কিছুক্ষণ ধরে তেমন ভাল যাচ্ছেনা। এ্যাঁ, কি বলছো ভাই…

[গ্রেটম্যান এবার টেলিফোনের স্পীকারটি হাত দিয়ে চেপে ধরলেন, যাতে ওদিকে কোনো শব্দ না যায়]

[সেক্রেটারিকে] জ্বালিয়ে খেলে। বলে কিনা আজকের ফাংশনগুলো সব ক্যানসেল করে দিতে। বিশেষ করে সঙ্গীত সমিতির উৎসব, অথচ ওইখানেই অ্যাকট্রেস চিত্রা দেবী আসবেন—সোহনলালজী সভাপতি, আমি প্রধান অতিথি, আর চিত্রা দেবী উদ্বোধিকা। চিত্রা দেবীর সঙ্গে সেই সেবারে হোটেলে ব্যাংকোয়েটে দেখা হয়েছিল। টেলিফোন করবেন কথা দিয়েছিলেন, তা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছেন, কিংবা তোমাদের মত কেউ হয়তো আমাকে কনেকশন দেয়নি—কালকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

[টেলিফোনের স্পীকার থেকে হাত ছেড়ে]

হ্যালো, হ্যালো, হারু, লাইনে ডিস্টারবেন্স হচ্ছে অর্থাৎ গোলোযোগ হচ্ছে। কিছু মনে কোরোনা ভাই, এখন থেকে সব কাজে আমাদের ভার্ণাকুলার ব্যবহার করতে হবে।…অ্যাঁ কী বলছো তুমি ? চিত্রা দেবীকে তুমি নিজে ফোন করে দেবে ? আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবে, বলবে আমি অসুস্থ বলে যেতে পারলাম না ?…নানা সেটা ভাল দেখায় না…তাছাড়া ওঁরা আমার নাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন…রেডিও থেকে, খবরের কাগজ থেকে লোক আসবে …কী বললে ? তোমাদেরও ওইসব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, কাগজে কাল সকালে নামও বেরিয়ে যাচ্ছে, ওখানেও পাবলিসিটির পুরো ব্যবস্থা…কিন্তু ভাই শরীরটা তো প্রায়ই খারাপ হচ্ছে…স্বামীজী বলেছেন বীর হও। অসুস্থ শরীরে তাঁর পুজো করা তিনি কি পছন্দ করবেন ?…হ্যালো, না না, চিত্রা দেবীকে তোমার ফোন করতে হবে না, কথা যখন দিয়েছি তখন মরতে মরতেও যাবো…চিত্রা দেবী তোমাদের ফাংশনেও আসছেন নাকি ?…আসছেন না…কমিটিতে ওকে ডাকবার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু অনেকে রাজী হননি…না না, এটা তোমাদের অন্যায়। স্বামীজী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ এঁরাও তো অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন।…হ্যালো হ্যালো, তুমি ওখানে কিছু বোলোনা, আমি

তোমাদের সভাতেও যাবো, এখনি ডাক্তারকে ডেকে কোনো স্পেশাল ওষুধ আনিয়ে নিচ্ছি। [টেলিফোন নামিয়ে]
অসহ্য, যেতেই হবে। এর নাম গণতন্ত্র। একটা সাধারণ লোক যা বলবে একজন অসাধারণ লোককে তাই মুখ বুঁজে মানতে হবে। অথচ রাজতন্ত্রে, ডিকটেটরশিপে আমাদের এসব অসুবিধে ছিল না। সেখানে কারুর সাধ্য ছিলনা আমাকে মিটিঙে নিয়ে যায়। নগেন পালকে কথাটা এক সময় বলতে হবে। আমার আত্মজীবনী তো উনিই লিখছেন। এই পয়েণ্টটাও যেন লিখে নেন। তবে এটা থাকবে দ্বিতীয় খণ্ডে—সেটা এখন সীল করা থাকবে, প্রকাশিত হবে আমার মৃত্যুর দশ বছর পরে।

সে—অতি উত্তম প্রস্তাব স্যর।

গ্রে—বলা যায়না, আমার ওই মন্তব্যটাই আর একটা শতবার্ষিকী চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে। নব্বুই বছর পর্যন্ত যদি বাঁচি (তার বেশী আমি বাঁচতে চাইনা) প্লাস টেন, অর্থাৎ কিনা সেনটেনারি ইয়ার—যানে তোমরা যাকে বল কিনা শতবর্ষফুর্তি উৎসব।

সে—ফুর্তি নয়, পুর্তি বোধ হয় স্যর।

গ্রে—ওই হোলো···আমাদের ব্যাকরণে বলে প টা প্রায় ফ হয়ে যায়।

সে—তা হলে স্যর, ডায়েরীতে বিবেকানন্দ উৎসবের কথাটা টুকে রাখি।

গ্রে—আঃ, ডিসটার্ব কোরোনা। আমি ভাবছি স্পীচরাইটার দেবিদাস রায়ের কথা। তোর এখনই ছুটি নেবার কী দরকার ?

সে—গত দু'বছর তিনি একদিনও ছুটি নেননি।

গ্রে—কী করে তোমরা আশা করো যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বছরে দেবিদাসবাবু ছুটি পাবেন ? আর বলিহারি যাই, এই সব মহাপুরুষদের। ঠিক ওই সময়েই বিবেকানন্দকেও জন্ম নিতে হলো। যত সব···।

সে—এখন ছুটি না নিলে আর কখনই ছুটি পেতেন না।

গ্রে—মানে ? সামনে আরও শতবর্ষপুর্তি আছে নাকি ?

সে—দেবিদাসবাবু তো তাই বলছিলেন। একই দশকে তিনজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী। তার ঠিক পরেই আবার আছেন শ্রীঅরবিন্দ।

গ্রে—অ্যাঁ! বলো কি ? কেন রে বাপু, একটু রয়ে সয়ে জন্মালে কী মহাভারত অশুদ্ধ হতো ? ইন এনি কেস, কালকের বক্তৃতায় এটা একটা ভাল পয়েণ্ট হবে। রত্নপ্রসবিনী বাংলা···একই দশকে তিনটি বিশ্ববিজয়ী সন্তান।

সে—বাংলা না ভারত ?

গ্রে—তুমি জান না, এটা বাঙালীদের গ্যাদারিং। অন্য সভা হলে ভারত বলতাম, এখানে বাংলা।

সে—কিন্তু গান্ধী স্যর ? উনি তো গুজরাটে জন্ম নিয়েছিলেন।

গ্রে—আঃ, সংগঠনমূলক কিছু বলতে পারো না ; এইটা আমাদের জাতের দোষ। সাধে কি আর স্বামীজী তোমাদের গালাগালি করেছেন ; আর সাউথের লোকদের তুলেছেন। এমন একটা সুন্দর আইডিয়া তুমি নষ্ট করে দিলে। শুধু ডেস্ট্রাকটিভ, ধ্বংসাত্মক সমালোচনা।

সে—আই অ্যাম স্যরি, স্যর।

গ্রে—স্যরি বলে যেন এখনই সরে পোড়ো না। স্পিচরাইটার নেই, কিছু একটা তো করতেই হয়। দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন ? একটা চেয়ার নিয়ে বোসো।... এখন কথা হচ্ছে কি, স্বামী বিবেকানন্দ দেশের জন্যে কী কী করেছেন সেটা একটু খুঁজে দেখতে হয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধে—উনি জেলে যাননি। রবিঠাকুরের শতবার্ষিকীর বেলায় আমাকে ওই একই ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল। অথচ এ কথাটা বলবার উপায় নেই। কাগজে এখনি এডিটরিয়াল বেরিয়ে যাবে। নুন মাখিয়ে আমাকে কাঁচা খাবার জন্যে সম্পাদকরা তো উঁচিয়ে বসে আছেন।

সে—যা বলেছেন, স্যর।

গ্রে—এটা বোঝা যাচ্ছে যে তিনি ১৮৬৩ সালে জন্মেছিলেন—না হলে এই ১৯৬৩ সালে নিশ্চয় তাঁর সেনটেনারি হতো না। একেই বলে কমনসেন্স—সোজাসুজি জানিনা, কিন্তু অন্য কতকগুলো ঘটনা থেকে আমি যা চাইছিলুম তা খুঁজে বার করে নিলাম। স্বামীজীর নিজের এই অসাধারণ শক্তি ছিল নিশ্চয়, না হলে এতো বড়ো হলেন কীভাবে ? আর ওঁর যা খ্যাতি সে তো কেবল দেশী নয়—সে তো ভগবানের দয়ায় আমারও কম হয়নি। কিন্তু বিদেশে ? ইয়া ইয়া আচ্ছা আচ্ছা সায়েব দিনরাত সোয়ামী ভাইভেকানন্দ বলতে অজ্ঞান হচ্ছে, এর জন্যে মাথায় সামথিং দরকার, বুঝলে ?

সে—তাতো বটেই স্যর।

গ্রে—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কী বলা যায় ? এখন সেইটাই প্রবলেম। দেবিদাস ছোকরা থাকলে ঝপাং করে একটা কিছু খাড়া করে দিত। নিজে নিজে যখন ভাবি—যেমন এই এখন, কী বলা যায় ভাবতে গিয়ে ঘেমে উঠছি। কিন্তু ছোকরার লেখাটা পড়লে মনে হয়, এই কথাগুলোই আমি বলতে

চাইছিলাম। অথচ চিন্তাটা এমন কনস্টিপেটেড হয়েছিল, যে বেরোতে চাইছিল না।

সে—হাজার হোক আপনারা ব্যস্ত মানুষ স্যর।

গ্রে—বলো, নিজের চোখে দেখেছো তো। কত লোককে অবলাইজ করতে হয়। শুধু জ্যান্ত লোকদের নয়, এই বিবেকানন্দর মতো যাঁরা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন তাঁদেরও।

সে—আমি তাহলে, স্যর।

গ্রে—তুমি তাহলে জীবনী ফাইলটা একটু ঘেঁটে দেখে, ইমিডিয়েটলি একটা নোট অন স্বামী বিবেকানন্দ পুট আপ করো।

সে—বায়োগ্রাফি ফাইলে তো যাঁদের সঙ্গে আমাদের কাজ কারবার, যাঁরা বেঁচে আছেন কেবল তাঁদের সম্বন্ধেই লেখা আছে।

গ্রে—[বিরক্ত হয়ে] আমি তোমার ওজর শুনতে চাই না। যেখান থেকে পারো নোট বার করো, না হলে চার্জশীট, হয়তো সাসপেণ্ডও হতে পারো। যতোই আইন বোঝো তোমরা, আমাদেরও ভাঁড়ে সামথিং হ্যাজ। এটা জেনে রেখো গ্রেটম্যানরা কখনও মরেন না, তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকেন, সেই জন্যেই তাঁদের অমর বলা হয়। এই সব অমর লোকদের সঙ্গে কাজ কারবার নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যায় নি। এঁদের সম্বন্ধে একটা ফাইল খুলে রাখা তোমার উচিত ছিল।

সে—ক'দিনের খবরের কাগজ দেখে একটা ছোট্ট জীবনী তৈর করে দেবো ?

গ্রে—তোমরা যোগ্য নও—সঙ্কটের সময় কেমন করে তোমাদের মতো লোক নিয়ে দেশ চলবে বুঝি না। অর্ডিনারি পাবলিক যারা, তারা খবরের কাগজ থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারে। আমরা তা পারি না, আমরা যা বলবো তাই তো অফিসিয়াল ভিউ বলে লোকে ধরে নেবে। সুতরাং যিনি যতবড়ই হোন না কেন, আমাদের সাবধানে ভেবে বল্‌তে হয়। এই মুখের একটি কথা দেশ বিদেশে চলে যাবে—হয়তো ইণ্টারন্যাশনাল কোনো সঙ্কটই বেধে গেল তার থেকে। এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে কোনো গেজেট নোটিফিকেশন আছে ?

সে—না, স্যর।

গ্রে—তাহলে পুলিশকে ফোন করো, বলো আমার এখনই একটা রিপোর্ট চাই।

[সেক্রেটারির প্রস্থান]

[এমন সময় টেলিফোন বাজলো]

হ্যালো···হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলছি···আর কেন বলো ভাই, এই বিবেকানন্দর ব্যাপারে বড় জড়িয়ে পড়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ, নাম শুনেছো নিশ্চয়, খুব

বড় সংস্কারক ছিলেন।…হ্যালো, ভূমি বা রাজস্ব সংস্কারের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তুমি ভুল করছো, উনি প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল সমাজ সংস্কারক।…ভোগীলালজীর ঐ ব্যাপারটা নিয়ে সেণ্টারে কথা বলেছি, টেলিফোনে ওসব কথা বলা সেফ নয়। পরে বাড়িতে এসো, যা চেয়েছিলে তাই হবে। আমাদের ফাণ্ডে চাঁদা দেবার কথাটা ওঁকে মনে করিয়ে দিও …আর নরেন্দ্রনাথ রায় আমার ছোটশালা, নামটা ডাইরিতে লিখে রাখো, তোমার সঙ্গে বোধ হয় কালকেই দেখা করবে। ভোগীলালজীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও। আচ্ছা ভাই, পরে কথা হবে।

[সেক্রেটারির প্রবেশ]

সে—পেয়েছি! পেয়েছি স্যর।

গ্রে—কী পেয়েছ? ইমপোর্ট লাইসেন্স পেলেও তো লোকের এতো আনন্দ হয় না। ভগবানকে পেয়ে বিবেকানন্দরও এতো আনন্দ হয়নি।

সে—বিবেকানন্দর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার লিস্ট দেবিদাসবাবুর ড্রয়ারে ছিল। ভবিষ্যতে বক্তৃতা লিখতে কাজে লাগবে ভেবে উনি বোধ হয় নোট করে রেখেছিলেন।

গ্রে—আঃ, বাঁচা গেল। এই রাতদুপুরে পুলিশকে ফোন করার হাত থেকেও বাঁচা গেল।

সে—দেবিদাসবাবুর নোট অনুযায়ী দেখছি ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী জন্ম। ছাত্রাবস্থায় ১৮৮১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এলেন। রামকৃষ্ণ দেহ রাখলেন ১৮৮৬ সালে, তারপরই রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। এর পরই পরিব্রাজক।

গ্রে—তাহলেই দেখ ট্যুর করা কত প্রয়োজন। ট্যুরের বিরুদ্ধে যারা বলে তারা বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করে না।

সে—দেখছি আমেরিকায় গেলেন ১৮৯৩ সালে।

গ্রে—বা বা, ভেরি গুড্।

সে—মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ধর্ম মহাসম্মেলনে ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করলেন।

গ্রে—কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজ করলেন কী করে? পয়েণ্টটা পরে ইনভেস্টিগেট কোরো।

সে—বিদেশেই আমাদের বিবেকানন্দ বিশ্ববিবেকানন্দ হলেন।

গ্রে—হবেনই তো—ফরেনে না গেলে কেউ কখনও উন্নতি করে না—তুমি রবিঠাকুর দেখো, গান্ধী দেখো, সব একই কেস্। যাক, নাম টাম তো হলো, তা ওঁর গোল্ডেন জুবিলী কোন্‌বার হলো? দেবিদাসবাবু আমার এক বক্তৃতায় রবিঠাকুরের জুবিলীর কথা রেফার করেছিলেন।

সে—সেটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না।

গ্রে—দেবিদাসবাবু খুব থরো নন—সব পার্টিকুলার্স ঠিক করে লিখে রাখেন না। অথচ উনিও সিলেকশন গ্রেড চান।

সে—দেখছি ওঁর নোট ১৯০২ সালেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

গ্রে—এরপর আর লিখে রাখবার গা করেন নি। বেজায় কুঁড়ে।

সে—এক মিনিট স্যর। দেখছি মাত্র ৩৯ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ দেহ রাখেন।

গ্রে—ওহো, ভেরি স্যাড লস। পরাধীন গভরমেণ্ট ছিল তখন তাই—না হলে সেদিন সরকারী, বেসরকারী সব অফিস বন্ধ করে দিতাম।

সে—আমি এখন তা হলে কী করবো স্যর?

গ্রে—মনে হচ্ছে বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছো। অথচ বিবেকানন্দর কথা ভেবে দেখো, কানট্রির জন্যে বাড়ি ঘরদোরই ছেড়ে দিলেন। এঁরা কেন যে অর্ডিনারি পিপ্‌লের জন্যে জীবনটা নয়ছয় করলেন। যাক্ শোনো—তুমি যদি পারো, অর্গানাইজারদের একবার ফোন করে দিও। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, ওরা আমাকে মানপত্র দেবার কথা ভাবছে। সেটা ইচ্ছে করলে, কালকের মিটিঙেই সেরে ফেলতে পারে। ওদেরও কাজের সুবিধে, আর আফটার অল্ বিবেকানন্দ যা করতে চেয়েছিলেন অথচ পারেননি আমরা তাই করছি। বিবেকানন্দ যে কথা বলেছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

সে—আজ্ঞে, স্যর···

গ্রে—আজ্ঞে, আবার কী? খুব প্রগ্রেসিভ কথা কিনা, তাই বুঝি পছন্দ করতে পারছো না? এই সব লোক নিয়ে দেশকে আমরা যে কী ভাবে সোসালিস্ট করে তুলবো তা ঠাকুরই জানেন।

সে—তা বলছি না, স্যর।

গ্রে—আর রাখো, 'তা বলছি না'। আমরা মিড্‌লক্লাশ লোকদেরই আমাদের লেভেলে আনতে পারছি না। আর বিবেকানন্দ বলে বসলেন—মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে, এটা ইরেস্পনসিবল কথা। উনি তো বলে সরে পড়লেন, এখন ঠেলা সামলাও।

সে—আমি বলছিলাম স্যর, সবার উপর মানুষ সত্য ওটা বোধ হয় চণ্ডিদাস বলেছিলেন।

গ্রে—এ্যা! তু'তুটো মিটিঙে ওটা যে আমি বিবেকানন্দর বলে চালিয়ে এসেছি। যাক মফস্বলের মিটিং···কী বলো?

সে—তাছাড়া, গ্রেটম্যানরা সব একই চিন্তা করেন। আপনিও তো ওই একই কথা বলছেন।

গ্রে—যাই হোক, বড় জোর সেভ করেছো তুমি। তোমার অ্যাডভান্স ইনক্রিমেণ্ট আমি ব্যবস্থা করবই। তোমার ভাগ্নেটার জন্যেও ভেবোনা। আমার ছোটশালার বন্ধুগুলোর একটা হিল্লে হলেই, যা হয় একটা করবো। যা বলছিলাম, এখনই না হয়, যা একটু সময় পাই ঘোড়ার মাঠে কাটিয়ে আসি। ছাত্রাবস্থায় আমাদের ইস্কুলে প্রত্যেক বছর স্বামীজীর জন্মদিবস হতো। তখন যদি বক্তৃতা প্রবন্ধগুলো একটু মন দিয়ে শুনতাম। কিন্তু তখন খাওয়া-দাওয়ার দিকটায় নজরটা বেশী ছিল। যেখানে লেবু, বোঁদে, সিঙাড়া, গজা এই সব ডিস্ট্রিবিউট হতো, সেইদিকটায় পড়ে থাকতাম। তখন ওই সব মিটিং অ্যাটেণ্ড করলে, এই দেবিদাসবাবুর জন্যে আজ আমাকে হা-পিত্যেশ করতে হতো না। আমি ভাবছিলুম, ওঁর ড্রয়ারটা আর একটু ঘেঁটে দেখো। হয়তো কিছু বাণী পেয়ে যেতে পারো, তা-হলেই আমার চলে যায়।

[সেক্রেটারির প্রস্থান]

[টেলিফোন বাজলো—ক্রিং ক্রিং]

হ্যালো, নগেনবাবু নাকি ?···নানা মোটেই বিরক্ত হচ্ছিনা। আপনার মতে সাহিত্যিক প্রতি ঘণ্টায় ফোন করলেও আমাদের রাগ হয় না। আপনার বইগুলো পেয়েছি। খুব ভাল লেখা হয়েছে—যদি কখনও সময় পাই পড়বো। আপনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা নবেল লিখুন না।······ অসুবিধে আছে বলছেন ? তা হলে পদ্য লিখুন—আমি সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে দেবার নির্দেশ দেবোখন। আর যা বলছিলাম, আমার আত্মজীবনীতে. বিবেকানন্দর কথা ভালো করে লিখে দেবেন। ওঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী আমার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করেছে। যদি আমাকে ফাঁসি যেতে হতো তাহলে ওঁর বই হাতে করেই যেতাম।···হ্যালো, ধন্যবাদের কোনো প্রয়োজন নেই। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়া, পথ দেখানোই তো আমাদের কাজ।

[সেক্রেটারির প্রবেশ]

সে—আপনি ঠিকই বলেছেন স্যর; দেবিদাসবাবুর ড্রয়ার থেকে বাণী সঞ্চয়ন বেরিয়েছে—উনি যে ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন, সেই ইস্কুলের মাস্টারমশায় রাধাকান্তবাবু একটা খাতায় বাণী সঞ্চয় করে রাখতেন।

গ্রে—দুনিয়াতে কত লোকের কত অদ্ভুত খেয়াল হয়। টীচাররা সময়ের মূল্য

বোঝে না। ছাত্রদের পড়াশোনার দিকে নজর না দিয়ে, বাণী লিখে সময় নষ্ট করছে। যাক, আমার তো এখন সুবিধে হলো। কী বলছেন ?

সে—অনেক বাণী রয়েছে।

গ্রে—তোমরা যে ইনএফিসিয়েন্ট। প্রত্যেক গ্রেটম্যানদের সম্বন্ধে যদি একটা করে ফাইল খুলে যাও, তা হলে এই শেষ মুহূর্তে বিপদে পড়তে হয় না। যা হোক বল দু' একটা বাণী—পাবলিক মিটিং, দু'একটা লাগদাই কোটেশন না ছাড়লে সুবিধে হবে না। তা বলে তোমাদের ঐ বাণীটা—হে ভারত ভুলিও না, মেথর মূর্খ···ওটা আর শুনিয়োনা—ওটা পচে, হেজে, গলে গিয়েছে।

সে—তাহলে অন্য দু'একটা শোনাই ?

গ্রে—শোনাও।

সে—স্বামীজী লিখছেন, 'যেখানে Struggle সেখানে rebellion, সেখানেই জীবনের চিহ্ন।'

গ্রে—ও-বাবা। এ-সব যে গোলমেলে কথা। না বাপু, ও সব কনট্রোভার্সির মধ্যে আমরা যেতে পারিনা।

সে—এর পরেরটায় স্বামীজী বলছেন,—'গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোনো ভরসা রাখিও না।'

গ্রে—ধনীদের সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। আমরা যা আশা করি তার অর্ধেকও চাঁদা পাওয়া যায় না। কিন্তু গণ্যমান্য ? আমাদের উপর ভরসা না রাখলে দেশ চলবে না।

[এমন সময় আবার টেলিফোন বাজলো]

হ্যালো···আরে ঝুনঝুনওয়ালাজী কেয়া খবর, বাতাইয়ে। হ্যাঁ শুনুন, এবার এখানেই নিখিল ভারত দরিদ্র সম্মিলনী করছি। আপনাকে কিন্তু পৃষ্ঠপোষক হতেই হবে। সেণ্টারের সব ক'টা রুই কাতলা এর পিছনে রয়েছে। পাঁচহাজার টাকা চাঁদা···না না, গরীব বললে শুনছি না। আর মনে রাখবেন এটা দরিদ্রদেরই প্রতিষ্ঠান, আপনাদের মতো গরীবরা না দিলে কারা দেবে ?

[টেলিফোন নামিয়ে রেখে]

না ওই কোটেশন আপনার চলবে না। কাগজে রিপোর্ট বেরোলে মার্চেন্টরা চটে যাবে। ওঁরা চাঁদা না দিলে কোনো ফাংশনই হবে না।

সে—স্বামীজী আরও বলছেন—'কার্যশক্তি হইতে সহ্যশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।'

গ্রে—উনি তো কোনদিন পলিটিক্স করেননি—অথচ কেমন করে এমন কথা বললেন ?

এই যে আমাদের পোস্ট ; সহ্য করবার জন্যে রয়েছি আমরা—কার্য করা থেকে ওটা ঢের ইমপর্টান্ট। কিন্তু ওটাও লোকদের বলা চলবে না। ওরা অন্য মানে করে বসবে।

সে—তা হলে স্যর ?

গ্রে—দেখো আর কী আছে। স্বামীজীই তো বলেছেন—একবারে না পারিলে দেখো শতবার।

সে—খাতায় লেখা রয়েছে—'ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোটজাত তারাই আবহমানকাল থেকে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না।…হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী—তোমাদের প্রণাম করি।'

গ্রে—তোমরা কী আমার সর্বনাশ করতে চাও ? এই সব লেবার খ্যাপানো কথা ভদ্রলোকের বলবার কী দরকার ছিল ? কোথায় প্রোডাকশন বাড়াবার কথা বল, তা নয় চিরপদদলিত। আর দেবিদাসবাবুর উপরও আমার আর ভরসা থাকছে না। আমার কনফিডেন্‌সিয়াল অ্যাসিস্টেণ্ট হয়ে নিজের ডাইরিতে এই সব লিখছে ! একটা ফটো তুলিয়ে, আজই পুলিশে পাঠিয়ে দাও। কোথায় যে কি পঞ্চম বাহিনীর কাজ চলছে কে জানে ?

সে—তাহলে, আর পড়ব কী স্যর ?

গ্রে—পড়তে তো হবেই। কালকের মিটিংতো আর আমাকে ছাড়বে না। ভদ্রলোক এই ধরনের কথা বলেছেন জানলে আমি কিছুতেই ইনভিটেশন অ্যাক্‌সেপ্ট করতাম না। উনি কি একটাও ভাল কথা বলেন নি ?

সে—এইটাতে উনি বলছেন—'এই যে চাষাভূষো, মুচি, মুদ্দফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী।…তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচজাতদের উপর এতকাল অত্যাচার করেছিস—এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে—আর তোরা 'হা চাকরি যো চাকরি' করে করে লোপ পেয়ে যাবি।'

গ্রে—স্টপ…স্টপ। আর শুনতে চাইনা আমি। 'তুই', 'তোরা', 'যাবি', এসব কী কথা ? আর আমরা এদিকে বাসে ট্রামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়াচ্ছি—'তুই', 'তুমি' না বলে সবাইকে 'আপনি' বলুন। আর একটা কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—শুধুই ধ্বংসাত্মক সমালোচনা, ঠিক যেন বিরোধীদলের নেতা—সংগঠনমূলক কথা একটাও নেই।

সে—'এই ইতর শ্রেণীর লোক কাজ বন্ধ করলে তোরা অন্ন-বস্ত্র কোথায় পাবি ?

একদিন মেথররা কলকাতায় কাজ বন্ধ করলে হাহুতাশ লেগে যায়—তিনদিন ওরা কাজ বন্ধ করলে মহামারীতে তোদের অন্ন-বস্ত্র জোটে না।'

গ্রে—কোন্ বইতে এ-সব কথা লিখেছেন? পুলিশও কী করছে বুঝিনা—এসব বই বাজেয়াপ্ত হয়নি এখনও? মেথর খেপাচ্ছেন ভদ্রলোক। এসেনসিয়াল সার্ভিসের লোকদের কাজ বন্ধ করতে মতলব দিচ্ছেন—এতো আইনে পড়ে যাবার কেস।

সে—তাহলে কী করবো স্যর? হোম ডিপার্টমেণ্টকে একটা নোট দেবো নাকি স্যর! আমি খাতা আনবো কী?

গ্রে—আচ্ছা, তার আগে জিগ্যেস করো, এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে ওরা কোনো ফাইল মেনটেন করছে কিনা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, [একটু ইতস্তত করে] টপ সিক্রেট, কিন্তু তোমাকে বলতে বাধা কী, ইনি কোনো পার্টির লোক নাকি?

সে—সন্ন্যাসীর জাতই নেই, তো পার্টি।

গ্রে—রাখো রাখো, ওসব কথা আমরা যথেষ্ট শুনেছি। এখন কী প্রসেসে উনি জনতাকে খ্যাপাতে চেয়েছেন, তার কোনো ইঙ্গিত পাও কিনা দেখতো?

সে—উনি লিখেছেন—'ছোট লোকদের মধ্যে আজকাল ধর্মঘট হচ্ছে, হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা আর ছোট জাতদের দাবাতে পারবে না।…তাইতো বলি, তোরা এই mass-এর ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয় তাতে লেগে যা। ……তোদের সহানুভূতি পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে।'

গ্রে—আই সি! একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত, জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে।

সে—…'সংস্কার করিতে হইলে উপর দেখিলে চলিবে না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।'

গ্রে—একেই আজকাল ইনফিলট্রেশন বা অনুপ্রবেশ বলে।

সে—উনি আরও বলছেন, 'মূলদেশে অগ্নি সংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠিতে থাকুক।'

গ্রে—অত সোজা নয়, ফায়ার ব্রিগেড বলে একটা জিনিস এখনও দেশ থেকে উঠে যাইনি। এই আগুন নেভানোর অন্য মন্তরও আমাদের জানা আছে। তুমি কুলদাবাবুকে টপ সিক্রেট নোট দাও—প্রত্যেকটি কোটেশন সম্বন্ধে যেন

ইনভেসটিগেশন করেন। প্রত্যেক বছর এদের পিছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করছি—অথচ কী যে করে এরা।

সে—এই লাইনটা বোধ হয় কাজে লাগবে—'সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক।'

গ্রে—ছি ছি! ভদ্রলোকের বিনয় বলে কোনো বস্তু ছিল না। আমিও তো জানি আমার থেকে বড় নেতা নেই। কিন্তু সে কথা আমি কখনও বলি? আমার কত স্পিচ তো টাইপ করেছো, কোথাও দেখেছো?

সে—আত্মম্ভরিতা জিনিসটা আপনার স্যর একদম নেই।

গ্রে—অথচ সেদিন আমার জন্মদিনে কোনো ব্যাটা সম্পাদক এই কথাটা কাগজে লিখলে না।

সে—স্যর, বোধ হয় উনি অহিংসও ছিলেন না।

গ্রে—অ্যাঁ, বল কি?

সে—উনি বলছেন, 'তুমি গেরস্থ, তোমার গালে একচড় যদি কেউ মারে, তাকে দশচড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।'

গ্রে—খুব সাবধান—এগুলো যেন কনফিডেনসিয়াল থাকে—ভাগ্যে আমাদের জনসাধারণ অত খুঁটিয়ে পড়ে দেখে না। এ-সব প্রচার হলে প্রত্যেক পাড়ায় রোজ খুনোখুনি হবে। পুলিশ খাতে খরচা পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

সে—আগুনের কথাটা আবার বলছেন। 'আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈরি হতে হবে—তবে কাজ হয়।'

গ্রে—ফায়ারবিগ্রেড ফাইলে কোটেশনটা রেখে দিও। ওদের মিটিঙে গেলে লাগানো যাবে। তাড়াতাড়ি হাত চালাও একটু। এই কাজটা সেরে, মিসেস হাজরা এবং মিসেস স্বামীনাথনের সঙ্গে বসতে হবে আমাকে। নগরসুন্দরী প্রতিযোগিতা সাব কমিটির মিটিং। ওদের আদর্শ হচ্ছে, সুন্দরম, সত্যম, শিবম্। অর্থাৎ কিনা যাহা সুন্দর তাহাই সত্য।

সে—স্যর, সীতা কি খুব সুন্দরী ছিলেন?

গ্রে—অত কাঠখড় পুড়িয়ে, হরধনু ভেঙে রামচন্দ্র যখন বিয়ে করেছিলেন তখন নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলার পার্সনালিটি বলে কিছু ছিলনা—রামচন্দ্রের অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করলেন। মিসেস হাজরা যা বলেন—আরে পাতাল প্রবেশ করে কী হবে? প্রতিবাদ কর, আওয়াজ তোল। ডাইভোর্স করতে যদি লজ্জা লাগে অন্ততঃ জুডিশিয়ল সেপারেশন দাবি কর। মিসেস স্বামীনাথনও তাই বলেন।

সে—অথচ স্বামীজী বলছেন—'ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।'

গ্রে—আঃ, বাঁচালে তুমি। চিত্রা দেবীর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে একটু—ওঁকে এই লাইন কটা শুনিয়ে দেবো।

সে—মেয়েদের সম্বন্ধে স্বামীজী অন্য কথাও বলছেন—'কতকগুলো চেলা চাই—বুদ্ধিমান ও সাহসী, যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? শত শত ঐরকম চাই, মেয়ে মদ্দ দুই। মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই…শক্তির বিকাশ চাই।'

গ্রে—বা! বা-বা-বা! কি সর্বনাশা ফন্দি। ঘরের লক্ষ্মীদের উনি যমের মুখে ঠেলে দিতে চান।

সে—মানুষকে কিন্তু সত্যিই ভালবাসতেন তিনি। বলছেন—'আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই; যিনি বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া…

গ্রে—এ্যাঁ! থাক আর পড়তে হবে না। শুনে আমার গা ঘুলোচ্ছে। শেষপর্যন্ত বেশ্যার নিমন্ত্রণ।

সে—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন।

গ্রে—থাক, থাক—ওসব বড় বড় কথা মুখে অনেকেই বলে থাকে। কালকের মিটিঙে অনেক কম বয়সের ছেলে ছোকরাও থাকবে। এই নৈতিক অবনতির দিনে আমি তাদের আরও ওসকাতে পারবো না। তাছাড়া আমার স্ত্রী শুনলে রসাতল করবে।

সে—বোধ হয় উনি প্রেমের কথা বলছেন। এইতো এখানে চিঠিতে লিখছেন—প্রেমে বাঙাল, বাঙালী, আর্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়।'

গ্রে—সে আর বলে! ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে রোজ ডজন ডজন এক করে দিচ্ছে। আর নিরপরাধ বাপ-মা-রা বুকচাপড়ে চোখের জল ফেলছে। খাতায় কলমে লিখতে পারিনা, কিন্তু জিনিসটা মোটেই ভাল নয়।

সে—উনি যে পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন সেটা হলো—'চালাকী দ্বারা কোনো মহৎ কার্য

হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।'

গ্রে—রাখো রাখো, ওসব কথা অনেক শুনেছি। এখন বাড়ি যাও তুমি। দেখি, কি করা যায়।

[সেক্রেটারির প্রস্থান]

ক্রিং ক্রিং···

হ্যালো···কথা বলছি···কে চিত্রা দেবী? না আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা। আপনি আমাকে ফোন করবেন, এ আমার সৌভাগ্য। শেষবার সেই যে আপনার নতুন ছবির ট্রেড্ শোতে দেখা হলো, তারপর থেকেই ভাবছিলাম আপনাকে ফোনে ডেকে অভিনন্দন জানাবো। এমন অভিনয় আমি অনেকদিন দেখিনি। হ্যালো, কালকে আমার প্রোগ্রাম জানতে চাইছেন? আর বলবেন না। বড্ড ব্যস্ত রয়েছি। পাবলিক ম্যানদের অবস্থা পাবলিক উয়োম্যানদের থেকেও জঘন্য। সকালে গোটাদশেক কমিটি আর সাব-কমিটির মিটিং। তারপর বাণিজ্য সমাজের অ্যানুয়াল মিটিং এবং গ্যাঞ্জেস ক্লাবে লাঞ্চ আর ককটেল। তারপর বিকেলে রেসে যাচ্ছি, সে খবর বোধ হয় দেখেছেন। আমাকে উপস্থিত থেকে পুরস্কার দিতে হবে। ওটা আজকাল একটা খেলাধুলোর মধ্যে—আমাদের এনকারেজ করতেই হয়। তারপর ইম্পিরিয়াল হোটেলে নগরসুন্দরী কমপিটিশনের ইমপর্টাণ্ট মিটিং। তারপরই মুশকিল বাধিয়েছে। বলেন কেন, একটা মিটিং রয়েছে—ওই যে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী—আমি প্রধান বক্তা। ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হয়। হ্যালো, কী বলছেন? আপনারও জন্মদিন কাল? সত্যি? আমি জানতাম না। ককটেল দিচ্ছেন বাড়িতে? তারপর ডিনার? আচ্ছা অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। কী বললেন? আমাকে যেতেই হবে? কিন্তু মিটিংটাই তো ফ্যাশাদ বাধাচ্ছে।···হ্যালো, কী বললেন, না গেলে খুব রাগ করবেন? অ্যাঁ! আড়ি করে দেবেন? না না, প্লিজ, চিত্রা দেবী আপনি ওরকম করবেন না। আমি যাবোই। মিটিঙের গোড়াতেই দু'এক মিনিট বক্তৃতা করে আমি সভা ছেড়ে সোজা আপনার ওখানে চলে যাবো।

বেতারের খবর

···এখন খবর পড়ছেন·········আজ বিপুল উৎসাহের সঙ্গে ভাব গম্ভীর পরিবেশে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। হতে পারি দীন

মোরা নাহি কভু হীন সঙ্ঘ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় মনীষী···শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও উপস্থিত ছিলেন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার জন্য তিনি দেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান জানান। দেশের বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে বিবেক-বাণীই যে আমাদের অন্যতম ভরসা একথা তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বার বার মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, বিবেকানন্দর বাণী যতদিন আমাদের মধ্যে আছে ততদিন আমাদের মৃত্যু নেই, ততদিন আমরা অমৃতের সন্তান।

Swami Vivekananda as a Speaker and Writer of English

Dr. Srikumar Banerjee

1

The end of the nineteenth century was indeed a golden period, a period of the all-round blossoming of the national talent for Bengal. Not only did we have first-rate creators and literary artists, like Bankim Chandra and the youthful Rabindranath, who have shed undying lustre on Bengali literature and raised it to the level of the highest literatures of the world. Not only did we have Sri Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Keshab Chandra Sen and a number of lesser luminaries in the spiritual field, who rediscovered the ancient springs of religious inspiration and rivalled the saints and seers of antiquity in a direct realisation of the mystery of divinity. But what is still more wonderful, these creative artists and seekers after God absorbed to the full the life-giving influences of English literature and displayed a perfect mastery of the English language in their own writings, a gift of exposition and a sense of style comparable to that of the greatest English prose masters. Bankim Chandra wielded a style as trenchant and incisive, as fitted to carry the burden of great controversial issues as that of the great English masters of the expository style, of religions and philosophical discourses. Rabindranath has his own inimitable English style, richly coloured and packed with poetic images that covinces as much by its logic as by its emotional fervour, although it may have just an exotic flavour about it. In a slightly earlier period, the first modern Bengali poet, Madhusudan Datta, lived a double intellectual life with

one foot planted on his native soil and the other bestriding the rich and varied fields of western inheritance and serving as an ideally perfect medium between the twin spheres of thought and culture. Mastery of English was a happy bye-product of our assimilation of western influences in the exercise of our original creative faculties.

Equally, if not more, wonderful was the mastery of English among our top-ranking orators, of whom we had quite a respectable number during the period in question. It is strange, when we think of it, how some of our outstanding figures could manipulate an alien tongue to such marvellous effects of persuasion. These gifted speakers were mostly concerned with social and political issues : but a good few of them also employed their oratory in religious discourses. In the political arena, Ramgopal Ghosh of the Derozio age was one of the first to have made his mark. But oratory reached a higher flight when political passions were aroused and a demand for racial equality and for a fair share of self-government became more and more insistent. The founders of the Indian National Congress were, most of them, gifted with superb powers of oratory. W. C. Bonnerjee, Manmohan Ghosh, Surendranath Banerjee, Bepin Chandra Pal, B. G. Tilak, Lala Lajpat Rai, G. K. Gokhale, Pandit Madanmohan Malaviya and others were all towering figures in the field of oratory, who could appeal both to the reason and emotions of their audience and make the blood flow more quickly in their veins through their eloquence and deep conviction in the justice of the cause they pleaded for. This kind of oratory has become almost a lost art with the present generation, partly because the causes we champion have not the old stirring quality being confined more or less to narrow partisan and pratical issues and partly due to the

weakening of that magic spell that English words used to cast on us in the past. Today our great speakers, like Jawaharlal Nehru or Dr. Radhakrishnan, speak in a more introspective vein, in which they seek rather to convince our reason than to excite our feelings.

Towards the middle of the nineteenth century, eloquence found a new and hitherto untried field in the sphere of religious persuasion. Raja Rammohon Roy was the first to emerge in this field, being goaded to action both by the persistent vilifications of Christian missionaries as also by the conservative adherence to superstitious practices of Hindu orthodoxy. But he was more at home in wielding the pen than in verbal oratory. Quiet constructive work was more congenial to his philosophic temperament than mounting the rostrum in defence of his views. The establishment of the Brahmo Samaj and its gradual adoption of more and more radical measures of reform soon created an atmosphere of feverish excitement, in which not merely reasoned attack and defence, but the hurling to and fro of abuse and vituperation between the two contending parties came to be the chief weapons of warfare. Soon schisms arose in the Brahma fold itself and sections seceding from the parent body fought more bitterly among themselves than against the common enemy. Among the leaders of this new schism, Keshab Chandra Sen, Pratap Chandra Mazoomdar and Shibnath Shastri soon discovered a new avenue for an eloquent exposition of the essence of Hinduism by visiting Europe and America for the propagation of their religious faith. The missionary activities of Hindu and Brahmo preachers let loose a new stream of oratory along which Swami Vivekananda was wafted on to the haven of an immortal renown.

2

Keshab Chandra Sen first visited England in 1870 and Pratap Chandra Mazoomder followed in his footsteps in four successive visits in 1874, 1883, 1893 and 1900, having taken a prominent part in organising the Chicago Parliament of Religions and stood on a common platform with Swami Vivekananda as representing liberal Hinduism.

These religious discourses are eloquent enough, and they not unoften breathe a note of devotional fervour. But there are certain factors that militate against their ranking as spiritual revelations. For one thing, they were conceived in the spirit and conformed to the pattern of Christian sermons. Being addressed to a predominantly Christian audience, they stressed fundamental articles of faith and universal principles common to all the religions. This might be ethically good but had hardly the arresting quality of a new vision. It would be very interesting to compare the address of Sri Pratap Chandra Mazoomdar with that of Swami Vivekananda delivered from the same platform in the Chicago Parliament of Religions. Sri Mazoomdar, in speaking of the genesis of the Brahmo religion, stresses its reformatory zeal evidenced in its crusade against the social evils of orthodox Hinduism. This young faith, which shows its energy more in reacting against an older faith and is still exploring its positive aspirations, has hardly clothed itself with the serene authority of a long established religion of immemorial antiquity, fortified by centuries of strenuous practice and authentic realisation. Its ideal of a synthesis of all forms of faith, a loose confederation of the best elements of them all, however plausible theoretically and apparently catholic in its outlook, does not present the picture of a well-knit, organic coherence of texture. It seeks to grasp too many planks—a

gesture which does not encourage confidence against a possible shipwreck. The speaker no doubt refers to the eagerness of his co-religionists to seek and find God and forge direct links with Him as the most important object of religion, but the congress could not be very deeply interested in these preliminary efforts of a newly born religious sect to find its feet, however sincere and well-meaning the efforts might have been. The Christian members of the congress saw their own earlier history reproduced in these exploratory attempts, which gave them no clear indication of a surer path to be followed, a long tested certainty of realisation. The whole speech, though eloquently and sincerely expressed, introduced what may be called an ephemeral note in stressing the heart-searching of a callow creed that borrowed many elements from Christianity itself and was not quite sure about its own credentials. The very anxiety on the part of the spokesman to justify secession from the older religious stock from which it was born, betrays the defensive and half-apologetic role taken up by him—an attitude that was not likely to make a profound impression on the audience.

Far different is the nature of the debut made by Swami Vivekananda. As we imagine him stepping up to the rostrum to deliver his inaugural address on the 11th September, 1893, full of serene self-confidence, calm and imperturbable in the possession of absolute truth, expounding the inmost core of the Hindu religion with the lucidity that comes of perfect knowledge and fulness of conviction, we realise that he has a new revelation to offer to his audience. He speaks of the age-old glories of Hinduism, with its gospel of toleration and universal acceptance and his noble detestation of all kinds of sectarianism, bigotry and fanaticism which have plunged the world into

blood-baths time and again. With the noble hymns of the Gita on his lips to fortify his faith in the future of mankind, he drives home his points as if he is unfolding an incontestable truth. The quiet assurance of his manner, the dignity of his deportment, his confident faith in the authentic achievements of the past, place his utterances on a level immensely higher than that of one who treads warily on a controversial issue about which he himself is not free from doubts.

The first tremendous impression made by his inaugural address was consolidated still further, when he followed it up eight days later by the Paper on Hinduism which he read at the Parliament. Never was a religion with all its subtle intricacies, it mystic assumptions, its complex associations with past traditions and hoary legends, its range of ideas so alien to the western mind, presented with such a convincing brilliance of exposition and an air of infallibility that quailed not before the most obvious apparent impossibilities. Here was a master of the great mystery of religion expounding before people brought up in an alien culture and a different order of religious ideas all the inscrutable subtleties of his own spiritual intuitions as if he was reading from the pages of an open book which all could follow with the same ease. He establishes the Hindu belief about the divine origin of the Vedas on the analogy of the law of gravitation which had been in existence even before creation as an inalienable law of Nature. The spiritual laws enunciated in the Vedas partake of the eternity of God and are without beginning or end. The faith in a cycle of births, with the possibility of recovering by force of concentration the submerged memories of all anterior existences, the unfailing operation of the laws of Karma measuring out the joys and sorrows of our present life in a scale of justice determined by

our own past actions is demonstrated with the swiftness of an unerring intuition. Liberation from the meshes of Karma is only possible through the realisation of God through love and sinful, sorrow-laden man is addressed as a child of immortal bliss in view of his certain prospect of God-realisation through cultivating an absolute purity of heart. The perfect man, beloved of God, enjoys infinite bliss until he merges in the World-soul and far from losing his individuality, has its potency increased a million fold through the process. The philosophical conceptions of the Hindu religion have been, as he points out, confirmed by the latest discoveries of science and hence to a people who take pride in the scientific basis of their culture and belief they should come home with all the authority of an unchallengeable creed.

He then tackles the question of image-worship and of polytheism which are such essential elements in the religion of the ignorant and appear so obnonious to the Western mind accustomed to monotheism. He provides a most eloquent defence of this as an indispensable psychological condition for the initial stages of the attempt to grasp the absolute and points out similar traces of the operation of idolatry even among Christians professing monotheism. His language soars to magestic heights when his imagination is fired with the idea of a graded approach to Divinity, and he speaks of the image-worshipper as "a young eagle soaring higher and higher, gathering more and more strength till it reaches the glorious sun" in a passage strongly reminiscent of Jeremy Taylor without any imitation of the latter's sometimes cumbrous and long-winding magnificence of imagery and construction. The uncharitable judgment on Hindu idolatry so readily indulged in by the Western mind provokes him to telling, yet restrained sarcasm. "Idolatry in

India is not the mother of harlots." "If the Hindu fanatic burns himself on the pyre, he never lights the fire of Inquisition."

3

This missionary preaching of Hinduism among people of a different race and alien faith was a veritable turning point in its history. Nothing like this in its long existence had ever been attempted before. When Sankaracharyya led his crusade against Buddhism, he was merely carrying on a philosophical discussion on the orthodox lines with new arguments thrown in to be sure to meet the Buddhistic challenge. He merely vanquished his opponents in disputation which was confined to the circle of learned scholars and established his viewpoint for general acceptance. We have no detailed knowledge of his method and technique nor whether he had released a great flood of emotion in the popular mind in favour of his doctrines. At any rate we may be quite sure that he had not to go to the root of the matter, to the fundamental preconceptions of Hinduism as he was addressing an audience who had already accepted the basic principles. For Vivekananda to address and convince a Western audience who would take nothing for granted and had to be initiated into an entirely unfamiliar view of life providing the basis for Hindu religious speculations was an entirely different thing than for Sankaracharyya to confute the Buddhistic heresy or for Sri Chaitanya to propagate the religion of love among people already predisposed in its favour. Vivekananda had to adapt his arguments and the development of his thesis to the predominantly materialistic and scientific temper of his audience. He had to present the essential features of Hinduism and its conception of the true functions of life in an entirely new light which would never have occurred to any of his predecessors. He had to reduce Hinduism with all its immense variety of

forms, the perplexing multiplicity of its rituals and observances, and the sometimes crude, irrational conduct of its ignorant votaries to a few basic elements and show how they held together as a homogenous whole and could be reconciled with the most advanced thinking of a scientific age. At the same time he must give nothing away, must not hum and haw, not compromise any of its basic principles but express his firm and mature conviction of its attainment of the highest spiritual truth. This double task he has accomplished with rare skill and success The very attempt to make himself intelligible to foreigners compelled him to be clear in his own thoughts and present his case with the utmost lucidity and persuasiveness. Avoidance of all complex issues, close reasoning not too oppressive in its weight, simple presentation of elemental truths, the marshalling of homely images and illustrations which would easily go home and occasional flights of rhetoric and bursts of eloquence which would thrill his hearers and purify their mind of the last vestiges of doubt—these were the methods that made of his religious discourses such a splendid and unqualified success.

4

Swami Vivekananda's writings embrace a variety of subjects—speeches, discourses, conversations, letters, replies to questions put to him by the curious and the devout, and naturally his style and method of treatment would vary according to the nature of the subject. Some of his writings are on abstract philosophical topics, like expositions of the Vedanta philosophy or of the theory of illusions, which have rather gone stale in the present age. People's interest in Hinduism has crossed these frontiers and a knowledge of the fundamental metaphysical assumptions of Hinduism is now more general and wide-spread than when Vivekananda first broached these topics. Naturally the present

generation would not find much that is fresh or arresting in them. But through all of them, whether the treatment is sketchy or comprehensive, superficial or profound, a statement of elementary principles or a penetrating insight into the essential depths, there runs a common note, a note of superb confidence, a faith in man and a stirring appeal to evoke the best that is in him. Metaphysical subtleties, speculations about the nature of God and the best way to realise him are perhaps unavoidable in interpreting religion. But they are tempered with practical exhortations, a call for action, for a ceaseless striving for breathing the freshness of the upper air clear of the fog and dust of petty earthly concerns, a message of courage and hope that God is latent in the lowliest of us and can be discovered if we would only will it with an adequate intensity of purpose. The somewhat gloomy fatalism, the passive waiting for the grace to fall from on high, the crouching entrenchment behind a barricade of ritual and external observances find no countenance from his active and dynamic spirit. Life is to be judged by the one test of its ability to realise God : no other substitute is acceptable. Never does any religious teacher inculcate with more unswerving consistency a purely God-centred life. Never do we find a teacher a more ardent believer in the will power of men and the unlimited possbilities of human nature. There is perhaps not much that is new in the Gospel that he preaches. But the method of his preaching, the unerring guidance that he offers, the sure path that he chalks out, the ringing sentences in which he urges his followers to follow the straight course, the call for renunciation and sacrifice as something easy enough for human nature—all this invests the time-honoured discipline with a strangely potent appeal for those who listen to it. He gives us the impression, as few could give, that

the ideal is well within our reach, if we would sincerely desire it.

Swamiji's writings are instinct with his personality and radiate spiritual energy and enthusiasm from their every pore. He stresses and hammers at the essential fact about religion—viz. divine realisation, urgency of a direct contact with God. He has a fling at the pleasant pastime of the average writer on religion, who wares eloquent on religious problems and writes learned articles on them on mere secondary evidence without any first-hand experience there of. This average writer dissects the dead body of religious dogma without any power to infuse life into its dry bones. He makes subtle distinctions between body, mind and soul, the Individual and the Universal self without any direct perception of what a soul-suffused life means and how it shows itself in its daily conduct. To talk learnedly about religion is for Swamiji no claim to respect or distinction. A parrot copying human speech and reproducing human discourses furnishes the aptest analogy for such cases. Swamiji, on the other hand, has an everpresent sense of the all-pervasive influence of religion on the life of man. Whatever he thinks, enjoys or does must be punctuated exclusively by the rhythm of God-sense. Again and again he urges the Indian to recognise and restore this centrality of religion. All his plans would go away, all his speculations would miscarry, all his good resolutions of social and political service would be turned to nought unless propped up and sustained by this central support. He had very definite ideas about a religion-centred system of education for India, and although he has thrown out pregnant hints here and there of such a system, he had no time to formulate a detailed scheme which might serve as a model for us in this distracted age. Let us hope that the Vivekananda

University which is proposed to be inaugurated in the centenary year of his birth will give a concrete embodiment to his ideals and will set to itself the task of moulding the whole man rather than that fragment of it which fits in with the narrow mould of modern life. Let us fervently pray to Swamiji that his spirit will save us from copying the soulless educational machinery that is dignified with the title of a University in these degenerate times.

5

When all is said and done, Vivekananda's most significant contribution to Hinduism is the atmosphere of hope and strenous activity and the eagerness for realisation that he has diffused round religion. Our religion of the modern age, in spite of the abundant vitality of its Vedic origins and the daring self-introspection of the Upanishadic period has been more or less a thing of the twilight. We shut ourselves in our dark prayer room and mumble the set formula and go through the fixed ritual without the active and vigorous assent of all our faculties, the totality of our personality. We crouch deeper and deeper under the shadows of the wide-spreading banian tree of our ancient faith, the roots of which had been loosened by the gnawing bites of agnosticism. We have been clutching at hopes which glimmered and went out ; we have been nursing doubts and fears that swelled till they overshadowed our whole outlook ; we have been uttering our prayers without being certain that they reached the proper quarters. The whole atmosphere of our communion with the Supreme Power had been one of suspense and uncertainty, of a thickening and tantalising darkness. Into this atmosphere of gloom Vivekananda entered with his breath of undoubted assurance, a south wind of hope which dispelled all the mists and fogs. We breathed

once again the glad, confident morning air. A sunset picture was miraculously transformed into a radiant picture of sunrise. A faint, timorous hope suddenly grew into an absolute certitude of conviction. The distant God came very close to us and whispered encouraging words into our ears. The silent communion of Sri Ramkrishna expended itself into a thousand voices echoed from mind to mind, never berating through all horizons, near and distant, till they swelled into a tidal wave of joy which flooded every heart. The immemorial Hindu religion, on which the shadows of the past lay thick, which ruminated past glories and had its gaze ever turned backward, was wonderfully rejuvenated, bathed in the swift currents of modern life and charged with a message for the future of humanity. This was the supreme legacy of Swami Vivekananda, though, alas, we are not sure whether we have proved worthy of the inheritance and whether the dark demon of doubt and despondency has not once again crept into the folds of our heart from which he had been enorcised by the incantation of the great master !

Vivekananda was a writer with a message and depth of conviction. He wrote in obedience to an imprious inner urge and not to show off his command of language. His ideas and faith shaped the mould of his style, just as a swiftly flowing river determines the contour of its banks. Reason was a strong element in his mind and style, though he kept it within its limits and made it an apt instrument of his mystical ideas of religion. He writes with a main view to securing clarity of presentation in respect of truths that lay immeasurably beyond the scope of reason. Most of his writings bear the stamp of this clarity of thought and lucidity of exposition, but his style has a secret strength, a silent influence springing not from reason but his transcendent hold upon the Divine Mystery. Amidst a series of

calm, equable sentences marshalling facts and expounding states of the mind, we suddenly come across an utterance that is ablaze with passion, a lifting of the emotional pitch all the more effective because of his practice of habitual restraint. The unseen aspiring fixes of revelation cast a halo, a tinge of glory upon the sober pedestrianism of reason. Swamiji did not seem to follow any models : the unique nature of his subject and the rather indeterminate character of his audience prompted his manner of expression. If there is any English writer to whom he may be compared, it is that once-famous, but now little read master of prose style, Cardinal Newman, who reconciled, more than any body else, the divergent harmonies of reason and revelation.

মনীষী সঙ্গমে—পরিশিষ্ট

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে গৌতমবুদ্ধ

চিত্তরঞ্জন দাশ

"All my life I have been very fond of Buddha but not of his doctrine. I have more veneration for that character than for any other."

—Swami Vivekananda.

যে শক্তি শাক্যরাজকুমারের রাজ-আভরণ ও কপিলাবস্তুর সিংহাসনাধিকার হরণ করিয়া তাঁহাকে প্রাসাদছাড়া করিয়াছিল, আর যে শক্তি দগ্ধকাম সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে নির্বিকল্প সমাধিসমুদ্রের প্রশান্ত তটভূমি হইতে সবলে ছিনাইয়া লইয়া নরনারায়ণের সেবার জন্য তাঁহাকে ধরণীর ধূলিতে অবগাহন করাইয়াছিল—সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসরের ব্যবধানেও সে শক্তিকে এক বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। সে শক্তি যে প্রেম, সে শক্তি যে করুণা, তাহা আজ উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

সমপ্রকৃতিতেই আকর্ষণ হয় তীব্র। এই দেবতনু একই করুণার উপাদানে গড়া বলিয়াই বিবেকানন্দ ছিলেন আজীবন বুদ্ধপূজারী।

ছাত্রজীবনে ধ্যানে বুদ্ধের দর্শন লাভ, যৌবনে বোধিগয়ায় তপশ্চরণ, বুদ্ধের চরণে জীবন বলি দিতে শিষ্যস্থানীয়দের উদার আহ্বান—এইরূপ বহু ঘটনাতেই বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির সহস্র নিদর্শন মুদ্রিত রহিয়াছে। বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর—ইহাও স্বামীজীর বাণী। বুদ্ধদেবের অপূর্ব জীবপ্রেমই ছিল তাঁহার সকল চিন্তা, চেষ্টা ও কার্যের উৎস। আর ছিল তাঁর ক্ষুরধার প্রতিভা ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা—যাহার বলে শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া-রূপ আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, সংস্কারবিহীন মন লইয়া মানুষজীবনের আসল সমস্যা ও তাহার যথার্থ সমাধান সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিল—শুধু তাই নয়, তৎকালীন বিক্ষয়মান হিন্দুধর্মকে বাহ্যত পরিত্যাগ করিয়াও মূলত সেই ধর্মের সুসংস্কৃত রূপকে প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের এই অতলান্ত প্রেম, এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও বজ্রদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বিবেকানন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে যতখানি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছিল, বুদ্ধের বাণী তাঁহাকে ততটা আকৃষ্ট করিতে

পারে নাই। একই প্রেমের বাণী দু'জনে প্রচার করিলেও যুগপ্রয়োজনে একের দৃষ্টিকোণ অপরের দৃষ্টিকোণ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

সর্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে চরম নিষ্কৃতিলাভের জন্য বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্বিশেষে মানুষমাত্রকেই নির্বাণলাভের সাধনায় আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আর এই নির্বাণতীর্থে উপনীত হইবার জন্য যে পথ তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন—তাহা হইল স্বার্থবিসর্জনের পথ, আত্মত্যাগের পথ। কিন্তু নিজেকে, আত্মাকে ত্যাগ করিব কেন? কারণ বুদ্ধ বলেন, "আত্মা বলিয়া, 'আমি' বলিয়া কিছু আছে কি না সন্দেহ। আত্মত্যাগ ঈশ্বরের প্রীতির জন্যও নয়, কেন না আত্মার ন্যায় ঈশ্বরের অস্তিত্বেও আমরা সন্দিহান।" আত্মা বা ঈশ্বর-বিষয়ক এই সন্দেহ, এইরূপ নাস্তিমূলক দর্শনের উপর বুদ্ধমতবাদের প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধদেবের নির্বাণও আপাতদৃষ্টিতে একরূপ একটি নাস্তিবাচক অবস্থা—যেখানে কামনা-বাসনার লেশমাত্র নাই, কিন্তু কি যে আছে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ বুদ্ধ-বাণীতে নাই।

স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন যে, বেদান্তের মতবাদ আর বুদ্ধদেবের মতবাদের মধ্যে বাহিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও মূলত কোনই অনৈক্য নাই। বুদ্ধের নির্বাণ, বিজ্ঞানীর আত্মা যে, একই বস্তু, যাহাই বাসনার বিলুপ্তি তাহাই যে, পূর্ণ ব্রহ্মানুভূতি, এ বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহও ছিল না। এই কারণে বৌদ্ধধর্মকে একটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ধর্ম বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। হিন্দুধর্মের পরিপূরকরূপেই বুদ্ধধর্ম তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতীত হইয়াছিল। চিকাগোর ধর্মমহাসভায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বুদ্ধধর্মকে fulfilment of Hinduism বলিয়া অভিহিত করেন। বলেন……

Sakya Muni came not to destroy, but he was the logical conclusion, the logical development of the religion of the Hindus.

তবে স্বামীজী বলিতেন, শুধু বলিতেন নয়, দাবি করিতেন যে, বুদ্ধের এই অপূর্ব জীবপ্রেম নাস্তিমূলক ধর্মের দ্বারা সহজে প্রচারিত হইতে পারে না। নাস্তিমূলক নির্বাণ অপেক্ষা অস্তিমূলক আত্মাই জীবপ্রেমের যথার্থ উৎকৃষ্টতর ভিত্তি। বুদ্ধের মত বেদান্তধ্বজী বিবেকানন্দও বলেন, স্বার্থ ত্যাগ কর, আত্মবিসর্জন কর। কেন? কারণ আত্মাই একমাত্র অবিতথ সত্য, আর এই আত্মা একদেহে আবদ্ধ নন। অগণ্য দেহে তাঁর নিত্য অধিষ্ঠান। বুদ্ধের মত বিবেকানন্দও বলেন—সর্বাগ্রে চাই নিজের উপর বিশ্বাস। কেন? বুদ্ধদেব বলেন, নিজের কল্যাণের পথ নিজেকেই বাহির করিতে হইবে, নিজেকেই পথ বহিয়া চলিতে হইবে। ঈশ্বর, আত্মা, দেবতা বলিয়া আকাশের ওপাশে কেহ বসিয়া নাই, যিনি তোমাকে এই নিয়ত অনুভূত দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ করিতে আসিবেন। আর বিবেকানন্দ বলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

আকাশের পরপারে বসিয়া নাই সত্য, তবে তিনি যে আত্মারূপে তোমারই হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন !

রাম, শ্যাম, যদু, মধুর মত ঈশ্বর একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি নন, তিনি যে, সমস্ত ব্যক্তিরই প্রকৃত স্বরূপ। তিনি ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ (Third person) নন, তিনি যে তোমার আমার সকলের মধ্যে উত্তম পুরুষ (First person)-রূপে, আমাদের 'আমিত্ব'রূপে, অনুক্ষণ বিরাজমান। তাঁহার শক্তিতেই তুমি শক্তিমান। তোমার শক্তি অল্প নয়—অপরিসীম। নিজেকে বৃথা দুর্বল শক্তিহীন ভাবিও না। নিজের উপর প্রত্যয় আন। যথার্থ আত্মপ্রত্যয়ই ঈশ্বরপ্রত্যয়।

'নাস্তি'মূলক ধর্ম বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, মানুষ উহাতে অবলম্বন করিবার মত কিছু খুঁজিয়া পায় না। ঈশ্বর হোক, আত্মা হোক, কোন না কোন সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষ তাহার জীবনকে শ্রেয়াভিমুখী করিতে পারে। চরম শূন্যতা লক্ষ্য করিলে অজস্র আশা-আকাঙ্ক্ষার, মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরাট বোঝা লইয়া সে দাঁড়াইবে কোথা ? ভারতে তাই বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের বাহ্যত যে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে, স্বামীজী বলেন, তাহা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়াছে। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম টিকিয়া আছে, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের শূন্য আসন স্বয়ং বুদ্ধদেবের অথবা অন্যান্য দেবদেবীর দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া।

"নাস্তি"কে গ্রহণে মানবমনের দুর্বলতার কথা জানিয়াও বুদ্ধদেব কি তাহা হইলে ভ্রমবশতঃ ঈশ্বরকে, আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন ? স্বামীজী বলেন, তাহাও না। তিনি বলেন, তখনকার দিনে, বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আড়ম্বর বাহুল্যের দিনে,—'ঈশ্বর', 'আত্মা' সম্বন্ধে এত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ক্ষমতাগৃধ্নু পুরোহিত-সমাজ আপনাদিগকে বেদ-উপনিষদের একমাত্র ব্যাখ্যাতা বলিয়া এমন কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, যাহার জন্য বুদ্ধদেব ঐ সমস্ত ধারণা সংশোধন ও পরিমার্জনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া একেবারে পরিবর্জন করিয়াছিলেন। মানুষের ধর্মচিন্তাকে নূতন শব্দ ও ভাবের খাতে প্রবাহিত করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ...প্রাচীন ভাবে ও ভাষায় গ্রহণযোগ্য কিছু ছিল না বলিয়া যে, তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তা নয়। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা ছিল—প্রাচীন শব্দাবলী (terminology) ও শাস্ত্রের সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব রাখিলে পাছে সেই সূত্র ধরিয়া সংশ্লিষ্ট কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণাগুলি আসিয়া পড়ে। এই সাবধানতার জন্যই প্রাচীনের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

এই 'নাস্তি'-বাচক দিকটা, ঈশ্বর আত্মার অনস্তিত্বজ্ঞাপক দিকটা, সম্ভবতঃ বুদ্ধধর্মের

দার্শনিক ভিত্তিকেও দুর্বল করিয়াছে। স্বামীজী বোধ করি সেই কারণেই বৌদ্ধধর্মকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সর্বপ্রধান ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইলেও দর্শনবিচারে উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই।

বৌদ্ধধর্ম 'নাস্তি'ভাবপ্রধান হইলেও উহার অস্তিবাচক দিক (positive aspect) যে, একেবারেই নাই এমন নয়। বুদ্ধদেব যে সেবার ভাব, প্রেমের ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহাই এই ধর্মের অস্তিবাচক (positive) রূপ। এই 'অস্তি'-বাচক বুদ্ধধর্ম মরে নাই, মরিবার নয়। বুদ্ধধর্মের প্রেম-সেবা ও সংযমের ভাব এ দেশে, শুধু এ দেশে নয়, সমস্ত দেশে সমস্ত ধর্মেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে জন্য স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে আজিও অপসৃত হয় নাই।

যে প্রয়োজনে বুদ্ধদেবকে 'ঈশ্বর', 'আত্মা', 'বেদ', 'উপনিষদ' প্রভৃতির সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছি। স্বামীজী বলেন, কোন ধর্মই, কোন মতবাদই নাস্তিক-ভাবপ্রধান হইয়া বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার মতে পরবর্তী বৌদ্ধদের উচিত ছিল—বুদ্ধধর্মের অস্তিবাচক দিকটার উপর জোর দেওয়া এবং এইটি বুঝা ও প্রচার করা যে, বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম পরিপূর্ণ করিতে আসিয়া-ছিলেন—ধ্বংস করিতে নয়। He also like Jesus "came to fulfil and not to destroy." একটি মূল ধর্মভাব যে উভয় ধর্মের মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে ইহা বুদ্ধশিষ্যগণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই বলিয়াই সম্ভবত স্বামীজী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

But our views about Buddha are that he was not understood properly by his disciples.

বেদান্ত-প্রতিপন্ন আত্মসাম্যবাদ আর বুদ্ধদেব-প্রচারিত প্রেম ও সেবা—ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য,—দুয়ের অপরিহার্যতা স্বামীজী বার বার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

"Hinduism connot live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism. ......The Buddhist connot stand without the brain and philosophy of the Brahmins, not Brahmins without the heart of the Buddhists......Let us then join the wonderful intellect of the Brahmin with the heart, the noble soul, the wonderful humanizing power of the Great Master.

স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ দিয়া বুদ্ধদেবকে বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার দিন আজ সত্যই সমাগত।

বিবেকানন্দ-গ্রন্থপঞ্জী

সুনীলবিহারী ঘোষ
বাণী বসু

বিবেকানন্দ-গ্রন্থপঞ্জী

০ স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থপঞ্জী বিবেকানন্দ-সাহিত্য অনুরাগী পাঠকদের ব্যবহারের জন্য সংকলিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা লেখকের গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করার অর্থ হলো সেই লেখকের রচিত গ্রন্থের তালিকা এবং সেই লেখক সম্বন্ধে রচিত বইয়ের তালিকা। এই গ্রন্থপঞ্জীও সেইভাবে সংকলিত হয়েছে।

০১ কিন্তু কেবল গ্রন্থের তালিকা দিলেই কোনো গ্রন্থপঞ্জী সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখকের রচনা বা লেখক সম্বন্ধীয় রচনা ছড়ানো থাকতে পারে, যা হয়তো কোনোদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। সেই সব রচনার তালিকা গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। পত্রপত্রিকায় স্বামীজী সম্বন্ধে বহু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। 'ব্রহ্মবাদিন্' (অধুনাবন্ধ), 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'উদ্বোধন', 'বিশ্ববাণী', 'বেদান্তকেশরী', 'শ্রীরামকৃষ্ণবিজয়ম্', 'বেদান্ত মান্থলি বুলেটিন', 'বেদান্তদর্পণ', 'ভয়েস অব্ ফ্রিডম্' (অধুনাবন্ধ), 'বেদান্ত অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট', 'বেদান্ত ফর দি ইস্ট অ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট', 'দি মেসেজ অব্ দি ইস্ট', 'দি মর্নিং স্টার' (অধুনাবন্ধ) ইত্যাদি বহু পত্রিকায় স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা নেহাত কম হয় নি। উল্লিখিত পত্রিকাগুলি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রচারে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ সব ছাড়াও বহু পত্রিকা ও সংবাদপত্রে স্বামীজীর জীবন ও চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের গ্রন্থপঞ্জীর স্ফীত অবয়ব চিন্তা করে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কোনো রচনা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমরা আশা রাখি যে, ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী (যেটি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ) বাংলাদেশের পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিতে পারব।

০১১ এই গ্রন্থপঞ্জীর সীমানানির্ধারণে আর একটি সঙ্কোচননীতি আমরা গ্রহণ করেছি। বিংশশতাব্দীর ভারত-আত্মার বাণীমূর্তিরূপে বিবেকানন্দের নাম আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সর্বদা ও সর্বথা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি, ধর্মজীবন, অধ্যাত্মচিন্তা আলোচনায় স্বামীজীর বাণী স্মরণ করতেই হবে। এমন কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামীজী একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছেন। এ সব কারণে শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলীতে, সুভাষচন্দ্রের 'Indian Pilgrim'

জওহরলালের 'Discovery of India' ইত্যাদি গ্রন্থে স্বামীজীর নাম বারবার লেখা হয়েছে। সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীতে ঐ সব বই নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, কিন্তু বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীর আয়তন পরিমিত রাখবার জন্য যে-সব বই মুখ্যত স্বামীজী-সম্বন্ধীয় নয়, সে ধরনের বইগুলি নেওয়া হয় নি।

•১১১ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে কোনো বইতে স্বামীজীর প্রসঙ্গ থাকবেই। (এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংখ্যা বিবেকানন্দসম্বন্ধীয় গ্রন্থের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি।) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্বন্ধেও (যথা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ সম্বন্ধে ও নিবেদিতাদি স্বামীজীর শিষ্যগণ সম্বন্ধে) এর ব্যতিক্রম হবে না। তথাপি আগের কারণে স্বামী গম্ভীরানন্দ-সংকলিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, স্বামী তেজসানন্দ রচিত 'Ramakrishna Movement : Its Ideal and Activities' ইত্যাদি বইগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কেবল স্বামীজীসম্বন্ধীয় বই এতে নেওয়া হয়েছে। নীতিগতভাবে এ কথা মানলেও ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য ভাষায় এমন কয়েকটি বই গৃহীত হয়েছে যেগুলি কেবল স্বামীজীসম্বন্ধীয় নয়। প্রসঙ্গত, ফরাসী ভাষায় Jean Herbert রচিত 'Quelques grands penseurs de l'Inde moderne' এবং 'Introduction a l'etude des yogas hindous' বইদুটির নাম করা যেতে পারে। প্রথম বইটির স্পেনিশ, পোলিশ ও পর্তুগীজ অনুবাদ এবং দ্বিতীয়টির স্পেনিশ ভাষান্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

•২ প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে যে কথা সত্য, এই গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধেও সেটা সর্বাংশে প্রযোজ্য—অর্থাৎ এই গ্রন্থপঞ্জীর সম্পূর্ণতা আমাদের দাবি নয়। বহু বই আমাদের অদেখা থেকে গেছে, অনেক বইয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। কলকাতার এবং আশেপাশের অনেক পুরানো গ্রন্থাগারে আমরা সময় ও সুযোগের অভাবে যেতে পারি নি। এ কথাটা সর্বদাই স্বীকার করা উচিত যে, কেবল ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ক্যাটালগ' দেখলেই কোনো গ্রন্থপঞ্জী-সংকলনের কাজ শেষ হয় না। আমাদের জেলায় জেলায় বহু অখ্যাত গ্রন্থাগারে এমন অনেক বইয়ের খবর হয়তো পাওয়া যাবে যা তথাকথিত বড়ো গ্রন্থাগারে নেই।

•২১ পূর্বভারতের একটি স্থানে বসে এই ধরণের গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের অনেক বাধা আছে। স্বামীজীর বই বা তার অনুবাদ তো কেবল ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় বের হয় নি। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় স্বামীজীর বই প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনাও হয়েছে। বিশেষত তামিল, কান্নাডা ইত্যাদি দক্ষিণী ভাষাগুলিতে। স্বামীজীর জন্ম বাংলাদেশে হলেও তাঁকে আবিষ্কার করেছে মাদ্রাজ।

এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ১৮৯৪ সালের মে মাসের 'হিন্দু' পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য—"Calcutta claims him (Vivekananda) now that he is great. Madras learned to appreciat e him even before that. No man is a prophet in his own country." কিন্তু কলকাতায় এমন একটা গ্রন্থাগার নেই (ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা মনে রেখে) যেখানে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সব বই মেলে। বিভিন্ন রাজ্যসরকার প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থতালিকাও কলকাতায় সুলভ নয়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত স্বামীজীর বই এবং স্বামীজী-সম্পর্কিত বই আমরা তালিকাবদ্ধ করেছি, তবে অনুমান করি এর থেকে অনেক বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে।

০৩ এই গ্রন্থপঞ্জী যতোই অসম্পূর্ণ হোক, এর প্রামাণিকতা আমরা দাবি করতে পারি। এটি সংকলন করতে গিয়ে আমরা অনেকগুলি গ্রন্থাগারে গেছি, গ্রন্থাগারের 'ক্যাটালগ'ও দেখেছি। সর্বোপরি, বেঙ্গল লাইব্রেরির 'ক্যাটালগ' ১৮৯৩ সাল থেকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি। নানাবিধ রেফারেন্স বই যেমন, The Indian National Bibliography, The National Bibliography of Indian Literature (1901-1953), The British National Bibliography, The British Museum Catalogue, The India Office Library Catalogue, The Library of Congress Printed Catalog Cards, The National Union Catalog, The Cumulative Book Index, Index Translationum, ডাঃ রাজবলী পাণ্ডে-সংকলিত হিন্দীমেঁ উচ্চতর সাহিত্য, মাতাপ্রসাদ গুপ্তের হিন্দী পুস্তক সাহিত্য, সর্বজনশ্রদ্ধেয় মরাঠী গ্রন্থপঞ্জীকার শ্রীশংকর গণেশ দাতে-সংকলিত মরাঠী গ্রন্থসূচী ইত্যাদি আমরা তন্নতন্নভাবে দেখেছি। এখানেই এই গ্রন্থপঞ্জীর প্রামাণিকতা।

০৪ সাধারণত, লেখক-গ্রন্থপঞ্জী বইয়ের রচনাকাল বা প্রকাশকাল অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। কীভাবে লেখকের মন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে লেখকের ধারণা কীভাবে বদলাচ্ছে, এ সবের একটা সুন্দর ছবি কালানুযায়ী সাজানো গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া যায়। ঐ ধরনের বিন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীটি সেভাবে সাজানো হয় নি।

০৪১ সন্ন্যাসী হবার পরে স্বামীজীর নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি? তাঁর বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতা, না সুপরিচিত Paper on Hinduism? ২৯ শে জানুআরি, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে লিখছেন, "...আমি আমাদের ধর্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে

একটি সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ কর।" এই বক্তৃতাটিই, বোধ হয়, Paper on Hinduism নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি থেকে স্বামীজীর বই প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতার এস. সি. মিত্র অ্যাণ্ড কোম্পানি স্বামীজীর অনেক বই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের প্রকাশিত বই কি ভারতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত স্বামীজীর বই? ('স্বামীজীর বাণী ও রচনা' পৃঃ ৪৬৭ দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ পাই নি। স্বামীজীর বই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ থেকে প্রায় একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে প্রকাশিত বইয়ের প্রকাশের ঠিক তারিখ মাস ইত্যাদি না জানা থাকায় প্রকাশকালানুযায়ী ঐগুলিকে সাজানো, বোধ হয়, ন্যায়-সঙ্গত হবে না। স্বামীজীর বইয়ের ক্ষেত্রে পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করা কেবল কঠিন নয়, বহুস্থলে অসম্ভব।

০৪২ স্বামীজীর চিন্তাধারা সহস্রার পদ্মের মতো 'আপনাতে আপনি বিকশি' পূর্ণরূপে লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য বা আলোচনা যেন একেবারে শেষ কথা উচ্চারণ করেছে। সুতরাং কালানুযায়ী বিন্যস্ত গ্রন্থপঞ্জীতে স্বামীজীর চিন্তাভাবনার বিভিন্ন স্তর, খুব বেশি হয়তো, খুঁজে পাওয়া যাবে না।

০৪৩ এ কারণে স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী অক্ষরানুযায়ী সাজানো হয়েছে। স্বামীজী-রচিত বইগুলি নামানুযায়ী এবং তৎসম্পর্কিত বইগুলি লেখকানুযায়ী সাজানো হয়েছে। নানাস্থান থেকে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্করণ দেখানো হয়েছে।

০৪৪ গ্রন্থপঞ্জীটিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) অভারতীয় ভাষা, ও (খ) ভারতীয় ভাষা। স্বামীজীর রচনা মুখ্যত ইংরেজীতে। (বাংলায় স্বামীজীর মৌলিক রচনা সর্বসাকুল্যে চারটি বই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা ও পরিব্রাজক। এর উপর চিঠিপত্র ও কবিতা। ফরাসী ভাষায় লেখা স্বামীজীর দুটো চিঠি পাওয়া গেছে। কয়েকটি চিঠি এবং স্তোত্র সংস্কৃতে লিখেছিলেন। হিন্দীতেও কিছু রচনা আছে)। অভারতীয় ভাষা বিভাগে প্রথমে ইংরেজী বই, পরে ডেনিশ, ডাচ, ফিনিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, গ্রীক, ইতালিয়ান, পোলিশ, পর্তুগীজ, রাশিয়ান, স্পেনিশ ও সুইডিশ ভাষায় অনূদিত বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে। ইংরেজীভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

০৪৪১ ভারতীয় ভাষা বিভাগে প্রথমে বাংলাভাষায় পূর্ণবিবরণ সহ পরে

অসমীয়া, উর্দু, ওড়িয়া, কান্নাড়া, গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, নেপালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মালয়ালম এবং হিন্দীভাষায় অনূদিত বইয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর বক্তৃতা, বাণী সংকলন ইত্যাদিকে স্বামীজীর রচনা হিসাবে ধরা হয়েছে।

০৪৪২ পূর্ণ বিবরণ হিসাবে বইয়ের নাম, সংস্করণ, প্রকাশস্থান, প্রকাশক, তারিখ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, উচ্চতা ও মূল্য দেওয়া হয়েছে। যে সব বই দেখবার সুযোগ আমরা পাইনি সেগুলির কিছু কিছু বিবরণ বাদ পড়েছে। বইয়ের মূল্য আধুনিক প্রথামত দশমিক মুদ্রায় দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত টীকা দেওয়া আছে।

০৪৫ অন্তর্ভুক্ত বইগুলির প্রথম অথবা যথাসম্ভব সর্বাপেক্ষা পুরাতন সংস্করণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর রচনার বিভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণ থেকে শুরু করে নূতনতম সংস্করণ পর্যন্ত সবগুলি সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা স্বামীজীসম্পর্কিত গবেষণায় অনেক নূতন আলোক দান করবে। বিশেষভাবে, স্বামীজীর অনেক বক্তৃতা প্রথমে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সেগুলি মার্জিত হয়ে, কোথাও বা আদ্যোপান্ত পরিবর্তিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, স্বামীজীর চিন্তাভাবনার সূত্র-অন্বেষণে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির গুরুত্ব নিতান্ত কম নয়।

০৫ চিকাগো বক্তৃতার পর (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) স্বামীজী জগদ্বিখ্যাত হলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসাধনা আরম্ভ হয়েছিল বেশ কিছু আগে। সন্ন্যাসজীবনের পূর্বে লেখা স্বামীজীর (নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে) কয়েকটি বই বা তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

০৫১ "সঙ্গীতকল্পতরু"। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. এবং বৈষ্ণবচরণ বসাকের সংকলন ও সম্পাদনায় এই গানের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির ভূমিকা 'বিশেষ কথায়' বৈষ্ণবচরণ বসাক লিখছেন, 'প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সংকলনকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয়ই প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই।' বইটির প্রারম্ভে "সঙ্গীত ও বাদ্য" নামে যে দীর্ঘ আলোচনা আছে অনেকে অনুমান করেন ঐটি নরেন্দ্রনাথের লেখা। স্বামীজী বাংলা গদ্যে যে শক্তি ও প্রাণরস সঞ্চারিত করেছিলেন এই আলোচনায় সেটি বের করা খুবই সহজ। ঐ আলোচনার কিছু নিচে দেওয়া হলো।

"অনন্ত বিশ্ব যাঁহার কার্য্য যাঁহার প্রতি ছন্দে গ্রহনক্ষত্রাদি ভ্রমণ করিতেছে, সেই

দেবাদিদেব আদিকবি বিশ্বপতি কৃপা করিয়া কোন কোন পুণ্যবানের মস্তকে [?] বর্ষণ করেন। ভারতের এই ভয়ঙ্কর মহাত্মশালী অতীতের স্মৃতিপুর্ণ পরিত্যক্ত এই বিশাল রঙ্গভূমির ত সেই সঙ্গীত একটী সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন। হইতে পারে আজি পাশ্চাত্যভূমি বিজ্ঞান চর্চ্চায়, দর্শন চর্চ্চায়, ন্যায় চর্চ্চায়, জ্যোতিষ চর্চ্চায়, গণিত চর্চ্চায় ও ভৈষজ্য চর্চ্চায় প্রাচীন ভারতকে দূর পরাহত করিয়াছে ; কিন্তু ভারতের সঙ্গীত, তুমি শতসহস্রবিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ পরিবর্ত্তনের ঘোর অবনতির, ঘোর দুর্গতির মধ্যে আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহিয়া, শত বিঘ্ন শত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছ।" (পৃঃ ৯)

এই বইটি পরে বৈষ্ণবচরণ বসাকের সম্পাদনায় 'সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়।

০৫২ "১৮৮৪ সালে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথ গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যখন সংসার চালাইবার মনস্থ করিলেন, সেই সময় তিনি গীতগোবিন্দ গ্রন্থ-খানির মুল ও বঙ্গানুবাদ দিয়া মতিলাল বসুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং মতিলাল বসু পরে নিজ প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়. সে পুস্তকখানি বাজারে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।" (মহেন্দ্রনাথ দত্ত—শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড : পৃঃ ১৯০-১৯১)

০৫৩ "জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেনসার নরেন্দ্রনাথ অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেনসারের প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল। তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের "এডুকেশন" পুস্তকখানি বাঙ্গালাভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। (তদেব—২য় খণ্ড : পৃঃ ১৬৩)

সিস্টার ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথায় স্পেনসারের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পত্রালাপের উল্লেখ আছে। (দ্রঃ Reminiscences of Swami Vivekananda, পৃঃ ১৮৫)

০৫৪ টমাস এ কেম্পিসের লাতিন ভাষায় রচিত 'Imitation of Christ' গ্রন্থটি স্বামীজীর খুবই প্রিয় ছিল। ঐ গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ তিনি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ঐ অনুবাদ 'বাণী ও রচনায়' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

০৬ গ্রন্থপঞ্জীসংকলনে স্বামীজীর গ্রন্থসম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়েছে, তা হ'লো :

০৬১ স্বামীজীসম্পর্কিত বইয়ের অল্পতা। স্বামীজীর প্রভাব আমাদের চিন্তায় যতোই পড়ুক না কেন, তাঁর সম্পর্কে আমাদের চিন্তা বা আলোচনা এখনও ছোট

গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত আছে। তাঁর সম্বন্ধে লেখা বইগুলি মূলত দুই শ্রেণীর—তাঁর জীবনী বা তাঁর উপদেশসংকলন। তাঁর উপর যে সব আলোচনা হয়েছে সেগুলি মুখ্যত তাঁর ধর্মজীবন নিয়ে, কিছু বই তাঁর স্বদেশমন্ত্র, দেশপ্রীতির উপর লেখা। শিল্প,সংগীত, চিত্রকলা, শিক্ষা ইত্যাদি সংস্কৃতির নানাদিকে বহু মূল্যবান মন্তব্য স্বামীজী করেছেন। কিন্তু সে সব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখনও হয়নি। আশার কথা যে, স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে তাঁর শিক্ষাচিন্তা, সংগীত, সাহিত্যকৃতি নিয়ে সুধীজন আলোচনা আরম্ভ করেছেন। এতদিনের অভাব এবার দূরীভূত হবে।

স্বামীজী সম্পর্কিত কয়েকটি বই অনেকদিন ধরে আমাদের চিন্তার খোরাক মেটাচ্ছে। বইগুলির একাধিক সংস্করণ হয়েছে। নূতন কিছু লেখা প্রায়ই হয় নি। এর কারণ কি? আমাদের মনে হয় জাতীয় চরিত্রই এর সবচেয়ে বড়ো কারণ। বাংলাদেশের মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনেরই অনেকগুলি জীবনী লেখা হয়েছে, বা তাঁদের জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরাধীন দেশ নিজের শৃঙ্খলমোচনেই সর্বদা ব্যস্ত ছিল। স্বামীজীর বাণী তাই পূর্ণরূপে কেউই দেখেন নি। স্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে কেউ বা দরিদ্রদেবসাধনার মন্ত্র, কেউ বা আত্মত্যাগের বাণী আর কেউ বা দেশপ্রীতির আহ্বান খুঁজে পেয়েছিলেন। শিক্ষা, শিল্প, সংগীত ইত্যাদির সাধনা স্বাধীন দেশেই পূর্ণরূপ পায়। তাই হয়তো স্বামীজী সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা আজও হয় নি।

০৬২ স্বামীজী রচিত গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'লো বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রকাশক দ্বারা স্বামীজীর গ্রন্থপ্রকাশ। একই বই ভারতবর্ষ থেকে ও আটলান্টিকের দুই তীর থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে আবার মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে এবং আমেরিকাতেও বোস্টন, সান ফ্রান্সিসকো, নিউ-ইয়র্ক থেকে একই বই বেরিয়েছে। স্বামীজীর চিন্তা ও বাণী দেশবিদেশে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মাপকাঠি এই একত্র প্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ 'রাজযোগ' নামে ইংরেজী বইটি ধরা যেতে পারে। এই বইটি ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজের বৈজয়ন্তী প্রেস, লণ্ডনের Longmans, Green & Co. ও নিউ ইয়র্কের Weed Parsons থেকে, ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজের Awakened India থেকে Prabuddha Bharata Vedanta Library Series হিসাবে, ১৮৯৯ সালে নিউ ইয়র্কের Baker & Taylor Co. থেকে, ১৯০১এ কলকাতার উদ্বোধন, ১৯০২এ নিউ ইয়র্কের Vedanta Society, ১৯১৫তে আলমোড়া অদ্বৈত আশ্রম থেকে Himalayan Series হিসাবে, ১৯২০এ নিউ ইয়র্কের Brentano's ও Coward-McCann থেকে, ১৯২২এ লণ্ডনের Kegan Paul, ১৯৩৩এ নিউ

ইয়র্কের Ramakrishna Vivekananda Centre ও ১৯৩৬ সালে লণ্ডনের Luzac & Co. থেকে বের হয়েছে। এ ছাড়াও মাদ্রাজের Thompson & Co. ও লণ্ডন থেকে স্বামীজীর শিষ্য E. T. Sturdy-এর সম্পাদনায় বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

০৬৩ স্বামীজীর অধিকাংশ গ্রন্থই মূলত বক্তৃতা বা পত্র। বিখ্যাত বক্তৃতা বা পত্রগুলি অনেক জায়গায় এককভাবে, কখনও বা যুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর অপরিসীম সাফল্যের পর মাদ্রাজের এক মহতী সভায় স্বামীজীকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ দিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে স্বামীজী যে পত্র লিখেছিলেন তা সাধারণের কাছে 'Address to the Hindus of Madras' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বইটি নানা নামে, বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, (৴০) An appeal to Young Bengal-এর সঙ্গে, (৵০) In defence of Hinduism নামে, (৶০) The Universality of Hinduism and the Vedas নামে, (।০) Reply to the Hindus of Madras নামে, (।৴০) Reply of Swami Vivekananda to the Madras address নামে, (।৵০) কলকাতার S. C. Mitra & Co. প্রকাশিত 'Lectures' এর ভেতর এবং (।৶০) Valuable letters and other lectures-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

০৬৪ পাশ্চাত্ত্যে স্বামীজীর যোগপুস্তকগুলি বিশেষত 'রাজযোগ' বইটি এবং এদেশে 'চিকাগো বক্তৃতা', ভারতে প্রদত্ত 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী', সম্ভবত, সবচেয়ে জনপ্রিয় বই। পত্রাবলীর মূল্য অসীম। ভারতের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের কাছে পত্রাবলী 'গীতাস্বরূপ' ছিল। স্বামীজীর বাণী অনেক সময় হাতে লিখে ইস্তাহারের মতো দেশের যুবক ও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিলি করা হতো। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা বক্তৃতায় এর উল্লেখ করেছিলেন :

"As a student in one of the classes, in Matriculation or so, the letters of Sri Vivekananda used to be circulated in manuscript form among us all. The kind of thrill which we enjoyed, the kind of mesmeric touch that those writings gave us etc.…

(২০শে জানুআরি, ১৯৬৩ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা)

০৭ গ্রন্থপঞ্জী সংকলনেও 'পত্রাবলী' বিশেষ মূল্যবান। নিজ বই সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ ঐ বইতে পাওয়া যায়। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

(১) ১৮৯৫ সালের অগস্ট মাসে লেখা (পত্রসংখ্যা ২০১.) :—'আমি এখন

যোগসূত্র ধরিয়াছি এবং এক একটি সূত্র লইয়া উহার সহিত সকল ভাষ্যকারের মত আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্তই লিখিয়া রাখিতেছি এবং এই লেখার কাজ শেষ হইলে উহাই ইংরাজীতে পতঞ্জলির পূর্ণাঙ্গ সটীক অনুবাদ হইবে।' (রাজযোগ সম্বন্ধে)

(২) ১৮৯৫ সালের ৬ই অক্টোবরে লেখা (পত্রসংখ্যা ২১৫):—'আমি মিঃ স্টার্ডির সহিত 'ভক্তি' সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি'।

(৩) ১৮৯৬ সালের ১৭ই মার্চে লেখা (পত্রসংখ্যা ২৫৪):—'রাজযোগ লঙম্যানদের হাতে। বইগুলি ইংলণ্ডে ছাপানোর কথায় এখানকার বন্ধুরা খুব চটে গিয়েছেন ; যেহেতু আইনতঃ আমি সেগুলি তাঁদের দিয়ে দিয়েছি। এখন কি করা যায়—বুঝতে পারছি না।'

(৪) ১৮৯৬ সালের ২৭শে অক্টোবরে লেখা (পত্রসংখ্যা ৩০১):—'আমার কর্মযোগখানি যে প্রকাশ করনি, এটা একটা লজ্জার কথা—অথচ আমার পরামর্শ না নিয়ে বইখানির এক অধ্যায় ছেপে দিয়ে আমাকে বেকায়দায় ফেলেছ।' (Karma-yoga : a lecture সম্বন্ধে)।

০৭১ ৫০১-সংখ্যক পত্রে স্বামীজী লিখছেন যে, জুল বোয়া (Jules Bois) নামে এক বিখ্যাত ফরাসী লেখক স্বামীজীর অনেকগুলি গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু বহু তল্লাশ করেও জুল বোয়া-অনূদিত কোনো বই আমরা পাই নি। অপর দিকে, Jean Herbert স্বামীজীর বহু গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, আর করেছেন Lizelle Reymond। রোমাঁ রোলাঁ একটি চিঠিতে শ্রীহার্বার্টকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে ফরাসী চিত্তের সংযোগ স্থাপনের জন্য।

"I feel happy that through your good care the message of Vivekananda penetrates the French people directly. It has a great significance to them, in this age of abundant though tragic crisis. ··· On reading again 'The Real and the Apparent Man' I admired how the intuition of the Indian prophet had united, without knowing it, with the virile reason of the great interpreters of Communism. Marx and Lenin could claim the great words of Vivekananda : 'He only lives who lives in all.'

(December, 1935).

০৮ বিবেকানন্দসাহিত্য অনুরাগী পাঠকদের একথা জানা আছে যে, কেবল একজনের জন্য আমাদের পক্ষে স্বামীজীর বই পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি হলেন

শ্রী জে. জে. গুডউইন। স্বামীজী বলতেন 'Faithful Goodwin', 'আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ'। "আমাদের সব বই-এর জন্য আমরা তার কাছে ঋণী। আমার বক্তৃতাগুলিকে সে সাঙ্কেতিক প্রণালীতে লিখে রেখেছিল, তাই থেকে বই হয়েছে।"
(পত্র, ৩০১)

০৮১ যে সব প্রকাশক প্রথমদিকে স্বামীজীর বই প্রকাশ করেছেন তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কলকাতার হরমোহন মিত্র (এস সি মিত্র অ্যাণ্ড কোং), মাদ্রাজের আলসিঙ্গা পেরুমল, টমসন অ্যাণ্ড কোম্পানি—পরের দিকে উদ্বোধন, অদ্বৈত আশ্রম, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-এর প্রচেষ্টায় স্বামীজীর বাণী আজ সর্বত্রপ্রচারিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, নিবেদিতা ইত্যাদি যাঁদের প্রচেষ্টায় স্বামীজীর বাণী বহুল প্রচারিত হয়েছে তাঁদের একটি সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ তালিকা হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম ও বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন সংকলিত স্বামীজীর জন্মশতবর্ষস্মরণে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে পাওয়া যাবে।

০৯ স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী এদেশে এখনও পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। আমাদের থেকে কুশলতর ও অভিজ্ঞতর ব্যক্তির কাছে দেশ নিশ্চয়ই দাবি করতে পারে স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী। আমরা এ বিশ্বাস রেখেছিলাম যে, স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে কেউ-না-কেউ স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করতে এগিয়ে আসবেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার লাইব্রেরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের অনেক আশা ছিল। সে আশা নিরাশায় পর্যবসিত হওয়ায় আমরা সন্ত্রস্তচিত্তে এই গ্রন্থপঞ্জী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলাম। বহু ভ্রান্তি বিচ্যুতি আছে, এ কথা সর্বদাই বলব। সর্বপ্রকার উপদেশ, মতামত সাদরে গৃহীত হবে। যে-সব বই এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, সেই সব বইয়ের খোঁজ যাঁরা দিতে পারবেন তাঁদের কাছে আমরা অনুগৃহীত থাকব।

০৯১ লজ্জার ও আনন্দের কথা যে, ফরাসী লেখক Jean Herbert স্বামীজীর একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রায় পঁচিশ বছর আগে সংকলন করেছিলেন। গ্রন্থপঞ্জীটি অবশ্য পাশ্চাত্যভাষায় রচিত বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবু শ্রীহার্বার্টের নিষ্ঠাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সেই গ্রন্থপঞ্জীটি বর্তমানে দুর্লভ, ঐটি আমাদের দেখতে দেওয়ায় শ্রীহরিমাধুরী বিশ্বাসকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

০৯২ এই গ্রন্থপঞ্জীর পাণ্ডুলিপি তৈরি করার কাজে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীনিমাই চক্রবর্তীর নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

০৯৩ স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়ন্তীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে এই বিবেকানন্দ-গ্রন্থপঞ্জী নিবেদিত হলো।

ক ॥ অভারতীয় ভাষা

English

স্বামীজী-রচিত বই

The complete works of the Swami Vivekananda, comprising all his lectures, addresses and discourses delivered in Europe, America and India ; all his writings in prose and poetry, together with tr. of those written in Bengali and Sanskrit ; reports of his interviews and his replies to the various addresses of welcome ; his sayings and epistles,—private and public—original and translated : with an index ; carefully revised and edited. Mayavati memorial ed. Almora, Advaita Ashrama, 1924-32. 7 v. 22cm.

—London, Luzac, 1947. £ 5. 5s.

—Boston, Vedanta Centre ; San Francisco, Vedanta Society of South California.

—Index to the complete works of Swami Vivekananda. Almora, Advaita Ashrama, 1931. 85p. 21.5cm.

—In 8 volumes. Calcutta, Advaita Ashrama, 1947-1951. 60.00.

—Vedanta Society of South California, 1955. $ 29.50.

1. Address at the Parliament of Religions···. 3rd ed. Calcutta, 1907.
2. Addresses and replies. Calcutta, Udbodhan. 3.00.
3. Addresses on the Vedanta philosophy. 3 v. London, Luzac, 1896. 128p. 18cm.

   Vol. 1—Karma Yoga or Realization of the Divine through works performed without attachment.

Vol. 2—Bhakti Yoga or Realization of the Divine through Love.

Vol. 3—(i) The ideal of a Universal Religion. (ii) The Cosmos and Microcosm.

4, Advaita Vedanta : the scientific religion. Almora, Advaita Ashrama, 1952. 73p. 15.5cm. 0.62.

5. Altar flowers. Almora, Advaita Ashrama, 1934.

Contents.—A hymn to Shiva.—A hymn to the Divine mother.—A hymn to Sri Ramakrishna.—A hymn to Sri Ramakrishna.

Translations.

6. (An) Appeal to young Bengal, with the reply to the address of the Hindus of Madras, with analysis and notes : [a] lecture···2nd ed. Calcutta, S. C. Mitra & Co., 1910. 51p. 17cm.

7. Atman. Boston, Vedanta Centre ; San Francisco, Vedanta Society. $ 0.20.

—Madras, [1897]. 0.12. (The Prabuddha Bharata Vedanta Library series).

—Almora, Advaita Ashrama. 20p. 0.12. (Himalayan series, 5).

—Calcutta, S. C. Mitra & Co. 0.12.

8. Be and make. 0.06.

9. Bhakti, or Devotion. Almora, Advaita Ashrama, 1947. 30p. 15.5cm. 0.43.

—Madras, [1897]. 0.12. (The Prabuddha Bharata Vedanta Library series).

—Calcutta, S. C. Mitra & Co. 0.12.

10. Bhakti-Yoga. 2nd ed. Calcutta, Udbodhan, 1909. viii, 168p. 17cm. 0.62.

—Calcutta, S. C. Mitra & Co. 1.00.

—Boston, Vedanta Centre. $ 0. 20.

—Madras, Thompson & Co., 1896. 75p. 1.00. (Brahmavadin Series, 3).

11. Bondage and freedom. Almora, Advaita Ashrama. 0.62
12. Cast, culture and socialism. Almora, Advaita Ashrama, 1947. ix, 99, 3p. 16cm. 1.25.
13. Chicago address. 4th ed. Calcutta, Udbodhan, 1910.xv, 79p. 15.5cm. 0. 37.

    Contents.—A brief note of the World's Parliament of Religions with excerpts from the authorised history of its proceedings by the Rev. John Henry. Barrows (p. 1-15). —Barrows' speeches on Hinduism (p. 17-58).—Short addresses at the Parliament (p. 61-79).—Appendix contains the programs of Swamiji's speeches. Prefatory note signed by N[ivedita].
14. Chicago addresses. 10th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1952. 46p. 13.5cm. 0. 50,

    Contents—Response to welcome at the World's Parliament of Religions, Chicago. (11thSept. 1893).—Paper on Hinduism (19th Sept. 1893).—Religion not the crying need of India (20th Sept. 1893).—Buddhism, fulfilment of Hinduism (26th Sept. 1893).—Addresses at the final session (27th Sept. 1893).
15. Christ, the messenger. 2nd ed. Calcutta, Udbodhan, 1943. 28p. 18cm. 0.37.

    —Boston, Vedanta Centre. $ 0.20.
16. Cosmos. Boston, Vedanta Centre. $ 0.20.
17. Discourses on Jnana-Yoga and other lectures. Almora, Advaita Ashrama, 1935. 98p. 0.62.
18. (The) East and the West. 4th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1949. 119p. 17.5cm. 1.50.

English version of 'Prachya o Paschatya'.
—Madras, [1909]. 108p. 1.00.

19. Education ; comp. from the speeches and writings of Swami Vivekananda ; comp. and ed. by T. S. Avinashilingam. 5th ed. Madras, Ramakrishna Mission Vidyalaya, 1958. 96p. 18cm. 1.00.

20. Education, nationalism, spirituality. Howrah, Belur Math, 1931. 7p. 17.5cm.

21. Eight lectures on Karma Yoga (the secret of work, delivered in New York, Winter 1895-6). New York, Brentano's, 1896. 54p. 22. 5cm.
Published under the auspices of the Vedanta Society.
(*Vide* Entries no. 39, 109).

22, Epistles of Swami Vivekananda. Almora, Advaita Ashrama.
1st series. 4th ed. 1925. 96p. 17. 5cm. 0.62.
2nd series. 2nd ed. 1920. 105p. 17. 5cm. 0.75.
3rd series. 1916. 144p.
4th series. 1917. 144p.
5th series. 1918. 81p. 0.37.
6th series. 1920. 81p. 0.50.
(Himalayan series 13, 21, 32, 35, 39. 42)

23. Essentials of Hinduism. 4th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1947. 66p. 16.5cm. 0.75.

24. Extracts from the Swami Vivekananda's sayings. Mysore, Ramakrishna Ashrama, 1925. 8p.

25. Jnana Yoga : or Realisation through knowledge. Madras. 350p. 2.50.
—Calcutta, S. C. Mitra & Co. 2.50.
(*Vide* Entries no. 37, 45, 110).

26. The great lecture on Hinduism at the World's Fair of Religions at Chicago. Calcutta, Udbodhan, 1930. 38p. 0.50.

With preface by Sister Nivedita.

27. Hail ! Independent India ! 2nd ed. Almora, Advaita Ashrama, 1949. 12p. 15.5cm. 0.12.

28. Hinduism. Madras, Ramakrishna Math, 1928. 114p. 16.5cm. 0.62.

    The running title is "Hinduism—a Universal religion."
    Papers read at the Parliament of Religions held at Chicago in 1893.

    Contents.—Hinduism—a Universal religion.—Hinduism—of the Vedanta.—Hinduism—Its common basis.—Hinduism—Its philosophy.—Hinduism—Its four yogas.

29. Hinduism. Madras, 1897. 0.31. (The Prabuddha Bharata Vedanta Library series).

    Contents.—The paper on Hinduism.—Reply to the Madras Address.—Common bases of Hinduism (A Lahore lecture).

30. Ideal of a universal religion. Madras, Thompson & Co., [1896]. 28p. 0.16. (Brahmavadin series, 4).

    —Boston, Vedanta Centre. $ 0. 20.

31. In defence of Hinduism. Almora, Advaita Ashrama, 1938. ii, 35p. 0.25.

    Reply to the address given by the Hindus of Madras, 1893.

32. India. Almora, Advaita Ashrama, 1947. iii, 120p. 15. 5cm. 1.75.

33. The Indian lectures of Swami Vivekananda ; being a record of his addresses in India after his mission to the west. Calcutta, Udbodhan, 1922. vi, 431p. 18cm. 2. 50.

    (*Vide* Entries no. 46—50)

34. Inspired talks. 4th ed. Madras, Ramakrishna Math, 1938. 282p. 16cm. 1. 75.

First published in 1908.

Taken down by his disciple Miss S. E. Waldo.

—Boston, Vedanta Centre. $ 1. 50.

35. Inspired talks ; my master and other writings [conversation taken down by his discipie S. E. Waldo]. Rev. ed. New York, Ramakrishna Vivekananda Centre, 1958. 259p. $ 2.50.

36. Is Vedanta the future religion ? Almora, Advaita Ashrama, 1951. 35p. 15.5cm. 0.50.

Lecture "delivered in San Francisco on April 8, 1900."

37. Jnana-Yoga. 9th impression. Calcutta, Udbodhan, 1955. v, 421p. 15.5cm. 3.00.

First published in 1902.

—Boston, Vedanta Centre. $ 1. 50.

—New York, Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1933. x, 423p. 15cm.

38. Karma-Yoga, a lecture. Madras, Thompson & Co., [1896]. 20p. 0. 06. (Brahmavadin series, 1).

39. Karma-Yoga ; a course of eight lectures delivered in New York. Calcutta, Udbodhan, 1901. 168p. 17cm. 1.75.

—Madras. Thompson & Co., [1897]. 105p. 1.00. (Brahmavadin series, 5).

—Boston, Vedanta Centre. $ 1. 50.

—Madras. 100p. 0.75.

—Calcutta, S. C. Mitra & Co. 1.00.

40. Karma-Yoga and Bhakti-Yoga. 6th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1937. 1.50.

Karma-Yoga. 5th ed. i, 122p.

Bhakti-Yoga. 6th ed. ii, 106p.

Bound together under the above title.

—Deluxe Pocket ed. New York, Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1933. vi, 106p. 15cm.

41. Lecture at the Floral Hall, Colombo and the description of his reception in India. Calcutta, S. C. Mitra & Co. 0.06.

42. Lecture at the Parliament of Religions, Chicago with an analysis and a Bengali translation. Calcutta, S. C. Mitra & Co. 180p. 0.62.

43. Lecture on Hinduism. Calcutta, S. C. Mitra & Co., [189-]. 0.06.

44. Lectures. Calcutta, S. C. Mitra & Co. 1.00.
Contents.—Lectures at the Parliament of Religions.—at Hertford & at Brooklyn.—at Brooklyn.—Is the soul immortal.—Reincarnation.—The address of the Raja of Khetri & Swami's reply to it.—Swamiji's reply to the address of the Hindus of Madras.—The song of the sannyasin.

45. Lectures on Gnana-Yoga. Madras, 1897. 2.50. (The Prabuddha Bharata Vedanta Library series)

46. [Lectures] From Colombo to Almora: Being a record of the Swami Vivekananda's return to India after his mission to the West, including reports of seventeen lectures. Madras, The Vyjayanti Press, 1897. xi, 276p. Prefatory note signed: F. Henrietta Muller.

47. [Lectures from] Colombo to Almora: A complete collection of all his lectures delivered in India. Rev. ed. Preface by F. Henrietta Muller. 346p. 17.5cm. 1.50.

48. From Colombo to Almora: Seventeen lectures. . . . A record of his tour in India after his arrival at Colombo, including some of the addresses read and the replies given to them. Madras, Thompson & Co., [1897]. 300(?)p. 1.25.

49. [Lectures] From Colombo to Almora, being a record of Swami Vivekananda's return to India after his mission to the West; includes reports of his lectures and replies to addresses. (The only authorized, second and enlarged ed.) Madras, Brahmavadin Press, 1904. xiii, 333p. 2.50.

50. Lectures from Colombo to Almora. 2nd ed. Almora, Advaita Ashrama, 1918. 359p. 21cm. 3.75. (Himalayan series, 16). First published in 1908.

51. Letters of Swami Vivekananda. 4th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1948. vii, 420p. 18cm. 5.00.
First published in 1940.

52. Life after death. Almora, Advaita Ashrama, 1947. 34p. 15cm. 0.50.
Contents.—Is the soul immortal ?—Reincarnation.

53. Madras lectures, being the full text of the six lectures delivered at Madras and Kumbakonam. Madras, Thompson & Co., 1897. 113p. 1.00. (*Vide* Entry no. 88).

53a. The mission of our master. Madras, G. A. Natesan & Co., 1921 (?).

54. Modern India. 5th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1946. ii, 75p. 16cm. 0.62.
English version of 'Bartaman Bharat'.
First published in 1923.

55. My life and mission. 4th impression. Almora, Advaita Ashrama, 1957. ii, 35p. 18cm. 0.87.
Lecture delivered at the Shakespeare Club of Pasadena, California, on Jan. 27, 1900.

56. My master : with an appended extract from the 'Theistic Quarterly Review' ; Almora, Advaita Ashrama, 1903. 50p. 17.5cm. 0.50. (Himalayan series, 1).

—Madras. 90p. 0.08.

—Calcutta, Sarada Press, 1907. 61p. 18cm.

—2nd ed. pub. in 1911 includes (i) Paramahamsa Ramakrishna, by P. C. Mozumder, (ii) Christ, the messenger, (iii) Addresses at the Parliament of Religions.

—Boston, Vedanta Centre. $ 1.00.

57. Nature of the soul and its goal. Boston, Vedanta Centre. $ 0.20.

58. On India and her problems, compiled by Swami Nirvedananda. 4th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1946. vii, 128p. 18cm. 1.50.
First published in 1925.

59. On religion and philosophy, pt. 1. Calcutta, Ramakrishna Mission Students Home, 1926. xiii, 127p. 17.5cm. 0.75.

60. Other lectures and letters. Calcutta, Udbodhan: 1.50.

60a. Our motherland. Dakshineswar, Sarada Math, 1963. iv, 44p. 12cm. 0.40.

61. Our women, [compiled by Swami Ranganathananda]. 2nd ed. Almora, Advaita Ashrama, 1946. vi, 59p. 15.5cm. 0.62.
First published in 1945 by Ramakrishna Math, Karachi.

62. Paper on Hinduism as a religion, read before the Parliament of Religions in Chicago, 1893. Madras, 1894. 12cm.

63. Pavhari Baba. Calcutta, Udbodhan, 1907. 30p. 18cm. 0.19.

64. Poems. Almora, Advaita Ashrama, 1947. x, 67p. 17cm. 1.37.
Section 1 : Poems written in English.
Section 2 : English versions of the poems composed in Bengali, Sanskrit and Hindi.

65. (The) Powers of the mind. Almora, Advaita Ashrama, 1947. 26p. 16cm. 0.43.

Lecture delivered at Los Angeles, California, Jan. 8, 1900.

66. Practical Vedanta. 2nd ed. London, Luzac, 1930. 85p. 18cm. 2s.
—6th impression. Almora, Advaita Ashrama, 1958. 116p. 16cm. 1.25.
Four lectures delivered in London, Nov. 10-18, 1896.

67. Principles of Nationalism. Howrah, Belur Math, 1928. 15p.

68. Raja-Yoga. Calcutta, Udbodhan, 1901. ii, 159p. 21cm. 2.25. (*Vide* Entries no. 69, 70, 107, 117).

69. Rajayoga ; or, conquering the internal nature : together with Patanjali's Yoga aphorisms (Sanskrit text with English translation) and appendix ; references to yoga from the Svetasvatara upanishad (Sanskrit text with English translation). London, Luzac, 1937. 303p. 16.5cm. 3s. 6d.
—11th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1959. 305p. 15.5cm.

70. Raja Yoga : or the royal science of communion with the Supreme Being, with a free translation of Patanjali's Yoga Aphorisms with a running commentary thereon. Madras. 200p. 1.00.
—Madras, [Awakened India], 1898.
—London, Kegan Paul, 1922. xiii, 269p.
—New York, Weed Parsons, 1897. 234p.

71. Raja Yoga : Six lessons: Gift ed. New York, Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1913. 31p. 15cm.
—Calcutta, Udbodhan, 1928. 36p. 17.5cm. 0.50.

72. The real and the apparent man. Madras, Thompson & Co., 1896. 28p. 0.16. (Brahmavadin series, 6).
—Boston, Vedanta Centre. $ 0.20.

73. Realisation and its methods. Calcutta, Udbodhan, 1908. 165p. 17cm. 0.75.
    —Boston, Vedanta Centre. $ 0.60.
74. Religion, its methods and purpose. Boston, Vedanta Centre. $0.20.
75. Religion of love. 6th ed. Calcutta, Udbodhan, 1942. ii, 110p. 18cm. 0.79.
    First published in 1907.
    —Boston, Vedanta Centre. $ 0.60.

75a (The) Reply of Swami Vivekananda to the Madras Address. Madras, G. Ramaswamy Chetty, 1894. 27p. 0.09.

76. Reply to the address of the Hindus of Madras. Calcutta, S. C. Mitra & Co., [189-]. 0.06.
77. Reply to the address of the Maharaja of Khetri. Calcutta, S. C. Mitra & Co., [189-]. 0.06.
78. Reply to the Madras address. With an appeal to young Bengal. Calcutta, Ayurveda Printing Works [printers], 1895. 36p. 18cm.
    —Madras, 1897. 0. 09.
    —Almora, Advaita Ashrama, 1923. 23p. 21.5cm. (Himalayan series, 38).
79. Rousing call to Hindu nation, comp. by Eknath Ranade, Calcutta, Swastik Prakashan, 1963. 168p. 21.5cm. 2.00.
80. Sadhanas or preparation for higher life. 2nd ed. Almora, Advaita Ashrama, 1952. 13p. 15cm. 0.31.
    First published in 1947.
81. (The) Sages of India, lecture etc. Calcutta, S. C. Mitra & Co., 1905. 18p. 20.5cm. 0.03.
82. Salvation and service. Almora. Advaita Ashrama, 1949. ii, 81p. 19.5cm. 1.00.

83. Sankhya and Vedanta. Almora, Advaita Ashrama, 1904. 114p. 0.75. (Himalayan series, 4).
84. Science and philosophy of religion (a comparative study of Sankhya, Vedanta and other systems of thoughts). 3rd ed, Calcutta, Udbodhan, 1922. 127p. 18cm. 0. 75.
    First published in 1908.
    —Boston, Vedanta Centre. $ 0.60.
85. Selections from Swami Vivekananda, Almora, Advaita Ashrama, 1944. x, 612p. 17cm. 10.00.
86. Sight beyond (sayings of Swami Vivekananda). Dacca, Purnachandra Chakraborty, 1924. vi, 13p.
87. Six lectures (with reports of Ramakrishna Mission). Calcutta, S. C. Mitra & Co. 198p. 0. 50.
    Contents.—The address of the Hindus of Calcutta & Swamiji's reply to it.—Vedanta. (Calcutta)—Sri Ramakrishna Paramahamsa Deva (New York).—Maya (London).—Ideal of a universal religion (New York)—Lecture at Floral Hall (Colombo).—The description of his reception in India.—Ramakrishna Mission (Report of a Hindu organization).—Ramakrishna Mission famine relief works, 1897 (a short report).
88. Six Madras lectures. Madras. 0.50. (The Prabuddha Bharata Vedanta Library series).
89. Speeches and writings. 7th ed. Madras, G. Natesan & Co. 3.00.
90. (A) Study of religion. Calcutta, Udbodhan, 1908. 214p. 17cm. 1.00.
    —Boston, Vedanta Centre. $ 0.60.
91. Swami Vivekananda : a collection of his speeches and writings. Madras, 1905.

92. Swami Vivekananda's visit to Ceylon. Colombo, V. Iyampulli Chettiyar, 1897. 0.50.
    Full reports of Vivekananda's first two lectures delivered in the Island, copies of addresses presented to him and extracts from English and American papers.
93. Talks with Swami Vivekananda. 2nd ed. Almora, Advaita Ashrama, 1939. xvi, 397p. 15.5cm. 1.75.
    English version of 'Swamijir sahit kathopakathan'.
94. Teachings of Swami Vivekananda. 3rd rev. and enl. ed. Almora, Advaita Ashrama, 1959. vi, 263p. 15.5cm. 3.00.
    First published in 1948.
95. Thoughts of power. 5th ed. Almora, Advaita Ashrama, 1952. 59p. 13.5cm. 0.50.
    First published in 1946.
96. Thoughts on Gita. 4th enl. ed. Almora, Advaita Ashrama. 1958. 90p. 16cm. 0.90.
    A collection of speeches delivered in San Francisco in 1900.
97. Thoughts on Vedanta. 2nd ed. Calcutta, Udbodhan, 1918. 76p. 17.5cm. 0.62.
    First published in 1908.
    A collection of lectures on the Vedanta philosophy delivered in Europe and America.
    —Boston, Vedanta Centre. $ 0.60.
98. To the youth of India. Almora, Advaita Ashrama, 1954. 168p. 18cm. 1.75.
99. The universality of Hinduism and the Vedas : Being the reply of Swami Vivekananda to the address of the Hindus of Madras. Calcutta, Kohinoor Press. 37p. 17.5cm.
100. Thus spake Swami Vivekananda. Calcutta. Udbodhan. 0.37.

101. 2 lectures delivered at Brooklyn and Hertford. Calcutta, S. C. Mitra & Co., [189-]. 0.06.

102. Two lectures on Karma-Yoga. Almora, Advaita Ashrama. 0.12.

103. Valuable conversations with Swami Vivekananda. Calcutta, Udbodhan, 1902. 116p. 1.00.

104. Valuable letters and other lectures. Calcutta, Udbodhan, 1902. 112p. 20.5cm. 2.00.
Chap. 1—Letters.
(i) Reply to the Madras Address. (ii) Reply to the Khetri Address. (iii) Letter on Max Muller. (iv) Letter on Paul Deussen.
Chap. 2—Lectures.
(i) The powers of the mind. (ii) Christ, the Messenger. (iii) Influence of spiritual thoughts of India in England. (iv) Bhakti. (v) Religion of love. (vi) Notes.

105. Vedanta. Calcutta, S. C. Mitra & Co. 0.25.
Lecture delivered at Lahore.

106. Vedanta philosophy with an introduction by Prof. C. C. Everett. Madras, 1906. 44p. 17.5cm. 0.37.
(*Vide* Entry no. 108).

107. Vedanta philosophy ; lectures by the Swami Vivekananda on Raja yoga and other subjects, also Patanjali's yoga aphorisms, with commentary and glossary of Sanskrit terms. New ed. with enl. glossary. New York, Baker & Taylor Co., 1899. xv, 381p. 19cm.
—Vedanta Society, 1902. $1.50.
—New ed. New York, Brentano's, 1920. xiv, 269p. 19cm.
—New Nork, Coward-McCann, 1920. xiv, 269p. $ 2.50.
—New York, Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1933. $1 50.

108. Vedanta philosophy at the Harvard University—a lecture and discussion. Calcutta, Udbodhan, 1929. 81p. 18.5cm. 0.37.

109. Vedanta philosophy; eight lectures by the Swami Vivekananda on Karma yoga (the secret of work). Delivered under the auspices of the Vedanta Society. 2nd ed. New York, Baker and Taylor Co., 1901. 171p. 19.5cm.

110. Vedanta philosophy; lectures by the Swami Vivekananda on Jnana Yoga. New York, Vedanta Society, 1902. 357p. 19.5cm.

'The present volume consists chiefly of lectures which were delivered in London, England'—*Preface.*

111. What does Swami Vivekananda say? Mysore, Ramakrishna Ashrama, 1934. 9p.

112. What religion is in the words of Swami Vivekananda, ed. by John Yale. London, Phoenix, 1963. 30s.

Introd. by Christopher Isherwood.

113. Wisdom and devotion. Boston, Vedanta Centre.

114. Women of India. 4th ed. Madras, Ramakrishna Math, 1958. 40p. 12cm. 0.25.

First published in 1925.

A speech delivered at the Shakespeare Club House, in Pasadena, California. on Jan. 18, 1900.

—San Francisco, Vedanta Society, 1925. 30p. 18cm. $ 0.30.

115. Work and its secret. 2nd ed. Almora, Advaita Ashrama, 1951. 16p. 15.5cm. 0.37.

First published in 1947.

A lecture delivered at Los Angeles, Jan. 4, 1900.

116. World's fair address. Boston, Vedanta Centre. $ 0.20.

117. Yoga philosophy ; lectures delivered in New York, winter of 1895-1896, on Rajayoga or conquering the internal nature ; also Patanjali's yoga aphorisms, with commentaries. New ed. London, New York [etc.], Longmans, Green & Co., 1897. 234p. 19.5cm.
—Madras, Vyjayanti Press, 1897. 194p.

118. (The) Yogas and other works : including the Chicago addresses, Jnana-yoga, Bhakti-yoga, Karma-yoga, Raja-yoga, Inspired talks, and Lectures, Poems, and Letters ; Chosen and with a biography by Swami Nikhilananda ; Rev. ed. New York, Ramakrishna-Vivekananda Centre, 1953. xii, 978p. 23.5cm. $ 10.00.

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

English :

1. Abhedananda, *Swami*. Vivekananda and his work. 3rd ed. Calcutta, Ramakrishna Vedanta Math, 1950. 58p. 15.5cm. 1.00.
   First published in 1924.
   "This was the first appreciation of and homage to the great Swami by his colleague in the foreign land after he had left his mortal coil"—*Preface*
2. Athalye, D. V. An exposition of Swami Vivekananda's conception of Vedantism. Bombay, Taraporevala, 1932. 280p.
   First published in 1929.
3. —Swami Vivekananda : a study. Poona, Swadeshi Publishing Co., 1930. 280p. 4.00.
4. Avinasalingam, Tiruppur Subrahmanya Chettiyar. The school and the centenary. Coimbatore, Ramakrishna

Mission Vidyalaya. vi, 74p. 22.5cm. 3.00. (Swami Vivekananda centenary series, 2).

5. Avyaktananda, *Swami*. Vivekananda : the National builder. Patna, Ramakrishna Ashrama, 1929. iv, 139p. 17.5cm. 1.00.

6. Banhatti, G. S. Quintessence of Vivekananda. (*In press*).

6a. Bhattacharya, Bejoychandra. Karl Marx and Vivekananda. Calcutta, the author, 1953. xvi, 106p. 18cm. 1.50.

7. Burke, Marie Louise. Swami Vivekananda in America ; New discoveries. Calcutta, Advaita Ashrama, 1958. xx, 639p. 24. 5cm. 20.00.

—San Francisco, Vedanta Society of South California, 1958. $ 6.75.

8. Chakravorty, Tarinisankar, *ed.* Patriot-saint Vivekananda. Allahabad, Ramakrishna Mission Sevashrama, 1963. vi, 160p. 21. 5cm. 1.00.

9. Chaudhuri, Sanjib. Vision of Vivekananda. Calcutta, the author, 1962. viii, 62p. 21cm. 2.00.

10. Das, Trilochan. The social philosophy of Swami Vivekananda. . .with a foreword by Benoykumar Sarkar. Calcutta, Bharat Sahitya Bhawan, 1949. v,40p. 17.5cm. 1.00.

11. Datta, Bhupendranath. Swami Vivekananda, patriot-prophet, a study. Calcutta, Nababharat Publishers, 1954. xv, 428p. 20.5cm. 10.00.

12. —Swami Vivekananda : the socialist. Khulna, Swaraj Ashrama, 1928. 59p. 0.50.

13. Desai, Ramprasad K. Life of Swami Vivekananda. Baroda, 1906. 267p.

14. Ganguly, Manomohan. The Swami Vivekananda : a study. Calcutta, Sarada Press, 1907. iv, 65p. 17.5cm. 0.50.

15. Gupta, Nagendranath. Ramakrishna-Vivekananda. Bombay, Ramakrishna Math, 1933.

16. Jagadiswarananda, *Swami.* Swami Vivekananda and modern India. Calcutta, Ramakrishna Vedanta Math. 65p. 0.75.

17. Kasturi, N. Swami Vivekananda, the patriot monk of modern India. Mysore, Ramakrishna Ashrama, 1926. 37p. 0.19.

18. Last days of Swami Vivekananda, by his Eastern and Western disciples. Almora, Advaita Ashrama, 1927. 96p. 1.00.

19. (The) Life of Swami Vivekananda, by his Eastern and Western disciples. Almora, Advaita Ashrama, 1912. First published in 4 volumes, afterwards in 2 volumes. Now available in one volume.

20. Majumder, B. Vivekananda, the informer of Maxmuller.

21. Malcolm-Smith, E. F. Vivekananda. Trichur, V. Sundara Iyer & Sons, 1934. 150p. 0.87.

22. Mitra, Kamakhyanath. Swami Vivekananda, the great world teacher and prophet of new India. Calcutta, Vivekananda Society, 1913. iv, 59p. 18cm. 0.37.

23. Murdoch, John. Swami Vivekananda on Hinduism; an examination of his address at the Chicago Parliament of religions. Madras, Christian Literature Society, 1895. viii, 88p. 20.5cm.

24. Natesan, M. S. Swami Vivekananda: a sketch. Srirangam, Sri Vanivilas Press, 1913. xvi, 48p. 17cm.

25. Nehru, Jawaharlal. Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. Almora, Advaita Ashrama, 1949. i, 15p. 15.5cm. 0.37.
Speech delivered on 20th March, 1949 at the Ramakrishna

Mission, New Delhi, on the occasion of the 114th birthday anniversary of Sri Ramakrishna.

26. Nikhilananda, *Swami*. Vivekananda : a biography. New York, Ramakrishna-Vivekananda Center, 1953. viii, 216p. 23.5cm. $ 3.50.

27. Nivedita, *Sister*. (The) Master as I saw him, being pages from the life of the Swami Vivekananda. Calcutta, Udbodhan, 1910. ii, 514p. 17cm.

28. —Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda···, ed. by Swami Saradananda. Calcutta, Udbodhan, 1913. vii, 166p. 18. 5cm. 1.00.

29. Phillips, James E. Vedanta philosophy : an examination of Vivekananda's Karma yoga. London, Trades' Union Labour [printers], 1897. 16p. 17cm.

30. Ramaswami Sastri, K. S. The message of Swami Vivekananda to the modern world. Madras, Ramakrishna Math, 1928. 50p.

31. Reminiscences of Swami Vivekananda, by his Eastern and Western admirers. Calcutta, Advaita Ashrama, 1961. viii, 404p. 18cm. 7.50.

32. Rolland, Romain. The life of Vivekananda and the universal gospel···tr. from French by E. F. Malcolm-Smith···.Almora, Advaita Ashrama, 1947. 422p. 18.5cm.
English version of 'La Vie de Vivekananda ou l'Evangile Universal'.
First published in 1930.
—San Francisco, Vedanta Society of South California, 1953. $ 2.50.

33. —Prophets of the new India ; tr. from French by E. F. Malcolm-Smith. London, Cassell, 1930. xxi, 548p. 20.5cm. 21s.

Contents : Book 1—Ramakrishna.—Book 2—Vivekananda. —Book 2. Pt. I—The Life of Vivekananda.—Book 2 Pt. II—The Universal gospel of Vivekananda.—Book 2 Pt. III—The Ramakrishna Math and Mission, the awakening of India after Vivekananda etc.

34. Sadasivananda, *Swami*. Swami Vivekananda, my master. New Delhi, the author, [1957]. 88p. 0.37.
English version of the original Bengali title 'Amar Gurudeb Swami Vivekananda.'

35. Sarkar, Benoykumar. The might of man in the social philosophy of Ramakrishna and Vivekananda. Madras, Ramakrishna Math, 1936. 28p. 21cm. 0.12.

36. Sarma, D. S. The master and the disciple. Madras, Ramakrishna Math, 1948. 155p. 2.00.

37. A short account of the life and teachings of the Swami Vivekananda. Dacca, Ramakrishna Mission, 1904. viii, 88p. 16.5cm.

38. A short life of Swami Vivekananda. Almora, Advaita Ashrama, 1940. vi, 118p. 16cm. 0.62.

39. Swami Vivekananda : a sketch of his life and teachings. Madras, G. A. Natesan & Co., 1921. 40p. 0.25.

40. Swami Vivekananda, disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa at the Parliament of Religions. Madras, Lawrence Asylum [printers], 1894. 43p. 18cm.

41. Swami Vivekananda : Disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa Deva at the Parliament of Religions, Chicago, America. Lectures on Hinduism. With Bengali tr. and a portrait of Swami. Calcutta. Gurudas Chattopadhyay. 117+40p. 18cm.

42. Swami Vivekananda, disciple of the Lord Ramakrishna Paramhansa Dev, at the Parliament of Religions, Chicago.

Calcutta, Nababibhakar Press, 1894. Various pagings. 18cm.

43. Swami Vivekananda in England. Calcutta, S. C. Mitra & Co.
[1st fascicule]. In England 1895. 16p.
[2nd fascicule]. In England 1896. 24p.
(Swami Vivekananda series)

44. Swamiji and social ideals. Howrah, Ramakrishna Vivekananda Prachar, 1933. 13p. [gratis].

✓45. Virajananda, *Swami*. Life of Swami Vivekananda. Almora, Advaita Ashrama, 1914. 456p. 17.5cm. 3.25.

46. Vyasa Rao, K. The Master and the Disciple. Madras, V. R. Sastrula, 1925. 58p.

ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা

স্বামীজী-রচিত বই

Dennish :

Karma-Yoga.

Dutch :

1. Inana-Yoga. 2. Karma-Yoga en Bhakti-Yoga. 3. Raja-Yoga. 4. De Werkelijke en de Schijnbare Mensch.

Finnish :

1. Mestarini (My Master). 2. Toiminann Tie Taydellisyyteen (Karma-Yoga).

French :

1. Au coeur des choses. 2. Bhakti-Yoga. 3. Bhakti-Yoga et Karma-Yoga. 4. Le Calice. 5. Ce que l'Inde pent donner au monde. 6. Le chant du Sannyasin. 7. Commentaires sur les Aphorismes de Patanjali. 8. Conferences sur Bhakti-Yoga. 9. Entretiens et causeries. 10. Entretiens Inspires et autres ecrits. 11. Grecs et Hindous.

12. L Ideal d'une Religion Universelle. 13. Jnana-Yoga. 14. Karma-Yoga. 15. L'Homme reel et l'Homme apparent. 16. Man Maitre. 17. La Morale Vedantique : Pratyahara et Dharana. 18. Pensees choisies. 19. La Philosophie du Vedanta. 20. Raja Yoga ; ou, La conquete de la nature interieure. 21. Le Vedanta. 22. La Yoga de la Connaissance. 23. Les Yogas pratiques (Karma, Bhakti, Raja).

German :

1. Erkenntnisse des Hinduismus. 2. Gesprache auf den Tausend Inseln. 3. Hinduismus (Ansprache). 4. Jnana-Yoga. 5. Karma-Yoga. 6. Karma-Yoga und Bhakti-Yoga. 7. Praktischer Vedanta. 8. Raja-Yoga, mit den Yoga-Aphorismen des Patanjali. 9. So spricht Vivekananda. 10. Vivekananda, Ein Lebensbild und neun Vortrage.

Greek :

1. To idanika mias pagkosmias threskeias. 2. E Vedanta sten praxe.

Italian :

Raja-Yoga, La conquista della natura interiore.

Polish :

1. Bhakti Yoga. 2. Jnana Yoga. 3. Mon Maitre. 4. Raja Yoga.

Portuguese :

Raja Yoga ou conquista da natureza interna.

Russian :

1. Bhakti-Yoga. 2. Indouizm. 3. Jnana-Yoga. 4. Karma-Yoga. 5. Moi ouchitel. 6. Philosophia vedanti. 7. Philosophia Yoga (Raja Yoga). 8. Shest nastavlenyi o Raja-Yoga.

Spanish :

1. Aforismos de la Yoga de Patanjali. 2. Bhakti-Yoga (Sendero de Devocion). 3. Canto del Sannyasin. 4. Colleccion de Escritos. 5. Conferencias Teosoficas. 6. Conversaciones y Dialogos. 7. Correspondencia Epistolar. 8. Cosmos. 9. Discursos. 10. Discursos Sobre Filosofia Oriental. 11. Discursos y Coloquios. 12. Epopeyas de la Antigua India. 13. Filosofia Vedanta. 14. Jnana-Yoga (Sendero de Sabiduria). 15. Karma-Yoga (Sendero de accion). 16. Miscelanea Teosofica. 17. Ocho conferencias. 18. Platicas inspiradas, cartas selectas y otros escritos. 19. Platicas Sobre Filosofia Yoguistica. 20. Problemas de la India Modirna. 21. Raja-Yoga (Desenvolvimiento de la Naturaleza Interna). 22. Religion, sus metodos y proposito. 23. Un viaje por Europa. 24. Vedanta Practica.

Swedish :

Raja Yoga,

স্বামীজী-সম্পর্কিত বই

French :

1. Herbert, Jean—Introduction a l'etude des yogas hindous. 2. Herbert, Jean—Quelques grands penseurs de l'Inde moderne. 3. Nivedita, *Sister*—Vivekananda, tel que je L'ai vu. 4. Rolland, Romain—La Vie de Vivekananda ou l'Evangile Universel. 2vols.

German :

Rolland, Romain—Das Leben des Vivekananda.

Polish :

Herbert, Jean—Wielcy mysliciele Indyj wspolczesnych.

Portuguese :

Herbert, Jean—Alguns grandes pensadores da India moderna.

Spanish :

Herbert, Jean—La Sabiduria Hindu.

খ ॥ ভারতীয় ভাষা

বাঙ্গালা ঃ

স্বামীজী-রচিত বই

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (জন্ম শতবর্ষ স্মরণে)। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৬৩। ১০ খণ্ড। ৩০·০০ ও ৪০·০০ (শোভন সং)।

(১) অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫। ৬পৃ। ১৮ সেমি। ০·০৩।

(২) আদর্শ। হাওড়া, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার, ১৯৩০। ২৪পৃ। ১৭ সেমি।

(৩) আদর্শ কি—ত্যাগ না ভোগ? হাওড়া, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার, ১৯২৫ (?)। ০·১২।

(৪) আদর্শ-পুরুষ। ০·০৯।

(৫) আমায় মানুষ কর। হাওড়া, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার, ১৯২৫ (?)। ০·০৬।

(৬) আহ্বান। ০·০৬।

(৭) ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট। ৪র্থ সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৫৫। ৵০, ৩০পৃ। ১৮·৫ সেমি। ০·৩৭।

(৮) উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫ (?)। ০·০৯।

(৯) কথোপকথন। ২য় সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৩। ৵০, ১৩৮পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৬২।

(১০) কর্মকৌশল। ঢাকা, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১৯২৩। ।৵০, ১৭, [২], ১৫পৃ। ১৭ সেমি। ০·১৯।

গ্রন্থশেষে মূলাংশ 'Work and its secrets' সহ।

(১১) কর্মযোগ, স্বামী শুদ্ধানন্দ দ্বারা অনূদিত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০০। ১১৪পৃ। ১৭·৫ সেমি। ১·২৫।

(১২) কেশরী-নিনাদ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫ (?)। ০'১২।
ইংরেজী নামপত্র—Lion's roar.

(১৩) গৃহী-সন্ন্যাসী। হাওড়া, বেলুড় মঠ, ১৯২৯। ১২পৃ।

(১৪) চিকাগো বক্তৃতা। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০২। ।০, ৩৩পৃ। ১৮'৫ সেমি। ০'৫০।
পরিশিষ্ট : পৃ ২৯-৩৩।
—২য় সংস্করণ। (চিকাগো ধর্মসভায় সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা)। ৵০, ৫৮পৃ। ১৭ সেমি। ০'৩১।
পরিশিষ্ট : পৃ ৫৩-৫৮।

(১৫) (বিবেকানন্দ স্বামীর) চিকাগো বক্তৃতা [ও মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত], শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দ্বারা অনূদিত ও সম্পাদিত। কলিকাতা, অনুবাদক, ১৯২৭। ১২৭-১৫৮, ৮পৃ। ১৭'৫ সেমি। গ্রাহক সংখ্যা ০'১২ ; খুচরা সংখ্যা ০'১৯। (গীতা-পুরস্কার সিরিজ, ৪)।

(১৬) জ্ঞানযোগ। ৮ম সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫। ৪৪৪পৃ। ১'৫০।
প্রথম প্রকাশ ১৯০২।

(১৭) দেববাণী। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১৫। ৵০, ১৮৪পৃ। ১৮ সেমি। ০'৭৫।
S. E. Waldo লিখিত 'আমেরিকায় স্বামীজী' ও M. C. Franki লিখিত 'আচার্যদেব' সহ।
Inspired talks-এর বঙ্গানুবাদ।

(১৮) ধর্মবিজ্ঞান। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১০। ।৵০, ১৪৯ পৃ। ১৭'৫ সেমি। ১'০০।
The Science and philosophy of religion-এর বঙ্গানুবাদ।

(১৯) পওহারী বাবা। ৫ম সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৩১। ১৮ পৃ। ১৭'৫ সেমি। ০'১৯।
প্রথম প্রকাশ ১৯০৯।

(২০) পঞ্চোপচার।

(২১) পত্রাবলী। কলিকাতা, উদ্বোধন।
১ম ভাগ। ১৯০৫। ৵০, ১০০পৃ। ১৭ সেমি। ০'৫০।
২য় ভাগ। ২য় সং। ১৯১৬। ৵০, ১৬৮ পৃ। ১৭'৫ সেমি। ০'৬২।
৩য় ভাগ। ১৯১৬। ।০, ১৫৭পৃ। ১৮ সেমি। ০'৬২।
৪র্থ ভাগ। ২য় সং। ১৯২৫। ।০, ১৮১পৃ। ১৮ সেমি। ০'৬২।

৫ম ভাগ। ২য় সং। ১৯৩৪। ০·৬২।

(২২) পরিব্রাজক। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০৬। ।০, ১৬২পৃ। ১৮ সেমি। ০·৭৫।
উদ্বোধন পত্রিকায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' রূপে প্রকাশিত।

(২৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য। কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৯০২। ।০, ৮০পৃ। ১৮ সেমি। ০·৩৭।

(২৪) বঙ্গযুবকগণের প্রতি। হাওড়া, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার, ১৯৩১। ৮পৃ। ০·১২।

(২৫) বক্তৃতা ও পত্র। ০·২৫।

(২৬) বর্তমান ভারত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০৫। ।।৵০, ৬৬পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·২৫।

(২৭) বিবেকবাণী।

(২৮) বিবেকবাণী, রাধারমণ সেন দ্বারা সংকলিত। ৬ষ্ঠ সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫। ৵০, ৬৮পৃ। ০·১২।

(২৯) বিবেকানন্দবাণী, অমরেন্দ্রনাথ রায় দ্বারা সংকলিত। কলিকাতা, পঞ্চানন বাগচি, ১৯২৯। ।৵০, ৭৭পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৫০।
পরিশেষে সংকলকলিখিত প্রবন্ধ সহ।

(৩০) বিবেকানন্দবাণী, কুমারকৃষ্ণ নন্দী দ্বারা সংকলিত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৩৯। ৵০, ২১৩পৃ। ০·৭৫।

(৩১) বিবেকানন্দ-মাহাত্ম্য (পূজ্যপাদাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশবাণী), সুবর্ণপ্রভা সোম দ্বারা সংকলিত। কলিকাতা, কালীমোহন বুক স্টল, ১৯১৯। ৶০, ৮০পৃ। ১৬ সেমি। রাজ সং ০·৭৫ ; সাধারণ সং ০·৫০।

(৩২) বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ দ্বারা সংকলিত। কলিকাতা, দি আইডিয়েল এড্‌ভার্টাইজিং এজেন্সি, ১৯৬১। ৵০, ৯৮পৃ। ১১·৫ সেমি। ১·০০।

(৩৩) বীরবাণী। কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ১৯০৫। ।০, ৩২ পৃ। ১৮ সেমি।

(৩৪) বেদবাণী, মাখনলাল সরকার দ্বারা সংকলিত। ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, ১৯৫২। ।৵০, ৫৮ পৃ। ১২ সেমি। ০·৩১।
রামকৃষ্ণ বাণী (পৃ ১-১৭)। বিবেকানন্দবাণী (পৃ ১৭-৫৮)।

(৩৫) ভক্তিযোগ, স্বামী শুদ্ধানন্দ দ্বারা অনূদিত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০০। ৯৭পৃ। ১৭·৫ সেমি। ১·০০।

(৩৬) ভক্তিরহস্য। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১০। ।০, ২১০পৃ। ১৮ সেমি। ০·৬২।

(৩৭) ভাব ও ভাষা। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫ (?)। ০·৩০।

(৩৮) ভাববার কথা। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০৭। ।০, ৬৫পৃ। ১৮ সেমি। ০·৩১।

(৩৯) ভারত-কল্যাণ, স্বামী নির্বেদানন্দ দ্বারা সংকলিত ও অনূদিত। বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা), রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোম, ১৯৫৫। ।৵০, ১৩৫ পৃ। ১৮ সেমি। ১৩৭।

ভারত ও ভারতীয় সমস্যা সংক্রান্ত বাণীর চয়ন ও অনুবাদ।

(৪০) ভারতীয় নারী। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৩১। ॥০, ১১৮ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৭৫।

(৪১) ভারতে বিবেকানন্দ অর্থাৎ স্বামীজির আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার ভারত ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অভিনন্দন ও তাহার উত্তরসমূহ, তাঁহার ভারতীয় সমুদয় কুড়িটি বক্তৃতার উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রভৃতি। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯০৮। ।৵০, ৪০৪পৃ। ২১ সেমি। ১·৫০।

(৪২) ভারতের ধর্ম। হাওড়া, বেলুড় মঠ, ১৯৩১। ১১ পৃ। ১৭·৫ সেমি।

(৪৩) মদীয় আচার্যদেব। ৫ম সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৩১। ৬৫ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৩৬।

My master-এর বঙ্গানুবাদ।

প্রথম প্রকাশ ১৯০৯।

(৪৪) মহাপুরুষ প্রসঙ্গ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১৪। ।০, ১৫৬পৃ। চিত্র। ১৮ সেমি। ০·৬২।

(৪৫) মাতৃভূমি ভারত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৬৩। ০·৪০।

(৪৬) যুগবাণী, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ দ্বারা সংকলিত। ২য় সং। কাটোয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৯৫৩। ৫৪ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৫০।

প্রথম প্রকাশ ১৯৫২।

(৪৭) যুগভেরী, ব্রহ্মচারী মাধবচৈতন্য দ্বারা সংকলিত। ফরিদপুর, কার্তিকপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৯২২। ৪৭পৃ। ১৫·৫ সেমি। বিশেষ সং ০·৩১; সাধারণ সং ০·১৮।

(৪৮) যুগমন্ত্র। হাওড়া, পঞ্চানন্দ চৌধুরী, ১৯২৬। ১০+৯ পৃ। ১০ সেমি। ০·১২।
ইংরেজি—১০ পৃ। বাংলা—৯ পৃ।

(৪৯) রাজযোগ, ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ দ্বারা অনূদিত। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৮৯৮। ||৵০, ২৩৭ পৃ। ২১ সেমি। ১·৬২।

(৫০) [সরল] রাজযোগ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৯। ৪২ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·২৫।

(৫১) শিক্ষা। কলিকাতা, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯২৭। ৬১ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·২৫।

(৫২) শিক্ষা: শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। কলিকাতা, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯১৫। ০·২৫।
—২য় সং। ১৯১৭। ১৪ পৃ। ২০·৫ সেমি। ০·৫০।

(৫৩) শিক্ষাপ্রসঙ্গ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৫৫। ||০, ১৬২ পৃ। ১৮ সেমি। ১·৫০।

(৫৪) সখার প্রতি। হাওড়া, বেলুড় মঠ, ১৯৩০। ৪পৃ। ১২ সেমি।

(৫৫) সন্ন্যাসীর গীতি। ২য় সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১০। ৵০, [২৯পৃ]। ১২ সেমি। ০·০৬।
শেষভাগে Song of the Sannyasin.

(৫৬) স্বদেশ-মন্ত্র, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সংকলিত। কলিকাতা, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯২৫। ১৬·৫ সেমি। ০·২৫।

(৫৭) স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দ্বারা সংকলিত। মালদহ, গৌরাঙ্গ মিশন, ১৯৩৭। ৩২ পৃ। ০·১২।

(৫৮) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। চট্টগ্রাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ১৯২৪। ১৫ পৃ। ১৮ সেমি। ০·০৬।

(৫৮ক) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৫৬। ৩০৭ পৃ। ২·২৫।

(৫৯) স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১৩। ।০, ১৭১ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৬২।

(৬০) হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ। ০·০৯।

(৬১) হিন্দুধর্মের নব জাগরণ। ০·৩৭।

(৬২) হিন্দুধর্ম কি? কলিকাতা, এস সি মিত্র। ০·০২।

(৬৩) নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক, সংকলক। সঙ্গীত-কল্পতরু। কলিকাতা, আর্য পুস্তকালয়, ১৮৮৭। ৪৭৯+১৮ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ২·৫০।

বাঙ্গালা :

স্বামীজী-সম্পর্কিত বই

(১) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। কলিকাতা, এম সি সরকার।
১ম ভাগ। ভারত। ১৯৫৮। ।৵০, ২০৩ পৃ। ২২ সেমি। ৫·০০।
২য় ভাগ। আমেরিকা। ১৯৬১। ।৵০, ১৯৮ পৃ। ২২ সেমি। ৫·০০।

(২) অজিতা দেবী ও কানাইলাল ঘোষ। পরিব্রাজক। কলিকাতা, সুসাহিত্য সংসদ ; অ্যাকাডেমিকা দ্বারা পরিবেশিত, সেপ্টে ১৯৬১। ॥০, ২৯৩ পৃ। ২২ সেমি। ৫·০০।

(৩) অনিলচন্দ্র ঘোষ। যুগাচার্য বিবেকানন্দ—জীবন ও বাণী। ঢাকা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি, ১৯৩২। ৴০, ৯৮ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৭৫।

(৪) অন্নপূর্ণা দেবী। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, পলাশী ; নবগ্রন্থ কুটির দ্বারা পরিবেশিত, ১৯৬২। ১১৯ পৃ। ২১·৫ সেমি। ২·০০।

(৫) অপূর্বানন্দ, স্বামী। যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ। কলিকাতা, জেনারেল বুকস, ১৯৬৩। ৩·০০।

(৬) অভেদানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দ, ধীরানন্দ ঠাকুর দ্বারা ইংরেজী হইতে অনূদিত। কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫২। ।০, ৩২ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৫০।
"Swami Vivekananda and his work" এর বঙ্গানুবাদ।

(৬ক) অমরনাথ রায়। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ২য় সং। কলিকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরি, ১৯৬৩। ১·৭৫।

(৭) অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ। বিবেকানন্দ। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯১৮। ।০, ৭২ পৃ। ১৬ সেমি। ০·৩৭।

(৮) অসিত মুখোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, সুরেন্দ্রনাথ পাল, ১৯৪৯। ৪৪ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৭৫।

(৯) আগন্তুক, ছদ্মনাম। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, আর্ট ইউনিয়ন, [তানা]। ১৬ পৃ। ২১ সেমি। ০·৫০।

(১০) ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। স্বামী বিবেকানন্দ। ৩য় সং। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৪। ৭০ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৩৭।
প্রথম প্রকাশ ১৯১৮।

(১১) উদ্বোধন, কলিকাতা। স্বামীজীর কথা। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৭। ।৵০, ১৬৯ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৭৫।

(১২) কলিঙ্গনাথ ঘোষ। মহাত্মা গান্ধী ও স্বামী বিবেকানন্দ। জলপাইগুড়ি, গ্রন্থকার, ১৯৩৮। ৩২ পৃ। ০·১২।

(১৩) —স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র, সেবাধর্ম ও স্বদেশপ্রেম। জলপাইগুড়ি, গ্রন্থকার, ১৯৩৮। ।০, ৫৮ পৃ। ০·২৫।

(১৪) কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। স্বামীজীর জীবনকথা। ৫ম মুদ্রণ। কলিকাতা, কলকাতা প্রকাশন, ১৯৫৭। ১৮২পৃ। ১৮·৫ সেমি। ২·২৫।
প্রথম প্রকাশ ১৯৪০।

(১৫) কালীপদ চক্রবর্তী। অঙ্কুরে বিবেকানন্দ। কলিকাতা, বিশ্ববার্তা সাহিত্যাগার, ১৯৬৩। ৪৮ পৃ। ১৮ সেমি। ১·৫০।
স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটক।

(১৬) —বিলে থেকে বিবেকানন্দ। কলিকাতা, বিশ্ববার্তা সাহিত্যাগার, ১৯৬৩। ১১০ পৃ। ১৮ সেমি। ২·২৫।
নাটক।

(১৭) কিরণচন্দ্র দত্ত। সাধনা (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ)। কলিকাতা, শরৎ-সাহিত্য কুঞ্জ, ১৯২৪।

(১৮) কুমারচৈতন্য, ব্রহ্মচারী। হৃদিবান বিবেকানন্দ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫। ০·১২।

(১৯) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দী। কলিকাতা, কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, ১৯২৭। ৮০, ৪১৭পৃ। ২১·৫ সেমি। ৪·০০।

(২০) গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। মুক্তপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, প্রাচ্য ভারতী, ১৯৫০। ৩১৯পৃ। স্থলভ সং ৫·০০; শোভন সং ৬·০০।

(২০ক) চণ্ডিকানন্দ, স্বামী। বিবেকানন্দ লীলাগীতি। কলিকাতা, স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, ১৯৬২। ॥০, ৮৪ পৃ। ১৮ সেমি। ১·০০।

(২১) তামসরঞ্জন রায়। জাগোরে ধীরে। কলিকাতা, কলিকাতা পুস্তকালয়, ১৯৬৩। ২৯পৃ। ১৭·৫ সেমি। ১·০০।
ছায়ানাট্য।

(২২) —বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা। কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স, ১৯৬৩। ।০, ১৭০ পৃ। ১৮ সেমি। ৪·০০।

(২৩) —যুগাচার্য বিবেকানন্দ। কলিকাতা, কলিকাতা পুস্তকালয়, ১৯৬৩। ।০, ১৬৭ পৃ। ২১·৫ সেমি। ৪·০০।

(২৪) —স্বামী বিবেকানন্দ। ২য় সং। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৫৩। ॥৵০, ১০৪পৃ। ১৭ সেমি। ১·৫০।
প্রথম প্রকাশ ১৯৫০।

(২৫) ত্র্যম্বকানন্দ, স্বামী। বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ, বিদ্যার্থী শ্রীরামকুমার কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, সম্পাদক, ১৯২৫। ৵০, ১৪পৃ। ১৮·৫ সেমি। ০·১২।

(২৬) দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ কখন ও কেন আসিয়াছিলেন। কলিকাতা, জীবনরঞ্জন রায়চৌধুরী ও দিবাকর রায়, ১৯৫০। ॥৵০, ১১৫ পৃ। ১·০০।

(২৭) দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৩। ৫·০০। (যন্ত্রস্থ)

(২৮) দেবেন্দ্রনাথ দাসচৌধুরী। বিবেকানন্দের ছাত্রজীবন। চট্টগ্রাম, কোহিনুর প্রেস, ১৯৩২। ।০, ৫০ পৃ। ০·২৫।

(২৯) দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিবেকানন্দ। কলিকাতা, ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন, ১৯২০। ৵০, ৩২পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·১৯। (কল্পতরু গ্রন্থাবলী)।

(৩০) দ্বিজপদ ভট্টাচার্য। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, বাণীরূপা সাহিত্য-সদন, ১৯৫১। ।০, ৯২ পৃ। ১৮ সেমি। ১·৫০।

(৩১) নগেন্দ্রকুমার গুহরায়। বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ। কলিকাতা, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, ১৯১৩। ॥৵০, ৮৯ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৫০।

(৩২) নিবারণ সেন। (শ্রীশ্রী) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনী ও বাণী। কলিকাতা, তারকচন্দ্র গুহ, ১৯৫০। ॥০, ৮২ পৃ। ১৮ সেমি। ১·০০।

(৩৩) নিবেদিতা, ভগিনী। স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, স্বামী মাধবানন্দ দ্বারা ইংরেজী হইতে অনূদিত। কলিকাতা, উদ্বোধন, [তানা]। ৪২০পৃ। ৪·০০।
'The master as I saw him'-এর বঙ্গানুবাদ।

(৩৪) —স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১৭। ।০, ১৩৪ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৭৫।
'Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda'-এর বঙ্গানুবাদ।

(৩৫) নিরাময়ানন্দ, স্বামী। ছোটদের বিবেকানন্দ। কলিকাতা, স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, ১৯৬৩। ।৵০, ৫৮ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৫০।

(৩৬) নির্লেপানন্দ, স্বামী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯৪৫। ।৵০, ২৫৮ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৮৭।

(৩৭) পদ্মনাথ ভট্টাচার্য। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। বারাণসী, ভারতধর্ম প্রেস, ১৯২৪। ৵০, ১৬৮ পৃ। ১৮ সেমি।

(৩৮) পরেশ ধর। বিবেকানন্দ। কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬২। ।৵০, ১০৬ পৃ। ১৮ সেমি। ২·৫০।
স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটক।

(৩৯) পূর্ণানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব রহস্য। বজবজ, বিবেকানন্দ সংঘ, ১৯৬৩। ৵০, ৮২ পৃ। ১৫·৫ সেমি। ০·৯০।

(৪০) প্রণবরঞ্জন ঘোষ। বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৬৩। ॥৵০, ১৮৩ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ৫·০০।

(৪১) প্রমথনাথ বসু। স্বামী বিবেকানন্দ।
১ম ও ২য় খণ্ড। কলিকাতা, গ্রন্থকার, [তানা]। ৩৯৪পৃ। ১৭ সেমি। ১·০০ (প্রতিখণ্ড)।
৩য় খণ্ড। কলিকাতা, প্রকাশচন্দ্র বসু, ১৯১৯। ।৵০, ৩৯৫-৬২৬পৃ। ১৭ সেমি। ১·০০।
৪র্থ খণ্ড। কলিকাতা, প্রকাশচন্দ্র বসু, ১৯২০। ।৵০, ৬২৭-১১০৬ পৃ। ১৭ সেমি। ১·০০।
—২য় সং উদ্বোধন কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত।

(৪২) প্রিয়রঞ্জন সেন। বিবেকানন্দ চরিত। ২য় সং। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩২। ।৵০, ৬৩পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৩০।

(৪৩) প্রেমঘনানন্দ, স্বামী। বিবেকানন্দের কথা ও গল্প। ২য় সং। দেওঘর, রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, ১৯৪১। ৵০, ৯৬পৃ। ০·৬২।
প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬।

(৪৪) বিজয়চণ্ডী রায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গীতাঞ্জলি। কলিকাতা, মাধুরীলতা রায়, [তানা]। ॥৵০, ২৩৫পৃ। ২১·৫ সেমি। ৪·২৫।
২য় ভাগে স্বামীজীর জীবনী ও বাণী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ।

(৪৫) বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। বিবেকানন্দের রাজনীতি। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৬৩। ১৷৹০, ১১১পৃ। ১৮ সেমি। ২·৫০।

(৪৬) বিধায়ক ভট্টাচার্য। বাংলার বিবেক। কলিকাতা, দেবসাহিত্য কুটির, ১৯৫৬। ৫২পৃ। ১৮·৫ সেমি। ০·৬২।

স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটক।

(৪৭) বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রীতি। কলিকাতা, সমিতি, ১৯০৮। ২১ পৃ। ১৬ সেমি। ০.০৬।

(৪৭ক) দিগল সাহা। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৩। ৩.০০।

(৪৮) বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী, ১৯৬৩। ৷৷০, ১২৪ পৃ। ২১.৫ সেমি। ১.০০।

(৪৯) ভূতনাথ ভৌমিক। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, ভারতী বুক ষ্টল, ১৯৬৩। ৷০, ১৪০ পৃ। ২১.৫ সেমি। ৩.০০।

(৫০) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ৫.০০।

(৫১) মণি বাগচি। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স, ১৯৫৯। ৶০, ১২৪ পৃ। ২১.৫ সেমি। ২.০০।

M. L. Burke-এর 'Swami Vivekananda in America : New Discoveries' গ্রন্থ অবলম্বনে।

(৫২) —ছোটদের বিবেকানন্দ। কলিকাতা, কমলা বুক ডিপো, ১৯৫৩। ১৪৪ পৃ। ১৮.৫ সেমি। ২.০০।

(৫৩) —সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৩। ৷৶০, ১৯৩ পৃ। ২১ সেমি। ৫.০০।

(৫৪) —সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী। কলিকাতা, সুতপা প্রকাশনী ; শিক্ষাভারতী দ্বারা পরিবেশিত, ১৯৩৬। ৷৷০, ১১২পৃ। ২১.৫ সেমি। ৩.০০।

(৫৫) মতিলাল রায়। যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। কলিকাতা, প্রবর্তক, ১৯২৬। ৷০, ১৪৯ পৃ। ১৭.৫ সেমি। ১.৫০।

(৫৬) মনোরম গুহঠাকুরতা। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, আশুতোষ লাইব্রেরি, ১৯২৬। ৷০, ১০৮ পৃ। ১৭.৫ সেমি। ০.৪৭।

(৫৭) মহেন্দ্রনাথ দত্ত। (শ্রীমৎ) বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত। কলিকাতা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি।

১ম খণ্ড। ২য় সং। ১৯৫৭। ১৷৶০, ৩০৯ পৃ। ১৯ সেমি। ৩.২৫।

পূর্ববর্তী সং ১৯২৪।

২য় খণ্ড। ২য় পরিমার্জিত সং। ১৯৬০। ১৲, ২৩০ পৃ। ১৯ সেমি। ৩.০০।

পূর্ববর্তী সং ১৯২৫।

৩য় খণ্ড। ২য় পরিমার্জিত সং। [তানা]। ৮০, ১২৮ পৃ। ১৭'৫ সেমি। ৩'০০।

পূর্ববর্তী সং ১৯২৬।

(৫৮) —লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ।

১ম খণ্ড। কলিকাতা, যুগান্তর বাণীভবন, ১৯৩১। ৵০, ১৮৩ পৃ। ১৭'৫ সেমি। ১'৫০।

২য় খণ্ড। কলিকাতা, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৯৩৮। ১৮৬ পৃ। ১৭'৫ সেমি। ৩'০০।

২য় খণ্ডে 'রাজযোগ' সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নের সমাধান।

(৫৯) —স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী। কলিকাতা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৯৬০ (?)। ॥০, ৭৪ পৃ। ১৮ সেমি। ১'২৫।

(৬০) মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও সদাশিবানন্দ, স্বামী। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯২৫। ৵০, ৮৮ পৃ। ১৮'৫ সেমি। ০'৭৫।

(৬১) মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। বিবেকানন্দ চরিত।

(৬২) মুক্তিপ্রাণা, প্রব্রাজিকা। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ। দক্ষিণেশ্বর, সারদামঠ, ১৯৬৩। ।০, ২২০পৃ। ১৮ সেমি। ২'৭৫।

(৬৩) মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, নবভারতী, ১৯৫৭। ৪৮৮ পৃ। ৭'৫০।

(৬৪) মোহিতলাল মজুমদার। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, জেনারেল প্রিণ্টার্স, ১৯৬৩। ।৵০, ১৮৪ পৃ। ১৮'৫ সেমি। ৫'০০।

(৬৫) যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীজী। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটির, ১৯৫১। ৭২ পৃ। ১৮ সেমি। ০'৬২।

(৬৬) রাণা বসু। স্বামী বিবেকানন্দ। ২য় মুদ্রণ। কলিকাতা, বাক্-সাহিত্য, ১৯৬৩। ৪৮ পৃ। ২১'৫ সেমি। ১'০০।

প্রথম প্রকাশ অগস্ট, ১৯৬২।

(৬৭) রোলাঁ, রোমাঁ। বিবেকানন্দের জীবন, ঋষি দাস দ্বারা ইংরেজী হইতে অনূদিত। কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, [তানা]। ২৮৪ পৃ। ৬'০০।

মূলগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় 'La Vie de Vivekananda ou l'Evangile universal' নামে প্রকাশিত।

ইংরেজী নাম : The life of Vivekananda and the universal gospel.

(৬৭ক) লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, ডি আর ডি পাবলিকেশনস, ১৯৬৩। ‖০, ২৩১ পৃ। ২১ সেমি। ৩.৫০।

(৬৮) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামিশিষ্যসংবাদ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯১৩। পূর্বকাণ্ড। ৮০, ২২৩ পৃ। ১৭ সেমি। ১.০০।
উত্তরকাণ্ড। ‖৶০, ২২২ পৃ। ১৭ সেমি। ১.০০।

(৬৯) শশিভূষণ ঘোষ। স্বদেশের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ। ঢাকা, সিটি প্রেস, ১৯২৮। ১৭ পৃ। ১৭.৫ সেমি। ০.০৬।

(৭০) শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ছেলেবেলার বিবেকানন্দ। কলিকাতা, শিশু-সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৩। ৭০ পৃ। ২৪ সেমি। ২.০০।

(৭১) শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। পরিব্রাজকাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার উপদেশ, পত্র ও চিকাগো বক্তৃতার সারাংশ। কলিকাতা, রামকৃষ্ণ-সাহিত্য প্রচার সংঘ, ১৯২৭। ৪১-৯৬ পৃ। ১৮.৫ সেমি। খুচরা সংখ্যা ০.৩১। গ্রাহক সংখ্যা ০.১৯। (গীতা পুরস্কার সিরিজ)।

(৭২) শুদ্ধানন্দ, স্বামী। বিদ্যার উৎসাহদাতা স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, উদ্বোধন, ১৯২৫। ০.১২।

(৭৩) শ্যামানন্দ, স্বামী। বিবেকানন্দ কাব্য-লহরী। কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ, [তানা]। ৪.০০।

(৭৪) শ্রদ্ধানন্দ স্বামী। বাঙ্গালার বিবেকানন্দ।

(৭৪ক) শ্রীশরণাপুরী। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। সিউড়ী, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৯৬৩। ২৫৮ পৃ। ২২ সেমি। ৪.০০।

(৭৫) শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী। ছোটদের বিবেকানন্দ। কলিকাতা, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৭। ৯৪ পৃ। ১৮ সেমি। ১.২৫।

(৭৫ক) সত্যঘনানন্দ, স্বামী। আমাদের বিবেকানন্দ। বেলঘরিয়া, রামকৃষ্ণ-মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, ১৯৬৩। ।০, ৮৪ পৃ। ১৮.৫ সেমি। ০.০৬। (বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা, ৫)।

(৭৬) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ছেলেদের বিবেকানন্দ। ৬ষ্ঠ সং। কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৫৮। ।৶০, ৯০ পৃ। ১৮ সেমি। ১.২৫।

(৭৭) —(শ্রীমৎ) বিবেকানন্দ চরিত। কলিকাতা, ইকনমিক্ বুক ডিপো, ১৯১৯। ১৶০, ৪৬১ পৃ। ১৭ সেমি। ২.৫০।

(৭৮) —স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৯২৬। ৵০, ৭০ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ০·৩৬। (শিশুতোষ সিরিজ, ৪৫)।

(৭৯) সরলাবালা সরকার। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৭। ।৵০, ২২৪ পৃ। ৪·৫০।

(৮০) সুন্দরানন্দ, স্বামী। জাতীয় সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ। কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৫২। ।০, ১+২০১ পৃ। ১৭·৫ সেমি। ২·৫০।

(৮১) সুবোধচন্দ্র মজুমদার। স্বামী বিবেকানন্দ! ২য় সং। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩৪। ৮৪ পৃ। ০·১৯।

(৮২) সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ত্রয়ী। কলিকাতা, গ্রন্থকার, ১৯৩০(?)। ৫৩ পৃ। ১·০০।

(৮৩) সুরেশচন্দ্র দাস ও মাধবচন্দ্র পাল। বিবেকানন্দ স্মৃতি। ০·৩৬।
কবিতায় স্বামীজীর কথা।

(৮৪) সুশীলকুমার দেব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। হাওড়া, বেলুড় মঠ, ১৯২৫ (?)।

(৮৫) স্বপনকুমার, ছদ্মনাম। দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দ। কোন্নগর, অরুণালয়, দেবসাহিত্য কুটির, কলিকাতা, দ্বারা পরিবেশিত, ১৯৫৬। ৪০ পৃ। ১৮ সেমি। ০·৫০।

(৮৬) স্বামীজী। হাওড়া, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচার, ১৯৩৪। ৫পৃ।

(৮৭) হৃদয়নাথ চক্রবর্তী। (শ্রীশ্রী) রামকৃষ্ণ বিবেকোল্লাস, স্বামী সারদানন্দ দ্বারা সঙ্কলিত। কলিকাতা, তারাগতি ভট্টাচার্য, ১৯১৬। ৭২ পৃ। ১৮ সেমি।
কবিতায় রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাখ্যান ও তত্ত্ব।

স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি স্মারকগ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এর বিস্তৃত তালিকা 'উদ্বোধনে' (ফাল্গুন, ১৩৬৯) দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষা

অসমীয়া ঃ

ভারত-কল্যাণ।

উর্দু ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ স্বামীজীকে জীবন কী মুখতসর কহানী।

ওড়িয়া :

স্বামীজীরচিত বই

(১) পাওহারী বাবা। (২) বর্তমান ভারত। (৩) বেদান্তর বার্তা। (৪) মদীয় আচার্যদেব।

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

(১) জগন্নাথানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দ।
(২) ভারতচন্দ্র দত্ত। ভারতর মুক্তিপাগল বিবেকানন্দ।
(৩) শশিভূষণ রায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

কান্নাডা :

স্বামীজীরচিত বই

1. Anusthana Vedanta. 2. Bhakti: Gauna mattu para. 3. Bhaktiyoga. 4. Bharata mahile. 5. Chicago upanyasa. 6. Colombo inda Almorakke. 7. Devaduta Esukrishta. 8. Dhyana. 9. Dhyanatege dari. 10. Divyavani 11. Hindu-dharmasara. 12. Isvaranuraga. 13. Jananamarga. 14. Jnana-yoga. 15. Karmarahasya. 16. Karmayoga. 17. Mumuksha lakshana. 18. Nanna Gurudeva. 19. Nanna jivana mattu dhyeya. 20. Parivrajaka. 21. Patragalu. 22. Patramale. 23. Pavahari Baba. 24. Prachya mattu Paschatya. 25. Rajayoga. 26. Sadhana. 27. Samvadatarangini. 28. Vartamana Bharat. 29. Vedanta. 30. Vidyabhyasa. 31. Vivekavani.

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

1. Govinda Venkatesa Chulki. Swami Vivekananduru.
2. K. V. Puttappa. Swami Vivekananda.
3. Niramayananda, *Swami*. Swami Vivekananda (Balakari-gagi)
4. Swami Vivekananda.

গুজরাতী :

স্বামীজীরচিত বই

(১) কর্মযোগ (২) কেলবাণী (৩) জ্ঞানযোগ (৪) পাতঞ্জল যোগসূত্র (রাজযোগ) (৫) পত্রো (৬) বহেনোনে (৭) বিবেকানন্দ বিচারমালা (৮) বিবেকানন্দ সার (৯) বীরবাণী (১০) যুবানোনে (১১) রাজযোগ (১২) স্বামী বিবেকানন্দন বচনামৃত (১৩) স্বামী বিবেকানন্দন সদুপদেশ ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে ।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

(১) চৈতন্যানন্দ, স্বামী । স্বামী বিবেকানন্দ ।
(২) জপানন্দ, স্বামী ও জয়ন্তীলাল এম ওঝা । স্বামী বিবেকানন্দ ।
(৩) ডাহ্যাভাই মেহতা । স্বামী বিবেকানন্দন জীবনচরিত ।
(৪) ধনবন্ত ওঝা । স্বামী বিবেকানন্দ ।
(৫) মানুভাই পঞ্চোলী । ত্রিবেণীতীর্থ ।
(৬) রামপ্রসাদ দেশাই । স্বামী বিবেকানন্দন জীবনচরিত ।
(৭) স্বামী বিবেকানন্দ ।

তামিল :

স্বামীজীরচিত বই

1. Amerikka prasangam. 2. Bhaktiyogam. 3. Chicago prasangam. 4. Enaṭu por murai. 5. Indiya prasangankal. 6. Indiyavin etirkala nilamai, Indiya vazkkaiyil Vedanta nilamai. 7. Jnanadipam. 8. Jnanayoga vilakkam. 9. Kalvi. 10. Karmayogam. 11. Namatu taynatu. 12. Pantamum muktiyum. 13. Rajayogam. 13. Swami Vivekanandar sambhashanaikal. 15. Tarkala Indiya. 16. Viramurasu.

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে ।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

1. Chidbhavananda, *Swami*. Sri Vivekananda charitram.
2. Ramaswami. A. Vivekanandar aticchuvattil.
3. Varadarajayyangar, S. V. Srimat Vivekananda Swamikal virivanadivya charitram.

তেলুগু :

স্বামীজীরচিত বই

1. Bhaktiyogamu. 2. Bharata yuvajanulara. 3. Bharatadesamu. 4. Bharatiya mahila. 5. Hindumatamu. 6. Jnanayogamu. 7. Kulamu, samskriti, samyavadamu. 8. Lekhavali. 9. Na jivitamu-jivita karyamu. 10. Pavaharibaba. 11. Prabodha ratnakaramu. 12. Prachyamu. paschatyamu. 13. Sandesa tarangini. 14. Viveka suryodayamu.

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

1. Gopalakrishna, Rentala. Vivekanandaswami.
2. Nehru, Jawaharlal. Ramakrishnadu, Vivekanandaswami.
3. Niramayananda, *Swami*. Balala Vivekanandudu. (*In press*)
4. Ramabhadrayya, Vangipurapu. Atmadesikudu.
5. Venkatasubrahmanyam, Dhulipala. Narendrudu.
6. Viswasrayananda, *Swami*. Swami Vivekananda. (*In press*)

নেপালী :

ইন্দ্র সাঙাস। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ র তিনকা দুই চেলা। (স্বামী বিবেকানন্দ র স্বামী অভেদানন্দ)।

পাঞ্জাবী :

(১) নিরাময়ানন্দ, স্বামী। বচ্চিয়াঁ দে বিবেকানন্দ। (যন্ত্রস্থ)
(২) বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

মরাঠী :

স্বামীজীরচিত বই

(১ ক) কর্মযোগ, কৃষ্ণাজী নারায়ণ আঠল্যে দ্বারা অনূদিত। (১খ) কর্মযোগ,

শঙ্কর বিঠ্ঠল কদম দ্বারা অনূদিত। (২) কর্মরহস্য। (২ক) খাজগী পত্রেঁ। (৩ ক) জ্ঞানযোগ (পূর্বার্ধ), শ্রীকৃষ্ণ নীলকণ্ঠ চাফেকর দ্বারা অনূদিত। (৩খ) জ্ঞানযোগ, স্বামী শিবতত্ত্বানন্দ দ্বারা অনূদিত। (৪) দৈবীবাণী। (৫) পবহারী বাবা। (৬) পুনর্জন্ম আণি আত্ম্যাচেঁ অমরত্ব। (৬) পূর্ব আণি পশ্চিম। (৮) পূর্ব আণি পাশ্চাত্য। (৮ক) বাণী ব বিচার, বি. গো. আপটে দ্বারা সংকলিত। (৯) বিবেক-গুটিকা। (১০) বিবেকানন্দ কায় ম্হণালে। (১১) বিবেকানন্দ বচনামৃত। (১২) বেদান্ত আণি জীবন। (১৩) বেদান্তাচেঁ স্বরূপ আণি প্রভাব। (১৪) ভক্তি। (১৫ক) ভক্তিযোগ, কৃষ্ণাজী নারায়ণ আঠল্যে দ্বারা অনূদিত। (১৫খ) ভক্তিযোগ, গুণগ্রাহী দ্বারা অনূদিত। (১৬) ভারত ব ত্যাপুঢীল প্রশ্ন। (১৬ক) ভারতীয় নারী। (১৭) মহাত্মা পরিচয়। (১৮) মহাপুরুষাঞ্চেঁ জীবনকথা। (১৯) মাঝেঁ গুরুদেব। (২০) মাঝেঁ জীবন আণি কার্য। (২১) মুলাখতী ব সম্ভাষণেঁ। (২২) য়ুরোপান্তীল প্রবাসাচী টিপণেঁ। (২৩) রাজযোগ। (২৪) শিক্ষণ। (২৪ক) সমগ্র গ্রন্থ, ১৩ খণ্ডে। (২৫) সংবাদ আণি সম্ভাষণেঁ। (২৬) সর্বজনীন ধর্ম। (৩৭) সামর্থ্যবান সন্দেশ। (২৮) স্বামী বিবেকানন্দ যাঁচ্যা বোধপর উক্তি। (২৯) স্বামী বিবেকানন্দাঁচীঁ পত্রেঁ। (৩০) হিন্দু ধর্মাচেঁ নব-জাগরণ।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

(১) কৃষ্ণা নায়কু সুতার। মুলাঞ্চে বিবেকানন্দ।
(২) কৃষ্ণাজী নারায়ণ আঠল্যে। বিবেকানন্দ জীবন।
(৩) গুণাতীতানন্দ, স্বামী। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ (জীবন রহস্য)।
(৪) গো শ্রী বনহট্টী। বিবেকানন্দ: জীবন ব তত্ত্বজ্ঞান। (যন্ত্রস্থ)
(৫) জগন্নাথ রাবজী টুল্লু। স্বামী বিবেকানন্দ।
(৬) টি জি বাপট। স্বামী বিবেকানন্দ।
(৭) বিনায়ক সদাশিব সুখঠণকর। বিবেকানন্দাচ্যা বোধকথা।
(৮) বিনায়ক ভি পেঁডসে। রাষ্ট্রদ্রষ্টে স্বামী বিবেকানন্দ বোধকথা।
(৯) বৃহী বী নাইক। শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দ সুধা।
(১০) ভাউ শ্রীধর কুলকর্ণী। বাল স্বামী বিবেকানন্দ।
(১১) ভাস্কর বিষ্ণু ফডকে, রামকৃষ্ণ বাসুদেব বর্বে ও আর এন মণ্ডলিক। স্বামী বিবেকানন্দ যাচেঁ চরিত্র।
(১২) ভাস্কর বিষ্ণু ফডকে ও রামকৃষ্ণ বাসুদেব বর্বে। শ্রীমৎ পরমহংস স্বামী-বিবেকানন্দ যাঁচে চরিত্র।
(১৩) ভীমরাও বলবন্ত কুলকর্নী। স্বামী বিবেকানন্দ।

(১৪) মাধব সদাশিব গোলবলকর। শিকাগো ধর্মপরিষদেন্তীল বিবেকানন্দচীঁ ব্যাখ্যানেঁ।

(১৫) যদুনাথ দত্তাত্রেয় থত্তে। স্বামী বিবেকানন্দ।

(১৬) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দাঁচ্যা সহবাসাঁত; বৃহী এস বিনোডেকর দ্বারা অনূদিত।

(১৭) শ্রীকান্ত গোগটে। স্বামী বিবেকানন্দ।

(১৮) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। স্বামী বিবেকানন্দ চরিত্র।

(১৯) হরিপদ মিত্র, স্বামী শুদ্ধানন্দ ও হৃদয়নাথ সিংহ। বিবেকানন্দাচ্যাঁ আঠবাণী; বৃহী এস বিনোডেকর দ্বারা অনূদিত।

(২০) স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতাব্দি স্মৃতি-গৌরব। নাসিক, জন্মশতাব্দি মহোৎসব সমিতি।

মালয়ালম :

স্বামীজীরচিত বই

1. Bhaktiyogam. 2. Chicago prasangangal. 3. Ente jivitavum jivita krityavum. 4. Jnanayogam. 5. Karmmavum atinte marmmavum. 6. Karmmayogam. 7. Kizhakkum patinjarum. 8. Prayogika vedantam. 9. Rajayogam. 10. Swami Vivekanandante kattukal. 11. Vidyabhyasam. 12. Visvamatadarsam.

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

1. Krishna Variyar, A. G. Swami Vivekanandan.
2. Raman Menan, K. Vivekanandacharitam.

হিন্দী :

স্বামীজীরচিত বই

(১) আত্মানুভূতি তথা উনকে মার্গ। (১ক) ঈশদূত ঈশা। (২ক) কর্মযোগ, বদরীদত্ত শর্মা দ্বারা অনূদিত। (২খ) কর্মযোগ, বিদ্যাভাস্কর শুক্ল দ্বারা অনূদিত। (২গ) কর্মযোগ, রামবিলাস শর্মা দ্বারা অনূদিত। (২ঘ) কর্মযোগ। নাগপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (২ঙ) কর্মযোগ। লক্ষ্ণৌ, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং

হাউস হইতে প্রকাশিত। (২চ) কর্মযোগ। দিল্লি, সন্মার্গ প্রকাশন হইতে প্রকাশিত। (৩) গুরুশিষ্য সংবাদ। (৪) চিন্তনীয় বাতেঁ। (৫ক) জ্ঞানযোগ, জগন্মোহন বর্মা দ্বারা অনূদিত। (৫খ) জ্ঞানযোগ। নাগপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (৬ক) ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মানন্দ দ্বারা অনূদিত। (৬খ) ধর্মবিজ্ঞান। নাগপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (৭) ধর্মরহস্য। (৭ক) পাতঞ্জল যোগদর্শনবিবেক। (৮ক) পত্রাবলী। দেহরাদুন, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (৮খ) পত্রাবলী, ২য় ভাগ। নাগপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (৯) পবহারী বাবা। (১০) পরিব্রাজক। (১১ক) প্রাচ্য ঔর পাশ্চাত্য। নাগপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (১১খ) প্রাচ্য ঔর পাশ্চাত্য। আগ্রা, রামপ্রসাদ গর্গ কর্তৃক প্রকাশিত। (১২) প্রেমযোগ। (১২ক) বর্ত্তমান ভারত। (১৩) বিবিধ প্রসঙ্গ। (১৪) বিবেক রচনাবলী। (১৫) বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী, খণ্ড ১-৪। (১৬) বিবেকানন্দ জী কী কথায়েঁ। (১৭) বিশ্বশান্তি কা সন্দেশ। (১৮) বেদবাণী। (১৯) বেদান্ত ধর্ম। (২০) ব্যবহারিক জীবনমেঁ বেদান্ত। (২১) ভক্তি। (২২ক) ভক্তি ঔর বেদান্ত, রামবিলাস শর্মা দ্বারা অনূদিত। (২২খ) ভক্তি ঔর বেদান্ত। লক্ষ্ণৌ, অশোক প্রকাশন হইতে প্রকাশিত। (২২গ) ভক্তি ঔর বেদান্ত। দিল্লি, সন্মার্গ প্রকাশন হইতে প্রকাশিত। (২৩ক) ভক্তিযোগ, বিদ্যাভাস্কর শুক্ল দ্বারা অনূদিত। (২৩খ) ভক্তিযোগ, রূপনারায়ণ পাণ্ডে ও আদিত্য শর্মা দ্বারা অনূদিত। (২৩গ) ভক্তিযোগ। দিল্লি, সন্মার্গ প্রকাশন হইতে প্রকাশিত। (২৩ঘ) ভক্তিযোগ। লক্ষ্ণৌ, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। (২৪) ভক্তি রহস্য। (২৫) ভারতমেঁ বিবেকানন্দ। (২৬) ভারতীয় নারী। (২৭) মদীয় আচার্যদেব। (২৮ক) মরণোত্তর জীবন, দ্বারকানাথ তিবারী দ্বারা অনূদিত। (২৮খ) মরণোত্তর জীবন। এলাহাবাদ, রামদয়াল অগ্রবাল কর্তৃক প্রকাশিত। (২৯ক) মহাপুরুষোঁ কী জীবন গাথায়েঁ, হরিবল্লভ জোসী দ্বারা অনূদিত। (২৯খ) মহাপুরুষোঁ কী জীবন গাথায়েঁ। দেহরাদুন, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (৩০ক) মেরা জীবন তথা ধ্যেয়। এলাহাবাদ, রামদয়াল অগ্রবাল কর্তৃক প্রকাশিত। (৩০খ) মেরা জীবন তথা ধ্যেয়। দেহরাদুন, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত। (৩১) মেরী সমরনীতি। (৩২) মেরে গুরুদেব। (৩৩) মোক্ষ কা মার্গ। (৩৪ক) রাজযোগ অর্থাৎ অন্তপ্রকৃতি কী বিজয়, রামবিলাস শর্মা দ্বারা অনূদিত। (৩৪খ) রাজযোগ। নাগপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত। (৩৫) শক্তিদায়ী বিচার। (৩৬) শিকাগো বক্তৃতা। (৩৭) সরল রাজযোগ। (৩৮) হিন্দুধর্ম। (৩৯) হিন্দুধর্ম কে পক্ষমেঁ।

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বামীজীসম্পর্কিত বই

(১) ওঙ্কারনাথ শ্রীবাস্তব। স্বামী বিবেকানন্দ।

(২) গণেশ পাণ্ডেয়। স্বামী বিবেকানন্দ।

(৩) গোবিন্দ শাস্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দজী কা জীবনী ঔর ব্যাখ্যান।

(৪) জপানন্দ, স্বামী। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ।

(৫) ঝাবরমল্ল শর্মা, পণ্ডিত। খেতড়ী-নরেশ ঔর বিবেকানন্দ।

(৬) নন্দকুমার দেব শর্মা। স্বামী বিবেকানন্দ।

(৭) প্রেমচন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ।

(৮) বিনোদ। স্বামী বিবেকানন্দ।

(৯) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। বিবেকানন্দজী কে সংগমেঁ, এস এম গোস্বামী দ্বারা অনূদিত।

(১০) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিবেকানন্দ চরিত, মোহিনীমোহন গোস্বামী দ্বারা অনূদিত ।